# মনুষ্যত্বের সাধনা

বা

## আর্য্যঋষির মতে নরত্ব ও নারীত্বের সার্থকতা

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত

# মনুষ্যত্বের সাধনা

বা

( আর্য্যঋষির মতে নরত্ব ও নারীত্বের সার্থকতা। )

সৎগুরু প্রসাদী গ্রন্থাবলী -৩

বিষ্ণুপুরাণ

কঃ কেন হন্যতে জন্তু কঃ কেন রক্ষতে

হন্তি রক্ষতি চৈবায়ং হ্যসৎ সাধু সমাচরণ ॥

অনুবাদ :

কেহ না বিনাশে প্রাণী কেবা রাখে তারে।

অসৎ আচারে নাশে রাখে সদাচারে ॥

সেই সদাচার ঋষি প্রকাশ-কারণ।

হিন্দুধর্ম্ম নামে স্থানে শাস্ত্রানুশাসন ॥

---

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন গুপ্তেন গ্রথিত।

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ ১৩৪৩ সন

প্রিণ্টার—শ্রীকানাই লাল সরকার

প্রচার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

সাহায্য—১৲ মাত্র

বাঁধাই—১৷৷০ ,,

ওঁ হরি।

# উৎসর্গ পত্র।

পূর্ণ তপস্যা ও ত্যাগের মূর্ত্তি,

পুণ্য-চরিত, মহাজ্ঞানবতী, পবিত্র-আর্য্যবিধবার

পূর্ণাদর্শ, অকৃত্রিম স্নেহ-নির্ঝর মাতৃত্বের

পূর্ণস্বরূপ, পরম ভাগবত-ভক্তিমতি

**শ্রীশ্রীত্রিপুরানন্দতীর্থ**

মাতাজির পবিত্র নামে

**এই গ্রন্থ উৎসর্গিত হইল॥**

মা! জানিনা পূর্ব্বজন্মের কত সুকৃতির ফলে, আমার মত অযোগ্যও তোমার মত মায়ের স্নেহের পরশ ও আশীর্ব্বাদের অধিকার লাভ করিল। মা তুমিই উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া আমার মত মূর্খদ্বারাও এই প্রবন্ধ লিখাইয়াছিলে; আবার বিশেষ আদেশ দিয়া গ্রন্থকারে উহা প্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছিলে; তাই প্রকাশকালে এই গ্রন্থকে তোমারি স্মৃতি-মণ্ডিত করিয়া, তোমার পবিত্র-নামে উৎসর্গ করিলাম। মা, তুমি যেই উদ্দেশ্য লইয়া এই অধমের দ্বারা এই মহৎ গ্রন্থ লিখাইয়াছিলে, তোমার পুণ্যময়-নামের গুণে ও তোমার পবিত্র আশীর্ব্বাদে তাহা যেন পূর্ণ হয়, তোমার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা। ইতি—

সন ১৩৪৩<br>বৈশাখ

স্নেহাশীষ্-ভিখারী<br>**শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন**

# সৎগুরু প্রসাদী গ্রন্থাবলী।

১। **মুক্তিপথ বা রামায়ণ রহস্য**—১৵০ ও ১৷৵০

২। **মহাভারত রহস্য বা জীবত্বের পথপরিচয়**—১।০ ও ১॥০

৩। **মনুষ্যত্বের সাধনা** বা আর্য্যঋষির মতে নরত্ব ও নারীত্বের সার্থকতা—১৲ ও ১।০

**"রামায়ণ রহস্য ও মহাভারত রহস্য"** এই দুই গ্রন্থের লীলা মূলানু-যায়ী বর্ণনার সঙ্গে, প্রত্যেক লীলার সৌন্দর্য্য ও তাহার অধ্যাত্মিক বেদান্ত-তত্ত্বের যোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিষয়-সংবাদ-বিমুখ কেবল ঈশ্বর-পন্থী মহাতাপস ঋষিগণ ও সকলে সমবেত হইয়া, বেদ, বেদান্ত ত্যাগ করতঃ কেন এই গ্রন্থদ্বয় শ্রবণ করিতেন, কেন এই গ্রন্থদ্বয়কে সর্ব্বহিন্দুর সদা পাঠ্য করা হইয়াছে, কেন ইহার পাঠে সর্ব্ববেদ-বেদান্ত-পাঠের ফল লাভ হয় বলিয়া ঋষিগণ বলিয়াছেন, গ্রন্থদ্বয়ে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ-মান্য, ভূতপূর্ব্ব স্বাধীন-ত্রিপুরাধিপের পণ্ডিত-সভার শিরোমণি, পণ্ডিতরাজ এবং বিদ্যোৎসাহী পরম ভাগবত রাজা ৺মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সভাপণ্ডিত, ভাগবত ভূষণ শ্রীযুত্ বৈকুণ্ঠ নাথ বেদান্ত বাচস্পতি মহাশয় জানাইয়াছেন, শ্রীশ্রীরামানুজ স্বামী রামায়ণের ও শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী মহাভারতের রহস্য সংস্কৃত-ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্তঅংশ পাওয়া যায় নাই বলিয়া গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে না। আজ এই দুই গ্রন্থে সেই সব তত্ত্বকে পূর্ণরূপে পাইয়া বিস্মিত হইলাম! ঠিক তাহাদের গ্রন্থের ভাবে এই দুই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, বরং তাহা হইতে আরও সরলভাবে বাহির হইয়াছে।

## প্রাপ্তিস্থান—

কটন লাইব্রেরী—ঢাকা, বাঙ্গালাবাজার।

সিটি লাইব্রেরী—ঢাকা।

গ্রন্থকার

**শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন**

পোঃ—হাসছাদী, জিলা ঢাকা।

বা ২২নং কলুটোলা, ঢাকা।

ওঁ সৎগুরু প্রসাদাৎ!

# মঙ্গলাচরণ ও বস্তুনির্দ্দেশ ভূমিকা!

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবন্ প্রসীদতু॥
তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

পরম দয়াল, পতিতের বান্ধব, কলিপাবন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয় হউক! যাঁহার কৃপা-কণিকায় অজ্ঞব্যক্তিও সর্ব্বতত্ত্ব এবং শাস্ত্রবেত্তা হয়, সেই শ্রীচৈতন্য নামধারি ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; তাঁহার তুষ্টিতেই সর্ব্ব জগতবাসীর তুষ্টি ও তাঁহার প্রণামেই সকলের প্রণাম হউক।

সুরধুনী গঙ্গানদীর তীরে, পুণ্যভূমি শ্রীনবদ্বীপ ধামে, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে, সামান্য গৃহস্থরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও, যাঁহার আগমনের প্রভাবে ভারতের সর্ব্বদেশের হিন্দুগণের হৃদয়-আকাশের, কঠোর নির্য্যাতনকারী বিধর্ম্মী রাজশাসন-ভীতিরূপ অন্ধকার এবং বহুদিন ধরিয়া সাধনা ও আলোচনা-হীনতার অজ্ঞতার নিদ্রা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; প্রভাতে সূর্য্যোদয়মাত্র যেমন মানব নিদ্রালস্য ভুলিয়া তৎপরতার সহিত স্বকর্ম্মে নিরত হয়, তেমনি যাঁহার আগমনেই হিন্দুগণ বহুযত্নে ধর্ম্ম ও সাধনা রক্ষণে তৎপর হইয়া উঠিয়া—লুপ্ত-তীর্থের সংস্কার, ভগ্নমন্দির নির্ম্মাণ, লুক্কায়িত-বিগ্রহের উদ্ধার করিয়া আবার হিন্দু-আচার গ্রহণে মত্ত হইয়াছিল; যিনি রাজ-শাসনের সহায়তা বিনা, কোথায়ও একটু পশুবল প্রয়োগ না করিয়া বা রোগ-সারান, মৃতের জীবন-দানাদি অমানুষ

ঐশ্বর্য্য না দেখাইয়াও জগতে প্রেম, মৈত্রী, দয়া ও লোক-সেবাময়, ত্যাগ, বৈরাগ্যমাখা, ঈশ্বর-ভক্তি ও অসাধারণ তত্ত্বজ্ঞানের বৈষ্ণবী-স্রোত বহাইয়াছিলেন; যাঁহার ভক্তি-স্রোতের বেগে ঐরাবত তুল্য জ্ঞানবলে দাম্ভিক, রাজপণ্ডিত শ্রীযুত্ সার্ব্বভৌম ও সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, মূর্ত্তিমান জ্ঞানগুরু-মহাদেব বলিয়া পূজিত স্বামী শ্রীযুত্ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ডুবিয়া গিয়াছিলেন; প্রবলপ্রতাপ মোহম্মদী-সম্রাট বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পথ হইতে সরিয়া, চলিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন; রাজমন্ত্রী শ্রীরূপ সনাতন, ভূস্বামী রঘুনাথ দাসের মত লোক বিষয়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সুখভোগ ছাড়িয়া ভগবৎ ভক্তিরাজ্যের ভিখারী হইয়াছিলেন; যাঁহার শুধু দয়ার বলেই পাঠান-শাসনে লুপ্তপ্রায় হিন্দু-ধর্ম্মজ্ঞান ও আচার আবার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ভারতের অন্যপ্রদেশে হীনাচারী বলিয়া নিন্দিত, এই বঙ্গদেশেরই নগণ্য ব্রাহ্মণ-সন্তানরূপে জন্মিলেও, যাঁহার প্রেম ও সাধন-প্রভা তাঁহার স্থিতি-কালেই দক্ষিণে রামেশ্বর, পশ্চিমে মালব, উত্তরে পাঞ্জাব ও পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; যাঁহার জন্মে নগণ্য বঙ্গদেশ আজ জগতের তীর্থস্বরূপ হইয়াছে; সেই অদ্ভুৎবীর্য্য মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবকেই গ্রন্থারম্ভে এই অধম বার বার প্রণাম করিয়া, মঙ্গলাচরণ করিতেছে।

এই অদ্ভুৎবীর্য্য মহাপ্রভুর কৃপায়ই বর্ত্তমান যুগের মত কালেও, ত্যাগ, তপস্যা, তত্ত্বালোচনা বিনা শুধু মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন বা মৌখিক শরণ গ্রহণ মাত্র করিয়া মানব চরিত্র, মহত্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমাদি মহৎগুণকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল; হীন বর্ণের সন্তানও বেদ-গুহ্য তত্ত্বজ্ঞানাদি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অন্য অন্য যুগে শ্রেষ্ঠবর্ণের সন্তান সংসার ছাড়িয়া, কত ত্যাগ, তপস্যার শুদ্ধাচারে বহুবর্ষে যাহা যাহা লাভ করিতে পারিত না, এই প্রভুর কৃপায় যে সে লোক সংসারে থাকিয়া, নাচিয়া

গাহিয়া তাহা লাভ করিয়া জীবন-সার্থক করিয়াছিল। তাই ত সেইকালের সর্ব্বহিন্দুর নমস্ত, সর্ব্ব বেদান্ত-জ্ঞান ও তপস্যার মূর্ত্তি, সন্ন্যাসী প্রধান শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণকে দেখিয়া স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং আনন্দে তাঁহার স্তবগানের সঙ্গে, তাঁহার ভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি শ্রীগৌর পার্ষদগণের মহিমায় এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সমস্ত সন্ন্যাসী-মধ্যে দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন—সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাচার পালন কর, বিষ্ণুকে যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা কর, তীর্থ-ব্রত লইয়া সমস্ততীর্থ বিচরণ কর, সুন্দররূপে বেদাদি শাস্ত্র বিচার কর, শ্রীগৌরভক্তের পদসেবা না করিলে, বেদগুহ্য দুষ্প্রাপ্য পদের সংবাদও পাইবে না। আবার বলিয়াছেন শ্রীগৌরভক্ত বিনা পূর্ণ বৈরাগ্য, বিষয়-বার্ত্তাকে সত্যই নরক-তুল্য ভয়, মাধুর্য্যপূর্ণ বিনম্র স্বভাব, অলৌকিক তেজপূর্ণ মহাভক্তির ভাব, অন্যত্র দেখাত দূরের কথা আশা করাও বৃথা। নিজের প্রথম সন্ন্যাস-জীবনের বৈরাগ্য, শম, দম, পাণ্ডিত্য, মৈত্রি-সাধনা, তত্ত্বানুধ্যান, ও বিষ্ণু-ভক্তিকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন, আজ শ্রীচৈতন্য-প্রিয়, তাঁহার চরণ-জ্যোতিতে আনন্দ লাভ করিয়াছে যে দাস, তাঁহাদের মধ্যে এইসব গুণ যেমন স্বভাব-সিদ্ধ ভাবে প্রকাশিত দেখিতেছি, তাহার কোটি অংশের এক অংশ কণিকাও পূর্ব্বে কোথায়ও দেখিনাই, অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা বিনা এই শম, দমাদি গুণ ও প্রকৃত জ্ঞান, ভক্তি, সত্য, ত্যাগ, তপস্যাকে কেহই এইকালে লাভ করিতে পারে না।

## শ্রীপ্রকাশানন্দ কৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃত।

১ আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয় পাদসেবাং বেদাদিদুষ্প্রাপ্য পদং বিদন্তি। (২২)

২। ক ভাবদ্বৈরাগ্যং ক চ বিষয়বর্ত্তাস্থ নরকে-
স্বিবোদ্বেগঃ ক্বাসৌ বিনয়ভর মাধুর্য্যলহরী।
কভাবত্তেজোহলৌকিকমথ মহাভক্তিপদবী
ক সা বা সংভাব্যা যদবকলিতং গৌরগতিষু॥ (২০)

৩। অস্তাং বৈরাগ্য কোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবীভক্তি কোটিঃ।
কোট্যংশোহপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ অস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয় চরণনখজ্যোতিরামোদভাজাং॥ (২১)

সত্যই মহাপ্রভুর কৃপায় হীনবর্ণের বহু লোকও অপূর্ব্ব জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি আদির অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া, হিন্দুসমাজে সর্ব্বদা গুরুর সম্মান ও পূজাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণসন্তান পর্য্যন্ত, নিজের সর্ব্বপ্রকার গৌরব ভুলিয়া শ্রীগৌরপ্রেম-পাগল শূদ্রের চরণে মস্তক নত করতঃ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাইত মহাপ্রভুর পার্ষদ বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্রাদি, এমন কি, তাহাদের দাস, দাসীর কৃপা লাভকেও সেকালের হিন্দুসন্তান শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া, গুরুপদ দান করতঃ পূজা করিয়াছিলেন; আজও তাঁহাদের বংশধরগণ গোস্বামী-বংশ হইয়া শ্রেষ্ঠবর্ণকে পর্য্যন্ত মন্ত্র-দীক্ষা দান করতঃ সেই গৌরব ভোগ করিতেছেন; শ্রীবাসের বাটীর দাসীও গুরুপদ পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী শ্রীগৌর প্রেমমত্ত ভক্তগণের নিকটও তেমনি লোকে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ অধিকারীবংশ বলিয়া আজও সম্মান ভোগ করিতেছেন; এই অধিকারীগণ-মধ্যে যুগী, চণ্ডাল-বংশের লোক পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; শ্রেষ্ঠবর্ণও তাঁহাদের শিষ্য-পরিবার দেখা যায়। শ্রীগৌরভক্তগণ কেবল ত্যাগ ভক্তিতেই পূজ্য ছিলেন না, শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানেও এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

তাই সেকালের একটী পয়ার-কথা প্রচলিত আছে 'পাণ্ডিত্যের গৌরব নাই গৌরাঙ্গের হাটে। মূর্খও পণ্ডিত হয়ে নানা শাস্ত্র ঘাটে।" এই অদ্ভুৎবীর্য্য মহাপ্রভুর কৃপাবলেই অদ্য আমার মত অজ্ঞদ্বারা সর্ব্ব হিন্দু-ধর্ম্মের সারসূত্র-স্বরূপ এই প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আধুনিক-ভাবের প্রশ্নের সহিত হিন্দুশাস্ত্রের উত্তর, শাস্ত্র-দৃষ্টান্তসহ মিলাইয়া এমন সুশৃঙ্খল-ভাবে, আধুনিক-ভাষায়, সরলযুক্তি দ্বারা অল্পাক্ষরে প্রকাশ করিতে, বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠজ্ঞানিগণ দ্বারাও সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ; আর তাহা আমার মত ব্যক্তিদ্বারাই মাত্র একমাসমধ্যে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। পূত-চরিত তাপসী-মায়ের প্রবল শুদ্ধবাসনা পূর্ণ করিতেই, গুরু-কৃপা ও মহাপ্রভুর প্রভাবশক্তি, আমাকে কৃতার্থ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সন্ন্যাসিনী-মায়ের আদেশ পালন ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদ বিতরণ-জন্যই, এইগ্রন্থ জনসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দ লাভ করতঃ, প্রসাদ বিতরণকারী বলিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং এই মাও আমায় সর্ব্বান্তঃকরণে স্নেহাশীষ্ দান করিবেন; তাহাতে আমার শ্রম ও জীবন সার্থক হইবে, কলিপাবন মহাপ্রভুর কৃপার সংবাদ জগতে প্রচারিত হইবে।

## গ্রন্থ প্রণয়নের ইতিহাস।

অতি শুভ মুহূর্ত্তে ১৩৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে কনিষ্ঠ-ভ্রাতার আহ্বানে বরিশালে তাহার বাসায় যাইয়া, এই শ্রীত্রিপুরানন্দ তীর্থ মাকে সেখানে প্রাপ্ত হই। আরও ৩।৪ বর্ষ পূর্ব্বে এই বরিশালেই, প্রায় মাসাধিক কাল এই মায়ের সঙ্গে শাস্ত্র প্রসঙ্গে ও শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দ-ভোগ করিয়া গিয়াছিলাম; মা আমায় সন্তানের মত স্নেহ

করিতেন। এই পুণ্য-চরিত্রা, মহাজ্ঞানবতী, তাপসী মাকে বঙ্গদেশে প্রায় জিলায়ই শিক্ষিত যুবক যুবতীগণ বিশেষরূপে চিনেন। এই মায়ের পূর্ব্বনাম শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী। এই মাতা, গভর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার মুখার্জ্জি এম, এ, মহাশয়ের সুযোগ্যা সহোদরা। এই মায়ের অন্য সহোদর বরিশালে শঙ্করমঠ প্রতিষ্ঠাতা, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা, বিজ্ঞবর শ্রীপ্রজ্ঞানন্দ স্বামী। এই স্বামীজি আধুনিক উচ্চ-শিক্ষার শেষ-উপাধি লাভ করিয়াও প্রাচীন আর্য্যব্রাহ্মণের শেষ-কর্ত্তব্য, বরণীয়পথ সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক-শিক্ষায় ইউরোপীয়-দর্শন আদি পড়িয়া এবং হিন্দু-দর্শন ও হিন্দু-সভ্যতার জ্ঞানের কোন সংবাদ না পাইয়া, বর্ত্তমান যুবক যুবতীগণ ক্রমে হিন্দুধর্ম্মে অশ্রদ্ধ ও অবিশ্বাসী হইয়া পরিতেছে দেখিয়া, এই স্বামীজির প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠে। হিন্দুজাতির ও ধর্ম্ম-সাধনার ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসা সেই বিরুদ্ধমতি সন্তান গণকে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা জানিয়া, নবশিক্ষিতগণ দ্বারা আদর্শ হিন্দু-সমাজ গড়িতে, তাই তিনি চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই নিজে হিন্দুর ধর্ম্মভাষা সংস্কৃত ভালরূপে শিখিয়া, হিন্দুর বেদান্তাদি ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ষড়দর্শন আয়ত্ব করেন এবং পরে সর্ব্ব ভারতব্যাপিয়া ধর্ম্মের বক্তৃতা দান আরম্ভ করেন। পাশ্চাত্ত্য-দর্শনাদি সহ তুলনা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইতে, তিনি একদল আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ যুবক সংগ্রহ করেন এবং নিজের ইচ্ছামত ভাবে গঠন করিতে তাহাদিগকে তিনি চিরব্রহ্মচর্য্য সহ সন্ন্যাস দান করিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত করেন; সেই সন্ন্যাসীগণের আশ্রম-স্থানই তাঁহার স্থাপিত শঙ্কর-মঠ।

ভগবানের ইচ্ছায় একটী কন্যা জন্মিয়াই, যৌবনের প্রারম্ভে এই মায়ের সংসার-খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে; মা স্বামীহারা হইয়া পিত্রালয়ে

ফিরিয়া আসেন। শিশু-কন্যাকে মায়ের হাতে দিয়া, এই মা সন্নাসী-ভ্রাতার ভাবে অনুপ্রাণিতা হইয়া সন্ন্যাসী-জীবনই গ্রহণ করিয়া বসেন। ভ্রাতাও ভগ্নীদ্বারা বর্ত্তমান যুবতীগণকে হিন্দুভাবে আনিতে পারিবেন বুঝিয়া, মাকে নিজের মনোমত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষিতা করিয়া তোলেন। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ প্রজ্ঞানন্দজিকে তাঁহারি মনমত একজন সত্য-জ্ঞানবান-সহকর্ম্মী জানিয়া, অতি ভালবাসিতেন ও অনেক সময় একত্র বাস করিতেন। এই মা তৎকালে এই দুই মহাপুরুষের নিকট থাকিয়া হিন্দু-সন্ন্যাসীর ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা, ধীরতা, তেজস্বীতা, তত্ত্বানুসন্ধান, ধ্যান, ধারণা, ঈশ্বরে প্রেম ও অসাধারণ বাগ্মীতা-শক্তি অর্জ্জন করেন। এই মায়ের দ্বারা উভয় স্বামীজির বাসনাই সত্য সত্য পূর্ণ হইয়াছিল। এই মাও স্বামিজির মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়াছেন। পরে পুলিসের বৃথা সন্দেহাদি কারণে ও স্বামীজির তিরোধানে, মা কাশীধামে তপো-জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশীআন্দোলন-কালে বরিশালের জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির অনুরোধে, তিনি বরিশালে বাস করিয়া, তথাকার নারীগণের কল্যাণ সেবা লইয়া, বরিশালেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেছেন। গত ১৩৪১ সনে এই মা ঢাকাতে প্রায় চারি মাস ও ময়মনসিংহে এক মাস ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া, তথাকার নারীমণ্ডলীকে উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার মুখের শাস্ত্রতত্ত্ব-সমূহের সরল-ব্যাখ্যা শুনিলে, মায়ের জ্ঞান ও বিদ্যার সন্ধান পাইয়া মোহিত না হইয়া উপায় নাই। এই মায়ের ত্যাগ, অমানিতা, সর্ব্বমানবে সম-প্রীতি, পবিত্রতা ও ঈশ্বর-সাধনাযুক্ত তপোজীবন প্রত্যহ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, হিন্দুশাস্ত্র-বর্ণিত তপোমূর্ত্তি-ঋষিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়াই মনে হয়। এই মা যেন অতিস্নেহকাতর

মাতৃভাব-মাখা মূর্ত্তিমান জ্ঞান, তপস্যা ও ঈশ্বর-প্রেমের মূর্ত্তি। এই মাকে স্বামীজি যদিও ইংরাজি ও সংস্কৃত-ভাষা শিখাইয়া পাশ্চাত্ত্য-দর্শন সহ প্রাচীন হিন্দু-দর্শনই শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, কিন্তু মা পরে হিন্দুর পুরাণ আদি শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন, তাই তন্ত্র ও শ্রীশ্রীচণ্ডী সহিত বৈষ্ণব-শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবৎ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া থকেন।

এই মা হিন্দু-ঋষিগণকে সত্যজ্ঞানের মূর্ত্তি এবং শাস্ত্রোক্ত বিধান-গুলিকে সর্ব্বপ্রকারে মানব সমাজের সত্যকল্যাণময় বিধি বলিয়া মানিতেন একবার এক বক্তৃতা-সভায়, বোধ হয় রাজসাহীতে, আধুনিক উচ্চ-শিক্ষিতা এক যুবতী, প্রাচীন শাস্ত্র-বিধান ও ঋষিগণকে নিন্দা করিয়া, সমস্ত নারীমণ্ডলীকে তাঁহাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা-জন্য আহ্বান করিয়া বলেন—"এস, আমরা তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করি। শাস্ত্র-কর্ত্তা-পুরুষ স্বজাতি পুরুষের প্রতি পক্ষপাত করিয়াই, নারী-জাতিকে কেবল নির্য্যাতন, অধীনতার সহিত চির দাসীত্বই দান করিয়া, অন্তঃপুরের কারাগারে, যত হেয়-কার্য্যের ভার দান করিয়া দিয়াছে।" এই মা সেই যুক্তি আদি শুনিয়া এমনি মর্ম্মাহত হইয়া ছিলেন যে, অতি ধীরতা সহিত বিপক্ষে বুঝাইতে যাইয়াও ২।৪টী কথা বলিয়াই দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পরেন। মা মাত্র বলিয়াছিলেন—নারী-শত্রু সেই শাস্ত্র-কর্ত্তা পুরুষগণ কাহারা? তাঁহারাকি এই নারীগণের গর্ভস্থ-সন্তান, ভ্রাতা পিতা বা পতি ছিলেন না? তাঁহারা নারীকে কেন্ পুরুষের অধীন করিয়া দিয়াছেন? সেই শাসক-পুরুষ কি নারীরই জন্মদাতা, স্নেহময় পিতা বা আবাল্যের সখ্যতার সহচর প্রিয়-সহোদর ভ্রাতা, প্রেমময় স্বামী বা নিজ-অঙ্গজ, পরম স্নেহপাত্র পুত্র নয়? ইহারাই কি নারীর নির্য্যাতনকারী পুরুষগণ! ইহাদের সেবাই কি নারীর দাসীত্ব? ইহাদের তত্ত্বাবধান

নির্য্যাতনের শাসন ?—ইহা বলিয়াই মা দুঃখের উত্তেজনায় জ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তা যুবতীগণ সর্ব্বদাই এমন সব অদ্ভুৎ শাস্ত্র ও সদাচার-বিরুদ্ধ ঋষি-জ্ঞানের বিপক্ষে কথা বলিয়া মাকে মনোকষ্ট দিতেছিলেন। তাই মা আধুনিকশিক্ষিত যুবক যুবতীগণের সকল বিরুদ্ধমত ও তাহার মীমাংসাসহ, হিন্দু-শাস্ত্রের মহৎ জ্ঞানতত্ত্বের কল্যাণ-শক্তি প্রকাশক একখানা গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিয়া, সেই জন্য আকাঙ্খিতা হইয়া ছিলেন। সেই কালে আমায় নিকটে পাইয়া, মা আমাকেই তাঁহার সেই ইচ্ছা পূরণে আদেশ করতঃ নানা রূপে বুঝাইয়া তাহা লিখিতে উৎসাহিত করেন। পরে মায়ের তপোশক্তির ইচ্ছাই জয় যুক্ত হইয়া এই অধম দ্বারা অতি অপূর্ব্বভাবে, মাত্র একমাস মধ্যেই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়া উঠে।

পরম ভক্তিভাজন সমগ্র বঙ্গদেশের জ্ঞানদীপ, পূতচরিত, সাধুত্তম বারিশালবাসী হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবু স্যার ( sir ) মহাশয় আমায় বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি আমায় হরিসভায় কীর্ত্তন করিতে ও রামায়ণ, মহাভারতীয়-কথা শুনাইতে আদেশ করেন। ইতিপূর্ব্বে মহাপ্রভুর কৃপায় এই অধম রামায়ণ রহস্য ও মহাভারত রহস্য নামে দুইখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি উপহার দান করিয়াছিল। এই গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীরামের ও পাণ্ডবগণের বিষয়-লীলার মাধুর্য্য ও মহত্বসহিত, সেই লীলার সঙ্গে কেমন অধ্যাত্ম বৈদান্তিক-তত্ত্বসমূহেরও যোগ আছে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের এই নূতন ভাবে আস্বাদন, সভায় উপস্থিত জনগণের সত্যই মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিল! সেই কালেই মা আমায় এই গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করেন। এই গ্রন্থ লিখিতে যতদুর জ্ঞান, বিচক্ষণতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও সূক্ষ্মবিচার শক্তিসহ প্রকাশ করিবার ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন, আমাতে

তাহার সকলেরই অভাব দেখিয়া, প্রথমে মায়ের নিকট অস্বীকার করিলেও মায়ের সুযুক্তিপূর্ণ প্রেরণায়, এবং মায়ের তপোশক্তি ও মহাপ্রভুর কৃপায় যে অযোগ্য দ্বারাও এইকর্ম্ম সম্পাদন হইতে পারে, এই কথা মনে জাগিয়া এবং রামায়ণ মহাভারত রহস্য প্রকাশে মহাপ্রভুর কৃপাশক্তির বল দেখিয়াছি বলিয়াই, এই প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যোগী হইলাম। সেই বিষয়ে মনোনিবেশমাত্র ক্রমে প্রশ্ন ও উত্তর আসিয়া এই বৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হইয়া উঠিতে লাগিল, নিজেই পড়িয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম। প্রত্যহ বৈকালে লিখিতঅংশ মায়ের নিকটে যাইয়া পাঠ করিয়া শুনাইতাম। সেই স্থানে উপস্থিত অন্য মাতাগণ বলিতেন, "মা অদ্য আমাদের সঙ্গে এই বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য! আপনার প্রবন্ধে সেই প্রশ্ন ও উত্তরই আলোচিত হইয়াছে!" এমনি অপূর্ব্বভাবে এইগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ শেষ হইলে, স্যার শ্রীজগদীশ বাবুকেও এই প্রবন্ধ শ্রবণ করাই। তিনি সমস্ত শ্রবন করিয়া, তুষ্ট হইয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করেন ও বলেন —"প্রবন্ধ বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে। এই গ্রন্থ যেন প্রকাশিত হয়; ইহাতে দেশের কল্যাণ হইবে।" এই গ্রন্থের ভূমিকা তাঁহারই লিখিয়া দিবার কথা ছিল, কিন্তু গ্রন্থ ছাপাইয়া তাঁহার হস্তে তুলিয়াদিবার ভাগ্য অধমের আর ঘটিল না। সেই অতি পুণ্য-চরিত পুণ্যদর্শন, সদানন্দ ও স্নেহময় মূর্ত্তি দেখিবার ভাগ্য, তাঁহার মুখের মধুর অমৃতময় জ্ঞান-ব্যাখ্যা শ্রবণের ভাগ্য, চিরজীবনের মতই অকালে বিলোপ হইল। ভারতবাসী বিশেষ বঙ্গবাসী-হিন্দুগণের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতই এমন একটী জ্ঞানদীপ অকালে নিবিয়া গেল। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রসূত কুব্যাখ্যার অন্ধকারে পড়িয়া, বরিশালবাসী ধর্ম্মপ্রাণগণ সর্ব্বদা ইহার অভাব বোধ করিবেন, তাঁহার অভাব আর পূর্ণ হইবার নয়।

এই গ্রন্থ সমাধা হইলে মা তুষ্ট হইয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করেন, এবং দৃঢ়চিত্তে "ইহাকে প্রকাশ করিতেই হইবে" বলিয়া আমায় আদেশ করেন। এমনও বলেন, এইটী প্রকাশের অর্থজন্য ভিক্ষার প্রয়োজন হইলে তিনিও ভিক্ষা করিবেন, তবু এই গ্রন্থ প্রকাশ করা চাই। মায়ের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া, মায়ের অতি স্নেহ ভাজন, কন্যাস্বরূপা, পূতচরিতা ভগ্নী শ্রীমতী কিরণবালা গুপ্তা বলিলেন, "সন্তান থাকিতে মা কি ভিক্ষায় নামে, আমরাই ভিক্ষা করিব"। এই বলিয়া, তিনি তাহার আত্মীয় স্বজন ও ধর্ম্মভগ্নীগণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা আরম্ভ করেন ও আমায় এইগ্রন্থ প্রকাশজন্য দৃঢ় অনুরোধ করেন। ১৩৩৯ সনের শ্রাবণ মাসে বোধ হয় মা বই ছাপাইবার উৎসাহ দিয়া সেই ভগ্নীর সংগৃহীত ১৫৲ আমায় পাঠাইয়া দেন। তখন এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ভগবানেরই ইচ্ছা হইয়াছে, এই অর্থ-প্রেরণ তাঁহারি আদেশ-দান, মনে করিয়া ছাপাইবার চেষ্টায় ব্রতী হইলাম। আমি যে অর্থহীন, পরে অর্থপাইব এই আশায়, কে এখন ছাপাইয়া দিতে স্বীকার করিবে, তাহার সন্ধান করিতে পরম ভাগবত শ্রীগৌরগত প্রাণ, শ্রীযুত্ পিযূষ কিরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ডাক্তার মহাশয়ের কথা মনে হইল। তিনি আমার প্রার্থনা আনন্দের সহিত পূর্ণ করিলেন। তিনি তাঁহার প্রচার-প্রেসে গ্রন্থ ছাপাইয়া দিবেন, ছাপাইবার অর্থ পরে দিলেই হইবে বলিলেন। এইরূপে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় অন্নপূর্ণা-ভাণ্ডারও কাগজ চালাইবার ভার লইল। নগদঅর্থের অভাবে, ধীরে ধীরে প্রায় আড়াইবর্ষে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ভগ্নী শ্রীকিরণবালা, ভক্তিভাজন শ্রীপীযূষ বাবু ও অন্নপূর্ণা-ভাণ্ডারের মালিকগণের যত্নেই মায়ের এই বাসনাকে, এই অধম পূরণ করিতে সক্ষম হইল; মহাপ্রভুর প্রসাদ এইগ্রন্থ আমি মানব-সমাজে বিতরণের সৌভাগ্য

লাভ করিলাম! তাই আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ রহিলাম; মহাপ্রভুর নিকট ও এই মায়ের নিকট তাঁহাদের সর্ব্বদিকে কল্যাণ প্রার্থনা করি। সর্ব্বসাধারণের নিকটেও এই গ্রন্থ লইয়া, গ্রন্থপ্রকাশের অর্থ-সাহায্য ভিক্ষা চাহিতেছি। সকলেই এইগ্রন্থ গ্রহণ করতঃ, মূল্যভাবে অর্থ না দিয়া, প্রকাশ-সাহায্য ভাবে যেন অর্থদান করেন; আমার বিশ্বাস তাহা হইলে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রসন্নতা ও এই সন্ন্যাসিনী মায়ের স্নেহাশীর্ব্বাদ পাইয়া তাহারা কল্যাণ লাভ করিবেন; এবং অধমেরও বিশেষ-উপকার করিয়া কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন।

## বস্তু নির্দ্দেশ।

প্রাচীন হিন্দুশিক্ষায় শিশুকাল হইতেই হিন্দুসন্তান স্বধর্ম্মাচারী শিক্ষকের সঙ্গে থাকিয়া, হিন্দু-আচার আচরণ করতঃ, হিন্দুর শাস্ত্র ও আচারের গুণগান শুনিতে শুনিতে শিক্ষালাভ করায়, হিন্দুঋষি, শাস্ত্র ও শাস্ত্রাচারের কল্যাণকারক শক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করিত। তাই হিন্দুর নানা ত্যাগ ও কষ্টকর আচারের বিপক্ষতার মতিই জাগিত না। বর্ত্তমানের নবশিক্ষায় সর্ব্বপ্রকারে হিন্দু-সংস্কার ও আচার বর্জ্জিত শিক্ষকগণের নিকট, নিজেরাও হিন্দু-আচার বর্জ্জিত হইয়া আচার-হীন সঙ্গীগণের সঙ্গে, স্বধর্ম্মসংবাদ-হীন গ্রন্থ পাঠে, কেবল অর্থার্জ্জন, স্বসুখান্বেষণের বিদ্যা লাভ করে; সদা জীবভাব অসুরত্ব উত্তেজক উপন্যাস পত্রিকাদিই পাঠ করে, অভিনয় দেখে; তাহাতে অন্য, ধর্ম্মীকর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মাচারের নিন্দা ও অপব্যাখ্যা শ্রবণ করে; হিন্দুর শাস্ত্রীয় ভাবার আলোচনাও পরিত্যক্ত, তাই আজ হিন্দু-সন্তান ব্যবহারিক অভ্যাস বলেই শব্দ ব্যবহার করিয়া যাইতেছে, শব্দের ধাতুপ্রত্যয় গত ভাব প্রেরণা-শক্তি আর নাই; তাই পদের

নাম পদ কেন ; হস্তের নাম হাত, কর ও বাহু কেন ; জনককে পিতা, জননীকে মাতা বলে কেন ; নরের নাম মানব কেন ; পশুর নাম পশু কেন ? তাহাও আজ কোন হিন্দু-সন্তান জানে না ; নামগুলি মানবের যেমন নাম রাখিতে হয়, তেমনি পরিচয় দেওয়ার জন্য হইয়াছে মনে করে। এইসব কারণেই হিন্দু-ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ-আশা পুত্র কন্যাগণ হিন্দু-ঋষির জ্ঞানশক্তি, হিন্দু-শাস্ত্রের অভ্রান্তত্ব ও আচারের কল্যাণ-দান শক্তিতে ক্রমে সন্দিগ্ধ ও অশ্রদ্ধ হইয়া পরিতেছে। এইকালে পূর্ব্বের মত কেবল ঋষি বলিয়াছেন, শাস্ত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, শাস্ত্রবচন দেখাইয়াই বুঝাইতে গেলে বর্ত্তমান যুবক যুবতীগণ বুঝিতে পারিবেন কেন ? তাহাদের মনই বা মানিবে কেন ? এখন ইহাদিগকে বুঝাইতে হইলে, তাহাদের মনের বিরুদ্ধ ভাবকে, সন্দেহকে, বর্ত্তমান-ভাষা ও যুক্তিদ্বারা বিনষ্ট করিয়া, হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম, শাস্ত্রবচন ও দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন। এই জন্যই এই সন্ন্যাসিনী মা তাঁহার তপস্যা-শক্তির প্রভাবে এই মূর্খদ্বারা এই পুস্তক লিখাইয়াছেন। কেন না, জ্ঞানবানগণ ত হিন্দু-ভাব-বর্জ্জিত আধুনিক-শিক্ষিতগণের কতদিকে অজ্ঞতা ও সন্দেহ আছে তাহা বুঝিবেন না ; তাহাদের মত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মবিধানের আধুনিকভাবে বুঝাইবার প্রয়োজনীয়তাই বুঝিবেন না, তাই আমার মত অধমেরই প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন। অধম এই গ্রন্থ লিখেতে বসিয়া, কি লিখিবে তাহা কল্পনাই করি নাই, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন জাগিয়া ক্রমে গ্রন্থ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাই গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল প্রশ্ন ও উত্তরই দেখিতে পাইবেন।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য গ্রন্থের নামের মধ্যেই পাওয়া যায়। **মনুষ্যত্বের সাধনা বা আর্য্য ঋষির মতে নরত্ব ও**

**নারীত্বের সার্থকতা।** এই গ্রন্থে ঋষি-প্রকাশিত হিন্দু-শাস্ত্রে, নর ও নারীতে কিরূপ জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি প্রকাশ পাইলে, তাহাদের জন্ম সার্থক হয়, অর্থাৎ তাহারা ইহকালে সুখ, শান্তি ভোগ করিয়া, সুশৃঙ্খলায় জীবন কাটাইয়া যাইতে পারে এবং পরকালেও কল্যাণ লাভে সক্ষম হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা বুঝাইতে, সর্ব্বপ্রকার আধুনিক বিরুদ্ধবাদ ও অন্যধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতানক্য গুলির আলোচনা করিয়া, হিন্দুমতের শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতা দেখাইতে হইয়াছে। ঋষি-ব্যবস্থিত হিন্দু-সভ্যতার কল্যান-শক্তি, আধুনিক-সভ্যতার অকল্যাণ-শক্তি ও তাহাতে মানব-সমাজের কত অনিষ্ট আসিয়াছে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দু-সভ্যতার বর্ত্তমানে এমন হীনাবস্থার কারণ কি? রক্ষার উপায় কি? তাহাই প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। প্রশ্নের পরে ক্রমে প্রশ্ন আসিয়া, কেমন শৃঙ্খলার সহিত কত বিষয়ের সমাধানে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিষয়-সূচী নিম্নে দেওয়া হইল। পাঠের সুবিধাজন্য তাহার পৃষ্ঠাসূচীও সঙ্গে দেওয়া হইল। আশাকরি তাহা পাঠ করিয়া সকলেই গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। অধম মায়ের কৃপায় একটী নব চিন্তার ধারা বর্ত্তমান যুবক যুবতীগণকে উপহার দান করিল মাত্র। ইতি।

**নিবেদন**—খনি হইতে উত্তম মণি উঠিলেও, ভাল সংস্কারক শিল্পির হস্তে মার্জ্জিত না হইলে, তাহার জনমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় না, তেমনি উত্তম ভাব, তত্ত্বও ভাবাবিদ পণ্ডিত ও কবির হস্তে না পরিলে, সরস ভাষামণ্ডিত হইয়া মানবের কর্ণ-রসায়ণ, মনোমুগ্ধকর হয় না। এই গ্রন্থও তেমন এই অযোগ্যের হস্তে প্রকাশিত হইয়া, অসংস্কৃত মণি ও ভাষাসৌন্দর্য্য হীন ভাব হইয়া প্রকাশিত হইল; তাই

গ্রন্থের বর্ণগত ও ভাষাগত দোষগুলিকে সহৃদয় পাঠকগণ দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন ? প্রথম সংস্করণ যেন মণির উত্তোলন তুল্য, আশাকরি পর-সংস্করণে, কোনও ভাষাশিল্পি এই গ্রন্থকে মার্জ্জনা করিয়া প্রকাশ করিবেন। এই গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপনের সংবাদ বর্ণনে, বুদ্ধদেবের অনেক পরবর্ত্তী, ভারত-সম্রাট অশোক কেই ত্রিপিটক রচনা করতঃ, বৌদ্ধ নামক ধর্ম্ম স্থাপন-কর্ত্তা বলা হইয়াছে ; তাহা অশোক না হইয়া সম্রাট্ কণিষ্ক হইবে। মহারাজ অশোক বুদ্ধদেবের সময়েই সম্রাট্ ছিলেন! তিনি বুদ্ধদেবের তীরোভাবের পরে উপদেশসমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখেন মাত্র ; সম্রাট কণিষ্কই ত্রিপিটক গ্রন্থ গড়িয়া সৎধর্ম্ম-নামে নবধর্ম্ম স্থাপন করিয়া. বৌদ্ধগণকে হিন্দু হইতে পৃথক করিয়া ফেলেন।

বিনীত নিবেদক

**শ্রীরাজেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত।**

## পূর্ব্বভাগ।

## অন্তঃভাগ!

---

# মনুষ্যত্বের সাধনা।

## পূর্ব্বভাগ

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### ঋষিত্ব, আর্য্যত্ব ও অনার্য্যত্ব সংবাদ

আর্য্যঋষিমতে নরত্ব ও নারীত্বের সার্থকতা বা মনুষ্যত্বের সাধনা জানিতে হইলেই, প্রথমে জানিবার প্রয়োজন আর্য্য বলিতেই বা কি বুঝায় এবং আর্য্যঋষি বলিতেই বা কি বুঝায়। আরও পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই তাঁহাদের মতকেই মাত্র আর্য্য বলিয়া, অন্য মত গুলিকে অনার্য্য, অপধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করেন। তাই কোন্ ধর্ম্মমতটী আর্য্য তাহাও নির্ণয়ের প্রয়োজন। তার পরে সেই মতটী কি তাহাও জানিবার প্রয়োজন। তাই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে এই কয়টী বিষয়ের আলোচনায়ই প্রবৃত্ত হইলাম।

আধুনিক শিক্ষাসংস্কার প্রাপ্তগণের বিশ্বাস, হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তা ঋষিগণ আমাদের মত মানবই ছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানের তপস্যায় জ্ঞানলাভ করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্মবিধান ও শাস্ত্র সেই জ্ঞানী-মানবগণের প্রকাশিত জ্ঞানের কথা। বর্ত্তমানের জ্ঞানীগণও তেমনি ঋষি, তাঁহাদের জ্ঞানসমূহই বর্ত্তমানের ধর্ম্মশাস্ত্র হওয়া উচিত। জগৎ ক্রমোন্নতিশীল, তাই আমাদের প্রাচীন ঋষি ও শাস্ত্র ফেলিয়া এই সব বর্ত্তমান জ্ঞানী ঋষিগণের নবশাস্ত্র বিধান গ্রহণ করাই মঙ্গল। একদিন হয়তো, বর্ত্তমান জ্ঞানীগণকেই লোকে ঋষি বলিয়া মান্য করিবে, তাঁহাদের গ্রন্থই ধর্ম্মশাস্ত্র হইবে।

ঋষিত্ব—

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে মনুষ্যকৃত বলিতে স্বীকৃত নহেন, শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণকেও মানুষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কেবল হিন্দু শাস্ত্রই নহে, খ্রীষ্টিয়দের বাইবেল, মোহম্মদীয় কোরআণ, পার্শীদের আবেস্তা ইত্যাদি সকল ধর্ম্মপথির ধর্ম্মশাস্ত্রকেই, সেই ধর্ম্মবিশ্বাসীগণ অমানুষ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী এবং তাহার প্রকাশক যিশু, মোহম্মদ ইত্যাদিকেও অমানুষ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ পয়গম্বর বলেন; মানুষ বলিয়া স্বীকার করেন না। মুসলমান-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, মোহম্মদ নাকি বলিয়াছেন, মানব কখনও পয়গম্বর হইতে পারে না। মানবের সাধনালব্ধ শেষশক্তি পয়গম্বরদের জীবন আরম্ভেই, তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার পরে আর প্রেরিত পুরুষ আসিবে না।

আর্য্যগণের ইতিহাস স্বরূপ হিন্দুর পুরাণশাস্ত্র আলোচনা করিলে পাওয়া যায়, প্রাচীন কালে হিন্দুগণ ঋষিগণের জ্ঞানশক্তিতে এতদূর দৃঢ়-বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন যে, বর্ত্তমানকালে উচ্চবিচারালয়ের মীমাংসাকে নিজেরা না বুঝিয়া উঠিতে পারিলেও, সমস্ত বিচারক ও আইনজ্ঞগণ যেমন,

হাইকোর্টের নজির বলিয়া তাহাকেই অভ্রান্ত সত্য মানিয়া লয়েন, ঋষি ব্যবস্থাকেও তাঁহারা তেমনি বিনাবিচারে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন। সেই ঋষি-আদেশ যদি, তাঁহাদের বিবেকের বিরুদ্ধকর্ম্ম বা তৎকালীন প্রচলিতশাস্ত্র বিধানের বিপরীতও হইত, তবু সেই ঋষি-বিধান পালনে পশ্চাৎপদ হইতেন না। আর্ষব্যবস্থা বলিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রে নূতন বিধান হইয়া তাহা স্থানলাভ করিত; এক কথায় ঋষি বাক্যকে সকলে ভগবৎ বাক্য মনে করিত। এই জন্যই সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে একটী সূত্র আছে। সাধারণ মানবের বাক্য, ব্যাকরণ বিধান সম্মত ধাতু প্রত্যয়াদি যুক্ত না হইলে অশুদ্ধ হইলেও, ঋষিবাক্য ভুল হইতে পারে না। তাহাকে নূতনসূত্র করিয়া আর্ষমতে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। এই ঋষিব্যবস্থার ফলেই ভারতের একই হিন্দুনামধারী জনগণ মধ্যেও, দেশভেদে কুলভেদে বিভিন্নাচার এমনকি শাস্ত্রগর্হিত আচার পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয়। তাহাকে তাহারা সেই দেশের বা কুলের আর্ষাচার বলে। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসায়ও শাস্ত্রাচার, দেশাচার ও কুলাচার, তিনকেই প্রতিপাল্য ধর্ম্মাচার বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের আমিষ ভোজন, বাঙ্গালী হিন্দুর মৎস্যাহার, নেপালে হিন্দুর মহিষমাংস ভোজন, রাজপুতনায় ক্ষত্রিয়ের মাতুল কন্যা বিবাহ, উড়িষ্যায় নিঃসন্তান বিধবা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধুকে দেবরের সন্তান দান, হিন্দু ব্রাহ্মণের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এই সমস্তই ঋষিব্যবস্থায় আর্ষবিধানের ফল, তাই ইহাতে তাহারা হিন্দুত্বচ্যুত হয় নাই। পুরাণ মধ্যে যে কতগুলি বিসদৃশ অশাস্ত্রীয় বিবাহব্যপার দৃষ্ট হয়—ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা যযাতিরাজার শুক্র ঋষির কন্যা বিবাহ, সম্প্রদান গোত্রান্ত বিনাও শকুন্তলা দুষ্মন্তের বিবাহ, এমন কি এক নারীকে পঞ্চভ্রাতায়, ভ্রাতা জীবিত থাকিতেও বিবাহরূপ দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারও, এই ঋষি ব্যবস্থায় সেই কালের সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক পুরুষ

যুধিষ্ঠিরাদি স্বীকার করেন। ইহাতেই বুঝা যায় পূর্ব্বে হিন্দুগণ ঋষিবাক্য ঈশ্বরের বাক্যের মত একরূপ বোধ করিতেন, ঋষিগণকে ও ঈশ্বরকে তুল্য ভাবিতেন। পুরাণে শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের জীবন সন্ধানেও দেখা যায়, তাঁহারা কেহই মানবের মত পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভগবানের জ্ঞানপ্রকাশ ইচ্ছা হইলে, স্বয়ং ভগবান হইতে এক এক জন প্রকাশিত হন। তাঁহারা যেন প্রত্যেকে এক এক জ্ঞানের মূর্ত্তিমান বিকাশ। প্রত্যেক জ্ঞানকে জগতে প্রচার করিতে ভগবানের এক এক জ্ঞান ঐ দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছেন। তাই তাঁহাদের বাক্যে ও ঈশ্বরের বাক্যে কোনও পার্থক্য নাই। ঋষিগণ ঈশ্বরের মতই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা করণা ও পাটব ইত্যাদি মানবীয় দোষভাব বর্জ্জিত।

আপ্তত্ব ও অনাপ্তত্ব—

বর্ত্তমানে ক্রমোন্নতি-বাদের এক রোল উঠিয়াছে প্রাচীন জ্ঞান-গ্রন্থ, প্রাচীন দেশের ধ্বংশাবশেষ আমাদিগকে প্রত্যক্ষ বুঝাইয়া দিতেছে বর্ত্তমান হইতে প্রাচীন কত বড়, কত মহৎ ছিল: প্রাচীনের জ্ঞান শক্তি বর্ত্তমান হইতেও কত শ্রেষ্ঠ ছিল; যে জ্ঞান বর্ত্তমানে নবাবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা বহু পূর্ব্বকালেও মানব সমাজে প্রচলিত ছিল। মিশরীদের মৃতদেহ মমী করিয়া রাখা ইত্যাদির মত আরও অনেক জ্ঞান বিজ্ঞাও জগতে প্রচলিত ছিল, সে জ্ঞান বর্ত্তমানকালেও আবিষ্কৃত হয় নাই। তব আমরা বলিতে চাহি, প্রাচীন হইতে বর্ত্তমানের মানব উন্নত, জগত ক্রমোন্নতিশীল। শিশুশক্তি ক্রমে যৌবনের পূর্ণতায় উঠিতেছে, বৃক্ষাঙ্কুর ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বিরাট বৃক্ষে পরিণত হইতেছে, অজ্ঞান-মানব ক্রমে জ্ঞানবান হইয়া উঠিতেছে, এইসব দেখিয়া সাধারণ জ্ঞানে, সকলের মনেই এই ক্রমোন্নতিবাদ জগতের নিত্য স্বভাব বলিয়া

মনে হয়। কিন্তু ক্রমোন্নতির মত ক্রমাবনতিও কি জগতের নিত্য স্বভাব নয়? মধ্যাহ্নের প্রচণ্ডসূর্য্য ক্রমে ক্ষীণতেজ হইয়া অস্তাচলে ডুবিয়া যায় না? যৌবনের পূর্ণজ্ঞান ও দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে না? নিশার দারুণ অন্ধকার দূর করিয়া দিবসের আলো ও কর্ম্ম-কোলাহল, মানবগণকে মৃত্যুরূপ নিদ্রার কোল হইতে জাগাইয়া কর্ম্মপথে নাচাইতেছে; আবার দিবসের আলো কর্ম্ম-কোলাহল সহ মানবের জাগ্রত জীবনকে নিশার অন্ধকারে নিদ্রারূপ মৃত্যু আসিয়া আচ্ছাদন করিতেছে। এই বিকর্ষণ ও আকর্ষণ বা বিয়োগ ও সংযোগ এই দুই শক্তির খেলাই এই সৃষ্টি রাজ্যের মূল; জীবের কর্ম্ম-বৈচিত্রতার কারণ। বিয়োগ ও বিকর্ষণ হইতেই ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি প্রসারিত হইয়া, তাহাকে ভুলাইয়া কর্ম্মরত করে. আর সংযোগ বা আকর্ষণ হইতেই বহির্ম্মুখী মায়ার নাশ পাইয়া, সকল পৃথক সৃষ্টি একে যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। এই বিকর্ষণ ও আকর্ষণ শক্তি-দ্বয়কেই, অজ্ঞান ও জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, অসুরত্ব ও দেবত্ব, জীবত্ব ও মুক্তাবস্থা, অনার্য্যত্ব ও আর্য্যত্ব বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাদেরই একের আকর্ষণের ফল ক্রমোন্নতি ও অন্যের আকর্ষণ ক্রমাবনতি। সৃষ্টির প্রথম হইতেই এককালে এই দুই সত্বার জন্ম হইয়াছে। এই আকর্ষণ বিকর্ষণ উত্থান পতনের যুদ্ধ জীবের মধ্যে দেহে, মনে ও কর্ম্মজীবনে সর্ব্বদা সংঘটিত হইতেছে। আকর্ষণশক্তির আকর্ষণে দেহ ও জ্ঞানের উন্নতি আনয়ন করে, যখন বিকর্ষণশক্তি প্রবল হয় তখন সেই সকলের ক্রমে ক্ষীণতা ও বিনাশ সাধন হয়। এই তত্ত্বকেই গীতার দৈব ও আসুর জীবের দুইটী নিত্যস্বভাব বলিয়া বলা হইয়াছে।

দ্বৌভূত সর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈব আসুর এবচ।

গীঃ ১৬শ অঃ ৬ শ্লোঃ।

কেবল হিন্দু শাস্ত্রে নহে; খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রেও এই দুইকে, এঞ্জেল ও ডেবিল এবং মোহ্ম্মদীয় শাস্ত্রে, ফেরেস্তা ও সয়তান বলিয়া মানবের এই দুইটী ভাবকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই দুই ভাব সৃষ্টির প্রথমেই এক সময়ে সৃজিত হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে এই দুই সত্বার উপরেও আর এক সত্বা স্বীকার করা হইয়াছে। তাহাদের মতে জ্ঞান দুই প্রকার, পরাজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান, আর অজ্ঞান সয়তানের নাম মায়াশক্তি। পরাজ্ঞান মাত্র ঈশ্বরেরতত্ব ও ভক্তি, ইহাতে জীবকে ব্রহ্মভূত ও ভগবৎভক্ত করে। দ্বিতীয়ের অপরাজ্ঞান, দেবতাদের মত জ্ঞানাশ্বৈর্য্য জগতসেবা ও সৎকর্ম্মশক্তি ও জ্ঞান দান করে; ইহার বলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়। তৃতীয়ের মায়াশক্তি অজ্ঞান ও অবিদ্যাদান করিয়া, মানবকে পশুআদি তুল্য স্বদেহ ইন্দ্রিয় পরায়ণ করিয়া রাখে। এই অবিদ্যার আকর্ষণই ক্রমাবনতি আর বিদ্যার আকর্ষণই ক্রমোন্নতির মূল।

বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাক্ষ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ পদ্মপুরাণ।

মানব জ্ঞান লাভ করিয়া, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে। তাহার প্রবেশের পূর্ব্বেই কি সেই বিদ্যালয়ে জ্ঞান ও জ্ঞানদানের ব্যবস্থা ছিল না? জ্ঞান পূর্ব্বেই ছিল বলিয়া, অজ্ঞের অজ্ঞতা নাশ পাইয়া জ্ঞান স্থাপন হইয়াছে। জ্ঞান না থাকিলে কি করিয়া অজ্ঞ জ্ঞান লাভ করিত? বিদ্যালয়ে যেমন একই কালে, অজ্ঞ ও জ্ঞানী থাকেন, একই সংসারে যেমন শিশু, যুবা, বৃদ্ধ একত্র বিরাজ করিতেছে, তেমন এক কালেই জ্ঞান ও অজ্ঞানের সৃজন হইয়াছে। এই জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র হইয়া জগতকে আলোড়ণ করিয়া কর্ম্মবৈচিত্রতা আনয়ন করিতেছে। বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইলে, প্রথমেই বিদ্যার গ্রন্থ ও বিদ্যাদানের অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয়। বিদ্যালয়

ঋষি ও শাস্ত্র-প্রকাশ—

কর্ত্তাকেই প্রথম নিজ হইতেই এই সমস্ত করিতে হয়। পরে বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্তগণ হইতেই অধ্যাপক ও গ্রন্থাদি প্রস্তুত হয়। ভগবান যখন জগতে জ্ঞান বিকাশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তো তিনি বিনা আর কিছুই ছিল না। তাই তিনি নিজেই জ্ঞানগ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন ও নিজ হইতেই অধ্যাপকগণের সৃজন করিয়া ছিলেন। ভগবানের সেই আদি জ্ঞানগ্রন্থের নামই আর্য্যজ্ঞান-শাস্ত্র **বেদ** এবং তাঁহার অংশভূত অধ্যাপকগণই আর্য্যশাস্ত্রকর্ত্তা **ঋষি**। এক এক জ্ঞান ও বিদ্যাকে প্রকাশ করিতে, ব্রহ্মের সেই সেই বিষয়িণী জ্ঞান-সত্তাগুলিই ঋষি ও দেবতা রূপে জগতে প্রকাশিত হইয়া, জগতে তাহা স্থাপন করেন; তাই তাঁহারা সেই সেই জ্ঞানের অধিপতি দেবতা। তাঁহারা ব্রহ্মের মতই অভ্রান্ত ও নিত্য, তাই তাঁহাদের বাক্য স্বয়ং ব্রহ্মের বাক্য সদৃশ। কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই নহে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রেই তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্বয়ং ভগবানের বাণী, ভগবানের অঙ্গজাত প্রথম সন্তানগণ দ্বারা প্রকাশিত ধর্ম্মমত বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাইবেন। কি যিশু, কি মোহম্মদ তাঁহারাও ধর্ম্মপ্রচার-কালে বলিয়াছেন তাঁহাদের ধর্ম্মমত নূতন নহে। ভগবানের প্রথম-সৃজিত মানব, আদমের নিকট স্বয়ং ভগবান যেই ধর্ম্মসাধনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই আদম ও তাহার সন্তানগণ যেই ধর্ম্মের আচার পালন করিয়াছিলেন, কালধর্ম্মে তাহা লুপ্ত হইতে চলিলে, আবার সেই ধর্ম্ম প্রকাশজন্য ভগবান তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। বাইবেলের ধর্ম্মমত মাত্র বিংশশতাব্দি ধরিয়া প্রকাশিত নবধর্ম্ম মত নহে; মোহম্মদীয় ধর্ম্মমতও মাত্র চতুর্দ্দশ শতাব্দির ধর্ম্ম নহে। সৃষ্টির প্রথমেই এই ধর্ম্মশাস্ত্র সৃজিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রকাশক শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিও তৎকালেই ভগবান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই আমাদের মত মানব নহেন;

তাঁহারা জ্ঞানালোচনা দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া এই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই।

হিন্দু শাস্ত্রমতে ঋষি তিন প্রকার। প্রথম ঋষি সৃষ্টির আদিতে স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষি। ইঁহারা ব্রহ্ম হইতে জাত সেই সেই জ্ঞানাধিপতি দেবতা স্বরূপ। দ্বিতীয় ঋষি কালধর্ম্মে লুপ্তপ্রায় জ্ঞানকে আবার প্রকাশকারী স্মৃতিকারক ঋষিগণ। ইঁহারা পূর্ব্বের ঋষি ও দেবতাগণের অংশ হইতে জন্মিয়া, নষ্টপ্রায় পূর্ব্ব জ্ঞানকেই সেই কালের উপযোগী করিবা প্রকাশ করেন। খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদীয় শাস্ত্রে ইঁহাদিগকে প্রেরিত-পুরুষ পয়গম্বর বলা হইয়াছে। ব্যাসদেব, পরাশর, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীত ইত্যাদি চতুর্দ্দশঋষি বর্ত্তমান যুগের হিন্দুর স্মৃতিকারক ঋষি। ইঁহারা কেহ বিষ্ণুর, কেহ শিবের, কেহবা অন্য দেব ও ঋষির অংশ জাত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারা লুপ্তবেদ পুরাণ ও স্মৃতি ইত্যাদিকে আবার নূতন আকারে যুগানুযায়ী করিয়া স্থাপন করেন। প্রেরিতপুরুষ ঈশ্বরের বিশেষ অংশ বলিয়াই, যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র ও মোহম্মদকে খোদার দোস্ত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে; ইঁহারা কেহই সামান্য মানব নহেন। ইঁহাদের অমানুষ কর্ম্মদ্বারাই তাহা প্রকাশ হইয়াছে। অমানুষ শক্তি দেখিয়াই তো তাঁহাদের পদে এত মানুষের মস্তক নত করিয়াছিল; ইঁহারা ঐ দেশের স্মৃতিকারক ঋষি। তৃতীয় ঋষিগণ শাস্ত্র জ্ঞানের জীবন্ত দৃষ্টান্ত; ইঁহারা নিজের জীবন দ্বারা শাস্ত্র ও সদাচারকে জগতে স্থাপন করেন। ইঁহারাও ঋষি ও দেবতা গণের অংশেজাত; মানবের আদর্শ জন্য প্রেরিতপুরুষ। ইঁহারাই পুরাণে বর্ণিত ঋষি ও মনুবংশীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ। তাই মাত্র ইঁহাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারাই, হিন্দুর পুরাণরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রথিত হইয়াছে। ইঁহারাই হিন্দুর কর্ম্ম-জগতের আদর্শ ঋষিগণ। আদি স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে

প্রকাশিত হইয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অন্তর্হিত হইয়া থাকার মতই তাঁহারা লুক্কায়িত থাকেন। তাঁহাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত মানবগণই পরে জ্ঞানকে জগতে প্রকাশ করেন। কোনও জ্ঞানের লোপ হইলে, জ্ঞান দেবতাগণ অংশে অবতীর্ণ হইয়া আবার সেই জ্ঞানকে জগতে প্রকাশ করেন। ইহাকেই আমরা নূতন জ্ঞানের আবিষ্কার বলিয়া মনে করি। জ্ঞান নিত্য, সত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, এক সূর্য্যদেবের উদয় ও অস্তের মত। কালধর্ম্মে তাহার নাশ ও আবিষ্কার দর্শন করি মাত্র।

পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মমতই যদি একই ভগবানের বাণী, তাঁহারই অংশ-জাত ঋষিগণের দ্বারা প্রকাশিত ধর্ম্মমত, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম-পন্থীগণের মধ্যে এই পরস্পর দ্বেষ ও বিবাদ দেখা যায় কেন? ধর্ম্মমতের বিরোধ হইতে জগতে যত অধর্ম্মাচার হইয়াছে—মানবের হস্তে মানবের নিগ্রহ, পাশবিক অত্যাচার, অমানুষিক নির্য্যাতন, প্রাণহত্যা, দেশ লুণ্ঠন আদি পশুর খেলা হইয়াছে, এমন তো আর কিছুর জন্যই হয় নাই. মিশরসভ্যতা, রোমসভ্যতা, ইহুদীসভ্যতা, হিন্দু ও বৌদ্ধসভ্যতার জ্ঞানগ্রন্থ, শিক্ষা, সদাচার ও সুখশান্তি এই ধর্ম্ম বিরোধিতার আগুনেই কি ভস্ম হইয়া যায় নাই? ধর্ম্মের নামে এই অধর্ম্মের বর্ব্বরতা কেমনে মানবকে অভিভূত করিল?

মানব যখন জ্ঞানময় আর্য্যস্বভাবরূপ সত্যধর্ম্মকে হারাইয়া, অজ্ঞান-ময় অনার্য্যত্বের বশীভূত হইয়া পড়ে, তখনি ধর্ম্মের নামে এই মহা অধর্ম্মাচার গ্রহণ করতঃ, জগতের মহাউৎপাত স্বরূপ হইয়া উঠে। ধর্ম্ম প্রথমে থাকে প্রাণের ধর্ম্ম, প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্ম; দ্বিতীয়স্তরে দেহের ধর্ম্ম। শুধু আচার গত বৈধীধর্ম্ম—বিধিভাবে আচারটী মাত্র সম্পাদনই ধর্ম্ম হইয়া উঠে। তৃতীয়স্তরে সেই বিধিকে অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধায় অপভাবে আচরণে অপধর্ম্ম হইয়া উঠে। তখন মানব কোনরূপে বিধি পালন

করিয়াই ধর্ম্ম করে। হীন পুষ্প ফলাদি উপচার দেয়, কোন মতে নমঃ নমঃ বলিয়া পূজা সাড়ে, জল ছিটাইয়া শুচি হয় ইত্যাদি। চতুর্থস্তরে সেই আচার ছলনা মাত্র হইয়া উঠে, তাহার নাম ছলধর্ম্ম —এই সময়ে মানব ধর্ম্মের নামেও ছলনায় প্রবৃত্ত হয় পূজা ইত্যাদি নিজে করিতে শ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় বলিয়া, অল্প মূল্যে অন্যকে চুক্তি দেয়। সে ব্যক্তিও কেবল অর্থলাভের জন্য সেই চুক্তি স্বীকার করিয়া, পূজার নামে অর্থকে আত্মসাৎ করিয়া পরিবার পোষণ করে। এই সময় মানব আর্য্যত্বরূপ পূর্ণ মানব-জ্ঞানকে ভুলিয়া, অজ্ঞানময় পশুজীবনরূপ অনার্য্যত্ব লাভ করিয়া বসে। ধর্ম্মের সেই অবস্থায়ই মানব ধর্ম্মের নামে এই দারুণ পশুত্বের খেলা হইয়া থাকে।

মোহম্মদ তাঁহার অনুবর্ত্তীগণকে ইস্‌লাম অর্থাৎ ঈশ্বর-বিশ্বাসী নাম দান করিয়াছিলেন। যিশুও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণকে ঐ নামই দান করিয়াছিলেন। উভয় ধর্ম্মমতের মূলতঃ বিভিন্নতাও নাই, তাঁহারা একই আদমের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যিশুর অনুবর্ত্তী ও মোহম্মদের অনুবর্ত্তীগণ ধর্ম্মের ঐ অবস্থায় যাইয়া পরস্পর বিরোধে মত্ত হইয়া উঠিল। তখন একদল যিশুকে ও একদল মোহম্মদকে শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করিতে যাইয়া, খ্রীষ্টির ও মোহম্মদীয় নামে দুই ধর্ম্মদলের সৃজন করিয়া বসিল। ক্রমে দ্বেষের অনার্য্যত্বে অভিভূত হইয়া তাহাদের মতই মাত্র সত্য ও জীবের মুক্তিদ, অন্য মত অসত্য, তাহা পালনে মানবের ধর্ম্ম নাশ পায়, তাহারা জগতের আবর্জ্জনা তুল্য পরিত্যাজ্য, পশুতুল্য বধের যোগ্য বলিয়া, একদল অন্য দলকে পশুরমত ঘৃণা ও দ্বেষ আরম্ভ করিল; ধর্ম্মের নামে দারুণ অধর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল; এবং জগতের ও মানব সমাজের দারুণ দুঃখ ও অকল্যাণ আনয়ন করিল।

এক মাতা যেমন পুত্রদের হজমশক্তি বুঝিয়া, কোন সন্তানকে সাগু, কাহাকে অন্ন, কাহাকে ও রুটীরূপ ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য পরিবেশন করেন—সেইরূপ এক ভগবানই মানব সৃজন করিয়া, প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ধর্ম্ম-বিধান ও সদাচার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্ম-পন্থীর ধর্ম্ম-শাস্ত্রই সেই এক ভগবানের বাণী এবং তাঁহার অংশভূত আদিঋষিগণ দ্বারা সৃষ্টির প্রথমে স্থাপিত। ধর্ম্ম একটীও নূতন মত বা মনুষ্যকৃত নহে। কোন কোন সময়ে নিশার অন্ধকারে সূর্য্যালোক ঢাকিবার মত, কালধর্ম্মে অজ্ঞানে জ্ঞানেরপ্রভা আবরণ করিয়া ফেলিলে, ভগবানই তাঁহার অংশভূত প্রেরিত-পুরুষ পাঠাইয়া; নূতন সূর্য্যোদয়ের মত পূর্ব্বের জ্ঞানকেই আবার স্থাপন করেন। একই সূর্য্য, সর্ব্ব সময়েই তাহার এক অবস্থা, কিন্তু ভগবান এমন কৌশলে পৃথিবীকে স্থাপন ও তাহার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, সেই গতি হইতে সূর্য্যের তাপ ও আলোর বিভিন্নতা হইয়া, দিন রাত ও ষড় ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, নানারূপ দৃশ্য ও ফল ফুল পৃথিবীতে প্রকাশিত হইতেছে। জ্ঞানও তেমনি আর্য্যস্বরূপ একটী পূর্ণস্বরূপে দীপ্তিমান। বিধাতার কাল-ধর্ম্ম বিধানে, সূর্য্যের আলো ও তাপের বিভিন্নতার মত জ্ঞানেরও ভিন্নরূপের আভাস জীবগণ মধ্যে বিকশিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতিবান মানব গড়িয়া, ভিন্ন ভিন্ন লীলা ও কর্ম্ম পথে নৃত্য করায়।

হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায়, পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও ধর্ম্মমতই, এক সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজ হইতে সৃজন করিয়া, তাঁহার অংশজাত আদি শাস্ত্রকর্ত্তা-ঋষিরূপ প্রজাপতিগণ দ্বারা, তাহাকে জগতে স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তাই জগতের সকল প্রাণী সকল প্রকার মানব ও তাহাদের পৃথক স্বভাব, ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃজন কর্ত্তা,—সৃজনকর্ত্তা

আর দ্বিতীয় কেহই নাই। পূর্ব্বকালে একটী ধর্ম্মমত মাত্র প্রচলিত ছিল। তাহার নামই ছিল আর্য্যত্ব, আর তাহা আচরণ না করার নাম ছিল অনার্য্যত্ব। মোহম্মদ, খ্রীষ্টাদিও বলিয়াছেন জগতে মানব দুই প্রকার। এক ঈশ্বর বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক ইসলাম, অন্য অবিশ্বাসী অধার্ম্মিক কাফের। বর্ত্তমান হিন্দু নামীয় ধর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত কোনও নামই পাওয়া যায় না।

হিন্দু শাস্ত্রমতে ভাব ও শাস্ত্র প্রকাশ—

এই হিন্দু নাম, আরব ও ইউরোপবাসীর দত্ত নাম। সিন্ধুনদীর দেশবাসী বলিয়া ভারতবাসীকে তাহারা হিন্দু বলিত, হিন্দুর ধর্ম্ম বলিয়া এই ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম হইয়াছে। এক ভগবানের সৃজিত সমস্ত ধর্ম্মপথ এই বিশ্বাসেই হিন্দুগণ কখনও অন্য কোনও ধর্ম্মমতকে ঘৃণা বা দ্বেষ করিত না। তাই দেখিতে পাইবেন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমত বিনা অন্যমতকে ধর্ম্ম না বলিয়া যেমন অধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, হিন্দুগণ সেরূপ করেন না। তাঁহারা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মমতকে ম্লেচ্ছধর্ম্ম ও মোহম্মদীয় মতকে যবন ধর্ম্ম বলে, কখনও অধর্ম্ম বলেন না। সে ধর্ম্ম সাধনে ভগবত কৃপা লাভ হইতে পারে না, এমন কথাও বলেন না। যবন মতে সিদ্ধব্যক্তিকে হিন্দু যবনমুনি বলিয়া তাঁহার জ্যোতিষ মতও গ্রহণ করিয়াছে। যবন মতে সিদ্ধজনকে হিন্দুগণ, হিন্দুমতে সিদ্ধ সাধকের মতই সম্মান ও পূজা করিতেছে। মোহম্মদী ফকিরের সমাধিকে হিন্দুগণ ফল দুগ্ধাদি দান করিয়া পূজা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, মোহম্মদী ধর্ম্মমন্দিরকে হিন্দুর দেবালয়ের মতই হিন্দু সম্মান করে। যিশু মোহম্মদকে প্রেরিতপুরুষ বলিয়া সম্মান করিতে কোন হিন্দুই কুণ্ঠিত হয় না। রাজস্থানরূপ রাজপুতনার ইতিহাসে দেখিতে পাইবেন, প্রাচীনকালে দুইজন মোগল রাজপুতনায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজপুতগণ তাহাদিগকে কন্যাদান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

মোগল-রাজপুত বলিয়া তাহাদের বংশ পরিচিত হয়। রাজপুতরাজ বাপ্পারাও যবন রাজকন্যা বিবাহ করেন বলিয়া বর্ণিত আছে। অন্য ধর্ম্মগণের দ্বেষের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, ভারতবাসী হিন্দুগণও পরে অন্য ধর্ম্মদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে; এখনও তাহা সকল হিন্দুর মধ্যে সংক্রামিত হয় নাই।

বৃহৎ ধর্ম্ম পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ধর্ম্মজ্ঞান ও তাহার প্রকাশ জন্য ভাষার সৃজন বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাইবেন, জ্ঞানকে প্রকাশ জন্য বিধাতা শব্দকে ভাষারূপে সৃজন করিতে যাইয়া, কোথাও স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রত্যেককে পৃথক পৃথক রাখিয়া বহুবর্ণ, কোথাও বা মিলাইয়া অল্পবর্ণ করিয়া, ষট্পঞ্চাশত পৃথক ভাষা ও তাহার ব্যাকরণাদি শাস্ত্র সৃজন করিলেন।

ততো ভাষাশ্চ সসৃজে পঞ্চাশৎষট সংখ্যায়া।
তজ্ জ্ঞানায়চ বর্ণানাং তত্ত্ব ব্যাকরণানিচ॥

আজকালের জ্ঞান সংস্কারে অনেকে মনে করেন, ভাষা ও ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবগণ ক্রমে গঠন করিয়া লইয়াছে। নানা ভাষায় জ্ঞানবান জন একটী নূতন ভাষা সৃজন করিতে সক্ষম হয় বটে। কিন্তু ভাষা সংস্কারহীন ভাষাকে কখনও সৃজন করিতে পারে কি? তাই প্রথমে ভাষা সত্ত্বার সৃজন ভগবান হইতেই সম্পাদিত হইয়াছিল নিশ্চয়। যে সত্ত্বা ছিল না মানব দ্বারা তাহার সৃজন হইতে পারেনা।

পুরাণ শাস্ত্রের আর্য্যত্ব স্থাপনের ইতিহাস-অংশ আলোচনা করিলে পাওয়া যায়—বিধাতা প্রথমে মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ হইতে চারি স্বভাবের নর এবং নিজের বিভিন্ন ভাব হইতে দেব, দানব, সিদ্ধ, চারণ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, প্রেতাদি দেবতার সৃজন করিলেও, সে সৃষ্টি অজ্ঞানময় ছিল। কোন প্রকার জ্ঞান বিদ্যার প্রকাশ না থাকায়, তাঁহারা ভিন্ন

ভিন্ন প্রাণীর মতই, এক এক রূপ স্বভাব হইয়া, পশুপালের মত বিচরণ করিতেছিলেন। চারিশ্রেণীর মানবই এক নর নামে পরিচিত ছিল; দেবগণের এক দেবতা নাম ছিল। ভাষা ও শিল্পাদি কোন প্রকার জ্ঞান বিদ্যারই তখন বিকাশ ছিল না, উলঙ্গ পশুর মত ফলমূল আহার করিয়া, সেই দেবতা ও নর বৃক্ষতলে বা গহ্বরে বাস করিত। এইরূপ দেবতা ও মানব দেখিয়া বিধাতা তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তখন সেই মানব ও দেবতাগণকে জ্ঞানময় জীবন দান করিতে লোকপাল দেবতাগণ বা প্রজাপতিগণের সৃজন হয়। তাঁহারাই হিন্দুর শাস্ত্রকর্ত্তা আদিজ্ঞানের অধ্যাপক আর্য্যঋষি ও দেবতাগণ এবং ভগবান তাঁহাদের হস্তে যে জ্ঞানের গ্রন্থ দান করিলেন তাহাই আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ।

হিন্দুর বেদ নামক ধর্ম্মশাস্ত্র—বেদাঙ্গ শব্দব্রহ্ম বা শব্দজ্ঞান সংবাদ, বেদান্ত—সাধারণ জড়জ্ঞানের উপরে আত্মা ইত্যাদি অধ্যাত্ম জ্ঞানের সংবাদ, বেদ বলিতে প্রভু-সম্মতভাবে শ্রুতি স্মৃতি, সুহৃদ-সম্মতভাবে ইতিহাস পুরাণ. কান্তাসম্মত ভাবে কাব্য রামায়ণ মহাভারত। ব্রহ্মার মুখ প্রসৃত সাম, ঋক, যজু ও অথর্ব্ব সংহিতা. বিষ্ণু মুখ নিঃসৃত নিগম—ভক্তিশাস্ত্র, মহেশ্বর মুখ-নিঃসৃত আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রই প্রভুসম্মত বেদ শ্রুতিশাস্ত্র। ইহার উপরেও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতির্ব্বেদ কালতত্ত্ব, ধনুর্ব্বেদ যুদ্ধবিদ্যা, গান্ধর্ব্ববেদ সঙ্গীত বা নাদতত্ত্ব, ও পুর্ত্তবেদ শিল্পশাস্ত্র ইত্যাদিকে উপবেদ বলা হয়। এই সমস্তের মিলিত জ্ঞানের নাম হিন্দুর বেদ শাস্ত্র। এক কথায় মানবের জ্ঞাতব্য জ্ঞানের বিষয়ে, ঈশ্বরাভিকর্ম্ম পথ নির্ণয়ের সন্ধানই বেদ। ব্রহ্মার বিশেষ প্রার্থনায় স্বয়ং জগত-পালনকর্ত্তা ভগবান বিষ্ণুই ব্রহ্মা ও প্রজাপতিগণকে নিমিত্ত করিয়া,এক এক জ্ঞান ও বিদ্যা প্রকাশ জন্য সেই সেই জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রি দেবতারূপে জগতে আবির্ভূত হইয়া জ্ঞান ও বিদ্যা সকলকে প্রকাশ ও স্থাপন করেন। বিষ্ণুই নর-নারায়ণ

ঋষি হইয়া তপস্যা ধর্ম্মের প্রকাশ করেন। এইরূপ কপিল হইয়া বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান, দত্তাত্রেয় হইয়া অষ্টাঙ্গযোগ, ভৃগু অঙ্গীরাদি রূপে কর্ম্ম-তন্ত্র, বিশ্বকর্ম্মা হইয়া শিল্প, ধন্বন্তরী হইয়া চিকিৎসা, বিশ্ববসু গন্ধর্ব্ব হইয়া সঙ্গীত, এইরূপে এক এক রূপে এক এক জ্ঞান ও বিদ্যাকে ক্রমে জগতে প্রকাশ করেন। আবার চারি শ্রেণীর মানবের আদর্শ জন্য, তিনিই অংশে ঋষি হইয়া ব্রাহ্মণের, মনু ও তাঁহার বংশরূপে ক্ষত্রিয়ের ও এইরূপ বৈশ্য ও শূদ্রের আদর্শ হইয়া প্রত্যেকের আদর্শ কর্ত্তব্য শিক্ষাদান করেন। দেবতার আদর্শ জন্য তিনিই ইন্দ্র, বরুণ, ধর্ম্মরাজ ইত্যাদি লোকপাল-দেবতা হইলেন। এইরূপে কশ্যপ হইতে নানা অংশে দৈত্য-পতি, গন্ধর্ব্ব-পতি, নাগ-পতি, পিতৃ-পতি, যক্ষ-পতি, রক্ষ পতি ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের আদর্শ জ্ঞান-শক্তি স্থাপন করিলেন। ইঁহাদিগকে প্রথম সৃষ্টিরূপ প্রজাগণের জ্ঞান-দাতা অধিপতি করিয়া নিযুক্ত করায় ইঁহারা প্রজাপতি ও লোকপাল দেবতা নামে পরিচিত। ইঁহারাই হিন্দুদের সদাভাব্য ও নিত্যপূজ্য দেবতাগণ। এই সমস্ত দেবতা যেন এক ভগবানেরই ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতিবর্গ। এই সমস্তের মিলিতরূপই হিন্দুর উপাস্য পরম-দেবতা পরমেশ্বর। গীতার বিরাট রূপ মধ্যে অর্জ্জুনকে তাই নিজদেহে এই সকলকে দেখাইয়াছিলেন।

এই জ্ঞান-বিদ্যালয় পূর্ণরূপে সজ্জিত হইতে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে অঙ্গপুত্র বেনের রাজত্ব পর্য্যন্ত প্রায় দশম-পুরুষ কাটিয়া গিয়াছিল। প্রজাপতি-বংশধর রাজা বেন অজ্ঞানগ্রস্ত হইয়া অসুর স্বভাব হইয়া গেলে, ঋষিগণকে বেদের আচার আর্য্যত্ব ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া বসিল। ভৃগুআদি ঋষিগণ বুঝাইতে যাইলে, তাঁহাদের অপমান করিয়াছিল। তখন তাঁহারা তপোবলে বেনকে নিহত করেন। পরে রাজার শাসন বিনা আর্য্যত্ব রক্ষণ ও স্থাপন অসম্ভব বুঝিয়া সকল প্রজাপতি ঋষি ও দেবতাগণ মিলিয়া বিষ্ণুকে কাতরে ডাকিতে থাকিলে বেনের দেহকে নির্ম্মিত করিয়া রাজা

পৃথু ও অর্চ্চিরূপে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

দেবগণ পৃথুকে ত্রিজগতের রাজপদে বরণ করিলে, তিনি দেবতা ও ঋষিগণের সহায়তায় পৃথিবীর সমস্ত মানব ও দেবতাসমাজে শৃঙ্খলা-বিধান করিয়া, সমস্ত জ্ঞান ও বিদ্যাকে জগতে স্থাপন করেন। এই পৃথিবী প্রাণীবর্গকে ধারণ করেন বলিয়া ধরা নামেই পরিচিতা ছিলেন। এই পৃথু কর্ত্তৃক সংস্কৃতা হইয়া,—পথ, নগর, দুর্গ, সরোবর, প্রাসাদাদি দ্বারা সজ্জিতা হইয়া, পরে পৃথুকন্যা পৃথিবী নাম প্রাপ্ত হন। এই পৃথিবীর মত মানব জাতি ও দেব জাতিকেও তিনি, পৃথক পৃথক জাতির নামে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেকের জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকার নির্দ্দেশ করিয়া, রাজশাসনে শিক্ষিত করেন। সেই কাল হইতে নরের নাম মনুষ্য মানব হয়।

রাজা পৃথুই প্রজাপতি ঋষি ও দেবতাগণকে, সুমেরু-পর্ব্বতে স্থান দান করিয়া, সে স্থানের নাম স্বর্গ নামকরণ করেন। অসুরগণকে পাতালে, নরগণকে পৃথিবীতে স্থান বিভাগ তিনিই করিয়া দেন। বিশুদ্ধ স্বভাব মানবগণকে চতুর্ব্বর্ণে নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তিনিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নাম ও চারিবর্ণের পৃথক কর্ম্ম নির্ণীত করিয়া, তাহাদিগকে প্রজাপতিগণের প্রথম আবির্ভাব স্থান, ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত, সিন্ধু, নর্ম্মদা, সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা, গোমতি ও কাবেরী নদীর প্রবাহিত স্থানে স্থাপন করেন। এই চারিবর্ণের অনুলোম মিশ্রিতবর্ণগণকেও পৃথক পৃথক নাম-কর্ম্মাধিকার তিনিই বিভক্ত করিয়াছিলেন। আবার প্রতিলোম অধর্ম্মজ সন্তানগণকেও অন্ত্যজ আদি নামে পৃথকধর্ম্ম দান করিয়া, গ্রামের বাহিরে তিনিই স্থান দান করেন। এই পৃথুই ভারতের পশ্চিম দেশবাসী গণকে যবন নাম দান করিয়া, তাহার পশ্চিমে ম্লেচ্ছগণকে স্থাপন করেন। যবন পৃথক ভাষা ও ধর্ম্মবিধান দান করেন। এই জন্যই আরববাসী

মোহম্মদীয়গণকে হিন্দু যবন ও তাহার পশ্চিমবাসী ইউরোপীয়গণকে ম্লেচ্ছ বলে। মহাভারতে দেখিতে পাইবেন জতুগৃহে গমনকালে, বিদুর যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছ ভাষায় উপদেশ দান করেন বলিয়া বর্ণিত আছে। খ্রীষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্বে এই ম্লেচ্ছ নামের সংবাদ পাওয়া যায়। রাজা যযাতি পুত্রকে যবন হও বলিয়া অভিশাপ করেন। পূর্ব্বেই যবনত্ব না থাকিলে, যবন হইতে বলিবেন কেন? প্রাচীন কালে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগুলি, হিন্দুর শাক্ত শৈব বৈষ্ণবাদির মত, ভিন্ন নামে একেশ্বরেরই উপাসনা বলিয়া ধরিয়া লইত ও বিভিন্নাচারকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির বর্ণ-ধর্ম্মের মত পৃথক আচার ধরিয়া যার যার ধর্ম্মাচরণ করিত। পরস্পর দ্বেষ ও বিরোধ ছিল না।

ভগবানকে গড বা খোদা বলিয়া ভিন্ন নামে উপাসনা করে বলিয়া, খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদী হিন্দুর অনাচরণীয় হইয়া রহে নাই। হিন্দু মধ্যে শিব, বিষ্ণু, কালীকা ইত্যাদি কত ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে ভিন্ন প্রণালীতে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে, এক বাটীতেও পিতা-পুত্রাদিতেও সেই ভিন্ন পথে চলিতেছে, তাহাতে বিরোধ নাই। উদ্দেশ্য যদি পরম-পুরুষ, জগতকর্ত্তা, সর্ব্বদেবেশ্বর ভগবান থাকে, যে কোনও নামে তাঁহাকে সম্বোধন করুক না কেন, তাহাতে অপরাধ হয় না বলিয়া হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদী হিন্দুর অনাচরণীয় কেন?—

বিষ্ণুর সহস্র নাম, মহাদেবের সহস্রনাম পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে জগতের সমস্ত নামকেই ভগবানের এক একটী নাম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বিষ্ণুর শতনাম মধ্যে শেষে বলিয়াছেন, নমো নাম স্বরূপিনে। জগতের সমস্ত নাম ও আকারই প্রকৃত পক্ষে ভগবানের আকার এবং তাঁহারই নাম; জীবের আকার সমস্তই কি ভগবানের দত্ত আকার নহে? তাঁহারই ইচ্ছায় আমার অনিচ্ছায়ও বাল্য, কৈশোর

যৌবনাদি কতরূপ দেহে বিকাশ হয়, তাহাতে জীবের কি কর্তৃত্ব আছে? তন্ত্র শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন নামের সৃষ্টি নাদরূপী শব্দ হইতে। তাই শব্দই ভগবানের প্রকৃত নাম। সেই নাম ব্যক্ত ও অব্যক্ত যত প্রকারে উচ্চারিত হইতে পারে, সেই সমস্ত গুলিই ভগবানের প্রকৃত নাম। তাই হিন্দুর অকার হইতে ক্ষ কার পর্য্যন্ত পঞ্চাশত বর্ণের পৃথক পৃথক উচ্চারণ গুলিই ভগবানের মূল নাম বা নামের বীজ-মন্ত্র। তন্ত্রে তাই এক অক্ষরী নাম ও এক অক্ষরী ভাষায় ধর্ম্মজ্ঞান ও ঈশ্বর সাধনা বর্ণিত আছে।

হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের বর্ণিত সর্ব্বতত্ত্বকেই সত্য বলিয়া মানিয়া, তাহা পালনই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, যথাসাধ্য তাহা সাধনের চেষ্টা করার নামই আর্য্যত্ব। শাস্ত্রবর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব, জাতি-বর্ণ বিভাগতত্ত্ব, লোকপাল দেবতাদি বিভাগতত্ত্ব, ভগবানের সগুণ সাকার উপাসনা, নির্গুণ নিরাকার উপাসনা তত্ত্ব, সকাম সাধনা, নিষ্কাম সাধনা, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও ভক্তিরূপ চারি সাধনাপথ, এই সকল তত্ত্বকেই, না বুঝিতে পারিলেও স্বীকার করিয়া, কোনও মতকে ঘৃণা বা দ্বেষ না করিয়া, নিজের জ্ঞান, শক্তি ও কর্ম্ম-সুবিধা বুঝিয়া, একটী সাধনা গ্রহণ করত, জীবন যাপনই হিন্দুমতে আর্য্যজীবন। তাই দিনরাত্র শুচি শুদ্ধতা জ্ঞানালোচনা ও ঈশ্বর সাধনাকারী ব্রাহ্মণও যেই হিন্দু, আবার অনেক হীনাচারী শুদ্ধাচারহীন চণ্ডালাদি জাতি ও কোল ভীলাদি পার্ব্বত্য জাতিগণও তেমনি হিন্দু বলিয়া স্বীকৃত; তাহাদিগকে হীনাচারী বলে কিন্তু অহিন্দু বলে না। এই সকল জাতিরই লক্ষ্য, আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের শুদ্ধাচার। তাই যে বর্ণেরই কেহ একটু ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রবর্ত্তী হয়, সেই ব্রাহ্মণের মত শুদ্ধাচার ও ধর্ম্মসাধন, গ্রহণ করিয়া জীবন কাটায়, সমাজ পরিত্যাগ করে না। হিন্দুমতে মানবের এক কর্ত্তব্য ঋণ পিতামাতার নিকট, দ্বিতীয়ে ভগবানের নিকট। পিতৃঋণে পিতামাতার জন্য স্বজাতির বর্ণ ধর্ম্ম বা কুলাচার রক্ষা

করা মানবের প্রথম কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বর সাধনা কর্ত্তব্য। তাই ঋষিগণের মতে পিতৃকর্ত্তব্যে হীন-কুলজগণ নিজকুলের হীনাচারী রূপ হীনসঙ্গ বর্জ্জনে অক্ষম। তাই মানব তাহাতে থাকিয়াই আর্য্যজ্ঞানে শ্রদ্ধা রাখিয়া, যথাসাধ্য শাস্ত্রাচারে চলিতে চেষ্টা করিলে, সেও আর্য্যাচারীর প্রাপ্য জীবত্বমুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু সব মতকে না মানিয়া, কোন মতকে অসত্য বলিয়া বর্জ্জন করিলেই—ঋষিজ্ঞান হইতেও নিজের জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ ধরিয়া লইলেই, সেই অহংভাব আশ্রয় করিয়া, অসুরত্ব রূপ অনার্য্যত্ব সেই মানবকে অভিভূত করিবে ও আর্য্যত্বচ্যুত করিয়া ফেলিবে। এই জন্যই যে সমস্ত ধর্ম্মপন্থীগণ, এক একটী দল গঠন করিয়া, অন্য মতকে ঘৃণা ও দ্বেষ করে, সেই মতকে নিন্দাদি দ্বারা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সেই সব দলকেই হিন্দু আর্য্যত্বচ্যুত, সঙ্গের অযোগ্য করিয়া বর্জ্জন করিয়া রাখিয়াছে।

কেবল খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদীয় নহে, হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজও এই গণ্ডীর ও দ্বেষের দোষে হিন্দু বর্জ্জিত হইয়া আছে। জৈনগণ বিষ্ণু অবতার দত্তাত্রেয় ঋষির অষ্টাঙ্গ যোগকেই মাত্র সর্ব্ব সাধন সার নির্ণয় করিয়া, হিন্দুর অন্য সাধনপন্থীগণকে হীন ভাবিয়া দ্বেষ আরম্ভ করিলেই, হিন্দুর পরিত্যজ্য হইল। হিন্দু কিন্তু দত্তাত্রেয় বা তাঁহার অষ্টাঙ্গ-যোগকে পরিত্যাগ করেন নাই। এইরূপ বিষ্ণু অবতার বুদ্ধদেবের অহিংসা ও শরণ-ধর্ম্মই মাত্র বেদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত, তাহাই সৎধর্ম্ম; বেদের অন্য সব মত অসৎ, অপধর্ম্ম মাত্র বলিয়া যেই সে সব মতকে দ্বেষ করিতে লাগিল ও বিনাশ করিতে চেষ্টায় ব্রতী হইল, সেইদিন বৌদ্ধনাম-ধারী দলকে হিন্দু সমাজ আর্য্যত্বচ্যুত বলিয়া ত্যাগ করিল। বুদ্ধদেব বা তাঁহার অহিংসা বাদ ও শরণধর্ম্মরূপ বৈষ্ণব বাদকে পরিত্যাগ করিল না। বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বুদ্ধদেবকে

আজও হিন্দুগণ পূজা করে। এইরূপ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসমাজ ও পাঞ্জাবের আর্য্যসমাজ স্বগুণ উপাসনা ও বর্ণধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, কেবল নির্গুণ নিরাকার উপাসনা লইয়া গণ্ডী করায় ও স্বগুণ উপাসনা ও বর্ণ ধর্ম্মের দ্বেষ আরম্ভ করায় হিন্দুর পরিত্যাজ্য হইয়া আছে। কিন্তু নির্গুণ বাদকে হিন্দু পরিত্যাগ করে নাই। নিবৃত্তি পন্থী হিন্দু বর্ণাচারও পরিত্যাগ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসধর্ম্মমধ্যে চারিটী সম্প্রদায়— আচারী, রামায়ৎ, নিমাইৎ নির্ব্বানি ইত্যাদি। ইহারা বর্ণধর্ম্ম ও শুদ্ধাচার রক্ষা করিয়া চলেন, তাহা বিনা অশীতিটী সম্প্রদায় আছে, তাহাদের নাম পন্থ। নানক পন্থ, কবীর পন্থ, আঘোর পন্থ, নাথ পন্থ ইত্যাদি, এইসবে বর্ণ ধর্ম্মচার নাই।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আর্য্যাচারে সন্দেহের ভাবই অনার্য্যত্ব। এই জন্যই গীতায় দেখিতে পাইবেন, ঋষি বর্ণিত ক্ষত্রিয়াচার—"প্রয়োজন হইলে অধর্ম্মাচারী ও প্রতিযোদ্ধা গুরুবর্গ পিতা গুরু ইত্যাদি এবং আত্মীয় নিজ সন্তান ভ্রাতাকে পর্য্যন্ত বধ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া, ক্ষত্রিয়ের উচিৎ নহে" এই আর্য্যাচারে যখন অর্জ্জুনের সন্দেহ জন্মিল, সে যুদ্ধবিমুখ হইতে প্রস্তুত হইল। তখন ভগবান-শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—এমন বিষম কর্ম্ম-শঙ্কটকালে, কি করিয়া এমন অকীর্ত্তিকর, অস্বর্গকর অনার্য্য দূষিত ভাব তোমায় আক্রমণ করিল।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্ট মস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ গী ২।২

রাজ পৃথুই সৃষ্ট রাজ্যকে বর্ত্তমান আকারে শৃঙ্খলিত ও জ্ঞান বিদ্যাদি দ্বারা শোভিত করেন। জ্ঞান-সাধনার পুরস্কার ও বিরুদ্ধাচারের শাস্তি সেইদিন হইতে নির্দ্দিষ্ট হয়। ভগবান প্রথমে প্রকৃতিরূপ নিজ শক্তিকে প্রকাশ করিয়া দেখিতে যাইয়া, নানাপ্রকার প্রাণী ও জগতের সৃজন

করেন। কতরূপ সৃজন শক্তি আছে তাহা দেখিতে পূর্ণ, হীন ও বিরূপ সকলপ্রকার প্রাণীকেই সৃজন করিয়া দেখিলেন। সেই সৃষ্টিকে কতকদিন রাখিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইতেই, পরে বেদরূপ নিয়মাবলী এবং তাঁহার শিক্ষক কর্ম্মচারীরূপ প্রজাপতি-দেবতাগণকে সৃজন করিয়া পালনে নিযুক্ত করিলেন। এই পৃথুই ধর্ম্মরাজকে বিচারে, দেবরাজকে স্বর্গসুখ ভোগ করাইতে, বরুণদেবকে পাতালে নরক দুঃখভোগ করাইতে নিযুক্ত করিলেন। পুরস্কারের সুখসম্ভার ও শাস্তির দুঃখ নরক-যাতনা সেই কালেই সৃজিত হয়। সূর্য্যদেব, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, শনি, দেবতা এবং অসুর কুলের মঙ্গল ও রাহুকে, তিনিই একএক গ্রহের অধিপতি করিয়া কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দেন। এই বিধান শৃঙ্খলা যে মানব গ্রহণ করিল, সেই আচারবানগণই আর্য্য-নামে পরিচিত হইল, আর যাহারা গ্রহণ করিল না বা দ্বেষ আরম্ভ করিল, তাহারাই অনার্য্য নামে জগতে পরিচিত হইল। বিধাতার সাধারণ মানব সৃজনের পরে প্রজাপতি-গণের সৃজন এবং পৃথু কর্ত্তৃক পৃথিবীর শৃঙ্খলা; দেবতা ও মানবের শৃঙ্খলা, স্বর্গ ও পাতালাদি স্থান দান; প্রজাপতিদের কর্ম্ম বিভাগ কথা ব্রহ্মপুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। প্রায় পুরাণেই সংক্ষেপতঃ তাহার আভাস পাওয়া যায়।

আর্য্য ও অনার্য্য বলিয়া দুই জাতীয় মানব জগতে আছে বলিয়া, আধুনিক জ্ঞানীগণ বলিতে চাহেন। কিন্তু আদিমানবের অজ্ঞানময় জীব স্বভাবই অনার্য্যত্ব, আর দ্বিতীয়ের জ্ঞানময় স্বভাবই আর্য্যত্ব। তাই জ্ঞানালোচনা ছাড়িলে, জ্ঞানবান শ্রেষ্ঠ বংশীয়গণও অনার্য্যতুল্য হীনজ্ঞানী, হীনাচারী হইয়া উঠে, আর জ্ঞানালোচনা সদাচার গ্রহণে, আমরা যাহাকে অনার্য্য বলি, তাহারাও দেহে স্বভাবে জ্ঞানে আর্য্যতুল্য হইয়া উঠে। হিন্দু

আর্য্য ও অনার্য্য জাতি নহে

পুরাণের সূর্য্যবংশ বিবরণীতে দেখিতে পাইবেন, চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয়গণও আর্য্যসদাচার ও জ্ঞানালোচনা চ্যুত হইয়া অনার্য্য হইয়া পড়েন। শক, যবন, কোল, দার্ব্বা, চোল ইত্যাদি জাতি প্রজাপতি মনুবংশীয় ক্ষত্রিয় হইয়াও, মহারাজ সগর কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত আচার ভ্রষ্ট ও ব্রাহ্মণ সঙ্গহীন হইয়া আজও অনার্য্য হইয়া আছে। ইহারা সগরের পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহাকেও বধের চেষ্টা করিয়াছিল। মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহার জীবন রক্ষা করেন; পরে অগ্নি অস্ত্র দান করেন। সেই অস্ত্রবলে রাজ্য লাভ করিয়া সগর পিতৃশত্রুগণের কতককে নিহত ও কতককে রাজ্যচ্যুত ধর্ম্মচ্যুত করিয়া ভারত হইতে তাড়াইয়া দেন। আর্য্যশাস্ত্র ও আচার্য্য ব্রাহ্মণ সঙ্গহীন হইয়া, তাহাদের বংশ পরে অনার্য্য হইয়া যায়। পরে এই সকলের বংশধরগণ হইতে ভারতবাসী ও আর্য্য-সভ্যতার মহাঅকল্যাণ সাধন হয়। ব্রহ্মপুরাণ ৮ অঃ ৩০-৫০ শ্লোক।

সগরস্তু সুতোবাহোর্যজ্ঞে সহগরেণৈব।
ঔর্ব্বস্যাশ্রমাসাদ্য ভার্গবেণাভিরক্ষিতঃ॥
আগ্নেয় মস্ত্রং লব্ধ্বভ্য ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ।
জিগায় পৃথিবীং হত্বা তাল জঙ্ঘান হৈহয়ান॥
শকনা পহ্লবানাংচ ধর্ম্মনিরসদচ্যুতঃ।
ক্ষত্রিয়ানং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পারদানাংচ ধর্ম্মবিদ্॥
অন্য—শক যবন কম্বোজাঃ পারদাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
কোলাসর্পা মহিষকা দার্ব্বাশ্চোলাংস কেরলা॥
সর্ব্বেতে ক্ষত্রিয়া বিপ্রা ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।

সূর্য্যবংশের ইতিহাসে সূর্য্যপুত্র শ্রদ্ধাদেবই বর্ত্তমান মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত মনু। তাঁহার পুত্র নরিষ্যন্তের সন্তান শক। ইঁহার বংশধরগণ শকনামে পরিচিত হইয়া উত্তরা পথের রাজা হন। শ্রদ্ধাদেবের পুত্র

ইক্ষ্বাকুর বংশে ককরোরোমের পুত্র অস্ট্রীদ্, তাহার চারিপুত্র পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল। ইহারা স্বনামে রাজ্য স্থাপন ও বংশ স্থাপন করেন, ইহারা দক্ষিণাপথে রাজত্ব করিতেন। (ভাগবত ও ব্রহ্মপুরাণে)। তাই বলিলাম শক, কোল, চোলাদি মূলত মনুবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিল।

আজকাল অনেকে হিন্দুর পুরাণ গ্রন্থকে অপ্রামাণ্য ভাবিয়া, বর্ত্তমানে বেদ নামে পরিচিত গ্রন্থ আশ্রয়ে, আদিআর্য্যগণের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান বেদ, বর্ত্তমান কলিনামক যুগের আরম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, প্রাচীন বেদের কতক লইয়া ব্যাসদেব গ্রন্থন করিয়াছেন। আদি স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে যে পূর্ণবেদ প্রকাশিত হয়, তাহার চারি অংশের নাম ছিল, সাম, ঋক, যজু ও অথর্ব্ব। কালধর্ম্মে তাহা প্রায় লুপ্ত হইতে বসিলে, বিষ্ণু অংশে ব্যাসদেব হইয়া, এই যুগের মানবের উপযোগী করিয়া কতক কতক প্রকাশ করেন। তিনি বহ্বৃচি, নিগদ, ছন্দোগ ও আঙ্গিরস নামে চারি সংহিতা প্রকাশ করেন। ছন্দোগে সাম সকল, বহ্বৃচে ঋক, নিগদে যজু ও আঙ্গিরসে অথর্ব্ব সকল প্রকাশ করেন। তিনি যে সমস্ত প্রকাশ করেন নাই, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনীতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুপ্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যদেবকে আরাধনায় তুষ্ট করিয়া, নূতন যজু সমূহ, যাহা তৎকালে কেহ জানেন না তেমন যজু প্রকাশ করেন। সেই কালে সূর্য্যদেবের কেশর হইতে অনেক ঋষি নূতন যজু সংগ্রহ করেন, তাহা বাজসেনী সংহিতা হয়। এই রূপে চতুর্দ্দশজন স্মৃতি কারক ঋষি সকলেই বহু সংহিতা করিয়া লুপ্ত বেদকে ক্রমে পূর্ণ করেন। ভাগবতে বেদশাখা প্রণয়ন অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন, বেদের কত অসংখ্য শাখা প্রকাশ হইয়াছিল। ভাগবতের এক স্থানে বর্ণিত আছে, এক ঋকবেদের সাড়ে চারি সহস্র শাখা হইয়াছিল। বৌদ্ধ

আর্য্যগণের আদি বাসস্থান ভারত।

প্লাবনে ইহার অনেক অংশই ধ্বংস হইয়া যায়। তাই আচার্য্য শ্রীশঙ্কর সমস্ত ভারত সন্ধান করিয়াও ব্যাসকৃত বেদ সংহিতা চতুষ্টয় পাইলেন না। তিনি মাত্র বেদান্ত ও উপনিষদ গুলি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। পরে শ্রীরামানুজাচার্য্য বর্ত্তমান বেদের উদ্ধার করিয়া, তৎকালের অশীতিজন পণ্ডিত লইয়া তাহার সায়ণভাষ্য রচনা করিয়া যান। এই অসম্পূর্ণ বেদ দ্বারা কিকরিয়া আর্য্য ইতিহাস রচনা হইতে পারে? বেদের ইতিহাস অংশই পুরাণ। বেদে যে ঋষি; দেবতা বা রাজার নাম উক্ত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ পরিচয় জন্মাদি পুরাণেই বিস্তারে প্রকাশিত। তাই পুরাণ ছাড়িয়া যে প্রাচীন আর্য্যইতিহাস লিখিতে যাইবে, তাহার চেষ্টা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না। পুরাণের সহায়তা বিনা বেদের যথার্থ অর্থবোধই হইতে পারে না। এই জন্যই অনেক পুরাণেই বর্ণিত আছে, পুরাণ-জ্ঞানহীন ব্যক্তি বেদ পাঠে রত হইলে, বেদ তাহার ভয়ে রোদন করেন,—সে নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধ অর্থ করিবে। বেদাঙ্গ উপনিষদ সহ চারিবেদ পাঠ করিয়াও যদি পুরাণ না জানে, সে কখনও বিচক্ষণ হইতে পারে না। স্কন্দপুরাণ প্রকাশ খণ্ড ২ অঃ ৯০-৯১ শ্লোক।

বেদা বরিশ্চলং মন্যে পুরাণংবৈ দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদা প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভত্যল্পশ্রুতা দ্বেদো মময় চলয়িষ্যতি।
ইতিহাস পুরাণৈস্তু নিশ্চলোহয়ং কৃতপুরা॥
যো বেদ চতুরো বেদান সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥

পুরাণবর্ণনা মতে আদিপ্রজাপতি ঋষি ও দেবতাগণের জন্মস্থান, ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত।—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী নদী প্রবাহিত স্থান। পরে রাজা পৃথু সুমেরু পর্ব্বতে তাহাদের স্থান দান করেন।

প্রথম আর্য্যমানব আদিপ্রজাপতি স্বয়ম্ভুব-মনুর রাজধানী সরস্বতী-নদী ও সাগর সঙ্গমে বর্হিষ্মতী পুরী, এই ভারতে। আদি দৈত্যরাজ হিরণ্য-কশিপুর রাজত্ব সিন্ধুদেশ, বলীর যজ্ঞস্থান কাঙ্গরা-উপত্যকা, ধ্রুবের সাধনাস্থান মথুরায় ধ্রুবটীলা। পৃথিবীর শৃঙ্খলাকর্ত্তা, মানব জাতির শৃঙ্খলা-কর্ত্তা, জ্ঞানধর্ম্ম স্থাপন কর্ত্তা রাজা পৃথুর জন্ম ও কর্ম্মস্থান ভারত। স্থাম্নুতীর্থ বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের থানেশ্বর তাঁহার যজ্ঞভূমি। সেই প্রজা-প্রতিগণের জন্ম ও বিশেষ কর্ম্মস্থান গুলিইতো আজও আর্য্যভূমি ভারতের প্রাচীনত্বের নিদর্শন ও গৌরবের ধর্ম্মভূমিরূপ মুক্তিক্ষেত্র তীর্থ স্থান কত দেবতা, কত ঋষি, ভক্ত সাধক-মানবের পবিত্রস্মৃতি লইয়া আজও এই স্থানগুলি, মৃতপ্রায় হিন্দুর হৃদয়ে ধর্ম্মের জ্যোতি জাগাইয়া দিতেছে। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষকহীন, শাস্ত্রহীন, প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞহীন, সাধকহীন হইয়াও, মাত্র এই তীর্থ-স্মৃতি মহিমায়, সেই ঋষি, দেবতার স্মৃতি ও পদধূলির মহিমায় আজও এত নির্য্যাতন সহিয়া টিকিয়া আছে। আজ কালের সিদ্ধ পুরুষগণও এই সবকে, সত্যই সেই দেবঋষি-সেবিত স্থান বলিয়া স্বীকার করেন, তাই পুরাণ ইতিহাসকে কি করিয়া অস্বীকার করা যায়?

আদিরাজা পৃথুই দেবগণকে স্বর্গরূপ সুমেরুতে স্থান দান করেন। অসুররূপ উপদেবগণকে পাতাল নামক ভূবিবরে ও মর্ত্ত্যরূপ জনস্থান পৃথিবীতে মানবের বাস নির্দ্দেশ করেন। স্বর্গ তিনটী, ধামস্বর্গ-সুমেরুতে জ্ঞানস্বর্গ—যোগলব্ধ সুখময় রথ—ইচ্ছামাত্র প্রাপ্ত হইত ও যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিত। বিল-স্বর্গ-পৃথিবীর ভূগর্ভে পাতালপুরী। এই দেব ও অসুরগণ পৃথিবীর পালক নিযুক্ত হন। দেবগণ সদা মানবগণ-মধ্যে আর্য্যত্বরূপ দেবস্বভাব দান করেন ও তাহার রক্ষণে চেষ্টা করেন, আর অসুরাদি উপদেবগণ অনার্য্যত্বরূপ অসুর স্বভাব দান করেন ও তাহা রক্ষণের চেষ্টা করেন। কখনও অসুরভাব জগতে প্রবল হইয়া দেবত্বকে নাশ

করিতে চাহিলে, দেবগণ আসিয়া সেই অসুরত্বকে পরাজয় করিয়া তাড়াইয়া দেন। পুরাণে পাওয়া যায়, কখনও অসুরগণ বেদোক্ত সকাম সাধনায় দেবত্বলাভ করিয়া স্বর্গ অধিকারী হইয়াছেন। যেই কালে দেবতাগণ অহঙ্কারে বেদ লঙ্ঘণ করিয়া দেবত্ব ভ্রষ্ট হইতেন, অসুরগণ সেই কালে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া সুমেরু অধিকার করিয়া লইয়াছেন। তাহা লইয়া দেবাসুরে দারুণ যুদ্ধ হইত। পরে দেবগণ আবার দেবত্ব প্রভা লাভ করিয়া অসুর তাড়াইয়া স্বর্গ অধিকার করিয়াছেন এবং পৃথিবীতেও দেবত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বেদের এই দেবাসুর যুদ্ধকে আজকাল আর্য্য-অনার্য্য-যুদ্ধ, অসুর তাড়ানোকে অনার্য্য তাড়ানো,—নিম্নভূমিতে দেবরূপী আর্য্য-মানবের উপনিবেশ স্থাপন ব্যখ্যা হইতেছে। এই দেবাসুর সংগ্রাম মানব জীবনেও নিত্যই সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানবই একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। বিচার করিলে উভয়ের মধ্যে একরূপ তত্ত্বের খেলাই পাওয়া যায়। যদি বলেন প্রজাপতি দেবতা স্বয়ং-ঈশ্বরের অংশ, তাহাদের দোষ হয় কেন? আদি প্রজাপতিগণ সকালেই ঈশ্বরের-অংশ দোষাতীত। পর যুগের প্রজাপতিগণ তাঁহাদের অংশজাত বা কোনও শ্রেষ্ঠমানব হইয়া থাকেন। তাই তাঁহারা কখনও ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন; পূর্ণ বিনা অংশের ক্রুটী হইবেই। তাঁহাদের অতিদীর্ঘ জীবন মধ্যে সেই ক্রুটী মাত্র দুই একবারই হইত ও এই ক্রুটী জন্য শাস্তিতে তাহারা পূর্ণতা পাইত। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ইন্দ্র, চন্দ্রাদি ব্রহ্ম অংশভূত, তাই তাঁহাদের কোন ক্রুটী ছিল না। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে জাত ইন্দ্রই অহল্যা দর্শনে দেবত্ব ভ্রষ্ট হন ও চন্দ্র গুরু পত্নীকে হরণ করিয়া গ্রহপতি হন। অনেক মন্বন্তরেই মানবগণ পুণ্যফলে, প্রজাপতিত্ব ইন্দ্রত্বাদি পদলাভ করেন। বলী ও সুরথ রাজাদি তাহার প্রমাণ। মহাভারত ও অনেক পুরাণে যে, পূর্ব্বে মানবগণ মধ্যে বর্ণ বিভেদ

ছিল না, জ্ঞানাদির প্রকাশ ছিল না, বিবাহ বিধান ও সতীত্বাদি ব্রত ছিল না বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা প্রজাপতিগণের স্বজনের পূর্ব্বকার সংবাদ। প্রজাপতিগণের উদ্ভব হইতেই এই বর্ণ বিভেদ, জ্ঞান বিস্তার প্রকাশ, বিবাহ বিধান, সতীত্বাদি ধর্ম্মের সংবাদ পাওয়া যায়। স্বায়ম্ভুব মনু তাহার কন্যাগণের বিবাহই জগতের প্রথম আর্য্যবিবাহ। সেই প্রজাপতি-গণের বিবাহ-বিধানই হিন্দুর বিবাহ বিধান। মনুপত্নী শতরূপা, কন্যা কর্দ্দম পত্নী দেবহূতী ও দক্ষপত্নী মাতা প্রসূতি এবং ইহাদের কন্যাগণই জগতের প্রজাপতিগণের আদি মাতা। অরুন্ধতি, অনুসূয়া, দাক্ষায়ণী-সতী ইত্যাদি হিন্দুর আদর্শ সতীগণ ইহারাই। আর্য্যত্ব স্থাপয়িতা পৃথুপত্নী অর্চ্চি সহমৃতা হন (ভাগবত)। এই প্রজাপতিগণের আদর্শ আচারই পরে সর্ব্ব মানব সমাজে স্থাপিত হয়।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## হিন্দুধর্ম্মের আর্য্যত্ব সংবাদ।

পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রই আর্য্যত্বের দাবী করিয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিলে আর্য্যত্বের লক্ষণ কেবল হিন্দু শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। অন্য সমস্ত ধর্ম্মই ধর্ম্মের ও তত্ত্বজ্ঞানের অংশ মাত্র, সমস্তের পূর্ণতা একমাত্র হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। ঋজু শব্দ হইতে আর্য্য কথার জন্ম হইয়াছে। ঋজু—যাহা সকল মানবের প্রাণের পিপাসা তৃপ্তিকর, যাহা নিত্য সত্য সহজ

সরল মত তাহাই আর্য্যমত। মাত্র হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বিনা সকল মানবের, সর্ব্ব প্রকার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে, সর্ব্বপ্রকার বিভিন্ন প্রবৃত্তিবান মানবগণকে মার্জ্জনা করিয়া, সত্যই পূর্ণমানব করিয়া তুলিতে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে জগতে আর কোনও হিন্দুশাস্ত্রেরই শক্তি নাই।

কেয়ামত অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পরে, কেমনে আবার জগত সৃজিত হয়, আত্মার কেমনে জন্মহয়, গর্ভমধ্যে জীব কেমনে থাকে ইত্যাদি অনেক বিষয়ের প্রশ্ন মোহম্মদের নিকট করা হইলে, তিনি এই সকলের কিছুই উত্তর দান করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, এইসব আলোচনায় সময় নাশের কি প্রয়োজন? কেমনে ঈশ্বর-বিশ্বাস লাভ হয়, কেমনে বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া চিত্ত ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবিয়া যায়, তাহার সন্ধান শ্রবণ কর, সেই বিষয়ের আলোচনা কর, নাম জপ ও ঈশ্বরের মহিমা স্মরণ কর, তাহাতে জন্ম সফল হইবে। মোহম্মদ যে, একমাত্র অনন্য ভক্তি ও ঈশ্বর স্মরণকে প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন, তাই তিনি তাহাই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা ঈশ্বরপন্থীর নিকট বড়ই মধুর ও প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তাহাতে সকল আরববাসীর প্রাণের পিপাসা মিটিবে কেন? তাই পরে সে দেশের ঈশ্বর সাধকগণ-মধ্যে, হিন্দু ঋষি বর্ণিত সকল সাধন তত্ত্বই স্বভাব হইতে আপনি জাগিয়া উঠিল। কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি পথরূপ চতুর্ব্বিধ সাধনাতত্ত্ব, সোহংবাদ, উপদেব সাধনাগুলি পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠিয়াছিল। মোহম্মদের প্রতি গোড়ামী করিয়া, মোহম্মদীগণ সেই সমস্ত মতকে বিনাশ করিতে কত নির্য্যাতন ও নরহত্যা করিল, তবু সেই সমস্ত সাধনা আজও গোপনে মোহম্মদীগণ মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। এইসব মত যে নিত্য সত্যধর্ম্মের সংবাদ। সত্যের কি কখনও নাশ হইতে পারে?

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও আত্মানত্ম-বিবেক বেদান্তাদির সংবাদ ছিল না। কোনও মহৎপ্রাণ যখন জ্ঞানের পিপাসা মিটাইতে, সেই সব তত্ত্বের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, বহু জ্ঞান-পিপাসী তাহাদের সে জ্ঞানের শিষ্য হইতে আরম্ভ করিত। গোড়ামীযুক্ত খ্রীষ্টিয়গণ তাঁহাদিগকে অধর্ম্ম-প্রচারী বলিয়া কত নির্য্যাতন দিয়া বধ করিল। কিন্তু আজ সমস্ত খ্রীষ্টিয়গণ তাঁহাদের কৃত দর্শন পাঠকরা গৌরব মনে করেন। যিশু নির্গুণ নিরাকার-ব্রহ্মের উপাসনাই প্রকাশ করেন কিন্তু খ্রীষ্টিয়গণ মধ্যে, স্বভাব হইতেই স্বগুণ সাকারে উপাসনা জাগিয়া উঠিল না? কাথলিকগণের যিশু ও মাতা মেরীর মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধায় সেবা পূজা, তাঁহাদের নিকট সংসারের মঙ্গল প্রার্থনা, ক্রুশের সম্মান, এই সমস্তই এককথায় সকাম সগুণ সাধনা। এই সগুণ সাকারভাবে উপাসনা, সকামে উপাসনা দেহধারী মানবের একটী নিত্যস্বভাব। এই জন্যই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সাকার দেহ ধরিয়া, অব্যক্ত নিরাকার নির্গুণকে বুঝিতে যাওয়া বড়ই কষ্টদ। অব্যক্তকে বোধ করা মানবের অনেক কষ্টের সাধনার প্রযোজন। গীঃ—১২—৫ শ্লোক।

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম।
অব্যক্তহি গতি দুঃখং দেহ বদ্ভিরবাপ্যতে ॥

একদিন এই ভারতে আর্য্যগণ মধ্যেও প্রাণের ভক্তিধর্ম্ম অজ্ঞতায় আবরিত হইয়া আচার বহুল আড়ম্বরের সকাম তান্ত্রিক সাধনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে মহাব্যভিচার, মদ্য মাংসাহার, নারীসঙ্গ, দেবতার নিকট পশু পাখী হইতে নরকেও বলিদান আরম্ভ হইয়াছিল। রাজাগণ মধ্যে কে কত প্রাণী বধ করিয়াছে তাহাদ্বারা ধর্ম্মের ওজন করিত। শত সহস্র হইতে কোনও রাজা লক্ষপ্রাণী হত্যা করিয়া দেবপূজা সম্পাদন করিত। সেই দিন জগত পালনকর্ত্তা, সর্ব্বজীব বন্ধু, ভগবান বিষ্ণু

তাঁহার অসীম কৃপা লইয়া বুদ্ধদেবরূপে ভারতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার অপূর্ব্ব ঐশীশক্তি মাখা কৃপার বাতাসেই ভারতের পশুত্বময় দুর্দ্দিনতার বিনাশ হয়।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহং শ্রুতিজাতং সদয় হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতং,

কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীরং জয় জগদীশ হরে॥ জয়দেব।

বুদ্ধদেব প্রকাশ করিলেন, পৃথিবীর সমস্ত-প্রাণী বলিদান হইতেও ভগবানে আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ দান। আত্মসমর্পণ না করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরকে অন্য দ্রব্য দান করেন, ভগবান তাহার জলও গ্রহণ করেন না; কেন না তাঁহারতো দ্রব্যের অভাব নাই। এই বিষয়-জগতের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তিনি যতদূর তুষ্ট হন, রাজ-রাজেশ্বরের উপচার, মহাড়ম্বরের পূজায়ও তিনি তেমন তুষ্ট হন না। ভগবানে শরণ গ্রহণ হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সাধনা আর জগতে নাই।

যেচ বুদ্ধঞ্চ শরণং গতে ন গমিস্সন্তি অপায়াং।

রক্ষন্তি সকল দেবা জলেপিবা থলে পিবা॥ (বৌদ্ধ ত্রিরত্ন)।

এই শরণ গ্রহণ জন্য, দিন দেখিবার প্রয়োজন নাই, তীর্থ বা দেব-মন্দিরে গমনের প্রয়োজন নাই, কোনপ্রকার সাধকশ্রেষ্ঠ গুরুর অপেক্ষারও প্রয়োজন নাই, যেই সময় ইচ্ছা কাতরে, সত্যই প্রাণের আর্ত্তির সহিত বলিয়া উঠ, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। আমি জগতকর্ত্তা বুদ্ধ নামীয় ভগবানের শরণ লইলাম। সেই ঈশ্বর শরণের সদা সহায়তা করিতে, জীবের আরও দুইটী সাহায্যকারী মহা বন্ধু আছে। একটী ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিতীয় ঈশ্বরভক্ত। এই বিশ্বজগতে জীবের অবলম্বনীয় প্রকৃত মহারত্ন মাত্র—এই তিনটী ১। আশ্রয়ে—ভগবান, ২। সন্দেহে—শাস্ত্র, ৩। সাহায্যে—ভক্ত। এই তিন রত্নের শরণই মানবের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধনা গ্রহণ। তাই বুদ্ধদেব কৃত সাধনার দীক্ষা, এই তিনরত্নের শরণ গ্রহণ মাত্র ১। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,

২। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ৩। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। বুদ্ধদেব বলিলেন সকল ধর্ম্ম সাধনারই পূর্ণতা এই শরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল।

এই বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর কৃপাশক্তির প্লাবনে ভারতের রাজমুকুটধারী সম্রাট হইতে দীনভিখারী ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ হইতে অতি হীনাচারী চামার, মেথর পর্য্যন্ত, ভারতের সমস্তেই ভাসিয়া গিয়াছিল। কেবল ভারত নহে, পূর্ব্বের চীন, জাপান, পশ্চিমে ইউরোপ পর্য্যন্ত ইহার তরঙ্গে অলোড়িত হইয়াছিল। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ভারতের একচ্ছত্রী হিন্দুসম্রাট দারুণ বৌদ্ধদ্বেষী চণ্ডাশোক বুদ্ধদেবের বহু পরবর্ত্তীকালে জন্মিয়াও, এই তরঙ্গাঘাতে পৃথিবীর গৌরব প্রেমাশোক হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের শত শত রাজা, কোটী কোটী প্রজা বুদ্ধদেবের ভক্ত, সেই মতে সিদ্ধ অমানুষ শক্তিসম্পন্ন সহস্র সহস্র মহাপুরুষে ভারত পরিব্যাপ্ত, ইহা দেখিয়াই মহারাজ অশোক মনে করিলেন, এই বুদ্ধমতই মাত্র আর্য্য, বেদোক্ত ধর্ম্মের সারমর্ম্ম,—অন্য সমস্ত সাধনপথ অসার। তাই এই ধর্ম্মমতকেই মাত্র রক্ষা করিয়া, বেদোক্ত অন্য সমস্ত মত নষ্ট করিতে তাঁহার মতি জন্মিল। তাঁহার চেষ্টায় রাজশক্তি ও ধনের বলে, সমস্ত বুদ্ধ-ভক্তগণকে একত্র করিয়া, সংধর্ম্ম নামে এক নূতন দল গঠন করিলেন এবং অন্য-সাধনপন্থীগণকে অপধর্ম্মী নাম দিয়া, তাহাদের সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলেন; তাহাদের ধর্ম্মমত নাশের জন্য নানা চেষ্টায়ও ব্রতী হইলেন। বেদের ভাষা সংস্কৃতকে বিনাশ চেষ্টায় পালিভাষা রাজভাষা করিলেন ও বেদের বিনাশ জন্য পালি ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক নামে বুদ্ধ উপদেশাবলীকে ধর্ম্মাদর্শ করিয়া স্থাপন করিলেন। রাজব্যয়ে ও রাজ শাসনে প্রতি গ্রামে মঠ স্থাপন করিয়া, বৌদ্ধাচার্য্যকে বিনা মাহিনায় বালকগণকে বিদ্যাশিক্ষা দান ও গ্রামের সকলকে নব-ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা গোপনে হিন্দুশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ধ্বংস সাধন,

হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা প্রচারও হইত। এই বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছিল, অসভ্য হুন ও মোহম্মদীয় শাসন দ্বারাও বুঝি তত অনিষ্ট হয় নাই। হিন্দুর অষ্টাদশ সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য মাত্র উপনিষদ গুলির কতক ও কয়েকখানা পুরাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন, ব্যাস প্রকাশিত বর্ত্তমান বেদ সংহিতাই প্রাপ্ত হন নাই। পরে শ্রীরামানুজ স্বামী কাশ্মীর হইতে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসাধন বিষয়ে মাত্র হিন্দু হইতে পৃথক হইলেও, নীতিধর্ম্মাদি অনেক বিষয়ে হিন্দু আচারীই ছিলেন। দেব-উপাসনা বর্ণধর্ম্মাদি তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই। তবে সন্ন্যাস আশ্রমে জাতি বিচার ছিল না। বৌদ্ধ শ্রাদ্ধাদি, চতুর্ম্মাস্যের প্রবণাদি ব্রতবিধান সন্ধান করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন বিশাল বৌদ্ধধর্ম্ম দলেও পরে বেদান্তের বিচার ও বাদ, যোগের সহোজলী, অমরোলী ও বজ্রোলী মুদ্রার সাধনা, শ্বাস প্রশ্বাসের সাধনা, সমাধি, বর্ণধ্যান, জ্যোতিধ্যান, শূন্যধ্যান, এমন কি যেই তন্ত্রসাধনের দোষ বিনাশে বুদ্ধদেব অবতার হইয়াছিলেন, সেই তন্ত্রশাস্ত্রের তারা সাধনা, মহাকালের সাধনা, মন্ত্র, ব্যাভিচার পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল, তাহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে বিরোধেও মত্ত হইল। পরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য আগমন করিলে, তাঁহারা পুনঃ হিন্দুই হইয়াছেন বুঝিয়া, বৌদ্ধ নাম ত্যাগ করিয়া হিন্দুমধ্যেই মিশিয়া গেলেন; হিন্দুর ধর্ম্মসাগর হইতে একটী বুদ বুদ উঠিয়া আবার তাহার জলেই লয় পাইল। তাই বলিলাম, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র-বিনা জগতের কি খ্রীষ্টিয়, কি মহম্মদীয়, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি আর্য্য-সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রেই জগতের সকল মানবের উপযোগী, সহজ, সরল সত্যধর্ম্মের সংবাদ বর্ণিত নাই; সে গুলি কতক জনের উপযোগী, হিন্দুদের বর্ণধর্ম্মের মত এক এক প্রকার সাধনার সংবাদ মাত্র।

হিন্দু বিনা অন্য সমস্ত ধর্ম্মপন্থীই, সকল মানবের একরূপ সাধন-আচার গ্রহণকেই, ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতি-বানের একরূপ সাধনে, একরূপ ফল লাভ হইতে পারে কি? যেমন নানারূপ ধাতুপাত্রের ময়লা নাশ করিতে, কাহাকে মৃত্তিকা, কাহাকে ক্ষার, কাহাকে অম্ল, ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবদ্বারা মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, বিভিন্ন-প্রকৃতি মানবের মার্জ্জনাও তেমন ভিন্ন প্রকার হইবেই নিশ্চয়। মানবের কর্ম্মের মূল দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চারিটী সত্তা। অহঙ্কার নিবৃত্ত-বুদ্ধিকে বিষয়ে যুক্তকরে, তখন বুদ্ধি মনকে সেই বিষয়িণী চিন্তা দেয়, পরে মন চিন্তিত কর্ম্মকে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও দেহদ্বারা সম্পাদন করে। এই চারিটী সকলের দেহে থাকিলেও, মানব মধ্যে কেহ দেহ-শক্তি প্রধান, কেহ মনশক্তি প্রধান, কেহ বুদ্ধি কেহ অহঙ্কার-প্রধান ব্যক্তি হয়; একটী প্রবল ও অন্যগুলি দুর্ব্বল থাকে। দেহ-প্রধানব্যক্তি দৈহিক ক্রিয়া-প্রধান ও দ্রব্য প্রধান কর্ম্মই অধিক বুঝে ও স্বভাবতঃ করিতে ব্যগ্রহয়। তাই ঋষি তেমন ব্যক্তির জন্য, কর্ম্মযোগ নামে যজ্ঞাদি সাধন-পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনপ্রধান কল্পনারত-ব্যক্তির জন্য, বেদান্ত বিচারসহ জ্ঞান যোগের সাধনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধিপ্রধান—যাহারা এক বিষয়ে বুদ্ধিকে দৃঢ়রূপে সমাহিত করিতে সক্ষম, তাহাদিগকে অষ্টাঙ্গ-যোগ, চক্রভেদ, সমাধিময় রাজযোগ-সাধন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর অহঙ্কার-প্রধান—যাহারা একজনকে পিতা, বন্ধু বা পুত্র সম্বোধন করিয়া, সত্যই পিতা, বন্ধু ও পুত্রের মত ভালবাসিয়া, তেমন ভাবে সেবাদি করিতে সক্ষম, তাহাদের জন্য ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধরূপ অহঙ্কার নিরোধের ভক্তিযোগ-সাধনপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই চারি সাধনপথ এই চারি শ্রেণীর লোকের নিত্য স্বাভাবিক-সাধনপথ। তাইতো আরবের ঈশ্বর সাধকগণ মধ্যেও হিন্দুর কর্ম্মযোগ—রোজা, নমাজ, ও জাকাতাদি

কর্ম্মবিধির সাধনারূপ সরিয়তী নামে প্রকাশিত হইল। এইরূপ জ্ঞান যোগ—আত্মানাত্মবিবেক তত্ত্বজ্ঞানাদির-সাধনা তরিয়তী নামে, বায়ুযোগ —শ্বাস প্রশ্বাস যোগে, সমাধি, চক্রবেধ যোগে সাধনা, হকিকতি নামে এবং ভক্তিযোগ—সম্বন্ধ স্থাপনে আপনজন বলিয়া আত্মসমর্পণ, মারফতী সাধনা নামে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কেবল মাত্র এই চারি প্রকার সাধনাই নহে, হিন্দুর আমিই ঈশ্বর "সোহং" ভাবে সাধনা, "আনলহক" বলিয়া ও উপদেব প্রেতাদি সাধনাও জিনসাধনা নামে জাগিয়া উঠিয়াছিল; তন্ত্রের ঝাড়া ফুকায় রোগ সাড়ানোও জাগিয়াছিল। হিন্দুগণ হইতে এইসব সাধনা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই; সেই সব সাধনার ভিন্ন মন্ত্র আসনাদির বিভিন্নতায়ই বুঝাযায়, সেই দেশেই, ইহাতে কেহ সিদ্ধ হইয়া এই মত প্রচার করিয়াছেন। হিন্দু ঋষি মানব-জাতির মধ্যে যত প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি আছে তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া, প্রত্যেকের মার্জ্জনা ও পথই সাধনা নামে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাই তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে জগতের সকল ধর্ম্মসাধনার সংবাদই পাওয়া যায়। হিন্দুর পুরাণের ইতিহাস মতে জানা যায়—মানবের প্রথম জ্ঞান-গ্রন্থ এই হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র; তাই পূর্ণভাষা ও পূর্ণজ্ঞান দ্বারা রচিত। রাজা-পৃথু মানবজাতিকে বিভাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থাপন করতঃ এই শাস্ত্র হইতে তাহাদের উপযোগী মতটী, তাহাদের উপযোগী ভাষায় শাস্ত্র গড়িবার, এক এক ঋষি দিয়া সে দেশে স্থাপন করেন। তাই সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর বাণী ও তাঁহার অংশজাত আদি-সন্তানগণ দ্বারা স্থাপিত।

একটী মোহম্মদী ধর্ম্মগ্রন্থে পাঠ করিলাম—পয়গম্বর মুসা একদিন বন দিয়া গমন কালে শ্রবণ করিলেন, এক পশুপালক বলিতেছে—"রে খোদা! তোমায় যদি পাইতাম, আমার মেষের কোমল চামরায় তোমার জুতা গড়াইয়া দিতাম, মেষের অতিকোমল লোমে তোমায় মোজা

পরাইতাম, আমার গাভীর দুধ দিয়া তোকে স্নান করাইতাম, পেট ভরাইয়া দুধ খাওয়াইতাম।” মুসা নিকটে যাইয়া বলিলেন, “রে মূর্খ! খোদার কি দেহ আছে, যে জুতা পরাইবি, স্নান করাইবি, দুধ খাওয়াইবি।” মেষ পালক, জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কে বলিতেছেন, খোদার আকার নাই?” মুসা উত্তর করিলেন—“আমি পয়গম্বর মুসা।” পশুপালক ভূমিতে পরিয়া মুসাকে অভ্যর্থনা করিল, মুসা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কতদূর যাইতেই, মুসা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিলেন : ভগবান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“মুসা! তোমায় পয়গম্বর করিয়াছি কেন? মুসা বলিলেন—“জীবগণকে তোমার দিকে লইয়া আসিতে?” ভগবান উত্তর করিলেন—“না, দূর করিয়া দিতে?” মুসা কাতরে বলিয়া উঠিল, “না প্রভু! তোমার দিকে আনিতে।” ভগবান বলিলেন—“তবে একজনকে যে দূর করিয়া দিয়া আসিলে।” মুসা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—“দূর করিলাম কাহাকে প্রভু?” ভগবান বলিলেন পশুপালককে! সে যাহাই বলিতেছিল, আমাকে নয়? জুতা দিবে আমাকে, স্নান করাইবে আমাকে, দুধ খাওয়াইবে আমাকে, সে আমার কত নিকটে ছিল! তোমার কথায় সে এখন আমার বিষয় ভাবিতেও পারিতেছে না। তুমি কি জান, কতরূপে আমায় পাওয়া যায়? জীবের যত প্রকার হৃদয়, ততরূপ ভাবে আমায় পাওয়া যায়। আমি জীবরূপ একটী ফুলের বাগান সৃজন করিয়াছি। তাহারা এক এক ভাবরূপ ফুলদিয়া আমার পূজা করে। আমি সকলের পূজাই আনন্দে গ্রহণ করি।” এই বলিয়া ভগবান নীরব হইলেন, দুঃখিত অনুতপ্ত মুসা পশু-পালকের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং যাইয়া দেখিলেন, সে আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতেছে। মুসা তাহার নিকট যাইয়া বলিলেন—“বৎস, ক্রন্দন করিও না, মানব সেবা করিতে চাহিলে ভগবান তাহার সেবাও কৃপা করিয়া

গ্রহণ করেন।' কিন্তু পশুপালক কান্দিতে কান্দিতে বলিয়া উঠিল—না, না, মুসা কখনও কি মিথ্যা বলিতে পারেন? তাঁহার কথাই সত্য! আমি মহামূর্খ, খোদার বিষয় আমি কি বুঝিব! হায়, হায়, আমার চোখ আছে কিন্তু আমি খোদাকে দেখিতে পাইব না, হাত আছে খোদাকে সেবা করিতে পারিব না, তবে কি করিতে জন্মিলাম, আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে পশুপালক পাগল হইয়া গেল। প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব এমনি উদার, সাম্প্রদায়িক ভাব বিহীন, কিন্তু গোড়ামীরূপ অনার্য্যভাব আবরণ করিলেই, ধর্ম্মের নামে মানবকে ভীষণ অকল্যাণের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

ধর্ম্ম, কথাটীর প্রকৃত অর্থই মানবত্বের সার্থকতা। কোন্ পথে চলিলে মানব সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় মতে, কর্ম্ম সমাধা করিয়া যাইতে সক্ষম হয় বা মানব তাহার দেহের, গৃহের, সংসারের, সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া, জগতে প্রকৃত সুখ শান্তি ভোগ করিয়া যাইতে পারে, সেইরূপ কর্ম্মাচার ও জ্ঞান সভ্যতার সংবাদই ধর্ম্ম। এই সংবাদ কি এক এক ধর্ম্মে এক এক রূপ হইতে পারে? সকল ধর্ম্মেরই যখন উদ্দেশ্য এই এক, সকলের মতই মূলতঃ এক হইতেই হইবে; তবে আচরণের পার্থক্য হইতে পারে। যেমন শীতপ্রধান দেশের লোক একরূপ বেশ ধারণ করে—সদাই সর্ব্ব অঙ্গ গরমবস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখে, আবার গ্রীষ্ম প্রধান দেশে লোক প্রায় উলঙ্গ বেশ ব্যবহার করে। দেশ ভেদে বেশের বিভিন্নতা থাকিলেও বেশের উদ্দেশ্য, সুশ্রী দেখানো, লজ্জাবারণ, শীত ও বাত সহন সমস্ত দেশের মানবগণেরই এক। এইরূপ সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক, দেশভেদে আচার ও ভাষার বিভেদ মাত্র।

আর্য্যঋষি ধর্ম্মকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। জাতি-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও শাশ্বতধর্ম্ম। জাতিধর্ম্ম—স্বজাতীয় পূর্ণ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিও জ্ঞানের জাগরণ সাধনা শিক্ষা অধ্যায়। কুলধর্ম্ম—পিতা মাতা, সংসার সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যতার নীতিজ্ঞান শিক্ষা অধ্যায়, আর শাশ্বত-ধর্ম্ম—ঈশ্বর-সাধনা শিক্ষা অধ্যায়। জগতের সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়েই এই তিন প্রকার মানবকর্ত্তব্য শিক্ষাবিধান একরূপই স্বীকৃত দেখিতে পাইবেন। জাতিধর্ম্মের—অতিপ্রভাতে নিদ্রাত্যাগ করিয়া দন্ত মুখাদি প্রক্ষালন করা হইতে শৌচাচার, স্নান, অল্পাহার, অল্পনিদ্রা, বীর্য্যধারণাদি বিধান; কুলধর্ম্মের—পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুল্য সেবা ও সম্মান কর, প্রতিবেশীকে ভালবাস, রাজার সম্মান কর, চুরি করিও না, মিথ্যা বলিও না, দীনে দয়া কর, বিপন্নকে সাহায্য কর ইত্যাদি নীতি বিধান; আর শাশ্বতধর্ম্মের—প্রত্যহ সেই জগতকর্ত্তাকে একটু দৃঢ়বিশ্বাস-সহিত স্মরণ কর, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্তব কর ও ভূমে লোটাইয়া নমস্কার কর, দীক্ষা লও, নামজপ কর, তাঁহার মহিমা স্মরণ কর ইত্যাদি বিধান সম্বন্ধে; কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে কি বিরুদ্ধ মত পাওয়া যায়? এই সবে বিরুদ্ধ মত হইলে, তাহা ধর্ম্মই নহে। তবে শাশ্বতধর্ম্মাধ্যায়ে, হিন্দুশাস্ত্রে এমন অনেক অধিক বিষয় আছে, যাহা জগতের অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেই বর্ণিত নাই। পৃথিবীর অন্য সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ই নিগুর্ণ নিরাকার উপাসক, তাই তাহাদের ঈশ্বর-সাধন অধ্যায়, সকলেরই একরূপ। কিন্তু হিন্দুগণ সকলেই সগুণ সাকারের উপাসক, নিগুর্ণবাদকে স্বীকার করিয়াও সগুণ উপাসক। তাই তাহাদের ধর্ম্মে নিগুর্ণ বাদীদের সাধন সংবাদের উপরেও সগুণের অনন্তগুণের অনন্ত উপাসনার সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। এই বহুমত প্রচার ঋষিগণের অজ্ঞতা বা অনার্য্যত্বের সংবাদ নহে। তাঁহাদের মহাজ্ঞান আর্য্যত্বেরই সন্ধান।

ঋষি যে জগতের সকলপ্রকার হৃদয়ের ঈশ্বরলাভের সংবাদ দান করিয়াছেন। তাই হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার ঈশ্বর সাধনাই বর্ণিত আছে। তাঁহারা যেই মতের কথা বলেন নাই, তাহাতে কখনও ঈশ্বরলাভ বা ঈশ্বর কৃপালাভ হইতেই পারে না। হিন্দুর বিরাট শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া সমস্ত সাধনার সংবাদ সংগ্রহ বড়ই কঠিন ব্যাপার বটে, তাতে আবার হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ অনেকই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই যুগে এমন অবস্থা ঘটিবে জানিয়াই বুঝি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অর্জ্জুনকে উপদেশ দান ছলে, ঋষি-স্বীকৃত সর্ব্ব সাধনতত্ত্বের সংবাদ গীতা মধ্যে, সূত্ররূপে ভগবান নিজে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন, তবেই বুঝিতে পারিবেন, আর্য্যঋষি ভারতে কেমন ধর্ম্মপথ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। গীতা চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রব্য-যজ্ঞ, জ্ঞান-যজ্ঞাদিরূপে সংক্ষেপে একবার সর্ব্ব সাধন পন্থা প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নবম অধ্যায় ১৩ হইতে ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত আরও বিশদ ভাবে বর্ণনা করিতেছেন—( শ্লোকানুবাদ )

হিন্দুশাস্ত্র জগতের সকল সাধনার সংবাদ ?

কেহ ভূতাদির অতীত অব্যয়তত্ত্বে—অব্যক্ত নির্গুণ নিরাকার ভাবে ভজনা করে, কেহবা ভক্তির সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ব্যক্ত সগুণ সাকার-ভাবে নাম গুণাদি কীর্ত্তনে, রূপধ্যানে, স্তব নমস্কার করিয়া, যজ্ঞরূপ দ্রব্য উপহারাদি দিয়া উপাসনা করে। সাধারণতঃ এই দুই প্রকার বলিয়া পরে সেই অব্যক্ত ও ব্যক্তরূপের সাধনা কত প্রকার তাহাও ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। একত্বে—এজগতের সমস্তই সেই একমাত্র ব্রহ্ম, জ্ঞানাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত ভাবে। পৃথকত্বে—জীব ও ব্রহ্ম, উপাস্য ও উপাসকের পৃথকত্ব রক্ষা করিয়া দ্বৈতভাবে। বহুত্বে—ভগবান, প্রজাপতি দেবতা, লোকপাল দেবতাদি সহ। কেহ বিশ্বাত্মক—বিশ্বরূপে,

ক্রতু—যজ্ঞ বিশেষ মাত্র। যজ্ঞ ভাবে—পঞ্চ-যজ্ঞ বলিয়া। মহৌষধ—সোম-রসরূপে, স্বধা—আহুতি ভোক্তারূপে, মন্ত্ররূপে—শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া, আজ্য-রূপে—অগ্নিরূপে, হুতরূপে, জগতের পিতামহরূপে বৃদ্ধমূর্ত্তিতে, জগত মাতা নারী মূর্ত্তিতে, জগত পিতা প্রৌঢ় পুরুষরূপে ; ধাতা—কর্ম্মফল দাতা, বেদ্য—জ্ঞান রূপে, পবিত্র—জগতপাবন রূপে, ওঙ্কার—নাদরূপে, ঋক্, সাম, যজু শাস্ত্ররূপে, গতি—সকলেই শেষে যাহাতে গমন করে ভাবে, ভর্ত্তা—ভরণকারী, প্রভু—সকলের অধিপতি, সাক্ষি-সর্ব্বকর্ম্ম ও ভাবদর্শী, নিবাস—সকলের আশ্রয়, শরণ—শরণ লইবার উপযুক্ত সর্ব্ব শক্তিমান কৃপানুরূপে, সুখ—দুঃখ বিপদের সহায়রূপে, প্রভাব—সৃষ্টির কারণ, প্রলয়—সংহার কারণ, স্থান—স্থিতির কারণ, বিধান—সৃষ্টিরাজ্যের শৃঙ্খলা বিধিকারী, বীজ—বিশ্বের মূল উপাদান, অব্যয়—অবিনাশী নিত্যসত্ত্ব, তাপস্বরূপ যেই—তাপের নাশে জীবের মৃত্যু, বর্ষাদি ঋতুর কারণ তাহাদের বিনাশের কারণ, অমৃত—অমরত্ব দানের কর্ত্তা, মৃত্যু—জীবত্বের নাশকারী, সৎস্বরূপ—মুক্তির কারণ, অসৎ স্বরূপ—বন্ধনের কারণ, দেব প্রকৃতিমানগণ এই সব ভাবের যে কোনও ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই সব ভাবের অতিরিক্ত কোনও প্রকার ঈশ্বরসাধনা জগতে প্রচারিত আছে কি? ইহার প্রত্যেক পথই আর্য্যসম্মত ঈশ্বরসাধনা। ইহাদের প্রত্যেকটী দ্বারাই ভগবৎ কৃপালাভ হইতে পারে, হিন্দুশাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। তাই হিন্দু-জগতের কোন ধর্ম্মপথীর ঈশ্বরসাধনপ্রণালীকে কেহই দ্বেষ করে না। তাহাতে ঈশ্বর-সাধনা হয় না তাহাও বলে না। মোহম্মদীয়গণ যেমন অন্যভাবে ঈশ্বর সাধকগণকেই, কাফের—ঈশ্বরবিরোধী অধার্ম্মিক ভাবে, খ্রীষ্টিয় আদিগণ ভিন্নপথী, অন্য সম্প্রদায়ের লোককে তাহার সমাজ, পিতা মাতার কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনাকে, নিজেদের ধর্ম্মের বিজয় ও মহাপুণ্য মনে করে, সে-জন্য তাহাদের পিতা মাতাদের ক্রন্দনেও

তাহাদের মন গলে না। হিন্দু তেমন করে না। হিন্দুগণ মধ্যে ব্রাহ্মণধর্ম্ম, শূদ্রধর্ম্ম বা শাক্ত, বৈষ্ণবাদির ধর্ম্মমতের মতই অন্য ধর্ম্মমতকেও সেই দেশীয় ধর্ম্মই তাঁহারা বলিয়া থাকেন, কখনও অধর্ম্ম বলেন না। কেন না, জগতের সমস্ত ঈশ্বর-সাধনপথের সংবাদই তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বর-সাধন বলিয়া স্বীকৃত আছে। সেই জগতের শৃঙ্খলাকর্ত্তা, আদি প্রজাপতি পৃথুই প্রকৃতি বুঝিয়া পৃথিবীর সমস্তদেশে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভাষাদি পৃথক পৃথক নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ সব দেশে মাত্র তাহাদের অনুযায়ী কর্ম্ম জ্ঞানের সাধনা দান করিয়াছেন, আর ভারতে পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞান পূর্ণ ভাষা প্রকাশিত। তাই ভারতের হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে জগতের সমস্ত ধর্ম্মমতই বর্ণিত আছে, অন্য দেশের শাস্ত্রে তাহা নাই।

গীতা নবম অধ্যায়ে ৩০।৩১ শ্লোকে সুদুরাচার ব্যক্তিও আমায় অনন্য-ভাগে বিভাগ না করিয়া ভজনা করিতে পারিলে, আমার মতে সেই প্রকৃত সাধু। সে স্ত্রী শূদ্রাদি কিবা পাপ যোনিজ হইলেও, শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া শাশ্বৎশান্তি লাভ করে। এই কথাই মোহম্মদ, "উপাসনায় খোদার অংশী করিও না। তবেই সহজে ঈশ্বর আরাধনা হইবে" বলিয়াছেন। গীতার শেষ উপদেশ -

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮ অঃ ৬৬ শ্লো

আমি তোমায় অসংখ্য ধর্ম্মসাধন-পথ বলিয়াছি, সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ( মাম একং ) একমাত্র আমার শরণ লও, আমিই তোমায় সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া লইব। এই কথাই মোহম্মদের "লা এলাহ্ এলেল্লাহ্" এই বাণী—ঈশ্বর তুমিই একমাত্র আমার উপাস্য। আমি জগতের আর সমস্তের উপাসনা—কি দেবতা, কি মানব, কি প্রবৃত্তি সবকে ফেলিয়া একমাত্র তোমার শরণ লইলাম—এই ভাব।

হিন্দুঋষি কত দূর অসম্প্রদায়ী তাহার একটু ঈশ্বর স্তব শ্রবণ করুন।

যং শৈবা সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধা বুদ্ধইতি প্রমাণপটবঃকর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হৎ ইত্যর্থং জৈন শাসনরতা কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোয়ং বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

যাহাকে শৈবগণ শিব বলিয়া উপাসনা করে, বৈদান্তিক ব্রহ্ম বলিয়া, বৌদ্ধগণ বুদ্ধ বলিয়া, নৈয়ায়িক প্রমাণপটু কর্ত্তা, জৈন অর্হৎ বলিয়া ও মীমাংসকগণ কর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করে, সেই ত্রৈলোক্য নাথ হরি আমার বাঞ্ছিত-ফল দান করুন।

শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীনানকজি বলিয়াছেন—"সিমরউ যাস বিস্বুংভর এঁকৈ, নাম জপত অগণত অনেকৈ।" সেই একমাত্র বিশ্ব-ভরণকারীকে সদা স্মরণ কর, আর তাঁহার অনেক নামকে অগণত ভাবে জপকর। শ্রীতুলসী দাসজি বলিয়াছেন—"সবকে রসিয়ে সবকে বসিয়ে সবকে লিজিয়ে নাম। হাঁজি হাঁজি করতে রহে বসিয়ে আপনা ঠাম।" সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে বস, সকলের সঙ্গে রসকর, সব সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের-নামেই নামকর, সবকেই হাঁ, হাঁ করিয়া সত্য স্বীকার কর, কিন্তু নিজের স্থানে—নিজের সাধনে স্থির হইয়া বসিয়া থাক।

তবে প্রত্যেক সাধনায়ই প্রথম প্রবর্ত্তকগণকে, তাহার সাধন-পন্থী বিনা অন্য সম্প্রদায় বর্জ্জনের ব্যবস্থা আছে। নচেৎ তরুণশ্রদ্ধার ও সাধন-নিষ্ঠার বিনাশ পাওয়া সম্ভব। তাই কি মোহম্মদী, কি খ্রীষ্টিয়, কি হিন্দু—আবার হিন্দুর মধ্যে, শাক্ত বৈষ্ণবাদি, ব্রহ্মণ শূদ্রাদিরও প্রথমে অন্য সম্প্রদায় বর্জ্জন করিয়া, স্বভাব জাগাইয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। এই জন্যই বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীনরোত্তমঠাকুর বলিয়াছেন। প্রথমে, "না করিবে অন্যদেব নিন্দন বন্দন। না করিবে অন্যদেব প্রসাদ ভোজন॥" "আপন

আপন স্থানে, পিরিতী সবারে টানে, আপন ভজন স্থানে পড়য়ে বিরতি।" প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একটী প্রীতিআকর্ষণ আছে, তাই প্রথমে তাহার সঙ্গে মিশিলে, নিজের ভজনে বিঘ্ন হয়, তাই অন্যদেব পূজাদি ত্যাগ করিবে। পরে আবার বলিয়াছেন "অন্যদেব পূজি নিবে ইষ্টভক্তি বর।" স্বামিসহ বধুর প্রীতিবন্ধন হইয়া গেলে, অন্যের সঙ্গে মিলনে আর স্বামি-প্রেম নাশ পায় না। স্বামীর মঙ্গলজন্য তখন বধু অন্য পুরুষের নিকটও গমন করিয়া প্রার্থনা করে, তাহাতে দোষ হয় না। হিন্দু এই ভাবেই অন্য ধর্ম্মের সঙ্গ পরিহার করে, দ্বেষবুদ্ধিতে নহে। তবে বর্ত্তমান শিক্ষা-সংস্কারে ও অন্য ধর্ম্মীগণের হিন্দুদ্বেষ হইতে, আজকাল হিন্দুগণ মধ্যেও অন্যধর্ম্মদ্বেষ জাগিয়া উঠিতেছে। এখন অসম্প্রদায়ী, সর্ব্বমানবেরই প্রতিপাল্য, মানবত্ব-সার্থকতার নিত্য সত্যধর্ম্মের আর্য্যধর্ম্মমত শ্রবণ করুন।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## হিন্দু ধর্ম্মের বৈশিষ্ট গুলি ও তাহার আর্য্যত্ব।

পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্মমতেই একরূপ সাধনকেই ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়াছে কিন্তু হিন্দুগণ মধ্যে অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মসাধনা প্রচারিত। তাহাতে আবার পরস্পর বিরুদ্ধমত ও আচারও আছে। যেমন কেহ আমিষ স্পর্শও করে না, কেহ মৎস্য মাংস ঠাকুরের ভোগে দেয়। কেহ

নির্গুণ নিরাকারের উপাসক, কেহ সগুণ সাকার উপাসক, কেহ শ্বেতবর্ণ জটাজুট মণ্ডিত মূর্ত্তিতে ভগবান্ ভাবে, কেহ বনমালী শ্রীকৃষ্ণরূপে, কেহ বা নারীমূর্ত্তি কালীকারূপে উপাসনা করে। হিন্দু সংস্কার হীন অন্যসমাজের লোক ও বর্ত্তমান সংস্কারের শিক্ষিতগণের এইসব বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন ব্যপার। এই জটীলতার জন্যই পূর্ব্বকালে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র সকলকে পাঠ করিতে দেওয়া হইত না। বিশেষ জ্ঞানবানগণের নিকট সাধারণে শ্রবণ করিত। এইসব বিরুদ্ধাচারকে যাঁহারা রহস্য সহিত বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহারাই মাত্র শাস্ত্রবক্তা হইতে পারিতেন।

হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট।

১। নির্গুণ অব্যক্ত—নিরাকার স্বীকার করিয়াও, সগুণ ব্যক্ত আকারের উপাসনা করা। ২। বিশ্বব্যাপী স্বীকার করিয়া তীর্থে, ঠাকুর ঘরে, বিগ্রহ মধ্যেমাত্র আরোপ করিয়া সীমাবদ্ধ ভাবে উপাসনা। ৩। বিশ্বরূপ স্বীকার করিয়া এক আকারে উপাসনা। ৪। এক আকার স্বীকার করিয়া ঘটে, পটে, সূর্য্যে, চন্দ্রে, জলে, ব্রাহ্মণে, গুরুতে, অতিথিতে উপাসনা। ৫। একেশ্বর বাদী হইয়াও বহু দেবতার উপাসনা। ৬। নানারূপ ধ্যান, আচারে এক ঈশ্বরের উপাসনা। ৭। একধর্ম্ম সম্প্রদায়ী, এক উপাস্য, এক আচার আদর্শ হইয়াও জাতিরূপ বিভিন্নতা রক্ষাকরা। ৮। যত্রজীব তত্রশিব, অতিথি নারায়ণ স্বীকার করিয়াও, শ্রেষ্ঠবর্ণ হীনবর্ণের মানবকে অস্পৃশ্যের মত দেখে, ঘৃণাকরে ইত্যাদি হিন্দু আচারগুলি দুর্ব্বোধ্য হইলেও, ঋষির অজ্ঞতা প্রসূত নহে, মহাবিজ্ঞতা আর্য্যত্বের নিদর্শন।

মানব যখন দেহত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে অব্যক্ত নির্গুণ নিরাকার-সত্তায় দেহ ছাড়িয়া যায় না? সেই অব্যক্ত সত্তা আবার দেহে থাকিয়া সগুণ সাকার সগুণ হইয়া লীলা করিয়াছে। আত্মার এই সগুণ ও নির্গুণ অবস্থার

মতই, ব্রহ্মের সগুণ নির্গুণতা দুইসত্তা, ইহাতে বিরুদ্ধ বাদ হয় নাই।

ব্রহ্মের সাকার নিরাকার ও সগুণ নির্গুণত্ব।

পৃথিবীর অন্য সমস্ত উপাসনাই নির্গুণ অব্যক্তের উপাসনাপথ। তাই তাহারা হিন্দুর এই সগুণ ব্যক্তরূপের উপাসনার চিন্তারধারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।. গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথমেই, এই সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার বিষয় ও তাহার লাভালাভ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে নির্গুণবাদের কথা বলিয়াছেন—"আমার নিকট সকল প্রাণীই সমান কেহ দ্বেষ্যও নাই কেহ প্রিয়ও নাই।" ইহা বলিয়া, পরে সগুণের কথায় বলিতেছেন—"যে ভক্তির সহিত ব্যক্তরূপের ভজনা করে, সে আমার আমি তাহার।" অন্যত্র বলিয়াছেন,—"ভক্তের যোগ ক্ষেম বহনকরি।" "ভক্তকে এমন বুদ্ধি যোগাইয়া দেই, যাহাতে আমার নিকট আসিতে পারে।" "ভক্তের পাপতাপ ধোয়াইয়া দেই।" ইহাও বলিয়াছেন— "ভক্তের ভক্তিদত্ত পত্রপুষ্প ফল, জল, জড় দ্রব্যকেও আদরে গ্রহণ করি।"

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
গীঃ ৯ অঃ ২৯ শ্লোঃ।

অব্যক্ত অরূপ, ব্যক্ত সুমোহনরূপে দর্শন দেন, নির্গুণ অশেষগুণবান হইয়া বাসনা পূরণ করেন, নিষ্ক্রিয় ক্রিয়ারত হন, নিরপেক্ষ পক্ষপাতী হইয়া, ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন, শত্রু বধ করিয়া দেন, বিশ্বব্যাপী একস্থানবাসী হন, এই সগুণ উপাসনার গুণে!

সগুণ উপাসনা।

সেই "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" হইতেও মানব বিষয় রাজ্যের মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়, এই সাধককে শত্রু জয় করিতে পারে না, অগ্নি দাহন করিতে পারে না, বিষে জীবন লইতে পারে না, সমুদ্রে পথ

দেয়, আকাশ হইতে খাদ্য বৃষ্টিহইয়া জীবন রক্ষা করে এই সগুণ সাধনার ফলে! তাহা কি হিন্দুর নিন্দার কথা? এই সগুণ উপাসনাই হিন্দুর গৌরব, মানবত্ব সার্থকতার পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ।

কোনও ভক্তের ভক্তিতে কোন স্থানে ব্রহ্মের সগুণ হইয়া বিকাশের স্থানই হিন্দুর উপাসনার বিশেষ স্থান তীর্থ। সেই স্থান ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি ও পদধূলি দ্বারা অন্যস্থান হইতে বিশেষ গুণ প্রাপ্ত। বিশেষ ভক্তের প্রার্থনায় সেই স্থানে তিনি বিশেষ ফল দিতে স্বীকৃত। একজন ভক্তিবলে একরূপ সাধনায় ঈশ্বরকে সগুণ ভাবে লাভ করিয়া, মানবের মঙ্গল জন্য এই বর গ্রহণ করিয়াছেন—আমার এই সাধনার ফল সকলেই ভাগী হউক। বিনা ভক্তিতেও, যে আমার মত উপাসনা করিবে, সে তোমার সগুণতার কৃপালাভ করিবে। বরবাধ্য ভগবান্ বর দিয়াছেন—বেশ, তাহাই হইবে। কিন্তু যদি তোমার উপাসনার :স্তি, মন্ত্র, উপচার, কি আসন, কি পূজা দেওয়ার ভঙ্গিটুকু, পুষ্পটীরও প্রভেদ হয় তবে ফল পাইবে না। হিন্দুর ঠাকুর ঘরে ঠাকুর গড়িয়া উপাসনা, সেই ভক্তের সাধনার অনুবর্ত্তন। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" নির্গুণ নিষ্ক্রিয়কে বাটীর প্রহরী, দুঃখহারী পাপহারী, যোগক্ষেম বহনকারী করিয়া রাখার কৌশল। তাই ঘরে তেমন আচারী বিনা অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেই ঠাকুরকে সেই নির্দ্দিষ্ট আকারে, নির্দ্দিষ্ট আচারে, নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে, নির্দ্দিষ্ট ঘরে রাখিয়া উপাসনা করিতে হয়। অনির্দ্দিষ্ট ফুলটী, কি ফলটিও সে ঘরে প্রবেশ করিতে দেই না। বিরুদ্ধাচার হইলেই যে, ভগবান তাঁর বর দেওয়া সগুণ সত্তার সংহরণ করিবেন। এই বিরুদ্ধাচারের সাবধানতাই হিন্দুর ঠাকুর ঘরের ছুঁৎমার্গ। তাই এই আচার অজ্ঞতার খেলা নয়।

তীর্থ, ঠাকুরঘর ও তাহাতে প্রবেশে ছুঁৎমার্গ—

কর্ম্মকর্ত্তা যেমন সমস্ত কর্ম্মভার নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীগণের হস্তে বুঝাইয়া দিয়া, নিজে নিষ্ক্রিয় নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া বিশ্রাম করেন—ভগবানও জগত্ সৃজন করিয়া, সকল জীবকে যার যার কর্ত্তব্য জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি বিভাগ করিয়া দিয়া, কর্ম্মরাজ্যের সম্পূর্ণ কর্ত্তা হইয়াও নির্গুণ নিষ্ক্রিয়ের মত লুকাইয়া থাকেন। তিনি বেদরূপ জ্ঞানশাস্ত্রে সকলকে পাপ পুণ্য ভাবে, সুখী ও দুঃখী হইবার পৃথক কর্ম্মপথ বুঝাইয়া দিয়াছেন। এখন জীব ইচ্ছানুরূপ পথে চলিয়া, বর্ণিত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, জগতের কর্ম্মপথে ভ্রমণ করুক। এই জন্যই আর্য্যঋষি কর্ম্মফলবাদ নামে স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থন করিয়া, একরূপ ধর্ম্মসাধন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই তুলসীদাসজি বলিয়াছেন—

ব্রহ্মের নির্গুণতা।

"কোন কাহু সুখ আর দুঃখ দাতা। নিজকৃত কর্ম্মফল সবহি ভ্রাতা॥
জন্মহেতু কহ কাহু পিতা কাহু মাতা। কর্ম্ম শুভাশুভ দেই বিধাতা॥"

এ জগতে অন্য কাহাকে তোমার সুখ ও দুঃখ দাতা ভাবিতেছ? সুখ দুঃখ নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ মাত্র। জন্মগ্রহণ করায় তো কাউকে পিতা ও কাহাকে মা ডাকিতেছ, (শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বা সুখী ও দুঃখী ঘরে দেহ পাইতেছ, তাহার কারণ আর কি? তোমার কর্ম্মফল) তাই বলিতেছি, কর্ম্মই সৃষ্টি রাজ্যে শুভাশুভ দানের বিধাতা—বিধান কর্ত্তা।

কখনও যদি কর্ত্তা নিজে উপস্থিত থাকিয়া দেখেন, কর্ম্মচারীগণ, তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে না, বিরুদ্ধাচার করিতেছে। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয় কর্ম্মচারীকে শাস্তি দান করেন। ভগবানের সগুণসত্ত্বার বিকাশের সময়, অগমত্ত্বায়ও তেমন, জীবের প্রজ্বলিত অগ্নিতে হাত দিয়া দগ্ধ হওয়ার মত, নিশ্চয় দগ্ধ হইতে হয়। তাই ভগবান নির্গুণ হইয়া জগত হইতে লুকাইয়া থাকেন। তাই বিশেষ-ভক্ত প্রহ্লাদের আহ্বানে স্ফটিকস্তম্ভে

ব্রহ্মের সগুণতা।

ভগবানের সগুণ-সত্তার বিকাশ হইলে, সেই স্ফটিক স্তম্ভ ভাঙ্গিতে যাইয়া, দেবতা বিজয়ী, অমানুষ ব্রহ্মশক্তিধর হিরণ্যকশিপুর বিনাশ পাইতে হইল। মিশরের নির্য্যাতিত ইস্রায়েলগণ মধ্যেও, তেমন বিশেষ-ভক্তের আবির্ভাবে, অমানুষ দৈবশক্তির নিকট মিশরের দুর্জ্জয় রাজশক্তি বার বার পরাজিত হইয়া বিনষ্ট হয়। যষ্টি সর্প হয়, সমুদ্র পথদেয় খাদ্য বর্ষণ হয়। মোহম্মদের বিনাশের চেষ্টায়, সেকালের পুরোহিতবংশের দারুণ চেষ্টা, এই অমানুষ সগুণ ভগবৎশক্তির বিকাশেই বার বার বিনষ্ট হয়। সেই নির্গুণ অব্যক্ত-ব্রহ্ম যে কোথায়ও যে সগুণ ব্যক্ত হইয়াও বিকশিত হইয়া উঠিতে পারেন, এই সব দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ; সেই নির্গুণকে সগুণ করিয়া তুলিবার, সেই অব্যক্তকে একস্থানে ব্যক্ত করিয়া তুলিবার সন্ধানই ভক্তিরূপ স্নেহের ভজন-পথ। এই স্নেহেররাজ্য জ্ঞান-বিচারের দ্বারা বোধের অতীত। তাহার বোধের স্থান মস্তক নহে কেবল হৃদয়, বুঝিবার উপায় বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তি নহে, কেবল প্রাণ ও হৃদয়ের সরল বিশুদ্ধভাব।

মহৎচরিত্র, সৎকর্ম্মশীল, জ্ঞানবুদ্ধিমান পুত্র নিকটে আসিলে, পিতা মাতা আনন্দে সম্বর্দ্ধনা করে বটে, কোলে নেয় না, নিকটেও রাখে না। তাহাকে নূতন কঠিন কর্ম্মের ভার দিয়া ক্রমে দূর দূরান্তরে—প্রথমে হাটে পরে সহরে প্রেরণ করে। ঋষি মতে মহৎ চরিত্র

সগুণ ভজনের ফল।

জ্ঞানবুদ্ধিশালীকেও ভগবান তেমন মানবত্ব হইতে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত দান করেন, সে ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি-হীন হইয়াও, যদি মাতা পিতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাশীল, একান্ত অনুগত ভক্ত সন্তান হয়, তাহার আহ্বানে পিতা মাতা যাইয়া তাহাকে কোলেকরিয়া লইয়া আসেন। তাহাকে নিজ হাতে খাওয়াইয়া দেন, গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দেন, শরীরের ময়লা ধুইয়া দেন,

তার দুঃখ জ্বালা বিনাশ করিয়া দেন। হিন্দুর সগুণ-উপাসনা সেই শ্রদ্ধা ও স্নেহ রাজ্যের সংবাদ। জ্ঞানাভিমানী কর্ম্মী পুত্র যেমন, অভিমান- রূপ অসুরত্বে আবরিত হইয়া, সেই মাতৃপোষ্য পুত্রকে, জগতের হীন, জ্ঞানহীন, অতি মূর্খ অযোগ্য মানব বলিয়া, নিজকে শ্রেষ্ঠ মহৎ মনে করে। অমৃতময় মায়ের দান, অখণ্ডিত সুখ শান্তি হইতেও নিজের অনেককষ্টে অর্জ্জিত, অল্পকাল স্থায়ী একটু যশ, প্রশংসা, প্রভুত্ব সম্পদরূপ খণ্ডিত সুখ শান্তিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, সে জন্য সে কত শারীরিক মানসিক ক্লেশকে স্বেচ্ছায় বরণ করা কৃতিত্ব মনে করে। জগতের প্রায় সাধারণ মানবই এই সগুণ ভক্তিসাধন পথকে, তেমন হীনতার চক্ষে দর্শন করে; এই পথীগণকে হীনজ্ঞান হীনবীর্য্য অযোগ্য মনে করে। ভারতবাসীর এই সগুণ সাকার উপাসনার অবস্থাও আজ সেই অবস্থা। জগতের অন্য কোনধর্ম্মপথী ও আধুনিক-শিক্ষিত যুবক যুবতীগণ তাহাকে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছে না। ভাবিতেছে ইহা বুঝি অনার্য্যগণ হইতে হিন্দুমধ্যে প্রবিষ্ট পৌত্তলিকতা। কিন্তু এই সগুণ সাকারোপাসনা আর্য্যধর্ম্মের প্রাণ, ধর্ম্মসাধনার শ্রেষ্ঠ অধ্যায়; জীবের পূর্ণভগবান লাভ ও পূর্ণ-জীবত্ব মুক্তির-সন্ধান। কি খ্রীষ্টিয়, কি মোহম্মদীয়, কি বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মেরই চরমলক্ষ্য এই সগুণ উপাসনা। খ্রীষ্ট, মোহম্মদআদির জীবন সন্ধান করিলেও দেখাযায়, তাঁহারা নিজেদের জীবনে সর্ব্বদা ব্রহ্মের সগুণত্বের নিদর্শনই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ সমূহ মধ্যেও ভক্তিপথী-হিন্দু সেই ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারই দর্শন করে। কেবল হিন্দু নহে, ইউরোপের ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখাযায়, অনেক মহাত্মা খ্রীষ্টভক্ত সে দেশে জন্মিয়াও, বাইবেলের বাণীর অর্থ ভক্তিপথে করিয়া নির্য্যাতি হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন। মোহম্মদী মধ্যে সুফীগণ সকলেই এই সগুণ সাকার উপাসক ছিলেন।

তাঁহারা কেয়ামতের পরে, মোহম্মদের সাক্ষীতে বেহস্তে—কেবল স্বর্গে যাইবার সাধনা করেন নাই। তাঁহারা সম্বন্ধ-স্থাপনে কেহ প্রভু, কেহ বন্ধু, কেহ বা পিতা, দুই একজন স্বামীভাবেও ঈশ্বরকে লাভ করিতে ভক্তিপথে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দোষে তাঁহারা মোহম্মদী-সমাজ কর্ত্তৃক ত্যক্ত ও নির্য্যাতিতই হইয়াছেন। তাঁহারা কেহই নিরাকারবাদী নহেন। তাই সুফী শবলী নামজপের পূর্ণতা বিষয়ে বলিয়াছেন—স্মরণীয়ের দর্শনে স্মরণকে বিস্মৃত হওয়াই শ্রেষ্ঠতর স্মরণ। (তেজকর আয়োলিয়ার অনুবাদ তাপসমালা শবলীর উক্তি)। কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদীগণ কেবল নির্গুণ-উপাসনা ও কর্ম্মবাদ—সরিয়তীকেই তাহাদের প্রকৃত ধর্ম্মপথ মনে করেন।

এই সগুণ সাকার-বাদ, শ্রদ্ধার মূর্ত্তিপূজা সকল হিন্দুরই সাধারণ ধর্ম্ম-সাধন। জ্ঞানপথী কি যোগীপথী এই তত্ত্ব অস্বীকার করিলে হিন্দুত্ব চ্যুত হয়। এই সাধনার উপরে নির্গুণবাদী বৌদ্ধ, মোহম্মদী, ব্রাহ্ম ও আর্য্য-সমাজ কত উপায়ে বিনাশের চেষ্টা করিয়াছে. কত দ্বেষের হীনতা-জ্ঞাপক গালি বর্ষণ করিয়াছে, বৌদ্ধ ও মোহম্মদী কত কঠোর অত্যাচার নির্য্যাতন, তীর্থ, মন্দির ও বিগ্রহ অপবিত্র চূর্ণিত করিয়াছে, কেবল সত্যধর্ম্ম বলিয়াই আজও তাহা টিকিয়া আছে এবং তাই তীর্থ পবিত্রীকৃত, মন্দির নির্ম্মিত, বিগ্রহ স্থাপিত হইয়া আবার ভক্তিভরে পূজিত হইতেছে। সেই সব স্থাপনকারীর অপূর্ব্ব ভক্তির বলে, ভগবানের বিশেষ সগুণসত্তার বিকাশে, তখন কত অবিশ্বাসী বৌদ্ধ, মোহম্মদী সম্রাটপর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া, দেব মন্দির গড়িয়া দিলেন, দেবতা স্থাপনের সহায়তা করিলেন, দেব সেবার জন্য সম্পত্তি দান করিয়া দিলেন। তীর্থ ও দেবমন্দিরের বিদ্যমানতায়ই আজও হিন্দুধর্ম্মনামে একটী পৃথক ধর্ম্ম, জগতে টিকিয়া আছে, নচেৎ কোনদিন তাহা বৌদ্ধ বা মোহম্মদীয় ধর্ম্মমধ্যে বিলীন হইয়া যাইত।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রাণই সগুণ ভক্তি সাধন।

তাই ভাগবতে, ভগবান বলিয়াছেন "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুধু ভক্তি দিতে কাতর হই। এ জগতে কোন সাধকই ভগবানকে জয় করিতে পারেন না, কিন্তু ভক্ত তাঁহাকেও জয় করেন।" তাই এই সাধনা বিনা ভগবানকে পূর্ণরূপে লাভ করিবার, জীবত্ব হইতে পূর্ণ মুক্তিপাইবার আর দ্বিতীয় উপায়ই নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন, সেই পরম-পুরুষ ভগবান মাত্র অনন্য ভক্তির লভ্য। "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া॥" গীঃ ৮।২২। আবার অন্যত্র বলিযাছেন, সমস্ত-যোগ সাধন পন্থীগণ মধ্যে মদ্গত অন্তরাত্মা হইযা যে শ্রদ্ধার ভজন, তাহাই শ্রেষ্ঠতম যোগ পথ। গীঃ ৬।৪৭

এই ভক্তিধর্ম্ম ভগবানের অতিপ্রিয় গুহ্য ধর্ম্মমত।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

জ্ঞান সাধনায় দ্রব্যাদ্বৈত—তিনি বিনা দ্রব্য নাই, কর্ম্ম সাধনায় ক্রিয়াদ্বৈত তাঁহার বিনা অন্যের কর্ম্ম নাই, যোগসাধনায় ভাবাদ্বৈত—অখণ্ড ব্রহ্মভাব, সর্ব্বদা ব্রহ্মযুক্ততা লাভ করিলে, জীব ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভকরে। কিন্তু সেকালেও যদি এই ভক্তিপথের সন্ধান না পায়, তবে সকলই বৃথা, তাহার ভগবান লাভও হয় না, জন্মমৃত্যুরও শেষ হয় না। হিরণ্যকশিপু রাবণাদির মত তাপস মহাজ্ঞানী যোগীও এই ভক্তি-সম্বন্ধ অভাবে, সব হারাইয়া, পশু-জীবন লাভকরিয়া অকালে মরিল। তাই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে, লোকের যে দৈব ও আসুর দ্বিবিধ প্রকৃতি আছে—ভক্তিই মাত্র দৈব, ভক্তিহীনতাই আসুর প্রকৃতি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন মানব কর্ম্ম, জ্ঞান যোগাদি সাধনে ব্রহ্মভূত হইয়া, সম্পূর্ণ জীবত্বের অতীত কামনার পারে যাইতে পারিলে আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করে। বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে অপরাভক্তি ঈশ্বরকে কর্ম্ম জ্ঞানাদি পথে উপাসনা, আর পরাভক্তি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য

ও মধুররসের কোনও ভাবে ভগবানকে নিজজন, স্বজাতীয় ভাবে যে উপাসনা।

এই সগুণভাবের ভক্তি-সাধনা, ভগবানের এত প্রিয়সাধনা-অধ্যায় যে, যখনি ভারতে এই ধর্ম্মের উপর দারুণ আক্রমণ হইয়াছে, এই ধর্ম্মকে বিনাশের চেষ্টা হইয়াছে, তখনি ভগবান কখনও নিজে কোথায় বা দেবতা বা ঋষিগণকে এই ভারতে প্রেরণকরিয়া, আবার এই ধর্ম্মেরপ্রভা বিস্তার করিয়াছেন। একদিন হিন্দুগণমধ্যে প্রাণের-ভক্তি ডুবিয়া, তন্ত্রের ঐশ্বর্য্যসাধনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই দিন ভগবান বিষ্ণু পরম-করুণ বুদ্ধদেব হইয়া, কৃপার বন্যায় লক্ষ পশুবলিদান নরবলিদানের তাণ্ডবতা ডুবাইয়া আবার শরণ ও ভক্তিধর্ম্ম জাগাইয়া তোলেন। মহাজানিয় বৌদ্ধগণের ললিতবিস্তার ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত পাঠ ও সেকালের, বিষ্ণুচিহ্নিত বৌদ্ধমন্দির দেখিলেই বুঝাযায়, বুদ্ধদেব কেমন ভক্তিধর্ম্মে ভারত প্লাবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কতদিন পরেই বৌদ্ধগণমধ্যে নানা সম্প্রদায় প্রকাশ পাইয়া, বেদান্তের তর্ক যোগের শূন্যসাধনার ঐশ্বর্য্য-লাভ প্রবলহইয়া বৌদ্ধগণকে নিগুর্ণবাদী, ভক্তিপথের বৈরি করিয়া তুলিল। তখন তাহাদের হস্তে হিন্দুশাস্ত্র ভস্মীভূত হইল, হিন্দুমন্দির চূর্ণিত হইল। সেই দিন স্বয়ং মহাদেব শ্রীশঙ্করাচার্য্যরূপে কতিপয় দেবতা লইয়া আবির্ভূত হইলেন এবং স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মণ-ঠাকুর শ্রীরামানুজরূপে আসিয়া, আবার সেই সগুণ ভক্তিধর্ম্ম বিগ্রহসেবা ভারতে স্থাপন করিলেন! শ্রীশঙ্করাচার্য্য লুপ্ত সমস্ত দেব দেবীর স্তব নিজে রচনা করেন ও প্রতিতীর্থে —হিমালয়ের অভ্যন্তরে কেদার ও বদ্রীনাথে পর্য্যন্ত, নিজে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করেন। তারপরে মোহম্মদীগণের দারুণ আক্রমণে পঞ্চশত বর্ষের নির্য্যাতনে, এই ভারত তীর্থহীন, দেবমন্দির ও বিগ্রহ হীন, ধর্ম্মরক্ষক-হীন, শাস্ত্রহীন, জ্ঞানলোচনা-হীন ও হিন্দু দীক্ষা-সংস্কার

হিন্দুসদাচার-হীন হইয়া লয় পাইতে বসিয়াছিল। সেই দিনও আবার এই সগুণ ভক্তিধর্ম্মের স্থাপনজন্যই, বঙ্গদেশে ভগবান শ্রীমন্‌মহাপ্রভুরূপে দেবগণের সহিত আগমন করেন। আসামে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পঞ্জাবে শ্রীনানক, মধ্যপ্রদেশে শ্রীকবির ও শ্রীতুলসীজি আদি, দক্ষিণে শ্রীতুকারাম ইত্যাদি দ্বারা অমানুষ-সত্তার বিকাশে এই সগুণ ভক্তির উপাসনাই ভারতে স্থাপন করেন। ইঁহাদের শক্তিতে ভক্তির বিশেষ প্রভাবে ভারত আবার তীর্থ, দেবমন্দির ও বিগ্রহ দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎবিষ্ণু ও অন্যান্যকে অন্য দেবতা ও ঋষির আবির্ভাব বলিয়া হিন্দুগণ স্বীকার করেন।

আধুনিক-শিক্ষিত কেহ হয়তো বলিবেন—নিরাকারে কি ভক্তির-সাধনা হয় না? ভক্তির সহিত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম্মের মোক্ষ সাধনা মত। ভক্তি উপাসনাই সগুণ সাকার-উপাসনা; নিরাকারে ভক্তি হইতেই পারে না। ভজ্ ধাতু হইতে ভক্তি শব্দের জন্ম—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভজনের ভাবই ভক্তি চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে চাহে, কর্ণ তাঁহার বাণী শুনিতে চাহে, কর তাঁহার সেবা চাহে, মন তাঁহাকেই ভাবিতে চাহে, সর্ব্বইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ভগবানকে আস্বাদনের জন্য যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার নামই ভক্তি। গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, আর্ত্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী জগতে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আমাকে ভজনা করিতে আসে, সে নিশ্চয় সুকৃতিশালী। "বহুনাং জন্মনান্তে" অনেক জন্মের জ্ঞানালোচনায় জ্ঞানী তেমন ভাবে ভক্তিভরে আমার শরণ লয়। এই ভক্তিরূপ ভালবাসা জন্মিলেই নিরাকার ধ্যান বা তত্ত্বালোচনা থাকে না, সেবায় মতি জন্মিবে। নানা প্রকার সাকার দ্রব্যদিয়া তাঁহাকে সাকার ভাবে পাইতে, সাকার আপনজনের মত আদর যত্ন সেবা করিতে লালসা হইবে।

ভক্তি সাকার –

তাই বলিলাম ভক্তিপথ—স্নেহের-রাজ্যই সাকার। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে "ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাসনার মধ্যে, কোন্‌পথ যোগোত্তম" প্রশ্ন করিতে, অর্জ্জুন তাই ব্যক্তটিকে ভক্তির সহি উপাসনা বলিয়া, অব্যক্তের বেলা ভক্তি কথা যোগ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণও ব্যক্তরূপের সাধনায় পরম শ্রদ্ধাসহ বলিয়াছেন, অব্যক্তের বেলায় মাত্র অব্যক্ত উপাসতে উত্তর দিয়াছেন। তাই বলিলাম অব্যক্তে ভক্তি হয় না। ভক্তির ভজন ব্যক্তরূপে সগুণের উপাসনা। সন্তানগণকে খেলাঘরে দাস দাসীগণের নিকটে রাখিয়া, মাতা নিশ্চিন্তে কর্ম্মান্তরে থাকেন। সন্তানগণ মারামারী কাটাকাটী করিলেও মাতা আসিয়া দেখেনও না; দেখিতে তো দাসগণই আছে। কিন্তু কোনও ছেলে যদি, কিছুতেই খেলায় না মাতিয়া, খেলার দ্রব্য না লইয়া কাতরে মা মা বলিয়া কান্দিতে থাকে, তখন মা আপনি যাইয়া, খেলাঘর হইতে সে ছেলেকে কোলে করিয়া নিজের ঘরে লইয়া আসেন, আর তাহাকে খেলা ঘরে পাঠান না। ভালবাসার ডাকে মায়ের গমনের মত, ভক্তির সাধনে ভগবানের সগুণ সাকার বিকাশ, এই জড় জগতেও সংঘটিত হয় এবং ছেলের খেলা-সাঙ্গের মত জীবের জগতখেলা সাঙ্গ হয়।

এই ভক্তিরসাধনা দুই প্রকার। একটী সগর্ভ অন্যটী নিগর্ভপথ। **সগর্ভ পথ** গুরুমুখে শ্রুতরূপে ভগবানকে দেখিতে বাসনা করিয়া, ঐ রূপ ঐ গুণের ধ্যানের সহিত সাধনা পথ। আর **নিগর্ভ পথ** কোনও কল্পনা না করিয়া, "তোমার সত্যই যেই রূপ, তুমি সেই রূপে আসিয়া আমায় দেখা দেও" এই বলিয়া সাধনা পথ; নিগর্ভপথে চিত্ত স্থির ও বিষয়সম্বন্ধ হীন করিবার জন্য কতগুলি উপায় ঋষি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ-ধ্যান বা শ্বেত, পীত, নীলাদি বর্ণ-ধ্যান, চন্দ্র সূর্য্যধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান, শূন্যধ্যান, তত্ত্বধ্যান

—আত্মাহইতে পঞ্চবিংশ তত্ত্বের বিকাশ ও লয়চিন্তা, শ্বাস-প্রশ্বাসধ্যান, মায়াধ্যান—এই জগত মিথ্যা মায়ামাত্র চিন্তা, ব্রহ্মধ্যান—ব্রহ্মোস্মি বা শিবোহং ভাবে, আমি জীব নহি স্বয়ংব্রহ্ম—ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মশক্তি আমাতেই আছে এই চিন্তা, নাদধ্যান—ভিতরে নিরবচ্ছিন্ন ঘণ্টাধ্বনিবৎ ওঁকার স্ফুট হইতেছে তাহাতে চিত্ত নিরোধ ইত্যাদি শত শত উপায়, ঋষি হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ, ইচ্ছা থাকিলেও যখন ঈশ্বরে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শরণ লইতে অক্ষমতা বোধ করিলেন, তখন বুদ্ধদেবকে শরণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধদেব "কর্ম্মান্ত-চত্তিসা" নামে এইসব ধ্যানের চত্বারিংশত প্রকার ধ্যান তাঁহাদিগকে দান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এইসব সাধনায় কর্ম্মাসক্তি-বন্ধনের শেষহইলে, প্রকৃত ভক্তি ভাব জাগে, তখন শরণ লাভ হয়। সেই সমস্তসাধনাই আর্য্যঋষি-সম্মত নিত্য, সত্য, জীবের জীবত্বভাব নাশক, ঈশ্বরে ভক্তি জনক সাধনপথ। বৌদ্ধগণ ভক্তিসম্বন্ধহীন ভাবে, এই চত্বারিংশত কর্ম্মান্তসাধনের চেষ্টায় যাইয়া, নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং সাধনার উদ্দেশ্য শরণে প্রতিষ্ঠার কথাও বিস্মৃত হইল। এমনকি নিরীশ্বর-বাদী পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ভগবৎসাধনাও সাধারণতঃ দুইপ্রকার, একটী **বৈধী** ও অন্যটী **রাগানুগা** বা একটা পূজা ও একটা সেবা। বৈধটী—কেহ যে ভাবে, যে মন্ত্রে, যে উপচারে, যে রূপ আসনাদি অঙ্গভঙ্গি ও শুদ্ধাচারে পূজাদি সাধনায় ভগবৎকৃপালাভ করিয়াছিল, সেই বিধান মত ভগবানের উপাসনা। সেই পূর্ব্ব সাধকের বরলাভ প্রভাবে ভক্তিহীন জনও ঐ আচারে পূজাদিকরিয়া, সাধনার ফললাভে সক্ষম হয়। নিয়ম-মতে বিধিপালনের চেষ্টা বলিয়া এর নাম বৈধি-সাধন। এই সাধনপথ সাধারণতঃ শুদ্ধাচারী ব্রহ্মণাদি দ্বিজাতিগণেরই অধিকার, শূদ্রাদি

জাতির সেইরূপ আচরণ অসম্ভব। তাই পুরোহিতরূপী ব্রাহ্মণ দ্বারাই এই বৈধি-সাধন সম্পন্নকরে। রাগানুগা সাধন—প্রাণেরটানে প্রাণের-ঠাকুরকে আপনজন বলিয়া, স্বজাতীয় আত্মীয়বৎ ভাবে, গোপনে সেবাকরিবার লালসায় বিগ্রহসেবা গ্রহণ। সেই ঠাকুরকে পাইলে কিরূপে সেবা করিব,—বালক বালিকার সংসার-খেলা শিক্ষায় পুতুল খেলার মত খেলা-গ্রহণ ভাবে বা রামলীলার শবরী ইত্যাদির মত পূর্ব্বজন্মের সাধনলব্ধ ভক্তিবলে, সত্যই ভগবানকে আত্মবৎসেবা করিতে ব্যাকুল হইয়া, ঠাকুরকে গোপনে কাতরে সেবাকরা, অথবা ব্রাহ্মণাদির ঠাকুর সেবা দেখিয়া প্রলুব্ধহইয়া গোপনে সেইরূপ আচরণ গ্রহণকরাই রাগানুগা সাধন গ্রহণ। বৈধিটার মধ্যে নিশ্চয় পূজা পাইবেন অভিমান থাকে, আর সেবা সেই অভিমানহীন। তিনি বড় দয়ালু; কৃপা হইলে হীনের সেবাও গ্রহণ করিতে পারেন, ভাবে সেবা-সাধন করিতে হয়। যেমন স্নেহবাধ্য হইয়া, অনেক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সন্তানও গোপনে শূদ্রবন্ধুআদির বাটীতে, কখন তাহার হস্তেও ভোজন করেন, কিন্তু সে যদি বলিয়া দেয়, তবে আর আসেন না, লজ্জিত হন, ক্রুদ্ধ হন। সেবা-সাধনও তেমন, গোপনের অতিস্নেহ-যুক্ততা ও অভিমান-হীনতার সাধনা। এই জন্য এই সাধনার সংবাদ কাউকে বলিবে না, কোন ঈশ্বরবিভূতি দেখিলেও কাউকে বলিবে না, গৌরব করিয়া পরকে সেই সেবার বিগ্রহ প্রণাম করিতে, সেবার প্রসাদ খাইতেও বলিবে না। পূজার ঠাকুরের প্রসাদ সকলেরই গ্রহণকরা উচিৎ, নাকরিলে অপরাধ, কিন্তু সেবার প্রসাদ শ্রেষ্ঠবর্ণের গ্রহণ নিষিদ্ধ, গ্রহণে অপরাধ। তবে যাঁহারা ভক্তিতে ভগবানকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন, তাঁহার জাতি বুদ্ধি আর থাকে না। চামার রুইদাস, শূদ্র নরোত্তম দাস, জোলা কবির ইত্যাদিই তাহার প্রমান। শত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় রাজা পর্য্যন্ত ইহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজি হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ

করেন। এই সেবাগ্রহণের ভক্তিলাভই ঈশ্বর সাধনার চরম ফল। কেহ পূজাপথে, ঈশ্বর দর্শনের পরে এ ভাব লাভ করে, কেহ বা সেবাপথেই এই ভাবকে প্রাপ্তহয়। হিন্দুর ভক্তিশাস্ত্রমতে ভক্তি তিন প্রকার, সকামভক্তি—বিষয় ধনাদি কামনায় বা সংসার সুখ কামনায় ভক্তি। অকামভক্তি, মুক্তিআদি কামনায়, বিষ্ণুকাম ভক্তি ঈশ্বর লাভ কামনায়, বিষ্ণুকামের আর একনাম—প্রেমভক্তি। দাস্তরসে—প্রভু বা পিতার মত ভাবে। সখ্যে—ভ্রাতা বা বন্ধু বলিয়া; আর বাৎসল্যে—পুত্রভাবে ও মধুরে—স্বামীভাবে ভাবা, মানবেরমধ্যে এই নিত্য চারিপ্রকার স্নেহভাব আছে। ইহার কোনও ভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনে, তাঁহাকে সেইভাবে পাইতে লালসায়, যে সেবা গ্রহণ তাহাই প্রেমভক্তি।

সগর্ভসাধনার প্রথম অবলম্বনই, উপাস্যের শ্রীমূর্ত্তি বা তাঁহার স্মৃতি উদ্দীপক কোনও অবলম্বন গ্রহণ। খ্রীষ্টিয়গণের ক্রশ, মাতা মেরী ও যিশুরমূর্ত্তি অবলম্বন এবং মোহম্মদীয় কাবা মন্দিরের স্মৃতি অবলম্বনও এই মূর্ত্তিরই রূপান্তর মাত্র। তবু কিন্তু খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদীগণ দ্বেষ করিয়া হিন্দুর বিগ্রহ পূজাকে পুতল পূজা বলিয়া ঘৃণাকরে; আধুনিক শিক্ষিতগণও ইহাকে হিন্দুর হীনতা মনে করে।

মূর্ত্তি সাধন।

বিগ্রহ-পূজার নাম পুতুল-পূজা নহে। ভগবৎতত্ব ফেলিয়া কেবল লোকদেখানো, শ্রদ্ধাভক্তিহীন, বাহ্যাচার পূর্ণ যে ঈশ্বরের মূর্ত্তিপূজা উৎসব তাহাই পুতুল-পূজা। যেই মূর্ত্তিপূজা ঈশ্বরেরজন্য আর্ত্তি না জাগাইয়া, ক্রমে ঈশ্বরকে ভুলাইয়া, ঈশ্বর-বিমুখী অহঙ্কারাদি জাগাইয়া দেয় তাহাই পৌত্তলিকতার মূর্ত্তিপূজা। ঈশ্বরের আগমন-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার উদ্দীপনার জন্য, মূর্ত্তি বা কোন বিশেষ বস্তু আশ্রয়ে, তাহাতে আবির্ভাবের জন্য কাতরে আহ্বান মূর্ত্তিপূজা নহে। আরবদেশের একজন সুফী মোহম্মদীয়ফকিরের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তিনি

তাঁহার জীবনী বলিতে বলিতে বলিলেন, "পাঞ্জাবে একদিন অপরাহ্নে প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কোনরূপে প্রাণে শান্তি পাই না। সেই কালে এক হিন্দুমন্দিরে হঠাৎ সন্ধ্যার-ঈশ্বরারতি বাজিয়া উঠিল। ভিতরে হিন্দু নরনারীর বড়ই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। তাহারা বিষয়েরঅতীত কি ঈশ্বরসম্বন্ধ পাইয়া এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, দেখিতে বড়ই আগ্রহ হইল। লোকের সঙ্গে মিশিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। ঈশ্বরউদ্দেশ্যে সেই আরতি-উৎসব প্রাণে আনন্দই দান করিল। লোকসঙ্গেই বাহিরে আসিলাম। নিকটেই এক মসজিদ; মসজিদের মৌলবি আমায় জানে, আমি যে হিন্দু দেবতা দেখিতে গিয়াছি সে তাহাও লক্ষ্য করিয়াছে। আমি মসজিদে উঠিতেই সে বলিয়া উঠিল—"মূর্ত্তি পূজা করিয়া আবার মসজিদে কেন?" আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"মূর্ত্তি পূজা কি এমনি দোষের"? সে উত্তর করিল—"নিশ্চয় কোরাআণের তাহাই মত!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে তুমি সর্ব্বদা মূর্ত্তিপূজা করিতেছ কেন?" সে বিস্ময়ে বলিল, "আমি মূর্ত্তিপূজা করি?" আমি বলিলাম,—এই খাওয়াও ধোয়াও পড়াও কাহাকে? এই বলিয়া তাহার দেহ দেখাইয়া দিলাম ও বলিলাম —রোজ রোজ এই দেহ-পুতুলের পূজা কর, পুত্ররূপ পুতুলের, পত্নীরূপ পুতুলের পূজা কর তাতে দোষ হয় না, আর এক মুহূর্ত্ত খোদার পুতুলের পূজায় আমি অপবিত্র হইয়া যাইলাম? মৌলবী আর শব্দ করিলেন না। তাই বলি ঈশ্বরের মূর্ত্তি পূজাও দোষের নয়। আর ভগবানের কৃপাপ্রকাশিত কোন ভক্তদৃষ্ট-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, তাহা অবলম্বনে উপাসনা পৌত্তলিকতাই নহে। তেজকর আওলিয়ার বঙ্গানুবাদ নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে প্রকাশিত তাপস মালায় সুফী বাক্যে দেখিবেন—ঈশ্বরকে না পাইয়া, যে কিছু অবলম্বনে তাহার উপাসনা, তাহাই পুতুল পূজা। ভগবানকে লাভ

করিলেই ইহার শেষ হয়। (সুফী মস্‌সাদ্ দাম্ববী)। তাই তুলসীদাসজি বলিয়াছেন। তুলসীদাস তোমার এই সব জপ, তপ, পূজা বালিকার শিশুকালের পুতুলখেলা। যখন স্বামীর সঙ্গে মিলন হয়, ভালবাসা হয় সমস্তই পেটারায় তুলিয়া রাখে।

তুলসী জপতপ পূজা সব গোড়াকি খেল্।
সব প্রিয়সে সরবর হুই তো রাখ পেটারী মেল্॥

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে কবীরজির কথাও বেশ শিক্ষণীয়। যে দিন মোহম্মদীয় শাসনে নির্য্যাতনে ও বিরুদ্ধ ব্যাখ্যায়, হিন্দুর ভক্তিময় সগুণ সাধনা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল এবং বিজয়ের অভিমান, সম্পদের দর্প ও ধর্ম্মেরদ্বেষে ইস্লামের ইস্লামত্ব আবরিত বিকৃত হইয়াছিল; সেইকালে আবার ভক্তিধর্ম্ম স্থাপনের জন্য, কবীর নামে এই দেব-সত্ত্বা কাশী প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কবীরজি প্রকৃত ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মলাভের জন্য বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সে কালে সর্ব্বত্রই তাহার অভাব দেখিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—মুসলমান সমাজে মিশিয়া দেখিলাম কেবল সুন্নতের আড়ম্বর আছে, ইমানের দিকে নজর নাই। ব্রাহ্মণ সমাজে যাইয়া দেখিলাম কেবল পৈতার আড়ম্বর আছে, ব্রহ্ম-যুক্ততারদিকে দৃষ্টি নাই। মসজিদের নমাজে মিশিয়া দেখিলাম কেবল সরিয়তির কস্‌রত্, কাবা মন্দিরের ধ্যান উপাসনা, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। হিন্দু দেবালয়ে যাইয়া দেখিলাম, মূর্ত্তির পূজায়ই সবে তৃপ্ত, কেহ ঈশ্বরকে চাহে না। এইসব মসজিদ ও মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিলে যদি আবার ঈশ্বর-যুক্ততা জাগে। এক পাঠান-সেনাপতি বহু হিন্দুদেবমন্দির ও দেববিগ্রহ ভঙ্গ করিয়া, গৌরবের সহিত কবীরকে তাহা জানাইলেন। কবীরজি বলিয়া উঠিলেন,—অগ্নি নিবাইতে যদি কেহ, কাঠের যষ্টি দ্বারা চেষ্টা করে, কাঠের যষ্টিতে অগ্নি লাগিয়া

তাহারাও সকল দগ্ধ করে। সেনাপতি চলিয়া গেলে এক শিষ্য এই কথার অর্থ জানিতে চাহিলে, কবীর বলিলেন, মানব পৌত্তলিকতা নাশ করিতে যাইয়া, অজ্ঞানতা-জন্য নূতন পৌত্তলিকতায় পড়িয়া বিনষ্ট হয়। এই সেনাপতি মনে করিতেছে, মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া হিন্দুর পৌত্তলিকতা নাশ করিবে, কিন্তু মূর্ত্তিভঙ্গকরাই ঈশ্বর-সাধনা, এই হাতুরী বাটালি যে নূতন পুতুল-পূজা হইয়া তাহাকে আবরণ করিয়া বসিল, সে তাহার সংবাদও রাখে না। যেই কর্ম্ম ঈশ্বর-সাধনার রূপধরিয়া ঈশ্বরহইতে দূরে লইয়া যায় তাহাই পৌত্তলিকতার আবরণ। শস্যহীন-বীজের খোলায় যত্ন, প্রাণহীন-দেহের যত্ন করার মত, তত্ত্বহীন হইয়া বাহ্যাড়ম্বরের দর্পকরাই পুতুল-পূজা। এই আবরণ সগুন নির্গুণ সকল সাধনায়ই হইয়া থাকে, তাই এই দোষ কেবল দেবমূর্ত্তি পূজার দোষ নয়।

মূর্ত্তিই যে ঈশ্বর নহে, ভগবান তুষ্ট হইলে কৃপাকরিয়া, মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, সাধকের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা সকল হিন্দুই জানে। তাই তাহারা পূজার পূর্ব্বদিন মূর্ত্তি গড়ে পরদিন ফেলাইয়া দেয়, কেবল যখন পূজাকরে তখন কাতরে ভগবানকে আসিয়া তাহার পূজাগ্রহণে মিনতি করে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করে।

**হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজা**

কোনও বিশেষ ভক্তদ্বারা বিশেষ ভাবে পূজায়, কোন বিগ্রহে স্থায়ীভাবে ভগবৎ-সত্তার বিকাশও হিন্দু স্বীকার করে। কোন্ কোন্ দ্রব্যে ভগবৎসত্তা সহজে বিকশিত হইতে পারে, ঋষি তাহা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। তাই কেবল মূর্ত্তিই নয় জলপূরিত ঘট, শস্যরাশি, বালুকারাশি, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ধর্ম্মগুরু, সম্বন্ধগুরু—পিতা মাতা ও স্বামী, অতিথি, ব্রাহ্মণ আশ্রয়েও হিন্দু ভগবানের আহ্বান করিয়া পূজা করে। যেস্থানে সগুণ সাকারে একদিন ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়াছিল, তেমন স্থানই হিন্দুর সাধনাশ্রয়

তীর্থ স্থান। যে বৃক্ষ ভগবানের সগুণসত্তায় বিকশিত—বেল, তুলসী, পদ্ম ও আমলকী ইত্যাদি বৃক্ষে, নদী পর্ব্বতাদির মধ্যেও যাহারা ব্রহ্মের সগুণ সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধিত—গঙ্গা, যমুনাদি নদী, গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত, গণ্ডকী পর্ব্বতের ধ্বজবজ্রাদি বিষ্ণুচিহ্নে স্বভাবতঃ চিহ্নিত শিলাখণ্ড শালগ্রাম,গোমতী শিলা, নর্ম্মদানদীর অর্দ্ধচন্দ্র নাগ ত্রিশূলাদি রুদ্রচিহ্ন-চিহ্নিত শিলা, হিন্দুর দেবপূজার আশ্রয়। কেন হিন্দু এই সবের আশ্রয়ে ভগবান সাধন করে, তাহা না জানিয়া অনেকে, এইসব পূজাকে হিন্দুর বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী, স্থান ও শিলা আদি পূজক মনে করে; ইহার প্রত্যেকটীই সেই নির্গুণ ব্রহ্মের বিশেষ সগুণসত্তায় প্রকাশের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত। এই সব আশ্রয়ে সত্যই অল্পায়াসে ভগবানকে সগুণ ভাবে জাগাইয়া তুলিয়া, বিষয় জগতে নানা কল্যাণ ভোগসহ, সাক্ষাৎ ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়।

বিশেষ-ভক্তের আহ্বানে, ভগবানের নির্গুণতা বিনাশ পাইয়া সগুণ আবির্ভাব হইতে পারে। এই সত্তা হইতেই হিন্দু তাহার প্রাণের ঠাকুরকে পূজা করিতে, কোনও বিশুদ্ধ ব্রহ্মযুক্ত ব্রাহ্মণ বা তেমন কোনও

প্রতিনিধিতে পূজা।

ভক্তদ্বারা ভগবানের পূজা করানকে, আপনার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ বোধকরে; অভিমান সহিত নিজে পূজা করিতে ধাবিত হয় না। আজকাল ঈশ্বরার্ত্তিহীন হইয়া, কেবল বিধিরক্ষা করিতে যাইয়া, অল্প অর্থব্যয়ে যে কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই পূজা অনেকে শেষ করিতেছে; নিজেরা উপবাসী পর্য্যন্তও থাকে না। পূর্ব্বে কিন্তু উপযুক্ত লোক বিনা অন্যকে পুরোহিত করা হইত না। পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ সূর্য্য-বংশের পুরোহিত ছিলেন, মহর্ষি ধৌম্যকে কত চেষ্টায় পাণ্ডব পুরোহিত করেন; আজ পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণের গালি স্বরূপ, তাহাদের অন্ন-গ্রহণে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি আবরিত হয়। গৃহীও ঈশ্বর তোষণ চাহে

না, চাহে কোন মতে আচার রক্ষা, পুরোহিতও ঈশ্বর চাহেনা, চায়, অর্থ, জীবন পোষণ।

সগুণ আরাধনার আর এক অধ্যায় ভগবানের সঙ্গে বহুদেবতা-পূজা। অন্যধর্ম্মপন্থিগণ ও আধুনিক শিক্ষিতগণ ইহাতে মনে করে, হিন্দু একেশ্বর-বাদী নহেন। কিন্তু হিন্দু বহুদেব উপাসনা করিয়াও প্রকৃত পক্ষে একেশ্বর-বাদী। ভালবাসার ব্যক্তিকে একমাত্র ভোজন করাইয়া কি কাহারও প্রাণে তৃপ্তি আসে? প্রকৃত ভালবাসিলে, প্রিয়ব্যক্তির পিতা, মাতা, সন্তান, দাসদাসীগণকেও সেবনে তোষণে মতি হইবেই; তাহাই হিন্দুর সপারিষদ, সানুচর-দেবগণ সহিত ভগবানের আরাধনা। রাজভক্তপ্রজা যেমন, প্রধান রাজকর্ম্মচারী হইতে সামান্য চৌকিদারকে পর্য্যন্ত সম্মান করিয়া, রাজভক্তি প্রদর্শন করে, হিন্দুও তেমনি সর্ব্বদেবতা পূজিয়া একেশ্বরের উপাসনা করে। এই জন্যই দেখিতে পাইবেন, হিন্দুর ইষ্টরূপ ভগবান আরাধনা বিনা, দেবপূজা, তীর্থ, দান, শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের সঙ্কল্পে, হিন্দু মন্ত্রপাঠ করে, "ভগবান বিষ্ণুর প্রীতার্থে এই কর্ম্মে ব্রতী হইলাম।" আবার কর্ম্মের শেষ বলে—"এই সমস্ত পূজার ফল সেই পূর্ণ ভগবান বিষ্ণুকেই সমর্পণ করিলাম"—যেন রাজকর্ম্মচারীর পূজা করিয়া রাজাকে জানাইয়া দিলাম—"তোমার তোষণে তোমার কর্ম্মচারীর পূজা করিলাম।" অনেক সময় রাজ-কর্ম্মচারী বিরক্ত হইয়া, রাজার নিকট প্রজার বিপক্ষে নানা কথা বলিয়া প্রজাকে রাজরোষে ফেলাইয়া থাকে, আবার তাহারা তুষ্ট থাকিলে, মহাদোষ করিলেও ইহারা পক্ষসমর্থন করিয়া রাজ-কৃপার অধিকারী করিয়া দিতে পারে; সেই উদ্দেশেই দেব আরাধনা সহিত ঈশ্বর আরাধনা ঋষির ব্যবস্থা। সকল হিন্দুই একেশ্বরবাদী, ঈশ্বরপূজা ও দেব-পূজার পার্থক্য তাহারা বেশ জানিত। গীতায় দেখিতে পাইবেন

বহু দেবতা পূজা।

—দেবব্রতগণ দেবলোকে যায়, পিতৃ পূজকগণ পিতৃলোকে সুখী হয়, প্রাণীসেবক প্রাণীলোকে সুখ সম্মান পায়. কেবল ভগবান পূজকই ভগবানকে লাভ করিতে পারে বলিয়া বর্ণিত আছে। গীতা ৯ম ২৫ শ্লোঃ—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

আবার একেশ্বর-বাদে মানব কত মহাফলের অধিকারী হইতে পারে, তাহা "অপিচেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাক্ হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণ লইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের মতে সেই প্রকৃত সাধু, সে হীনজাতি, নারী বা পাপজন্মা কেন না হোক, শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া শশ্বৎশান্তি লাভ করে। (গীঃ ৯অঃ ৩০।৩১ শ্লো) গরুড় পুরাণে আছে—যজ্ঞকারী হইতে বেদান্ত জ্ঞানী সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-বেদান্তবিদ্ হইতে ঈশ্বরভক্ত কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ, সেই ভক্ত হইতে একান্ত-ভক্ত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। সেই ঐকান্তিক ভক্তই পরমপদে গমন করে—আর কখনও ফিরিয়া আসে না।

সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্ত পারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্তকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষ' গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥

এইরূপ একান্তভক্তি লাভ সাধারণ কথা নহে। মুখে বলিতে পারি বটে, আমি একেশ্বর- বাদী—একমাত্র ঈশ্বরবিনা আর কাহারও পূজা করি না। কিন্তু কার্য্য সন্ধান করিলে, দেহের পূজা, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির পূজা, স্ত্রী ও পুত্রের পূজায়—ঈশ্বর বিস্মৃত হইতে অনেক সময় দেখা যায়। যে মানব, রাত্রিতে প্রহরা দিতে কুকুরের পূজাকরে, দুগ্ধের জন্য গাভীর, ফলের জন্য

অদ্বৈত একেশ্বর পূজা

বৃক্ষের, ধনের জন্য ধনীর, মানের জন্য মানীর, জ্ঞানের জন্য বিদ্বানের, আরোগ্য জন্য চিকিৎসকের, বিচার জন্য রাজার উপাসনায় ব্যস্ত; কত যত্নে তাহাদের তোষণের চেষ্টান্বিত, সে কেমন করিয়া বলিবে "লা এলাহ এলেল্লাহ"—ঈশ্বর তুমিবিনা আর আমার কেউ উপাস্য নাই। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংগতঃ"—আমি সব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তোমার শরণ লইলাম। এইকথা কেবল মিথ্যা কথাই বলা হইবে। এই অদ্বৈত ভাবে একেশ্বরের শরণ মানবের কোনপ্রকার জাবস্বভাব থাকিতেই সম্ভবে না। তাই খ্রীষ্টিয়, মোহম্মদী, বৌদ্ধাদি নিষ্কাম নির্গুণ উপাসনাবাদ মধ্যেও সকাম প্রার্থনা, পূজা-মানৎ, দেব-উপাসনা ঈশ্বরভক্ত সিদ্ধপীরাদির উপাসনা স্বভাবেই জাগিয়া উঠিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে,—মানব কামনারূপ গুণাবরণের অতীত হইতে পারিলে, এক অদ্বৈত-ব্রহ্মোপাসনা লাভ করিতে পারে। সত্ত্বগুণাবরিত দেবতার, রজোগুণী যক্ষ রাক্ষসের ও তমোগুণী প্রেত অথবা প্রাণীর উপাসনা করিয়া থাকে। গীঃ ১৪।১৯ ও ১৭।৪

> গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯
>
> যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
>
> প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

একা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াও গুণভেদে মানব বিভিন্ন পূজার ফলভাগী হয়; ভিন্ন নামে ভিন্ন ভাবে পূজা করিবার প্রয়োজন হয় না। একই রাজাকে তুষ্ট করিয়া তমোগুণী হিংসাতৃপ্তি চাহিয়া, একজন সৈন্য লইয়া শত্রুবধ করায়; রজগুণী জয় বা ধন চাহিয়া, বিচারক বা ধনাধিপের নিকট চিঠি লইয়া যায়; সত্ত্বগুণী গুণ-বলে রাজ কর্ম্মচারী পদ পায়; গুণাতীত ভালবাসার বন্ধন লাগাইয়া, রাজপোষ্য হইয়া সঙ্গসুখ লাভ করে।

মানব ইষ্টলাভ জন্য অন্যের সাহায্য যাচনা করিবেই; শিশুকাল হইতে মানব সে এঅভ্যাস লাভ করে। তাই ভগবান হইতে, দেব, উপদেব—যক্ষ, রক্ষ, পিতৃ, প্রেত পর্য্যন্ত, প্রাণীবর্গের কুড়রপাখী, চীল, হস্তী, গো সামান্য টিকটিকীর পর্য্যন্ত উপাসনায় মানব কি মঙ্গল লাভে সক্ষম, ঋষি প্রত্যেকটীকে পৃথক পৃথক বর্ণনা করিয়া মানবগণকে জানাইয়া গিয়াছেন। তন্ত্র-শাস্ত্রের ডামর-অধ্যায়ে এই দেব হইতে প্রাণীবর্গের নিকট বিশেষ শক্তি ও সাংসারিক-স্বার্থ লাভ সাধনা বর্ণিত আছে; তাহা ঋষির অজ্ঞতার সন্ধান নহে। মহাজ্ঞান, অসম্ভব গবেষণা, প্রাণীচরিত্র-সন্ধান ও মানবের মঙ্গল চিন্তার সংবাদ। চীলপাখী হইতে উড়িবার শক্তি, কুড়র হইতে পরশমণির সন্ধান ও হস্তী, গোধাআদি হইতে ভবিষ্যৎ জানিবার শক্তি সত্যই মানব অর্জ্জণ করিতে পারে। অষ্টাঙ্গ-যোগপথের মুদ্রা-অধ্যায়ে পশু পাখীর নামে কতগুলি অঙ্গ কৌশল সাধনা বর্ণিত আছে; তাহাও ঋষিগণের মহাজ্ঞান গবেষণার সন্ধান। মাতঙ্গের মত দৃষ্টিশক্তি ও শিরোরোগহীনতা জগতে কোন প্রাণীর নাই। তাহার কারণ, নাক দিয়া জলপান ক্রিয়া তাহার জাতীয় বিশেষত্ব। ইহা নির্ণয় করিয়া মানবসমাজে মাতঙ্গীমুদ্রারূপ নাসাপান ব্যবস্থা ঋষি দান করিয়াছেন; তাহাতে চক্ষু রোগ ও শিরোরোগ নাশকরে। সর্পের মত তীক্ষ্ণাগ্নি আর কোন প্রাণীর নাই। তাহার বিশেষত্ব নাভিপর্য্যন্ত মাটীতে রাখিয়া উপরার্দ্ধের উত্তোলনে ফণাধারণ, মাথা ও লেজ যুক্তকরার শক্তি। মানবের এইরূপ করা নাগমুদ্রা, ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। বরফের দেশে জিহ্বাদ্বারা গলমধ্যস্থ নাসারন্ধ্র রোধ করতঃ, বায়ু দ্বারা উদর পূরণ করিয়া ভেক ছয়মাস জীবন রক্ষা করে। তাহার এই বিশেষত্ব হইতে, হিন্দু সাধুর ভেকী মুদ্রা কুম্ভক-সাধন ঋষি মানবকে দান করিয়াছেন। ঋষি

উপদেবতা সাধনা

জীবকে মঙ্গলের সন্ধানই বিতরণ করিয়াছেন; এখন মানব যদি গুণাবরণে সেইসব সাধন লইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়, তাহা কি ঋষির দোষ ?

হিন্দুর আর এক বিশেষত্ব ছুৎমার্গ—এক প্রণালীতে এক নামে এক ভগবানের উপাসক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিভাগ ; একবর্ণ অন্যবর্ণের জল পর্য্যন্তও ব্যবহার করে না। হিন্দুধর্ম্মের মূল জ্ঞানসূত্র যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী ; জগতের প্রত্যেক দ্রব্যই ব্রহ্ম। বৈষ্ণব মতেও, জীবেরে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ; অতিথি নারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণ ; আর ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণ কিনা শূদ্রাদি বর্ণকে হীন ঘৃণ্যভাবে দর্শন করে ? মানব হইয়া মানবে ঘৃণা এ কেমন কথা ? আবার একই হিন্দু নামে পরিচয় দান করিয়া, কেহ শৈব পরিচয়ে ভিন্ন উপচারে ভিন্ন মন্ত্রে, ভিন্ন রূপধ্যানে উপাসনা করে, কেহ বা শক্তি, কেহ গণেশ, কেহ সূর্য্য, কেহ বিষ্ণু বলিয়া প্রত্যেকে ভিন্ন আচার, মন্ত্র, ধ্যানে উপাসনা করে ; এত পৃথকত্ব লইয়া একটা সমাজ কি করিয়া টিকিতে পারে ? পৃথিবীতে সমস্ত ধর্ম্মমধ্যেই সকলের এক আচার, এক দেবতা, এক নাম, এক ধ্যান, সকলেরই এক-জাতি, তাই হিন্দুর এই বহু মত কেহই বুঝিতে পারে না ; ইহাকে ঋষির অজ্ঞতা মনে করে। আধুনিক শিক্ষিতগণও মনে করিতেছেন এই বহু বিভিন্নতাই, হিন্দুর পতনের কারণ, ইহার বিনাশ বিনা হিন্দুজাতির উন্নতির আর আশাই নাই।

জাতি বিভাগ ছুৎমার্গ।

এই বিভিন্নতা রাখিয়াও একদিন ভারতের হিন্দু সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ, পূজনীয় মানব হইয়াছিল ;—কোটী কোটী বর্ষ ভারতে স্বাধীনতা লইয়া রাজত্ব করিয়াছিল। পুরাণের বর্ণনা ছাড়িয়া দিলেও, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদির রাজত্বকালের ভারতের যে বর্ণনা, বিদেশীয় পরিব্রাজকদের

লেখনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ধর্ম্ম-সভ্যতায়ই, মানবগণকে এমন সুখ শান্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও নীতিগহত্ব বিষয়ে তেমন উন্নত করিতে পারিয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না। আজ রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়াইয়া, কেবল ভগ্ন ইট প্রস্তরাদি ছড়ান দেখিয়া, এই সবকে ফেলিয়া দিবার উপযুক্ত জঞ্জাল মনে হইতেছে বটে! কিন্তু এই ইট প্রস্তর দ্বারাই একদিন সর্ব্বমনোহর জগতে অতুলা-রাজপ্রাসাদ রচিত হইয়াছিল। এই গুলিকে ফেলাইয়া না দিয়া যথাযথ ভাবে সাজাইতে পারিলে, আজও আবার তেমন অতুল্য-প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে। আজকালের এই ধর্ম্মগ্লানি-যুগে, বিদেশীর জড়জ্ঞানে আবরিত অসুরভাব, আত্মতৃপ্তিবাসনায় উৎক্ষিপ্ত ভারতবাসী হিন্দুর আচার দেখিয়া, হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টাও ভগ্নস্তূপে রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য্য-সুখ-সন্ধান। প্রাচীন-ভারতের গৌরব ও সুখ শান্তির প্রাসাদ, এই সব আচার ও জ্ঞানরূপ ইটপ্রস্তর-রাশি উপাদান সাজাইয়াই গঠিত হইয়াছিল; আজও যথাযথ ভাবে সাজাইতে পারিলে আবার তেমন প্রাসাদই গঠিত হইবে, ফেলাইয়া দিলে হইবে না।

জগতের সর্ব্বত্রই বহুদ্বারা একের গঠন! বহু পরমাণুতে, বহুধাতু, বহু ইন্দ্রিয়, বহু প্রবৃত্তিতে একটী জীবদেহ গঠিত হয়; প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানবোধ বিভিন্ন, আকার বিভিন্ন, সুখ-আশা বিভিন্ন, চেষ্টা বিভিন্ন, তবু তাহারা এক দেহের অন্তর্গত হইয়া এক আত্মার অধীনে চলে না কি? ইষ্টক প্রস্তর আদি কত বিভিন্ন দ্রব্যে প্রাসাদ গঠিত, কত বিভিন্ন দ্রব্যে সজ্জিত, তার উপরে শয্যা, আসন, পালঙ্ক, ছিব, খাদ্যআদি কত বিভিন্ন দ্রব্য, দাস দাসী আদি বহুজন লইয়া, মানব এক গৃহ গঠন করিয়া বাস করে না কি? এক সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ, পিতা, মাতা ভ্রাতা, পুত্র, ভগ্নী, বধু, দাস আদি নানা পৃথক সত্তা দ্বারা এক

বহুত্বে একসত্তা

পরিবার গঠিত নয় কি ? তাহাদের প্রত্যেকের সমস্তই পৃথক, সম্মানের স্থান পৃথক, প্রভু ও দাস একত্র খায় না, একত্র বসে না ; ছেলে পিতা বধূ শ্বশুর কত পৃথক ভাবেই থাকে, তবু তাহারা এক সংসারের লোক ; সকলে মিলিয়া এক সংসারকে গড়িয়া তোলে, সংসারের জন্ম এক প্রাণে যুদ্ধকরে, সুখ শান্তির উপাদান যোগায় ; হিন্দুর বহু জাতি মিলনে তেমনি এক জাতি গঠিত হইয়াছিল। সংসারে যেমন দাস প্রভু, পিতা পুত্র, বধূ শাশুড়ী সমান স্বাধীনতার জন্ম যুদ্ধ ঘোষণা করে না, তেমনি হিন্দুরও বর্ণে বর্ণে দ্বেষ ছিল না। শ্রেষ্ঠবর্ণ আচারে, জ্ঞানে, মহত্বে, ত্যাগে সত্য ও দয়ায় সকলেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষায় যত্নবান ছিল ; তাহাদের সেই মহত্বই অন্যবর্ণকে সম্মান ও পূজা করিতে বাধ্য করিত। অদ্য আচার-হীন হইয়া কেবল দম্ভের শাসনে মহত্বের সম্মান চাওয়ায়ই, হীনবর্ণ সম্মান দিতে অস্বীকার করিতেছে।

অদ্য প্রাণ-হীন ধর্ম্মাচারে আচারই মাত্র ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মের দুইটী দিক—একটী গ্রহণ, একটী ত্যাগ। গ্রহণ—কেমন মহত্বভাব ত্যাগ, দয়া, ভালবাসা ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে, আর ত্যাগ—যেমন হীনভাব হীনাচার, হীনতা, দর্প, হিংসা, নির্দ্দয়তা ও মিথ্যাচারকে ত্যাগ করিতে হইবে। আজকাল গ্রহণ-সাধন অধ্যায় রাখিয়া, শুধু ত্যাগ-অধ্যায় পালন আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শুচি, ত্যাগ, ঈশ্বর-সাধনা গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় না, হীনকুলের স্পর্শ, তার অন্ন গ্রহণকে ত্যাগ না করিলে যেমন ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়। প্রভু, দাস, পিতা, পুত্রে স্নেহের আদান প্রদান থাকায়, তাহাদের উচ্চতা নীচতা কাহারও কষ্ট বা অভিমানের বাধক হয় না। আজ বর্ণ-ধর্ম্মমধ্যে সেই স্নেহের আদান প্রদান রুদ্ধ হইয়াছে, তাতে অদ্য ধর্ম্মীর বিরুদ্ধব্যাখ্যা, তাই আজ বর্ণে বর্ণে সত্যই দ্বেষবুদ্ধি জাগিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু হিন্দু ঋষিবিধান সেজন্ম দোষী

নয়। ঋষি বর্ণ-ধর্ম্মেরমধ্যে মানবজাতির মহা মঙ্গললাভের ব্যবস্থাই দান করিয়া গিয়াছেন, ইহা পরে বর্ণ-ধর্ম্মে দেখান হইবে।

মানবের পিতা মাতা তাহার নামকরণ করে, ঈশ্বরের নামকরণ কে করিয়াছিল? আর্য্যঋষি তাই নাদরূপ শব্দকেই ঈশ্বরের আদি নাম বলিয়া স্বীকার করিয়া, পরে তাঁহার ভগবত্বগুণ-বাচক শব্দ গড়িয়া তাঁহার নাম করেন। যেমন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী তাই ভগবান, সকলের অধীশ্বর বলিয়া ঈশ্বর, বিশ্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্ম, বিশ্বাত্মক বলিয়া বিষ্ণু ইত্যাদি। এইরূপ খ্রীষ্টিয়ের গড, মোহম্মদীর খোদা, আল্লাহও তেমন ভগবানের মহত্বপ্রকাশক শব্দ মাত্র। তাই ভগবানবুদ্ধি রাখিয়া যে কোনও নামে ঈশ্বরের আহ্বান হয় বলিয়া হিন্দু স্বীকার করে। তাই ভগবান-বুদ্ধি রাখিয়া শিব, কালী, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু বা বুদ্ধ ফাদার, বেঙ্গমা আদি যে কোন নামে, এক ভগবানকে আরাধনায় দোষ হয় না।

*এক ঈশ্বরের বহু নাম*

**ভিন্নরূপে ভিন্ন আচারে কেন?** এক সাধক যেরূপভাবে যে আকারে যে রূপ উপচারে পূজাদি করিয়া ঈশ্বরকে পাইয়াছেন, সেইরূপে উপাসনা গ্রহণই ইহার কারণ। প্রত্যেক সাধকই সাধনকালে এই আচার বিভিন্নতা রক্ষা করে, কিন্তু সিদ্ধ হইলে, তাঁহাকে লাভ করিলে একত্ব লাভ করিয়া বসে। হিন্দু একজনকেই এই নানানামে নানারূপে ভজনা করে, তাহার প্রমাণ, সকল নামের পূর্ব্বেই ভগবান জ্ঞাপক একটী অক্ষর থাকে—ওঁ। এই শব্দে অ+উ+ম+নাদ+বিন্দু, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-কর্ত্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ এই পঞ্চতত্ত্বের অতীত যিনি সেই ভগবানকে বুঝায়।

জগতের অন্য সমস্ত ধর্ম্মপন্থীই মনেকরে, তাহাদের বিধানে, তাহাদের শাস্ত্রের ঈশ্বরের নামে ঈশ্বর-উপাসনা না করিলে, মানব ঈশ্বরের কৃপা

পাইতে পারে না। সে জন্য অন্যধর্ম্মীকে তাহার সমাজ, ধর্ম্মপথ, পিতা মাতার স্নেহ-কর্ত্তব্যতা-বন্ধন ত্যাগ করিয়া তাহাদের ধর্ম্মে আসিতে বলে; হিন্দুঋষি তাহা বলেন না। তাঁহারা বলেন, তুমি যেই সমাজগণ্ডীতে কেন না থাক, তথায় সেই সমাজে, আচারে থাকিয়াই, মানবত্ব সার্থকতার ও ঈশ্বর লাভের যে উপায় প্রকাশ করিয়া গেলাম, তাহা অন্তরে গ্রহণ করিয়া, যথাসাধ্য আচরণের চেষ্টাকর, তাহাতেই তুমি আর্য্যধার্ম্মিকের প্রাপ্য সর্ব্ব-ফল লাভ করিবে, ধর্ম্মজন্য সমাজ-ত্যাগ, পিতামাতাকে কাঁদাই-বার বা নিজেও কাঁদিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি জ্ঞান পূর্ব্বক শুদ্ধাচার গ্রহণ কর, সে জন্য পিতা মাতা সমাজকে ত্যাগ করিও না। যেমন মিষ্টদ্রব্য আলোতে অন্ধকারে, দিনে রাত্রিতে সকল সময়ে সকলের নিকটই মিষ্ট; ধর্ম্মাচারও সকল স্থানে, সর্ব্বকালে, সকলের নিকটই একরূপ সত্য ফলদ। পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনাই ধর্ম্মসাধন; সমাজত্যাগ ও ধর্ম্মাচারের ভ্রিল গ্রহণের নাম ধর্ম্ম নহে। এইসব কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে হিন্দুঋষি এমন ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, সেই আচার গ্রহণে কোন ধর্ম্ম-পন্থীরই বিরুদ্ধভাব আসিতে পারে না; কোন জাতির মাতা পিতাই দুঃখিতও হইতে পারে না। অন্যধর্ম্মী বলিয়া, হিন্দুর ঈশ্বরসাধন দেব সাধনার ফলে কেহই বঞ্চিত হয় না। হিন্দু পুরাণেত ইহার দৃষ্টান্তের ইয়ত্তাই নাই। বর্ত্তমানযুগে শ্রীদারাবালী নামে পাঠান-সেনাপতি মোহম্মদীর সন্তান, মোহম্মদী-সমাজে থাকিয়াও, হিন্দুর শ্রীগঙ্গাদেবীর দর্শন লাভ করেন। তাঁহার কৃত গঙ্গাস্তব আজপর্য্যন্ত হিন্দু-ব্রাহ্মণগণও পাঠ করিয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মান করিতেছে। ঈশাখাঁয়ের বংশধর ত্রিপুরার জঙ্গলবাড়ীর জমিদার শ্রীহোসেনালী চৌধুরী মোহম্মদী সমাজে

ঈশ্বর লাভে জাতি ভেদ নাই—

থাকিয়াও, হিন্দুর শ্রীকালীমাতার কৃপা ও সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময়ে, নবদ্বীপের কাজিসাহেব মোহম্মদী সমাজে থাকিয়াও, হিন্দুর শ্রীবিষ্ণুদেবতার কৃপালাভ করেন। তাহার বংশধরগণ বলিয়াছেন, মোহম্মদী-সাধনের সঙ্গে তাহারা মহাপ্রভুর মন্ত্র সাধন করেন। মহাপ্রভুর সময়ের পাঠান-বৈষ্ণবগণ, পাঠান সুলতান-পুত্র শ্রীবিজুলীখাঁনও মোহম্মদী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ লাভ করেন। চট্টগ্রামের বাজেয়ন্তানের সিদ্ধ-পীরসাহেব ও তাহার অনুবর্ত্তীগণ মোহম্মদী সমাজে থাকিয়াও হিন্দুর বৈষ্ণব সাধক। সাধন-পথের বিভিন্নতা সম্বন্ধে শ্রীহোসেনালী চৌধুরীর সহ মোহম্মদীগণের বিচার বড়ই সুন্দর মীমাংসা।

মোহম্মদী হইয়াও তিনি হিন্দুমতে মূর্ত্তিপূজক হইলেন বলিয়া, ঢাকার মোহম্মদীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া আবার মোহম্মদী করিতে, আরব ও পশ্চিম ভারত হইতে কতজন শ্রেষ্ঠ মোহম্মদী সাধক-পণ্ডিত আনয়ন করিলেন ও তাঁহাকেও আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। যদিও তাঁহার সঙ্গে বিচারের কথা অপ্রকাশ ছিল কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। যেই কালে আসিবার কথা, তিনি সেই সময় আসিলেন না দেখিয়া, সকলে মনে করিল তিনি ভয় পাইয়া আসিলেন না। কিন্তু সমবেত উপাসনার পরে দেখা গেল, তিনি তাহাদের সঙ্গে বসিয়া আছেন। সকলে তাঁহাকে জমিদারের মত সম্মান করিয়া বলিলেন, কখন আসিলেন! কোনপথে আসিলেন? আমরা যে আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পথের সংবাদে কি প্রয়োজন, আসিতে পারিলেই হয়। আসিয়াছিত" মাত্র তাহাই দেখুন। মৌলবীগণকে তখন বিচার করিতে বলিলে, তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন, তিনিত উত্তর দিয়াছেন— "পথের সংবাদে কি হইবে, আসিতে পারিলেই হয়।" তিনি যখন

আসিয়াছেন অর্থাৎ মানুষ হইয়া অমানুষ শক্তি লাভ করিয়াছেন দেখিতেছি, তাঁহার সঙ্গে আর বিচার কি ? পথের সংবাদ পথ যাত্রীর নিকট প্রয়োজন, যাহার যাত্রা শেষ হইয়াছে, পথের সংবাদের বাদানুবাদে তার আর কি দরকার। জগতের অন্যধর্ম্মশাস্ত্রে মাত্র একপথের সংবাদ বর্ণিত, যতপ্রকার পথ হইতে পারে সেই সমস্ত পথের সন্ধানই হিন্দু-শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতের অনেক বিভিন্ন-আচারী-বংশ, বর্ণাতীত পার্ব্বতীয়গণও আর্য্যআদর্শ গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য তাহা পালনের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কুলের পূর্ব্বাচারকেও পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। সেই সকলের মিলনেই বিরাট হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বহু বর্ণ ও জাতির সমাগম। ইহারা প্রত্যেকেই ভোজনাচার ও সমাজিক কোনও নিয়মে ভিন্ন হইলেও, আদর্শ সকলেরই এক বলিয়া, তাহারা একটু হীনাচারী হিন্দু, তবু অহিন্দু নহে। খ্রীষ্টিয় মোহম্মদী আদিতে সন্ধান করিয়া দেখুন, সকলেই ধর্ম্মের পূর্ণাচার রক্ষা করিয়া চলে না। ইহাতে তাহাদের দেশভেদে বংশভেদে ভিন্নাচার সমাজ-গণ্ডী, উচ্চতা নীচতাও বেশ আছে। তবু তাহারা সকলেই খ্রীষ্টিয়। প্রাণে সত্য-ধর্ম্মের জাগরণ হইলে, এইসব উচ্চতা নীচতার দ্বেষ বিনাশ পায়, ধর্ম্মের গ্লানিতেই এই সবের বিশেষ প্রভাব জাগিয়া উঠে।

"মনুষ্য-পুত্র সেবা পাইতে নহে, সেবা করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" এইটী কেবল যিশুর বাণীই নহে, হিন্দু ঋষিও বলিয়াছেন "কাহারও নিকট মানব সেবা গ্রহণ করিলেই তাহার নিকটে ঋণী হয়। তাহার পরিশোধ বিনা, মানবের জন্মরূপ কর্ম্মজীবনের শেষ হয় না।"

**দুঃখমার্গ**

এই তত্ত্বেই হিন্দু ধর্ম্মপথী অপরের সেবা গ্রহণ করে না ; পরের হাতে খায় না, তার দেওয়া জলটুকুও ব্যবহার করে না। নিজে অসক্ত হইলে স্ত্রীপুত্রের বা জ্ঞাতিগণের সাহায্য

নয়। তাহাতেও অশক্ত স্ববর্ণের সেবা নেয়, তবু অন্য বর্ণের সেবা গ্রহণ করিয়া ঋণী হইতে চাহে না। হিন্দুর বর্ণে বর্ণে ছুৎমার্গের মূল এই সত্তা, প্রাণহীন আচার মাত্র ধর্ম্ম হইয়া আজ হিন্দু, অপরের প্রাণে কষ্ট দিতে পরের সেবা গ্রহণ করে না। এক বৃদ্ধ চণ্ডালদাস ব্রাহ্মণ প্রভুর বাটীতে কাজ করিত। সে কতদিন যত্ন করিয়া কত ফল শস্য আনিয়া প্রভুপত্নীকে দিত, কত ভক্তি ভালবাসা দেখাইত, কিন্তু কখনও ব্রাহ্মণবাটীতে সে ভোজন করিত না। এক দিন অনেক করিয়া প্রভুপত্নী খাইতে বলে, সে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল—আমি হীনচণ্ডাল, জিহ্বার তোষণ-জন্য আপনাকে কষ্ট দিতে পারিব না। আপনি ব্রাহ্মণ-কন্যা আমার জন্য হাত পোড়াইয়া পাক করিবেন; আর আমি সে অন্ন খাইব, আমি তাহা পারিব না। অন্যের সেবা না গ্রহণের মধ্যে, এই মহাপ্রাণতা ছিল, আজ তাহা ছুৎ-অহঙ্কার। এক ব্রাহ্মণ জমীদার বাটীতে, আমার জন্য তাহাদের শূদ্র-চাকরকে খাবার জল আনিতে বলিলে, আমি বলিলাম, আমিত ইহার হাতের জল খাইব না। দেখিলাম ইহা শুনিয়া তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, তখন বলিলাম, কেন খাইব না জান? তুমি শূদ্র বলিয়া নহে! তুমি রাত্রিবাস ত্যাগ কর নাই, শৌচে যাইয়া কাপড় ছাড় নাই, প্রস্রাব করিয়া জল নেও নাই; তোমার হাতের জল কি করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিব? আমি যে ভগবানকে না দিয়া কিছুই খাইতে ইচ্ছা করি না! তুমি ব্রাহ্মণ বাটীতে থাক, তাঁহারা তোমার জল খাইতে স্বীকার করিয়াছেন, আর তুমি তোমার কুলের এই হীনাচারগুলি ত্যাগ করিতে পার না? সেদিন হইতে লজ্জিত হইয়া সেই চাকর শুদ্ধাচারী হইয়াছে। এই আচার-হীনতা দ্বারাই হিন্দুর শ্রেষ্ঠবর্ণ হীনবর্ণের সেবাদি গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়; তাহা মানবঘৃণা নহে। তাই হীনকুলেও যখন কেহ শুদ্ধাচারী ভক্ত-সাধক

হইয়া উঠে, তখন সর্ব্ববর্ণ তাহাকে পূজা করে; তাহার প্রস্তুত ভগবানের প্রসাদ খাইতে বাধা দেওয়াত দূরের কথা, তাহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণেও কেহ কুণ্ঠিত হয় না।

আধুনিক জ্ঞানে, কর্ম্মচেষ্টার উপরেই কর্ম্মফলের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু আর্য্যঋষিমতে স্থান, কাল, পাত্র ও দৈব-সহিত চেষ্টার যুক্ততায় কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। দুগ্ধ লাভ কেবল চেষ্টায়ই হয় না। তাহাতে তাহার পাত্র রূপ গাভী চাই—ষাঁড় হইলে চলিবে না; কালরূপ দুগ্ধ দেয় সেই কালে দোহন চাই—গাভীও সন্তানবতী কালে বিনা অন্য সময় দোহনে দুগ্ধ মিলিবে না; স্থানরূপ স্তনদেশ দোহন চাই—পদ বা শৃঙ্গ দোহনে দুগ্ধ মিলিবে না; ইহার উপরে দৈব-কারণে দোহনের পরেও দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়, ভোজনে আসে না। কৃষি কর্ম্মেও স্থান—উপযুক্ত ভূমি চাই, জলে বা প্রস্তরে বপনে হইবে না; কাল—বীজের ফলদ-কাল ঋতু চাই, অকালে বপনে ফল দিবে না; পাত্র—বীজ চাই, অন্য কিছু বপনে ফল হইবে না; দৈব—ঈশ্বর কৃপা বৃষ্টি আদির অভাবের ফলেও ফল লাভ হয় না। সাধনাদি কর্ম্মেও ঋষি সেই স্থান, কাল, পাত্র ও দৈবের সন্ধান দিতেই তীর্থাদি স্থানের, তিথি নক্ষত্র কালের ও মূর্ত্তি-বিশেষের আশ্রয়ে সাধন-ফলের পৃথকত্ব নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কর্ম্মের কাল তিথি নির্দ্দেশ

স্থান তত্ত্বে—দেহমধ্যে বিভিন্ন-স্থানে বিভিন্ন-শক্তির বিকাশের সন্ধানই দেহতীর্থ সংবাদ, পৃথিবীদেহেও স্থানভেদে বিভিন্ন কর্ম্ম-সাধনার বিকাশ-নির্দ্দেশই স্থানতীর্থ—হিন্দুর তীর্থরূপ পুণ্যক্ষেত্র, ধাম আদির নির্দ্দেশ। কালতত্ত্বে—জ্যোতিষের তিথি নক্ষত্রাদির কর্ম্মফলের বিভেদ বর্ণ নাই। কালতীর্থ সংবাদ। পাত্রতত্ত্বে—পর্ব্বতবিশেষ, বৃক্ষবিশেষ, নদীবিশেষ, শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ, দেবমূর্ত্তি, চন্দ্র, সূর্য্য, জলঘট, পট ইত্যাদি আশ্রয়ে

সাধনার ফল নির্দ্দেশ এবং পশুজাতিতে গো ও মানব মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষত্বাদি নির্দ্দেশ। আর দৈবতত্ত্বে—ঈশ্বর-আরাধনা ও তাঁহার বিশেষ বিশেষ অংশ হইতে জাত দেবগণের আরাধনার নির্দ্দেশ। তাই ইহার একটীও ঋষিদের অজ্ঞতাপ্রসূত বা অনার্য্যগণ হইতে হিন্দুগণ মধ্যে গৃহীত নহে; তবে জ্ঞানহীনতা প্রযুক্ত বর্ত্তমানে অপকৃষ্ট ভাবে আচরিত হইতেছে সত্য।

ব্যাকরণ-শাস্ত্র মতে ক্রিয়ার কারক ছয়টী। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। কর্ত্তা—কর্ম্মকর্ত্রী ইচ্ছা বা অহঙ্কার; কর্ম্ম—ক্রিয়া-চেষ্টা; করণ—ক্রিয়া-শক্তির মূলকারণ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিবর্গ; সম্প্রদান—নিজের আনন্দ বা পরের প্রয়োজন হেতু; অপাদান—কর্ম্ম-নির্ব্বাহের দ্রব্য উপাদান-সমূহ; অধিকরণ—কর্ম্ম-নির্ব্বাহের স্থান ও কাল। এই ছয়টীর একটীর অভাবেও কর্ম্ম সম্পাদন হইবে না। এই ছয়টীর প্রত্যেকটীরই কর্ম্ম করাইবার পৃথক শক্তি আছে। অহঙ্কার হইতে যে কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়, অহঙ্কারই সেই কর্ম্মের কর্ত্তা; আবার অন্যের কর্ম্ম দ্বারা দুঃখ ইত্যাদি পাইয়াও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তখন কর্ম্মই সেই কর্ম্মের কারক; এইরূপ করণরূপ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিও কর্ম্মের কারক হয়, দেখিয়া বা শব্দ শুনিয়া গ্রহণে ধাবিত হই; সম্প্রদানে—পরের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই; অপাদানে—দ্রব্যই কর্ম্মের কারণ—মদ খাইয়া মত্ত হইয়া কর্ম্ম করি; আর অধিকরণে—আধাররূপ শয্যায় শুইয়া ঘুমে পড়ি, কালরূপ রাত্রিতে নিদ্রিত, প্রাতে জাগরিত হই। কিন্তু রাত্রিতে শয্যায় থাকিয়াও কেহ নিদ্রা যায় না; কর্ম্মদ্বারা আলোড়িত হইয়াও কেহ কর্ম্ম করে না; মদ খাইয়াও কেহ মত্ত হয় না; অহঙ্কার থাকিতেও কেহ কর্ম্ম-প্রবৃত্ত হয় না, দেখা যায়। তাই এই ছয় কারকের উপরেও আরও একটী সত্তা আছে! তাহাই দৈব-সত্তা—ব্যাকরণের

ষড়দর্শন বাদ।

সম্বন্ধ-পদ। শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইলে হয় কারক, আর বিভক্তি হীন হইলে হয় অব্যয়, কারকসত্তাহীন। তাই এই ছয় কারক যখন, বিভক্তিরূপ সম্বন্ধ যুক্ত হয়, তখনই জগতে কর্ম্মকারক, নচেৎ তাহারা অব্যক্ত অব্যয় কর্ম্মহীন হইয়া যায়। সৃষ্টি ক্রিয়ার এই ছয় প্রকার কারক-সত্তার তত্ত্ব নিরূপণ ও তাহাতে ঈশ্বর-সম্বন্ধ নির্ণয় বিচার হইতেই, হিন্দুর ঈশ্বর-নির্ণয়ের ছয়টী-পথ ষড়-দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে। তাই ছয়টীর উপরে আর দর্শনশাস্ত্র নাই। ইহার এক এক ভাগের নির্ণয়ে আবার বহুগ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, তাই হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব বহুপ্রকার ও বহু গ্রন্থে পূর্ণ। অন্য-ধর্ম্মের মত মাত্র একটী মতে, একটী গ্রন্থেই নির্দ্দিষ্ট নয়।

কর্ত্তৃকারক হইতে—শ্রুতি, কর্ত্তা নির্ণয়। কর্ম্মকারকে—স্মৃতি, কর্ম্মফল-বাদ। করণ কারকে—জীবের কর্ম্মকর ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিবর্গের সংখ্যানির্ণয়—সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন। সম্প্রদানে—কর্ম্মীর কর্ম্মানন্দ, দানাদি, জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ ও ভক্তের—রসানন্দ। আনন্দের মূল ভাব, ভাবের মূল রস, রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পঞ্চ প্রকার। শান্তে জ্ঞান-সমাধি, দাস্যে সেবা-ভক্তি, সখ্যাদিতে প্রেমভক্তি তত্ত্ব। অপাদানে—জড়বাদ, আয়ুর্ব্বেদে ধাতু সংবাদ ও সাংখ্যের জীবোপদান পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাদি নির্দ্দেশ সংবাদ। অধিকরণে—আধার-অধিকরণে কর্ম্মযোগীগণের, স্থান, পাত্র নির্দ্দেশ; কালাধিকরণে, জ্যোতির্ব্বেদ, কালতত্ত্ব। ইহার একটী তত্ত্বও হিন্দুগণ মধ্যে ক্রমে বিকশিত হয় নাই, অন্যস্থান হইতেও গৃহিত হয় নাই বা ঋষির মূঢ়তা প্রকাশকও নহে। স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ব্রহ্মের অঙ্গজাত আদি জ্ঞানাধিপতি-দেবতা শাস্ত্র-কর্ত্তা ঋষিগণ, এক কালেই তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেক মতের যোগ ও সামঞ্জস্য আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই এইতত্ত্বে একটী অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ১১ স্কঃ ২২ অধ্যায়। এই স্থানেই এই অধ্যায় শেষ করিয়া,

এখন আর্য্যঋষি প্রদর্শিত সার্ব্বজনীন, সকল মানবের মানবত্ব সার্থকতার অসাম্প্রদায়িক, কল্যাণকর ধর্ম্মসাধনার জ্ঞানের সংবাদ শ্রবণ করুন। সেই ধর্ম্মাচরণে জগতের কোন সম্প্রদায়ের বা কোন মানবেরই দুঃখ ভাবিবার বা অস্বীকার করিবার কারণ হইতে পারে না। তাই এই ধর্ম্মমতের নাম **আর্য্য** অর্থাৎ মানবজাতির ঋজু—সরল, নিত্য, সত্য-ধর্ম্মমত।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### আর্য্য-সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমত।

মানবের মানবত্ব কি? পক্ষ আছে বলিয়া একটী প্রাণীর নাম পক্ষী, পিশুনতা পরস্পরে হিংসার প্রাধান্যে কত গুলিকে পশু বলে, তেমনি মন প্রাধান্যে কতগুলি প্রাণীর নাম মানব হইয়াছে। মানসিক জ্ঞানালোচনার প্রাধান্যেই মানব পশুআদি হইতে ভিন্ন, তাই ইহাই তাহার মানবত্ব। অন্য প্রাণীগণ তাহাদের বাঁধা-স্বভাবে, কেবল স্বদেহেন্দ্রিয়-তৃপ্তি লইয়াই জীবন কাটায়, আর মানব মানসিক-শক্তির চালনায়, সেই পশু-স্বভাবের উপরেও কত জ্ঞান বিদ্যাদির আলোচনা ও ব্যবহার করিতে সক্ষম। মানব মনের চালনায় জলচর না হইয়া জলের তলে বিচরণ করে, পক্ষহীন হইয়াও আকাশে বিচরণ করে, বৃহৎ বৃহৎ হিংস্র পশুকে বশ করিয়া সেবা গ্রহণ করে, পরোপকার, পর-সেবা, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, শিল্পাদিতে নিজের ও অপরের সুখ শান্তি বর্দ্ধন করে।

রাজ্য-গড়িয়া সমাজ-গড়িয়া, বিদ্যালয়-গড়িয়া, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করিয়া, দুষ্টকে শাসন করিয়া, বিপন্নকে আশ্রয় দিয়া, রুগ্নকে আরোগ্য দিয়া জাতির সেবা, জগতের সেবা ও কল্যাণ করিতে পারে। তাহার উপরে দেবতাদি আরাধনা হইতে ঈশ্বর আরাধনায় পঞ্চপ্রকার মুক্তি ও ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। তাই এই মনের চালনা শক্তিই মানবত্ব; আর এই মানসিক জ্ঞানহীন মানব পশুতুল্য। তাই মানবের প্রথম কর্ত্তব্য মনের বিকাশ জ্ঞানালোচনা জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুকুলে বাসকেই ঋষি মানবের প্রথম জীবন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানব পিতাকে পঞ্চবর্ষ যত্নে পালন করিয়া, তার পরে দশবর্ষ সন্তানকে তাড়না দ্বারা জ্ঞান দান করাই, পিতার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন।

এর পরে মনচালনা,—জ্ঞান বিদ্যাকে কোন দিকে চালনা করিলে, মানবত্বের সার্থকতা হয়, তাহার নির্ণয় চাই। জ্ঞান বিদ্যাদ্বারা পশু-শক্তিকে বর্দ্ধন করিয়া, ইচ্ছামত দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি-সংগ্রহে তাহাকে নিযুক্ত করা যায়—ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-শক্তি, পর নির্য্যাতন, শত্রুনাশ-শক্তি বর্দ্ধন, করিয়া ধনসম্পদ, রাজত্ব, প্রভুত্ব সুখে মত্ত হওয়া যায়; আবার পরোপকার, জগত-সেবা, ঈশ্বর-সাধনায়ও নিযুক্ত হওয়া যায়; কোন্ পথ গ্রহণ করার নাম মনুষ্যত্ব? পশুত্বের অতীত বিশেষ শক্তিই মানবের মানবত্ব কর্ম্ম। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে মানবের নাম পূর্ব্বে নর ছিল। স্বায়ম্ভুব মনুর জ্ঞান ও চরিত্রের অনুবর্ত্তন করিয়া তাহাদের নাম মনু+ ষ্ণ=মানব হইল। জ্ঞানময় আর্য্যত্বই মানবের মানবত্ব; তাই মানবের আকার পাইয়াও জ্ঞান, বিদ্যা ও আচারহীন হইলে সে পশুতুল্য। এই জন্যই বানর, বনমানুষ ইত্যাদি কতটী প্রাণী, মানবের মত হস্তপদ আকার সাদৃশ্য পাইয়াও নরত্ব পাইল না; তাহারা বা+নর বানর নামে পশু হইয়া রহিল। মানবমধ্যেও জ্ঞান আচারহীন পার্ব্বতীয় ইত্যাদি মানব

এই মনের চালনা অভাবেই তেমনি পশুতুল্য জীবন কাটায়। মনচালনায় আত্মতৃপ্তি বাসনাকে রোধ করিয়া কর্ম্মশক্তিকে পর-সেবা, জগত-সেবা ও ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত করাই মানবের মানবত্ব। তাই এক কথায় জ্ঞানপূর্ব্বক সেবা-ধর্ম্মই মানবের মানবত্ব।

সাধারণতঃ জগতের সমস্ত প্রাণীই প্রায় নিজের জন্য কর্ম্ম করে। কতকটী-প্রাণী নিজ ও নিজজনের জন্যও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; মানব তাহার উপরেও পরের জন্য কর্ম্ম করিতে সক্ষম। অন্য প্রাণীর হস্ত কেবল আহার গ্রহণ ও পর পীড়ন করিতে পারে, মানব-হস্ত তাহার উপরেও অপরকে দান করিতে, দুঃখ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। মানব ফল-ভোজন জন্য একটী বৃক্ষ রোপন করে, জলের জন্য পুকুর খনন করে। সেই বৃক্ষের দেহে কোটী কোটি প্রাণী বাসা লইয়া পত্র, মজ্জা, ফুল, ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া খেলা করে; পুকুরে কোটী কোটী জলচর প্রাণী বাস করিয়া জলাদি খাইয়া জীবন যাপন করে; কত কত স্থলচরও জলপান করিয়া জীবন রক্ষা করে। মানব না জানিয়াও এত প্রাণীর সেবা করে, ইহাতেই মনে হয় ভগবান মানবকে এই জগতরূপ প্রাণী-শালার সেবকরূপে স্বজন করিয়াছেন। তাই সেবা ও বিনা মানবত্বের সার্থকতা আর কিছুতেই নাই; সেবাহীন মানব সত্যই—পশুতুল্য। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা জ্ঞান ও বিদ্যার সার্থকতা কেবল এই জগত সেবার সঙ্গে বা ঈশ্বরসেবার সঙ্গে যুক্ততায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন! জ্ঞানের সার্থকতা যদি পরকে দান করে বা ঈশ্বর সাধন করে; বিদ্যার সার্থকতা যদি পরসেবার সাহায্যে লাগে; পূর্ত্ত (ইঞ্জিনিয়ারিং) শক্তির স্বার্থকতা পরার্থে পুকুর, পথ, সেতুআদি গঠনে, প্রাসাদজ্ঞানের সার্থকতা দেবমন্দির, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অতিথিশালা নির্ম্মানে; অর্থের স্বার্থকতা

পরে ও দেবতায় দানে; পুকুর, বৃক্ষ রোপণাদির সার্থকতা যদি অপরে তাহার ফলভাগী হয়।

এই সেবা ভাবকে কতদিকে চালনা করিলে, মানবের সর্ব্বপ্রকার সেবাশক্তির পূর্ণ সার্থকতা হয়, ঋষি তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহাই হিন্দুশাস্ত্রের ঋণ-শোধ-সাধনা নামে স্বায়ম্ভুব-মনু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মানব প্রথম কর্ত্তব্য নির্ণয়। জগতে আজ পর্য্যন্ত, এমন সরলভাবে মানবের কর্ত্তব্য রূপ ধর্ম্মসাধন-নির্দ্দেশ কোনও ধর্ম্মাচার্য্যই প্রকাশ করিয়া যান নাই। এইটি সকলের স্বীকার্য্য, অসাম্প্রদায়িক, উদার, মানব-কর্ত্তব্য-নির্ণয় আর্য্যঋষির এক অপূর্ব্বদান। মানব জন্মগ্রহণ করিয়াই ছয় প্রকারের কর্ত্তব্যতার ঋণে আবদ্ধ হয়। তাই এই ছয় প্রকারের সেবাঋণ শোধেই মানবের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়।

ঋণ শোধ ভাবে ধর্ম্ম সংবাদ—

১। **আত্মঋণ**—নিজের দেহ ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিদান কর্ত্তব্যতা। অনেক গ্রন্থে এই আত্মঋণকে ধরা হয় নাই; অন্য পঞ্চটীকেই ঋণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। আত্মতৃপ্তি লালসা জীবের সাধারণধর্ম্ম বলিয়াই বোধ হয়, ইহাকে অনেকে ধরেন নাই। কিন্তু ভাগবতে ইহাকে বিশেষ ভাবে ধরা হইয়াছে। তাহাতে উক্ত আছে, যে দেহ দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্য্যন্ত অর্জ্জন হয়, এই দেহের যে যত্ন করেনা, উপার্জ্জিত অর্থের কতক-অংশ তাহাকে ভোগ করায় না, সে চোর ও অপরাধী। ২। **ভূতঋণ**—নিজের উপরেও অন্য-প্রাণীর প্রতি কর্ত্তব্য। একটী বৃক্ষ যে স্থানে জন্মে, সেও ছায়া দিয়া, ফল পুষ্পাদি দিয়া, ফুলের গন্ধ ও মধু-বিলাইয়া নিকটস্থ অন্য প্রাণীর সেবা করে, মানবের কি তাহার নিকটস্থ প্রাণীবর্গের প্রতি সেবাকর্ত্তব্য নাই? তাহাই মানবের প্রাণী-সেবা-কর্ত্তব্য ভূতঋণ। ৩। **নৃ ঋণ** —যাহার শাসনে সুখে শৃঙ্খলায়, চোর দস্যুর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া

গৃহে বাস করিতেছি, সেই রাজার প্রতি কর্ত্তব্যই নৃঋণ। ৪। **পিতৃঋণ**—জন্মদাতা, শৈশবের পালন ও রক্ষা কর্ত্তা, যাহাদের সেবা ও সংরক্ষণে মানুষ হইয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছি, সেই পিতামাতার প্রতি সেবা-কর্ত্তব্য পিতৃঋণ। ৫। **দেবঋণ**—দেহের কর্ত্তা পিতার উপরে, প্রাণের কর্ত্তা জগদীশ্বর ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য, জগত-শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী প্রজাপতি লোকপাল দেবতাগণের প্রতি কর্ত্তব্যই দেবঋণ। ৬। **ঋষিঋণ**—জ্ঞান-দেবতা আদিশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের প্রতি কর্ত্তব্যই ঋষিঋণ। প্রবৃত্তিপথী গৃহধর্ম্মী মানবগণের, এই ছয় প্রকার কর্ত্তব্য-ঋণ পরিশোধার্থে কর্ম্ম করিলে, তাহাদের মানবত্ব সার্থক হইবে; তাহারা ভগবানের অভীপ্সিত-কর্ম্ম পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিবে। আর নিবৃত্তপথী, যাঁহারা ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহাদের ঈশ্বর-সেবা-বিনা অন্যকর্ম্ম থাকেনা। তাই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃনাং পিতৃনাং ন কিঙ্করো নায় মৃণীচ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পারহৃত্য কৃত্যম্॥

যে মুকুন্দ ভগবানের চরণে সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়া শরণ লইতে পারে, সে কি দেবতা, কি ঋষি, কি ভূত কি আত্ম, কি রাজা, কি পিতা কাহারো কিঙ্করও থাকেনা, কাহারো কাছে ঋণীও থাকেনা।

মানব প্রবৃত্তিরাজ্যে গৃহসংসার করিয়া বাস করিতে যাইলেই, প্রত্যহ পঞ্চপ্রকারে কোটী কোটী প্রাণী হত্যা করিতে বাধ্য। এতপ্রাণী হত্যার কারণ গৃহস্থাশ্রম কি করিয়া মানবের কর্ত্তব্য হইতে পারে?

পঞ্চসূনা পাপ
পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

১। প্রত্যহ গৃহঝাট দিতে কত প্রাণীকে ঝাটাদ্বারা বধ করে। ২। জল ভাণ্ডে জল ভরিতে ভাণ্ডের মধ্যস্থ সমস্ত প্রাণী নষ্টকরে। ৩। চুলায় অগ্নি জ্বালিয়া চুল্লির প্রাণীবর্গ দগ্ধকরে। ৪। মসলা-পিষিতে কত প্রাণী পিশিয়া

শেষ করে। ৫। চাউল ময়দাদি প্রস্তুতে কত প্রাণী বিনাশ করে। এই পঞ্চপ্রকারে প্রাণী বিনাশকে, ঋষিগণ পঞ্চস্থনা-পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানব এই পঞ্চপ্রকারে অসংখ্য প্রাণীকে যেমন বধ করে, আবার তেমনি এই গৃহস্থ-মানবইত জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনও করিয়া থাকে। গৃহস্থ প্রাণীশালা-জগতের সেবক হইয়া পালনকারী হইতে পারে, তাহাই এই ছয় প্রকার সেবার সন্ধান। এই সেবা-সাধনে মানবের সেই পঞ্চস্থনা-পাপের ফল নাশ পায়। এই জন্যই মনুতে বর্ণিত আছে, নিত্য যাহারা পঞ্চমহাযজ্ঞরূপ সেবা-সাধন করে, তাহাদের পঞ্চস্থনা-পাপ স্পর্শ করিতেও পারে না। আর যাহারা পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া গৃহধর্ম্মী হয়, পুণ্যতীর্থাদি বা শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতেও তাহাদের মুক্তি হয় না। পঞ্চ মহাযজ্ঞ—১। **পিতৃযজ্ঞ**—পিতামাতা যেমন নিজ তৃপ্তি ছাড়িয়াও যত্নে শৈশবে সেবা করিয়াছেন, মানব নিজের সুখ সেবার পূর্ব্বে, সেই পিতামাতার সেবা ও তোষণ করিবে। পিতামাতার সেবা, পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিস্মরণ, তাঁহাদের উদ্দেশে জলাদি দানে পিতৃঋণ শোধ করিবে। ২। **দেবযজ্ঞ**—ভগবানের আরাধনা ও প্রজাপতি লোক-পাল দেবতাগণের স্মরণ, স্তব ও পূজাদি দ্বারা দেবঋণ শোধিতে হইবে। ঈশ্বর-আরাধনার অতীত দেব-আরাধনা অন্যধর্ম্ম সম্প্রদায়ে নাই। অন্য সমস্ত ধর্ম্মই নিগুর্ণ-উপসনা; স্বগুণ-উপাসকই সপার্ষদ ভগবানের উপাসনা করে। এই দেব-আরাধনার নিত্যত্ব গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দশম হইতে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। অনুবাদ—"যজ্ঞ সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া বিধাতা বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা প্রত্যহ যজ্ঞ করিয়া দেবগণকে ভাবিও, তবে দেবতাগণও তোমাদিগকে ভাবিবে, তাহাতে উভয়ের শ্রেয় হইবে। দেবতাগণকে না দিয়া যাহারা কেবল নিজে ভোজন করে, তাহারা দেব-দ্রব্য হরণকারী চোরতুল্য। দেবতার

প্রসাদভোজী পাপহীন হয় ; যে মাত্র নিজের ভোজন জন্য পাক পরে, সে তো পাপ ভোজন করে।" ৩। ঋষিযজ্ঞ—প্রত্যহ শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া, তাঁহাদের কৃত শাস্ত্র-পাঠদ্বারা ঋষিঋণ শোধিতে হইবে। জ্ঞানালোচনায়ই সেই জ্ঞানদেবতাগণের পূজন, তাঁহাদের জ্ঞানরত্ন দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে গ্রন্থ-অধ্যয়নেই তাঁহাদের উপাসনা হইত। নৃ-যজ্ঞ—অতিথি-সেবনে এই নৃপঋণ শোধ হইত। নৃপ কথার একঅর্থ রাজা, অন্যঅর্থ রাজভোগ হয়, সম্পদ প্রভুত্ব সুখের প্রতিদান। অতিথিরূপ প্রজা-সেবনে রাজার ঋণ শোধ ও আপনা বিনা পরের সেবায় সম্পদ ও প্রভুত্বের সার্থকতা হইত। ৫। ভূতযজ্ঞ—মানব বিনা প্রতিবেশী অন্য প্রাণীর উদ্দেশে আহার্য্য ছড়াইয়া দিয়া এই যজ্ঞ করিবার নিয়ম ছিল। অন্য চারি যজ্ঞান্তে প্রাণীবর্গের উদ্দেশে অন্নাদি ছড়াইয়া দিয়া তবে নিজে আহার করিবে। ৬। আত্মযজ্ঞ—নিজের আহারাদি মরণের অবধারিত কাল নাই বলিয়া, সকল মানবের এই ছয়টী কর্ত্তব্য প্রত্যহ সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা ছিল। দেবোদ্দেশে পূজাদিকে শুধু যজ্ঞ বলা হয়, আর এই পঞ্চযজ্ঞকে শাস্ত্রে মহাযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, ইহাদের অবশ্য কর্ত্তব্যতা ও অন্যান্য যজ্ঞ হইতেও ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বই প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন।

এই ঋণ-সাধনা-অধ্যায়ে মানব প্রত্যহ ১। ঈশ্বর-আরাধনা ও দেবযজ্ঞ করিবে ২। ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিবে ৩। পিতামাতার সেবা করিবে, ৪। অতিথি সেবা করিবে, ৫। প্রাণী বর্গের সেবা করিবে, ৬। তবে নিজের সেবায় নিযুক্ত হইবে। এইরূপ জীবন গ্রহণ করিতে জগতের কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বা কোনও জ্ঞানবান মানব বাধাদান করিতে পারেন কি ? এই সাধনায় সাম্প্রদায়িক নাম-গণ্ডী গ্রহণ বা জাতি কুল ত্যাগেরও প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে কি ? সকল মানব

এই সাধন গ্রহণ করিতে পারেন। এই ছয় কর্ত্তব্যকে অস্বীকার করিতে বোধ হয় জগতের কাহারও প্রাণই চাহিবে না; তাই এই মতটী আর্য্য-ধর্ম্ম-সংবাদ।

ঋষিগণ আর এক প্রকারেও মানব কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"জাতিধর্ম্মা কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতা।" গীতায় উক্ত এই তিন ধর্ম্ম ভাবে। ১। জাতি ধর্ম্ম—প্রকৃত মানবের মত দেহ-শক্তি ও ইন্দ্রিয়-শক্তি, ধৈর্য্য, ক্লেশ-সহন, কর্ম্মঠতা, অনলসতাদি শিক্ষার সাধন—দেহ-সাধন। ২। কুলধর্ম্ম—মানবের মত গৃহ-সংসার সমাজ-গড়িয়া বাসের সুখ, শৃঙ্খলার নীতি শীলতা, স্নেহ-কর্ত্তব্যতা, ত্যাগ, দয়া, ক্ষমাদির জ্ঞানলাভ-সাধনা, এইসব ভাবকে মনে জাগাইয়া তুলিতে হয়; ৩। শাশ্বত-ধর্ম্ম—দেহশক্তি মন-শক্তির উপরে আত্মিক শক্তিরূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যের উন্মেষ-সাধনা। এক কথায় মানবের মত দেহশক্তির জাগরণ, মনশক্তির জাগরণ ও আত্মিকশক্তির জাগরণ এই তিনেতে মানবের পূর্ণতা।

জাতি, কুল ও শাশ্বত ধর্ম্ম।

পশুআদি প্রাণীতে, অজ্ঞতামাখা, তমোগুণ-প্রধান দেহ-শক্তি ইন্দ্রিয়-শক্তি ও বুদ্ধিবল, সেই জাতির স্বভাবের মতই সীমাবদ্ধ। মানবের কিন্তু এইসব বল সীমাবদ্ধ নয়। মানব, ব্যভিচার ইত্যাদি দ্বারা দেহকে দুর্ব্বল রুগ্নও করিতে পারে, আবার সদাচার দ্বারা সবল, সুস্থ করিতে পারে; মানব ক্ষুদ্রদেহে হস্তি সিংহ পরাজয়কারী বিপুল-বল অর্জ্জন করিতে পারে। অন্যপ্রাণী যার যার নির্দ্দিষ্ট খাদ্যমাত্র ভোজন করে, মানব সকল প্রাণীর ভোজ্য ভোজন করিতে সক্ষম। অন্যপ্রাণী বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বভাবমতই চালনা করে, মানব বুদ্ধির বর্দ্ধন করিয়া, মানবদেহে অমানুষ-শক্তি ধারণ করিয়া, পুরাণ-শাস্ত্রে বর্ণিত দৈত্য-রাজ হিরণ্যকশিপু রাবণাদির মত, ত্রিলোকের ধন ঐশ্বর্য্য বিজয়াদি

সুখ-ভোগ করিতে পারে; মানব জ্ঞানে, মহত্বে প্রহ্লাদ, আবার দাতা বলী, হরিশ্চন্দ্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদির মত জগত-পূজ্য, প্রাতঃস্মরণীয় হইতে পারে। শিক্ষা ও চেষ্টা দ্বারা মানব হীন ও মহৎ দুইই হইবার শক্তি রাখে, এইটুকুই মানবের মানবত্বরূপ, অন্যপ্রাণীর অতীত বিশেষত্ব। অন্যপ্রাণীর এই শক্তি নাই বলিয়াই, তাহাদের পাপ ও পুণ্যরূপ. জীবনের অসার্থকতা বা স্বার্থকতা নাই; তাহাদের শাস্তি ও পুরষ্কার রূপ নরক ও স্বর্গও নাই। দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধে, মানসিক বুদ্ধিরাজ্য সম্বন্ধে ও ইহাদের অতীত আত্মিকরাজ্য সম্বন্ধে কি শিক্ষা ও চেষ্টায় মানবের মানবত্ব সার্থক হয়, তাহাই এই তিন প্রকার সাধনার সংবাদ।

অন্য প্রাণীর অজ্ঞতা ও তমোগুণ-আবরণ নাশের দেহেন্দ্রিয়ের সংযম, শুদ্ধাচার, শৌচাচার গ্রহণ, বা পূর্ণ-মানবের সত্যগুণ-বর্দ্ধক জ্ঞানময় আচার, খাদ্যাদির সদাচার গ্রহণই সাধারণ কথায় জাতিধর্ম্মাধ্যায়। ইহাতে রাত্রিতে

জাতিধর্ম্ম—

কতটুক নিদ্রাভোগ করিবে, কেমন সময় উঠিবে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া মুখ, চোখ, দন্তাদি ধাবন, মলত্যাগাদির নিয়ম, আহারের বিশুদ্ধতা, পরিমাণ, শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ত্রিবিধ ব্যায়াম, শরীরের বল-সাধনা, মনের জ্ঞানসাধনা, সৎগ্রন্থ পাঠ, আত্মার বলসাধন ধ্যান ধারণা, ব্রহ্মচর্য্য-বীর্য্যধারণ, ক্লেশ-সহন, শ্রমসহন, অনলসতা ইত্যাদি শরীর-কৌশল ও স্বাস্থ্যরক্ষা-অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণতঃ সমস্ত-ধর্ম্মেই এইগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে এবং প্রায় সকলই একরূপ নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু হিন্দু-ঋষির ব্যবস্থামত এমন সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খলিত বিধান অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায় না। মল ত্যাগান্তের শৌচে—অন্ত্রমধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া মূল-শোধন, অণ্ড, কুচকী আদিতে মৃত্তিকা লেপিয়া শোধন দ্বারা, যাতে অন্ত্রে, গুহ্যে, কুচকী ইত্যাদিতে রোগ না হইতে পারে এমন শৌচের বিধান—দন্ত, ওষ্ঠ,

জিহ্বা, গলা, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণে রোগ না হইতে পারে, এমন করিয়া মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা, অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে ধর্ম্ম-সাধনার অন্তর্গত করিয়া, ঋষি মানবের অবশ্য করণীয় নিত্যকর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন। তাই মনুতে বর্ণিত আছে, যাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া, এই মুখ প্রক্ষালনাদি নিয়ম মতে না করে. সে কি করিয়া বলিবে, আমি ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করি? তাহার দত্ত দ্রব্য, জপ, তপস্যা কিছুই ভগবান গ্রহণ করেন না।

এই জাতিধর্ম্মাধ্যায়ে, ঋষি অন্যধর্ম্মপন্থীগণ হইতেও এক বিষয়ে অধিক উপদেশ দান করিয়াছেন। অন্যধর্ম্মে ইহার সামান্য উল্লেখ থাকিলেও, ঋষিগণ ইহাতে অত্যন্ত জোর দান করিয়াছেন। তাহার নাম বীর্য্যধারণ বা ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-অধ্যায়। যাহার নিরোধ ও বিশুদ্ধতায়, মানবের মধ্যে সহজে পূর্ণমানবের শক্তি, জ্ঞান ও মহৎভাব—ত্যাগ, ক্ষমা ধৈর্য্যাদি গুণ সহিত দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক স্বভাবেই শক্তি জাগিয়া উঠে, যাহার অভাবে এইসব জাগিয়াও দাঁড়াইবার স্থান পায়না. সেই বীর্য্য-সাধনা, ঋষিগণের একটী কল্যাণ মহা প্রদান। এই বীর্য্য-সাধনা কেবল মানবের আপনার কল্যাণ নহে। ভবিষ্যৎ বংশধরেরও দেহ. মন. আত্মার কল্যাণের সাধনা। আর্য্যযুগে সমস্ত হিন্দু-নরনারীই বীর্য্য-সাধনায় অধিক যত্নবান ছিল। তাই জ্ঞানালোচনার শিক্ষা-আশ্রমের নামই ছিল, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। শিক্ষাকালে বীর্য্যরক্ষা ও শুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল মোক্ষ-কর্ম্ম। গৃহস্থ-জীবনেও ঋতুকালে—দশমরাত্রি হইতে ষোড়শরাত্রি, বিশুদ্ধ-আবর্ত্তস্রাব হইলে, উভয়ের শরীর সুস্থ থাকিলে, সেদিন শুভ তিথি আদি যোগ হইলে, স্ত্রী ও পুরুষ মিলিত হইত। বৃদ্ধ পিতা মাতাও এই নিয়ম পালন করিতেন ও পুত্র কন্যাগণকে সেই রূপভাবে মিলিত

হইতে শিক্ষা দিতেন। সেকালে, সন্তানার্থ বিনা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি—বেশ্যাগমন-তুল্য নিন্দিত ও নিতান্ত হীনতা প্রকাশক ছিল।

কঠ উপনিষদে দেখিতে পাইবেন, বীর্য্যবাহী স্নায়ুকে মনবাহী স্নায়ু বলা হইয়াছে। শাস্ত্রমতে বীর্য্যেরই একনাম চন্দ্র। হিন্দুশাস্ত্রে চন্দ্রকে মনের অধিপতি দেবতা বলা হইয়াছে। তাই চন্দ্ররূপ বীর্য্যের বলাধিক্য ও শুদ্ধতায়, মনের বল ও শুদ্ধতা জন্মে। তাই বীর্য্যবলে সর্ব্বপ্রকার মনোবল—জ্ঞানের অব্যর্থ স্মৃতি, ধৈর্য্য, সংযম, ক্ষমা, ত্যাগশক্তি ইত্যাদি মহৎ গুণসমূহ বর্দ্ধিত হয়। বীর্য্য-রক্ষা ও শুদ্ধতা জন্য ঋষিগণ যোগ-পথে বহু মুদ্রাদি কর্ম্ম-কৌশল, জ্ঞান-পথে সুচিন্তা-সাধন, ভক্তিপথে প্রেমের উন্মেষ সাধন এবং নিম্বপত্র সিদ্ধিআদি নানা ঔষধ সেবন ইত্যাদি বহু উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম এই বীর্য্য-সাধনা ও জননেন্দ্রিয়ের বিশুদ্ধতারই সাধনা। নারীর আদ্যঋতু-সংস্কার হইতে প্রতি ঋতুকাল-কর্ত্তব্য, গর্ভধারণের চেষ্টায় কর্ত্তব্য, গর্ভকালের আহার, বিহার, নিদ্রাদির বিধান, গর্ভকালে পঞ্চামৃতাদি গর্ভসংস্কার, শিশু-জননে আতুরগৃহ-পালন কর্ত্তব্য, ঋষি যে মাতা ও শিশুর কতদিকের মঙ্গল-চিন্তা করিয়া, কত কল্যাণের দান করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহা চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারে এমন লোকেরও অভাব হইয়া উঠিয়াছে। যে সংবাদ প্রত্যেক নরনারীর জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন, আজ তাহা অশ্লীল আলাপ বলিয়া নরনারীর অশ্রাব্য, অনালোচনীয় করিয়া রাখা হইয়াছে। আর একদিন, এই সব আচারের দিকে হিন্দুর এত যত্ন ও সাবধানতার দৃষ্টি ছিল যে, যে নারীর এই আদ্যঋতু সংস্কারাদি না হইত, সে পত্নীত্ব অধিকার সম্পত্তিআদি পাইত না, তাহার সন্তান পিতৃ-সম্পদে বঞ্চিত হইত।

এই বীর্য্য-ধারণার সাধনায়ই একদিন ভারতবাসী আর্য্য-হিন্দু, দেহ-সৌন্দর্য্যে, দেহ বলে, মনোবলে, আধ্যাত্মিক বলে, মহত্ত্ব পবিত্রতায়

সর্ব্বজগতের আকাঙ্ক্ষার আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল এবং কোটী কোটী বর্ষ, সমস্ত পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছিল। নানা ধর্ম্ম-বিপ্লবে, আর্য্য রাজশাসন-হীনতা, শাস্ত্র ও আচার্য্য হীনতা, অন্য-ধর্ম্মীর নির্য্যাতন, বিরুদ্ধ ব্যখ্যায়, আর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার হীনতায়ই, সেই প্রাচীন আর্য্য এবং নর-নারীর বংশে আজ আমাদের মত সৌন্দর্য্যহীন, বর্ণহীন, স্বাস্থ্যহীন, পবিত্রতাহীন, মহত্বহীন জগৎ-ঘৃণ্য মানবের উদ্ভব হইতেছে। জাতিকে আবার পূর্ণকরিয়া তুলিবার ইচ্ছা করিলে, মানবের এই জাতিধর্ম্ম ও বীর্য্য-সাধনা জাগাইবার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবদেহে তিনটী সত্তার সমাবেশ আছে। একটী জড় দ্রব্যসত্তা,—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি, দ্বিতীয়ে চিন্ময় গুণসত্তা—ইন্দ্রিয় জ্ঞান প্রবৃত্তিবর্গ, তৃতীয়ে আত্মিক অব্যক্ত ব্রহ্মসত্তা—জীবের আত্মা; এক কথায় দেহ, মন, আত্মা এই তিন-সত্তায় জীব গঠিত। জাতি-ধর্ম্মাধ্যায়ে কেবল দ্রব্যসত্তা দেহের দেহ ইন্দ্রিয় বীর্য্য মজ্জা রস রক্তাদি ধাতুর শোধন-সাধনা বর্ণিত হইয়াছে। চিন্ময় গুণসত্তার মার্জ্জনা ও পূর্ণতার সাধনাই কুল-ধর্ম্মাধ্যায় এবং আত্মিক-সত্তার বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন শাশ্বত-ধর্ম্মাধ্যায়। ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই তিন সত্তায় জীবের তিনটী দেহ কোষ আছে। এক দেহের মধ্যেই ক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নামে তিনটী দেহ। যখন জীব সুষুপ্ত—গভীরনিদ্রায় থাকে, তখন জীবের জীবত্ব-চৈতন্য দেহে থাকিয়াও এমন স্থানে থাকে যে দেহ ও মনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ থাকে না; সেই স্থানই কারণ-দেহ-কোষ। স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্য মাত্র মনে যুক্ত থাকে, সেই স্থানই সূক্ষ্মদেহ-কোষ। এর পরে জাগ্রতে চৈতন্য মন ও দেহ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়—তাহাই চৈতন্যের স্থূলদেহ-কোষ। আত্মারূপ ব্রহ্মসত্তা, জীবত্ব-অহঙ্কার-আবরণে কারণ-দেহরূপ আত্মিকদেহ-কোষে বদ্ধ হইয়া জীবাত্মা নাম প্রাপ্তহয়। তখন সেই জীবাত্মা সূক্ষ্মগুণময় দেহে

প্রবেশ করিলে নানা গুণাস্বাদ লাভে আকাঙ্ক্ষিত হয় এবং পরে স্থূল দেহ যেইরূপ প্রাণীর আকারে আবরিত সেই দেহ, ইন্দ্রিয় দ্বারাই যথাসাধ্য সেই গুণের বিকাশ করিয়া জীবারূপে ক্রিয়ারত হয়। নরদেহ বিনা, জগতের সমস্ত দেহই—এমনকি দেবদেহ পর্য্যন্ত, কতক হীনদেহ ও কতক অধিক ঐশ্বর্য্যময় দেহ; তাহাতে আত্মার সর্ব্বপ্রকার গুণের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। তাই আত্মার জীবত্ব বন্ধনও ছুটে না। তাই মানবের গুণ-রাজ্যরূপ স্বকুলধর্ম্ম—( কুল—জাতি বোধক ) জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন; তাহার সংবাদই মানবের কুলধর্ম্ম সংবাদ।

প্রত্যহ যেমন জড়দেহ রক্ষা ও পোষণ-জন্য জড়দ্রব্য অন্নাদি ভোজন প্রয়োজন, সেইরূপ মনোময়-দেহ রক্ষা ও পোষণ জন্য প্রত্যহ সেইরূপ জ্ঞানালোচনা মনেরখাদ্য দানেরও তেমন প্রয়োজন এবং সেইরূপ আত্মিক-দেহ রক্ষার ও পোষণজন্য আত্মিক-খাদ্য—পরমাত্মা ঈশ্বরের-ধ্যানও সেইরূপ প্রত্যহ প্রয়োজন। দেহের খাদ্য হইতেও মানসিক খাদ্য শ্রেষ্ঠ। কেন না, মনের তুষ্টি ও প্রফুল্লতা না থাকিলে উত্তম উপাদেয়-দ্রব্য ভোজনেও দেহের বল ও পুষ্টি হয় না। আর মনের তুষ্টি ও সন্তোষ থাকিলে, সামান্য-দ্রব্য ভোজনেও মানবের দেহ পুষ্ট ও বলশালী হয়। আবার মনের তুষ্টি ও উত্তম ভোজন থাকিলেও, মানব যদি সুষুপ্তিরূপ নিদ্রা যাইতে না পারে. তবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; জীবন রক্ষাই অসম্ভব হয়। এই সুষুপ্তির মত মন ও দেহেন্দ্রিয় নিরোধিতাই তাই আত্মারখাদ্য; জীবাত্মাকে বিষয়-যুক্ততা ছাড়িয়া, পরমাত্মার সহিত যুক্ত করাই আত্মার খাদ্য। এ জগতে দুইটী মাত্র সত্তা. একটী বিষয় আর একটি ব্রহ্ম। তাই বিষয়-নিরোধ হইলেই, আত্মার ব্রহ্মযুক্ততা হয়। তাই যোগ-শাস্ত্রে আছে—'যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।' এই জন্যই সুষুপ্তি হইলে, মানবের অমৃত ভোজনের মত, শরীরের অবসাদ ও মনের ক্লেশ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়;

ভগবান-যুক্ততাই তাহার কারণ। ভগবৎ-ইচ্ছায় জীব নিত্য-স্বভাব হইতেই এই সুষুপ্তিরূপ ব্রহ্মযুক্ততা লাভ করিয়া জীবিত থাকে ; নচেৎ বাঁচেই না। কিন্তু তাহা অজানিত–যুক্ততা, জীব ভগবানে যুক্ত হয় অথচ তাহা জানিতে পারে না। আর্য্যঋষি ধ্যানসমাধি ও ভক্তিযোগ দ্বারা তাহাকে জ্ঞানসহিত আস্বাদন-সন্ধানও দান করিয়াছেন, তাহাই হিন্দুর শাশ্বত-ধর্ম্মাধ্যায়।

মানব বিনা কোন প্রাণীই নিজের দেহেন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির উপরে, জীবন দাতা পিতা মাতাদির তোষণ, জাতির সেবা, দেশের সেবা রূপ কর্ম্ম করিতে পারে না। অন্য প্রাণীতে ঐশ্বরিক-বিধানে শিশুর প্রতি মায়ের সন্তানস্নেহ, শিশুর সখ্যতা, মাতৃ পিতৃ অনুবর্ত্তীতা একটু দেখা গেলেও, যৌবনের সঙ্গে দেহেন্দ্রিয়ের স্বার্থই প্রবল হইয়া সেই সবের বিনাশ পায়। মানবই পিতামাতাদির সঙ্গে সংসার গড়িয়া, প্রতিবেশীর সঙ্গে সমাজ-গড়িয়া, পরস্পরে কর্ত্তব্যতার আদান প্রদান বন্ধন করিয়া, জীবন যাপন করিতে পারে। পশুআদি নিজের স্বার্থে, অনায়াসে আপন-জন ও পরকে বধ করিয়া বসে। আর মানব আপন-জন, সমাজ, প্রতিবেশী, অন্যপ্রাণী প্রভৃতি বহুর তৃপ্তিসঙ্গে নিজের তৃপ্তি কল্যাণাদি সাধন করে ; এই টুকুই মানবের মানব-শক্তি ; তাই তাহারা প্রাণী-জগতে শ্রেষ্ঠ মহা-প্রাণী নামে পরিচিত।

কুলধর্ম্ম

শরীরের মধ্যে যেমন, মস্তক ও হৃদয় বিশেষভাবে রক্ষণীয়, ইন্দ্রিয় মধ্যে চক্ষু অধিক যত্নের ধন, সংসারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, দাসাদির মধ্যেও তেমন তারতম্য আছে ; সমাজের মধ্যেও গুরু, ব্রহ্মণ, ভক্ত, স্বজাতি ইত্যাদি, প্রাণীবর্গের মধ্যেও মানব, পশুতে গাভীর প্রতি কর্ত্তব্যতার বিভিন্নতা আছে। এই প্রত্যেকের প্রতি কর্ত্তব্য-সংবাদ, সামাজিক শীলতা, গুরুবর্গকে সম্মান, সুহৃদকে আদর ইত্যাদি প্রদর্শন,

অচৌর্য্য, সত্য ক্ষমা, ত্যাগ, বিনয়, কষ্টসহনাদির নীতিজ্ঞানই এই কুলধর্ম্ম-অধ্যায়। পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ভগবানের মত জ্ঞানে সেবাকর, প্রতিবেশীকে প্রেমকর, দোষীকে ক্ষমাকর ও দীনকে দানকর, চুরি করিও না, মিথ্যা বলিও না ইত্যাদি নীতিধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্ম-পথীরই একরূপ স্বীকৃত বিষয়, তাহাতে কাহারই বিরোধ নাই। ঋষি এই অধ্যায়ে রস-সাধনা নামে আরও একটী বিষয় অধিক দান করিয়াছেন।

জগতে স্নেহ নামে একটী কেবল আত্মার আস্বাদ্য মহাসুখের-সন্ধান আছে ; তাহার নাম রস। এই রসতত্ত্ব হইতে হিন্দুঋষি বৈষ্ণব-সাধনা পথের সন্ধান দান করিয়াছেন। এই রসই জীবের কর্ম্মসত্ত্বার ও সৃষ্টি রাজ্যের মূল। শ্রুতিতে ব্রহ্ম-স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে—ব্রহ্ম, রসোবৈসঃ। সৃষ্টিতত্ত্বে বর্ণিত আছে, প্রথমে এই রসের সৃজন হইয়াছিল। এইরস অন্য প্রাণী-বর্গের মধ্যে, কতক দিনের জন্য স্বভাব হইতে জাগে মাত্র —, সন্তান-পালন জন্য মাতা পিতাতে সন্তান-স্নেহ, শিশুগণ মধ্যে সখ্য গর্ভধারণ জন্য একটু মধুর ইত্যাদি পশু মধ্যেও জাগে। মানব ইচ্ছা করিলে চিরজীবন তাহা ভোগ করিতে পারে। সেই রস আত্মার তৃপ্তিদ বলিয়াই, জগতের সমস্ত প্রাণীই এই স্নেহরস পাইলে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। স্নেহে অভিভূত হইয়া হিংস্র পশু হিংসা ভুলিয়া, স্নেহ-দাতার রক্ষার প্রাণ দান করে,—তাহাকে বহন করে,—মানব তাহার সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বলি দিয়া, সেই রসদাতার দাস হইয়া থাকে ; তারজন্য ধন মান ধর্ম্ম, এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই রসের জন্মস্থান ও রসাস্বাদনের স্থান, মানবের কুলরূপ পিতা মাতার সংসার গৃহ। তাই এই রসের জ্ঞান ও তাহার প্রকাশও একটী কুলধর্ম্ম-সংবাদ।

মানব বাল্যে কেবল রস আস্বাদী ; তাহার মধ্যে কোনও রসই থাকে

না। খেলিতে খেলিতে বাল্যে সখ্যের জাগরণ হয়। জ্ঞানের সঙ্গে পিতা মাতার প্রতি দাস্য জাগ্রত হয়। বিবাহেও প্রথমে সখ্য ভাবই থাকে, সন্তান জন্মিলে বাৎসল্য জাগিয়া, মানবের মধ্যে সর্ব্বরসের পূর্ণতার মধুর-রস জাগিয়া উঠে। তখন তাহার নিকট জগত মধুময় হয় এবং সেও প্রকৃত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবসহ সেবা করিয়া জগতের সকলকে প্রকৃত মধুর-আনন্দ দান করিতে সক্ষম হয়। তাই ঋষি মানবকে রসে পূর্ণ করিয়া তুলিবারস্থান কুলরূপ সংসারকে, মানবত্ব-সাধনার একটী বিশেষস্থানরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মানবের কর্ম্মরাজ্য প্রধানতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত, একটী প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, জ্ঞানদাতা পিতার প্রতি কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় প্রাণেরকর্ত্তা জগন্নাথ অব্যক্ত ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য। কর্ম্ম-সাগরের এক কূল পিতার সংসার, অন্যকূল ঈশ্বরের সংসার ; তাহাই মানবের এক কর্ত্তব্য কুলধর্ম্ম ও অন্য কর্ত্তব্য শাশ্বত ধর্ম্ম-অধ্যায়।

ত্রিপুরা জিলার ত্রিশ নামক গ্রামের প্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবর শ্রীবসন্ত দাদা বলিয়াছিলেন—মানব প্রথমে একস্থানে ধানগাছের পাত্‌না দিয়া, পরে তুলিয়া পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে বপন করিলে, তাহাতে প্রচুর ধান্য জন্মে। পাত্‌না-ক্ষেতে রাখিলে গাছ ক্রমে মরিয়াই যায় ; কখনও ফল ধরে না। মানবের স্নেহ ও সেবাধর্ম্মের প্রথম পাত্‌নাক্ষেত্র এই কুলরূপ গৃহ-সংসার। কেবল সেখানেই যদি এই সবকে রাখিয়া দেয়, তবে তাহা নিষ্ফল, তুলিয়া বিশ্বজগতে সেই স্নেহ ও সেবা লাগাইলেই তাহার সার্থকতা ও তাহার যথার্থ ফল লাভ হয়। তিনি আরও বলিতেন, প্রকৃত সংসার, সন্ন্যাসীর তপোবন হইতেও ত্যাগ ও সংযম শিক্ষার স্থান। বাৎসল্যাদি স্নেহের উদয়ে নিজের কাম, ক্রোধ লোভাদি আপনা হইতে সংযত হইয়া যায় ; উত্তম-দ্রব্য তখন নিজে ভোগ না করিয়া স্নেহ-পাত্রকেই ভোগ

করাইয়া সুখ হয়। যুবতী সুন্দরী ভগ্নী, পুত্রবধু, কন্যাদিকে সর্ব্বদা গৃহস্থ যুবক, দর্শন স্পর্শন করিয়াও কামপীড়িত হয় না, তাহাদের ছায়া দর্শনে মহা তপস্বীর তপোবিঘ্ন ঘটিয়া যায়। কুলধর্ম্মের সম্বন্ধ-সাধনায় জীবের এমন কল্যাণ আনয়ন করে। বিষ্ণুর-অঙ্গোদ্ভবা স্বর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অপ্সরা উর্ব্বসী—যাহাকে দর্শন মাত্র দেবতা ও মহর্ষিগণেরও সংযম নষ্ট হইয়া যায়, সেই উর্ব্বসী অভিসারবেশে সাজিয়া, সকাম-কটাক্ষেও গৃহস্থধর্ম্মী-যুবক অর্জ্জুনের মনোবিকার আনিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন কুলধর্ম্মের মাতৃ-সম্বোধন করিয়া দেবতা-দুর্জ্জয় কামকেও অনায়াসে পরাজয় করিলেন। কুলধর্ম্ম-সাধনা মানবের এতই কল্যাণকর সাধনার সংবাদ।

হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এই কুলধর্ম্ম-সাধনা ভগবানের অতীব-প্রিয়। তাই বিষ্ণু স্বয়ং দেবগণ সহিত এই কুলধর্ম্ম শিক্ষাদিতে অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া, মানবের আদর্শলীলা প্রকাশ করেন। পরশুরাম রূপে কুলধর্ম্ম—পিতৃতোষণার্থে মায়ের শিরচ্ছেদ করেন। শ্রীরামরূপে পিতৃতোষণে বনবাসে গমন করেন, পত্নী-প্রেমে ধূলায় পরিয়া লোটাইয়া রোদন করেন ও পরে পত্নী অপহারীকে দারুণ চেষ্টায় স্ববংশে নিধন করেন। স্বয়ং মহাদেব ভগবতীর সহিত মূর্ত্তি ধরিয়া কুলধর্ম্ম আচরণ শিক্ষাদান করেন। এই কুলধর্ম্ম স্বামী-সেবায় শঙ্খচূর-পত্নী তুলসী দেবী বিষ্ণুকে লাভ করেন। সতী সাবিত্রী মৃতপতীকে জীবিত করেন। পুরাণে পঞ্চোপখ্যানে বর্ণিত আছে, ব্রাহ্মণ-পুত্র সন্ন্যাস ও তপস্যায় যে ফল ও তপশক্তি লাভ করিয়াছিল—গৃহস্থ-পত্নী কুলধর্ম্ম পতি-সেবায়, চণ্ডাল-পুত্র পিতৃ-সেবায়, বণিক সত্য-তৌলে, গৃহস্থ সত্য বন্ধুতায়, ধর্ম্মব্যাধ কুলধর্ম্ম মাংস-বিক্রয়ে ও রাজা জনক ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম রাজ্য-শাসনেও তাহাই লাভ করেন।

কুল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব—

মহর্ষি কর্দ্দমের পুত্ররূপে বিষ্ণুই কপিল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে,

কর্দ্দম বিষ্ণুর স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—ভগবন! এখন দেখিতেছি, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যে গৃহীই তোমার অতিপ্রিয়। সন্ন্যাসী কত কঠোরতায়, কতদীর্ঘ সময়ের তপস্যায়, তোমার দর্শন যোগ্য হয়; হয় তো বা এক মুহূর্ত্ত তোমার দর্শন লাভ করে। আর গৃহস্থ-গৃহে তুমি তার সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া, সর্ব্বকালে দর্শন দেও; তাহার ইহকাল পরকালের সর্ব্বভার গ্রহণ কর। মহাতপা ঋষিবর বিশ্বামিত্র, প্রথমে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বিলাসী বিষয়মত্ত গৃহমেধী ক্ষত্রিয়-যুবক বলিয়া, নিতান্ত উপেক্ষাভরে কিছু শিক্ষা দিতে, তাহার নিকট রাজ্য-দান প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাজা যখন সত্যই মহাত্যাগীর মত সব দান করিয়া ফেলিল; দানের দক্ষিণা দান জন্য পত্নী-বিক্রয়, আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়া, চণ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করিল—সত্যই অম্লান বদনে রাজার রাজ্য-পালনের মত আনন্দে চণ্ডাল-দাসত্ব করিতে সক্ষম হইল; তখন বিস্মিত ও মহা আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন—রাজন্! তুমিই যথার্থ মহাপুরুষ। ত্রিজগতে কাহারো নিকট বিশ্বামিত্র পরাজিত হয় নাই, কিন্তু তুমি আমায় সর্ব্বদিকে পরাজয় করিলে। আমি ত্যাগ তপস্যায় যে ঋষিত্ব-শক্তি অর্জ্জণ করিয়াছি, তুমি ভোগের মধ্যে থাকিয়া তাহা হইতেও অধিকশক্তি অর্জ্জণ করিয়াছ। আমি ঋষি হইয়া একা-মাত্র মুক্তির অধিকার পাইয়াছি; হয় ত আমার উপদেশে বা আদর্শ দেখিয়া, আরও দুই একজন মুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু রাজন্! তুমি কুলধর্ম্ম সাধনায় ঋষিত্ব লাভ করিয়া, কুল সহিত, দেশ সহিত নিজ জন লইয়া মুক্তিধামে গমন করিবে। হিন্দুর কুলধর্ম্ম-সাধন মানবের এমন মহা-কল্যাণের সন্ধান।

আমি হয় ত হীনকুলে জন্মিয়াছি, আমার পিতা মাতা জ্ঞানহীন ও হীনাচারী। আমি জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই দোষে নিজ পিতা মাতাকে

পরিত্যাগ করিয়া যাইব, না সর্ব্বদা তাহাদের অজ্ঞতাজন্য, হীনাচার-জন্য নিন্দা ও শাসনাদি করিয়া দুঃখদান করিব? তাহা কি পুত্রের উচিৎ কর্ম্ম হইবে? পিতা মাতা যেমনই হউক, কুলধর্ম্মে তাঁহারাই আমার প্রত্যক্ষ-দেবতা। তাঁহারা যে আচার ইচ্ছা করুন তাহাই আমার মাথা পাতিয়া লইতে হইবে; তবে নিজে জ্ঞান পূর্ব্বক সদাচার পালনে যত্নবান হইব। বুঝাইয়া স্নেহের-পথে পিতা মাতা স্বকুলের জাতির আচার ও জ্ঞান মহৎ করিতে চেষ্টা করিব, ইহারই নাম কুলধর্ম্ম পালন। ধর্ম্মব্যাধ নিজে ঋষিতুল্য জ্ঞানবান ও শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-আচারী হইয়াও, ব্যাধ সমাজের আচরণ ত্যাগ করে নাই। সে মাংস-বিক্রয় করিয়াই পিতার সেবা করিতেছিল। তবে সে জীবহত্যা করিত না, মাংস ভোজনও করিত না; অন্য জন হইতে মাংস ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিত। কেন না মাংস-বিক্রয় তাহার ব্যাধ নামক কুলের কুলধর্ম্ম, পিতা মাতার বংশগত কুলাচার। এই কুলধর্ম্মের কথা পরে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আরও বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

মানব বিনা অন্য সমস্ত প্রাণীতেই প্রত্যেকের দেহেন্দ্রিয়ে জাতিধর্ম্ম ও প্রবৃত্তিতে কুলধর্ম্মের কতক বিকাশ আপনা হইতেই হয়। কিন্তু শাশ্বত-ধর্ম্মের সাধনা, মানব বিনা আর কাহারই সাধ্যায়ত্ত নয়।

শাশ্বত ধর্ম্ম—

তাই বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—নর-তনু ভজনের মূল, মনুষ্যদুর্লভ জন্ম। ভাগবতে বর্ণিত আছে দেবগণও মুক্তির সাধনা জন্য এই নর জন্মই প্রার্থনা করেন। পুরাণে, আরও বর্ণিত আছে, মাত্র এই ঈশ্বরসাধনা শক্তিতেই মানব অন্য প্রাণী-বর্গ হইতে মহৎ; তাহা না থাকিলে অন্য প্রাণী আর মানবে কোনও পার্থক্য নাই। এই জন্যই অদীক্ষিত-মানব পরজন্মে পশুআদি জন্ম পায় বলিয়া ঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে অদীক্ষিত

নর নারীর জলটুকুও ধর্ম্মকর্ম্মে অব্যবহার্য্য করিয়াছে। অদীক্ষিত দেবকর্ম্ম, সমাজ-কর্ম্ম, এমন কি পিতৃশ্রাদ্ধেরও অধিকার পাইত না।

সাধারণতঃ সৃষ্টি-রাজ্যে একটী জন্ম প্রবাহের শৃঙ্খলা আছে। পৃথিবীতে চৌরাশী-প্রকার প্রাণী; তাহার প্রত্যেকের মধ্যে আবার এক লক্ষ প্রকার শ্রেণী আছে। একটী জীবাত্মা রূপ প্রাণ-সত্তা ক্রমোন্নত জীব-দেহ ভোগ করিয়া, এক মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই চৌরাশি লক্ষ জন্ম ভোগ করে। পরে প্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে ভগবানে লীন হয় ও আবার জাগরণে কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষের মত, নূতন সৃষ্টিতে ভগবান হইতে আবার বাহির হইয়া আসে; হিন্দুঋষি জন্ম প্রবাহকে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। বাইবেলও কোরআণেও এই মহাপ্রলয়রূপ কেয়ামত পর্য্যন্ত, আত্মা জগতেই বিচরণ করে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অনেক খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদী মনে করে, আত্মা ততদিন কবরে পড়িয়া থাকে; ঋষিমতে জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া জগতে ঘুরে। হিন্দু ঋষিমতে এই মহা প্রলয়ে ঈশ্বরে লীনহওয়া এইটী প্রাকৃতিক লয়-বিধান। ইহার উপরে মানব যে চেষ্টা করিলে, সেই মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেও জন্ম শেষ করিয়া, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; নূতন সৃষ্টিতেও তাহাদের আর আসিতে হয় না—ইহার নাম আত্যন্তিক লয়। এই কর্ম্ম অধিকার প্রাণী-বর্গের মধ্যে মাত্র মানব দেহেরই আছে; দেবগণেরও নাই। এই তত্ত্বই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ব্রহ্মা হইতে ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণীরই পুনরাগমন হয়; জাতের মৃত্যু ধ্রুব ও মৃতেরও জন্ম ধ্রুব; কিন্তু আমার নিকট আসিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যেখানে যাইলে আর ফিরিয়া আসে না, তাহাই আমার পরমধাম। হিন্দুর শাশ্বত-ধর্ম্মাধ্যায় সেই প্রাণীস্বভাব ধ্রুব-জন্ম ও মৃত্যুর নাশ করিয়া, ভগবানের নিকট তাঁহার পরমধামে যাইবার সন্ধান-বর্ণনা।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। ২অঃ ২৭শ্লোঃ
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮অঃ ১৬শ্লোঃ
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। ১৫-৬

খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদীয় সাধারণজনগণ জানেন যে কোনও পেয়াগম্বরকে মানিয়া, তাঁহার বিধি বিধানে চলিলে কেয়ামতের পর বিচার-দিনে সেই পেয়াগম্বর তাহাকে নিজজন বলিয়া স্বীকার করিবেন, ও তাঁহার সাক্ষ্যদানে ভগবান সে জনের অপরাধের শাস্তি ক্ষমা করিয়া, বেহস্তরূপ স্বর্গ-সুখ ভোগ করাইবেন; নচেৎ দোযোগরূপ নরকে পাপের সাজা ভোগিতেই হইবে। বাইবেল ও কোরাণেও এই কথাই বর্ণিত আছে. কিন্তু খ্রীষ্টিয়দের মধ্যেও অনেক ভক্ত-সাধক এবং মোহম্মদী মধ্যেও শরিয়ত ও মারফতি সাধকগণ, এই আত্যন্তিক মুক্তি ও ঈশ্বরলাভও মানব করিতে পারে বলিয়া স্বীকার করেন। জীবশক্তির এই আধ্যাত্মিক-রাজ্যের জাগরণে, মানব কত অমানুষ শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে তাহার ইয়ত্বা নাই। পরমাত্মারূপী ভগবানের অংশভূত-জীবাত্মা, নিশ্চয় ব্রহ্মের মত সর্ব্বশক্তিরই অধিকারী; তাহার যত প্রকার বাসনার উদয় হয়, নিশ্চয় সেই সবের পূর্ণতাও আছে। এই তত্ত্ব ধরিয়া, ষটনবতী বিভূতি ও অণিমা লঘিমাদি অষ্ট মহাসিদ্ধি-সাধনার উপায় ঋষি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মানব জড়দেহকে জড়অতীত দেবদেহ করিতে পারে, অণুর মত লঘু অদৃশ্য ও পর্ব্বতের মত গুরু হইতে পারে, সর্ব্বত্র দর্শন, সর্ব্বত্র শ্রবণ শক্তি, ইচ্ছা মাত্র যদৃচ্ছা গমন, রোগ সারানো, মৃতকে পর্য্যন্ত জীবিত করিতে শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে। ঋষি এই সিদ্ধশক্তির বিভেদকে সাধারণতঃ সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও একত্ব এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া বুঝাইয়াছেন। সালোক্য,—জীবত্বের নাশ,

অভাব দুঃখহীন হওয়া, সামীপ্য—ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তীত্ব দেবদেহ লাভ, সারূপ্য—ইন্দ্রত্ব লাভ, দেবকর্তৃত্ব শক্তিধর, সাষ্টি—ঈশ্বরের মত ঐশ্বর্য্যবান, ব্রহ্মাত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবত্বশক্তি লাভ, একত্ব—দুই প্রকার, জ্ঞান-সাযুজ্য সমাধি লাভ ও ভক্তি-সাযুজ্য ঈশ্বরের পার্ষদ হইয়া সেবালাভ। এই শেষপদই মানবের পৌরষ চেষ্টায় চরমফল বলিয়া, ইহাকে পঞ্চম-পুরুষার্থ বলে; তাহাই জীবত্বের যথার্থ অবসান পূর্ণমুক্তি। জগতের অন্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই, এই শাশ্বত ধর্ম্মাধ্যায়কে মানবের অবশ্যকরণীয় জীবন সার্থকতার প্রধান কর্ম্ম বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সকলেই একরূপ সাধনপথ—নিরাকার, নির্গুণ মাত্র ব্রহ্মের উপাসনাই দান করিয়াছেন। হিন্দু-ঋষি মানবের সত্ত্বাভেদে যত প্রকার হইলে, সকলেই মুক্তি পাইতে পারে তাহার সমস্ত প্রকার সাধনাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই হিন্দুর এই শাশ্বত-ধর্ম্মাধ্যায় অতি বিস্তৃত, বহুমতে পরিপূর্ণ। এই জন্যই হিন্দুগণ মধ্যে সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে দেওয়া হইত না। বিশেষ জ্ঞানবানগণই মাত্র তাহা আলোচনা করিতে পরিতেন ও তাঁহারাই প্রশ্নকারীর সন্দেহ মোচন করিয়া, তাহার অনুযায়ী সাধনা নির্ণয় করিয়া দিতেন। আজ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে গ্রন্থ-পাঠের সুবিধা পাইয়া, সকলেই শাস্ত্র পড়িতে যান ও বহু মতের অরণ্যে প্রবেশ করতঃ আর বাহির হইবার পথ-সন্ধান পান না, তাহাতে অধ্যাত্ম আলোচনা-হীন নবশিক্ষা শাস্ত্রের নিন্দা ও বিরূপব্যাখ্যায় আজ শাস্ত্রের সত্য অর্থসংগ্রহই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে শাস্ত্রব্যাখ্যার অধিকার না পাইয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিলে বা কেহ বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিলে রাজশাসনে দণ্ডনীয় হইত।

পূর্ব্বে আর্য্যগণ মধ্যে প্রত্যেক বালককে শৈশবেই গুরুগৃহে প্রেরণ করিত এবং এই জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও শাশ্বত-ধর্ম্মের জ্ঞান ও কর্ম্ম-

কৌশল শিক্ষালাভ করাইয়া, পূর্ণমানব হইলে, কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিত। যত বৎসর কেন না হউক, "এই সবে শিক্ষিত হইয়াছে" গুরু ইহা না বলা পর্য্যন্ত শিষ্যের শিক্ষা শেষ হইত না। ঈশ্বরপথী সেই গুরুগৃহ রূপ আশ্রমে বিনা-অর্থব্যয়ে প্রত্যেক বালক শিক্ষিত হইত। বৌদ্ধগণও এই আচারটী গ্রহণ করিয়া, অল্প সময় মধ্যে ভারতের নরনারীর প্রত্যেককে জ্ঞানবান করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রতিগ্রামে ত্রিংশতঘর মধ্যে একটী মঠ। প্রত্যেক মঠে, একজন করিয়া বৌদ্ধাচার্য্য শ্রমণ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী—(তখনও সন্ন্যাস নেয় নাই) থাকিত। ব্রহ্মচারীর সামান্য বেশ, সামান্য আহার; প্রত্যেক গৃহস্থ এক এক দিন করিয়া তাহা বহন করিত। ইহার বিনিময়ে গৃহস্থ-শিশুগণ বিনা ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা এবং গৃহস্থগণ প্রতি-সন্ধ্যায় জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ তাহার নিকট শ্রবণ করিত। প্রত্যেক জাতির বালকই ব্রহ্মচারীর আহার বিহার ও বেশ লইয়া, বাল্যপাঠ শেষ করিত। ইহাদের মধ্যে যাহাদিগকে জ্ঞান-পিপাসু ও উপযুক্ত বোধ হইত তাহাদিগকে, সেই শ্রমণ উক্ত বিদ্যালয় হইতে বড়মঠে পাঠাইয়া দিতেন। তথায়ও রাজব্যয়ে, ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা সহ জ্ঞানাভ্যাস শিখিত। শিক্ষা সমাপনে সেই শ্রমণ ইচ্ছামত হয় গৃহস্থজীবন, না হয় সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করিত। শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমণকে আদরে তাহার সবর্ণগণ কন্যাদান করিয়া গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী আয়োজন ও সাহায্য করিত। মঠের আচার্য্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণে অশক্ত, বিষয় কামাশক্ত হইলেই বিবাহ করিয়া গৃহী হইত, কলুষিত-জীবন লইয়া শ্রমণ সাজিয়া থাকিতে পারিত না; বৌদ্ধ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীগণ সেরূপ থাকিতে দিতেন না। সকল জাতীয় লোকই এই শ্রমণরূপ ব্রহ্মচারী হইতে পারিতেন। আচার ও উপযুক্ততাই তাহার নিদর্শন ছিল। বৌদ্ধগণ পূর্ব্ব আর্য্যশিক্ষার যুগানুযায়ী এই নূতন সংস্কার

পূর্ব্ব হিন্দুর শিক্ষাপ্রণালী

করিয়াছিলেন। এইরূপ বিদ্যাদান বিনা, আধুনিক বিদ্যালয় দ্বারা মানবের পূর্ণ বিদ্যা— জাতি-ধর্ম্ম, কুল-ধর্ম্ম, শাশ্বত-ধর্ম্ম যথার্থ রূপে শিক্ষাদান হইতেই পারে না।

পূর্ব্বে মানবকে শিক্ষাদ্বারা কিরূপ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইত, গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের লক্ষণ বলিয়া তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ৭ শ্লোক হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত অমানিত্ব মদাম্ভিত্ব ইত্যাদি অষ্টাদশ গুণের জাগরণে বিদ্যাশিক্ষা সমাপন হইত। আজ কালের শিক্ষায় ইহার কয়টী কাহাতে প্রকাশিত হয় মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন। অনুবাদ।

১। অমানিত্ব— স্বগুণের শ্লাঘা না করা, ২। অদাম্ভিত্ব—অপরকে হীন করিয়া নিজের প্রকাশ চেষ্টা না করা, ৩। অহিংসা—পরে পীড়া না দেওয়া, ৪। ক্ষান্তি—পরের অপরাধ ক্ষমাকরা, অপমানাদি সহন ৫। আর্জ্জবম্—কায় মন বাক্যে সর্ব্বত্র সরল ব্যবহার, ৬। আচার্য্যোপাসনা—গুরুবর্গের সম্মান ও শুশ্রূষা করা, ৭। শৌচ—কায় মন বাক্যের বিশুদ্ধতারক্ষা ৮। স্থৈর্য্য—দেহের কষ্ট-সহনতা, ৯। আত্ম-বিনিগ্রহ—ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সংযম, ১০। ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য—ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বিরাগতা, ১১। অনহঙ্কার—গর্ব্ব-হীনতা, ১২। জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্—মানব জীবনে জন্ম মৃত্যু জরাদি কষ্ট অনিবার্য্য, তাহা সত্য বোধ করা, ১৩। পুত্রদার গৃহাদিষু অশক্তি, অনভিসঙ্গ—পুত্র, পত্নী আদি আপনজনে আসক্তি-হীনতা ও সঙ্গে থাকিয়াও অসঙ্গের মত থাকিতে পারা, ১৪। ইষ্ট অনিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্বম—লাভ ও অলাভে সদা সমভাব রাখা, ১৫। ময়িচানন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তি —ঈশ্বরে অব্যভিচারী কাপট্য রহিত ভক্তি ও অনন্যযুক্তা, ১৫। বিবক্ত দেশ সেবিত্বং—বিশুদ্ধ দেশবাসী, ১৬। জন সংসদি অরতি—জনমত,

জ্ঞানীর লক্ষণ

জনসঙ্গ বিরক্তি, ১৭। নিত্যং আধ্যাত্ম জ্ঞান—জড়জ্ঞান ত্যাগ করিয়া সদা আধ্যাত্ম জ্ঞান নির্ণয়, ১৮। তত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্—সদা সর্ব্ববিষয়ের তত্ত্ব ও জ্ঞানার্থ দর্শী হওয়া, এই অষ্টাদশ লক্ষণই পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ এবং এই সবের অভাবই অজ্ঞান।

আর্য্য-ঋষি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নামে আরও একরূপে, মানবের কর্ত্তব্যরূপ ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাতে যে মানবের মনুষ্যত্ব স্বার্থকতার কত দিকের বিষয় চিন্তাকরিয়া, কত মহান্ কল্যাণের সংবাদ দান করিয়া গিয়াছেন, বিচার করিয়া দেখিলে মোহিত না হইয়া উপায় নাই। মানবের বর্ণ বা পৃথক জাতিস্বরূপ বিভিন্ন কর্ম্মাধিকারের গণ্ডী অনেক প্রকার আছে। ১। প্রাণীবর্গমধ্যে মানবত্বরূপ বিশেষত্বের জ্ঞান ও শক্তির সন্ধান একটী বর্ণধর্ম্ম সংবাদ। ২। স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বরূপের প্রত্যেকের পৃথক কর্ম্মশক্তির সন্ধান একরূপ বর্ণ-ধর্ম্মের সংবাদ। ৩। পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, ভ্রাতৃত্ব, প্রভুত্ব, দাসত্ব, বন্ধুত্ব, পতিত্বরূপ সংসার-সম্বন্ধগত পৃথক কর্ম্মাধিকার ও বর্ণধর্ম্মের সংবাদ। ৪। এক সংসারের লোক, প্রতিবেশী, আত্মীয়, অনাত্মীয় জগতবাসী, ধর্ম্মপন্থী, রাজ-কর্ম্মচারীর প্রতি পৃথক কর্ত্তব্যজ্ঞানও একরূপ বর্ণ-ধর্ম্ম সংবাদ। ৫। প্রবৃত্তপন্থী—সংসারাশ্রমী ও নিবৃত্তপন্থী—সন্ন্যাসাশ্রমীর পৃথক কর্ম্মাধিকারের সন্ধানও এক বর্ণধর্ম্ম সংবাদ। ৬। সংসারী নরেও, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসকালের পৃথক কর্ত্তব্যের সন্ধানও এক বর্ণধর্ম্ম সংবাদ। ৭। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদিরূপে পৃথক পৃথক কুলাচারের সন্ধানও একরূপ বর্ণধর্ম্ম সংবাদ। পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে এই ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ না থাকিলেও, অন্যরূপে তাহা প্রচলিত আছে। ইউরোপে সকলেই এক খ্রীষ্টধর্ম্মী হইলেও ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান পোলাদি নামে, তাহাদের প্রত্যেক-দেশবাসীর ভিন্ন আচার ও

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রূপে ধর্ম্ম সংবাদ

সম্মানের পার্থক্যজ্ঞান বেশ প্রচলিত আছে। একদেশেও লর্ডপরিবার হীনপরিবার ইত্যাদি বিভেদ আছে। মোহম্মদীগণ মধ্যেও তুর্কী, কুর্দ্দ, পারসিক, আরব, বেদুয়িন. মোগল, পাঠান, জাকখেল, জাঠ ইত্যাদি, বিভেদরূপ পৃথকত্ব বেশ আছে, তাহাই এই কুলাচার গত বর্ণধর্ম্ম সংবাদ।

ঋষি এই সব প্রত্যেক বর্ণ ধর্ম্মকেই এমন পূর্ণ বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, এমনটী আর কোন দেশের শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না। ১। পশুত্ব স্বভাবের উপর মানবত্বের প্রকাশই মানবত্ব বর্ণধর্ম্মস্থাপন সংবাদ। ২। স্ত্রীপুরুষের কর্ম্মাধিকার বিভাগই নারী ও নরের বর্ণধর্ম্মনির্ণয়। ৩। পিতা কত প্রকার, দাস কত প্রকার, বন্ধু কত প্রকার, প্রভুত্বাদির বিষয়ে, ঋষি এত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের সেই বিষয়ে গবেষণা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন্ কালে কি প্রয়োজন পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়া, সময় মত না চাহিতে ইঙ্গিতেই দিতে যে পারে সেই উত্তম সেবক, যে চাহিলে দেয় সে মধ্যম, আর যে চাহিলে প্রস্তুত করিতে ধাবিত হয়, সে অধম সেবক। বন্ধু মধ্যে, কেহ নর্ম্মসখা—অকার্য্যেও সঙ্গী হয়, কেহ সুহৃদ—কেবল আনন্দের সঙ্গী, কেহ বান্ধব—বিপদেও সঙ্গ ছাড়ে না, কেহ বয়স্য—হাস্যামোদী, কেহ চেট্—দৌত্যকার্য্যে সহায় ইত্যাদি বিভেদ বর্ণিত হইয়াছে। দাম্পত্য জীবনে, নায়ক নায়িকা বিভেদ, বামা, দক্ষিণা, ধীরা, অধীরা আদি কত বিভেদ বর্ণিত হইয়াছে। ৪। উচ্চবর্ণকে পূজা কর, স্ববর্ণে সখ্যতা, হীনবর্ণে কৃপা, মিত্রকে প্রেম, শত্রুকে উপেক্ষা কর; রাজ কর্ম্মচারীর মর্য্যাদা রাখ এবং প্রাণীবর্গ মধ্যে ব্যাঘ্র, সর্পাদিকে ভয়কর, বর্ণমধ্যে ব্রাহ্মণকুল ও সর্ব্ববর্ণে ঈশ্বরপথী এবং পশুকুলে গোকে বিশেষভাবে দেখ ইত্যাদি জ্ঞানই চতুর্থ বর্ণধর্ম্ম সংবাদ।

৫। গৃহী ও সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্যে, গৃহীর নিরামিশ ভোজন, সন্ন্যাসীর একবেলা হবিষ্য ভোজন তুল্য, (হবিষ্যে একবারমাত্র সিদ্ধ-ভাত ভোজন,)

গৃহীর দিবসে একবার নিরামিষ ভোজন সন্ন্যাসীর ফলাহার তুল্য, গৃহীর ফলাহার, সন্ন্যাসীর উপবাসতুল্য। গৃহস্থ একপত্নী ব্রতধারী হইলে ব্রহ্মচারী তুল্য, গৃহীর মাতা পিতা সেবনই পরমধর্ম্ম, পিতা মাতা পরিত্যাগ মহাপাপ, পিতা মাতার সেবাবসরে গৃহী ঈশ্বরসাধন করিবে; আর সন্ন্যাসীর অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়, পিতামাতার দর্শনেই তাহার পাপ হয়, ঈশ্বর বিনা দ্বিতীয় বস্তুতে মনোনিবেশই অপরাধ। গৃহী সংসার জন্য প্রয়োজনে মিথ্যা বলিতে পারে, জীবহত্যা করিতে পারে, ঔষধার্থে মদ্যপান করিতে পারে, সন্ন্যাসীর প্রাণান্ত কালেও মদ্যপান, মিথ্যা ও প্রাণীহত্যার ব্যবস্থা নাই। এই সব জ্ঞানই এই দুই পথার বর্ণ-ধর্ম্ম জ্ঞান।

৬। আশ্রমের বর্ণধর্ম্ম—মানবের প্রথম জীবনের শিক্ষা-অধ্যায়ের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য, সকল মানবেরই সাধারণ পালনীয় বিষয় ছিল। তাহার পরে শিক্ষা সমাপনে, মানব গৃহস্থাশ্রম বা সন্ন্যাস একপথ গ্রহণ করিত। শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর দেহেন্দ্রিয় নিরোধ, ভোগত্যাগ, স্বাধীনতা-ত্যাগে শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য—বীর্য্যনিরোধ সহিত গুরু-শুশ্রূষা, গুরুতে নির্ভর, সুখে দুঃখে ঈশ্বরকে মনে রাখা, কষ্ট-সহন ইত্যাদি কর্ম্মের সংবাদই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বর্ণধর্ম্ম। গৃহাশ্রমীর কর্ত্তব্যকে ঋষি তিন ভাগে বিভাগ করতঃ, তাহাদের সেই তিন কালের কর্ম্মকেও নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাদের মহা কল্যাণেরপথ জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন। গৃহী প্রথমে সংসারকর্ম্ম ও নিজ-ভোগ-বিলাসে মনোনিবেশ রাখিয়া, সামান্যভাবে ঈশ্বর-সাধনা রক্ষা করিবে। দ্বিতীয়ে ঈশ্বর সাধনকে অধিক করিয়া, সামান্যভাবে সংসারযোগ ভোগাদি করিবে। পরে তৃতীয়ে, ভগবান বল পূর্ব্বক কাঁদাইয়া কাড়িয়া লইবার পূর্ব্বেই, নিজে বিষয়-সংসারকে ত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরের শরণ লইয়া, নির্জ্জন আশ্রম করিবে;

দুঃখময় মৃত্যুকে সুখময় মিলনের দূত বলিয়া গ্রহণ করিবে। এই তিন অবস্থার নামই গৃহস্থের গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংবাদ। ১। গার্হস্থ্যে—কুলধর্ম্ম-সাধন ঋণশোধ আদি সাধনকে মোক্ষ করিয়া, ত্রিসন্ধ্যাদি সামান্যভাবে শাশ্বতধর্ম্মরূপ ঈশ্বর-সাধন রক্ষা করিবে। ২। বানপ্রস্থে—বনপ্রস্থানের আয়োজন, বার্দ্ধক্যের আগমনে, সাধারণতঃ পঞ্চাশত বর্ষের পরেই, এই অবস্থা গ্রহণের নিয়ম ছিল, এই সময় পুত্রের উপর সংসার সঁপিয়া, সংসার-কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করতঃ ঈশ্বর সাধনকে অধিক ভাবে গ্রহণ করিয়া, সন্তান হইতেই সেবা ও ভোজনাদি গ্রহণ করিবে। ৩। সন্ন্যাসে—নিজকে সম্যকরূপে ঈশ্বরে ন্যস্ত করিয়া গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া কেবল ঈশ্বরেরই ধ্যানে নিযুক্ত হইবে।

ঋষির শাস্ত্র প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্যই মানবকে কল্যাণের সংবাদ দান করিবেন ; কি করিয়া মানব তাহার মানবত্ব সার্থক করিয়া, মায়াময় জীবত্বকে পরাজয় করতঃ, আত্মারাম, পরম সুখময় ভগবানকে লাভ করিয়া, চরম সুখাকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্তি করিবে, তাহার সন্ধান দান। প্রতি বর্ণরূপ পৃথক অহঙ্কারের বন্ধন ছেদনের সন্ধানই এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-সংবাদ। প্রতি বর্ণই যাহাতে জীবন সার্থক করিয়া সুখময়কে প্রাপ্ত হয়, বর্ণধর্ম্ম তাহারই সন্ধান। কৃষি করিতে এক এক রূপ ভূমির এক এক রূপ পাইট করিবার প্রয়োজন হয়। বন ভূমিকে অগ্নিদগ্ধ করিতে হয়, শুষ্ককে আর্দ্র-করিতে হয়, জলাভূমিকে শুকাইতে পারিলে বীজ বপণের উপযোগী হয় এবং তবে সেই বীজে যথোপযুক্ত ফল লাভ হয়। বর্ণ-ধর্ম্মও সেই মানব হৃদয় রূপ বিভিন্ন ভূমির বিভিন্ন প্রকার চাষের সন্ধান। প্রত্যেক হৃদয়েই যাতে ধর্ম্মজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, মুক্তিফল প্রসব করে তাহার সন্ধান বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি রূপে যে একটী বর্ণ ধর্ম্মের সংবাদ হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে এবং ভারতে প্রচলিত আছে; পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের শাস্ত্রেই তাহার উল্লেখ বা প্রচলন দেখা যায় না। পৃথিবীর আদিরাজা বিষ্ণুঅবতার পৃথু যখন দেবতা ও প্রজাপতিগণের সহায়তায় মানবগণকে জ্ঞান বিদ্যা ও ধর্ম্ম-দান করিয়া শৃঙ্খলিত করেন, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বিশুদ্ধ চারিবর্ণের মানবকে ভারতে স্থাপন করিয়া, মিশ্রিত বিকৃতস্বভাব বর্ণগণকে পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে, এক এক নামে, এক এক রূপ ভাষা ও ধর্ম্মজ্ঞান দান করিয়া স্থাপন করেন। তাই অন্যসব দেশে এই সব বর্ণভেদ নাই এবং তাহাদের শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ নাই। সেই জন্যই হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের এই জাতি বাদের মত, অনেক ধর্ম্মসাধনার সংবাদও তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত হয় নাই। একই দেহের বিভিন্ন অংশে, যেমন ভিন্ন কর্ম্ম ও জ্ঞানশক্তির বিকাশ হয়, অন্যস্থানে তাহা হয় না,—যেমন মস্তক বিনা জ্ঞান বিকাশ পায় না, হৃদয় বিনা ভাব জাগে না উদর বিনা অন্নাদি হজম হয় না, প্লীহা বিনা রক্ত জন্মেনা ইত্যাদি—এইরূপ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশেও ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন জ্ঞান শক্তির বিকাশ পায়, এই জন্যই ভিন্নদেশে ঈশ্বর জ্ঞানের প্রকাশও মানবের মুক্তিলাভেরও প্রকার ভেদ ঘটে। তাই ভারতবর্ষ বিনা সগুণ মূর্ত্তভাবে ভগবান দর্শনের আরাধনা জগতে আর কোথাও প্রকাশ নাই। হিন্দু-শাস্ত্রমতে আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ বিনা অন্যত্র ভগবান ও দেবতাগণ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইতে পারেন না। তাই জগত ভরিয়াই নির্গুণ নিরাকার উপাসনা। ভগবানকে দর্শন করা যায় এমন কথা, এমন সাধনা আর কোনও দেশের শাস্ত্রে নাই। ভগবৎকৃপা লাভ হয়, তাহাই সে সব সাধনার চরম লাভ। ভগবান উদ্দেশে দত্ত খাদ্যাদি ভগবান কৃপা করিয়া স্বীকার করেন, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস; কিন্তু হিন্দু জানে, পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস

রাখিয়া ভক্তির সহিত পবিত্রদ্রব্য দিতে পারিলে, ভগবান্ জড় দ্রব্যও ভোজন করেন ; মানব তাহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিতে পারে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ গী ৯—২৬

ভারত যে বেদ-প্রকাশ-স্থান, আদি প্রজাপ্রতিগণের জন্মস্থান, সেই প্রজাপতি ও দেবতাগণের তপঃসিদ্ধির স্থান ; কোটী কোটী ঋষি এই দেশে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ভগবান্ বহুবার অবতাররূপে এই ভারতেই প্রকাশিত হইয়াছেন, তাইত হিন্দু-শাস্ত্রমতে পৃথিবীতে এই ভারতই মাত্র জীবের মুক্তিক্ষেত্র—স্বর্গ হইতেও জীবের মঙ্গলকর মহাস্থান ধর্ম্মক্ষেত্র। তাই ভারতের জ্ঞান-সাধনা বর্ণাদির বিভাগ জগতে আর কোথায়ও নাই বলিয়া, এইগুলি তাহাদের নিন্দা বা হীনতার কথা নহে।

হিন্দুর বেদ-সংহিতা, স্মৃতি পুরাণাদি প্রতিশাস্ত্রেই বর্ণিত আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্ররূপ চারি স্বভাবের, চারি জাতীয় মানবকে, ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভেই সৃজন করেন। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ দুইস্থানে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। গীঃ ৪—১৩

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ গীঃ—১৮—৪১

"গুণ ও কর্ম্মের বিভাগে ক্রমশঃ চারিবর্ণ আমারই সৃষ্ট॥ হে পরন্তপ অর্জ্জুন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের পৃথক গুণ ও কর্ম্মভাব স্বভাব হইতেই পৃথকরূপে ব্যক্ত হইয়া উঠে।" ব্রাহ্মণত্ব—বিষয় ছাড়িয়া শুধু ঈশ্বরে মতি, ক্ষত্রিয়ত্ব—দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন জগত সেবা-মতি,বৈশ্যত্ব—ব্যবসা করিয়া লোকেরও আহার বিহারের সুবিধা, নিজেরও ধন সম্পদ

সুখলাভ-মতি, শূদ্রত্ব—পরদাসত্ব হইতেই যদি নিজের ও নিজপত্নী পুত্রের ভোগ বিলাস চলিয়া যায়, তবে আর অন্য প্রকার কর্ম্ম চেষ্টায় কি কাজ? সমাজ, দেশ, ভগবানকে ফেলিয়া, এই হীনভাবে জীবন-যাপন-প্রবৃত্তিই শূদ্রত্ব। মানবের এই চতুর্ব্বিধ প্রকৃতি যে স্বাভাবিক ভগবানদত্ত স্বভাব, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভাগবতগীতায় নবম অধ্যায়ে ঈশ্বর-বিমুখী ত্রিবিধ আসুরী-প্রকৃতি ও ঈশ্বর-অভিমুখী দৈব-প্রকৃতি বলিয়া মানবের যে চতুর্ব্বিধ প্রকৃতির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে, তাহাই এই চারিবর্ণ। তমোগুণ প্রধান মোঘ আশা-প্রকৃতিই শূদ্রত্ব, রজোগুণ প্রধান মোঘকর্ম্মা-প্রকৃতিই বৈশ্যত্ব, রজো-আবরিত সত্বগুণীয় মোঘজ্ঞানা-প্রকৃতিই ক্ষত্রিয়ত্ব এবং শুদ্ধসত্বগুণীয় দৈবপ্রকৃতিই ব্রাহ্মণত্ব স্বভাব।

বর্ণগুলিকে পৃথকভাবে রক্ষা করিতে পারিলে, তাহদের ধর্ম্মনির্ণয় ও সাধন-পথ প্রদর্শন অতি সহজে করা যায় এবং তাহা দ্বারা জগতের ও মানব জাতিরও নানাদিকে সুখশান্তির বর্দ্ধন করা যায়। তাই ঋষি ভারতে এই জাতি বিভাগকে রক্ষারজন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। মূল চারিবর্ণ মিলিয়া আরও অনেক বর্ণের সৃজন হইলেও, প্রত্যেকের ঋষি পৃথক বর্ণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেকের সেইকর্ম্ম নির্দ্দেশ তাহাদের অসাধারণ চিন্তা ও জ্ঞানের নিদর্শন। যেমন, অম্বষ্ঠ-জাতি ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিল। তাই পিতৃগুণে আত্মায় ব্রাহ্মণ-ভাব ও মাতৃগুণে দেহে ও মনে বৈশ্যভাব রহিয়া গেল। তাই তাহাকে চিকিৎসাকর্ম্ম দান করিয়া বলিয়া দিলেন, চিকিৎসকের চিকিৎসাই ধর্ম্ম, তাহা বিক্রয় করিলে ধর্ম্মই বিক্রয় হয়, তাই তুমি চিকিৎসা বিক্রয় করিও না, লোক-সেবা ভাবে পীড়িতের চিকিৎসা করিও। এই টুকু ব্রাহ্মণ ভাবের পোষণ দেওয়া

বর্ণের পৃথকত্ব রক্ষার গুণ

হইল। পরে বৈশ্যভাবের পোষণ জন্য, গৃহস্থ-কর্ত্তব্যে নির্দ্দেশিত হইল, চিকিৎসক, সাধু ও দেবতাকে কখনও রিক্তহস্তে দর্শন করিবে না। চিকিৎসক দেহকে আরোগ্যদান করিলে, সে দেহের কর্ম্মফলভাগী চিকিৎসা হয়। তাই চিকিৎসককে তুষ্ট করিয়া, দেহকে কিনিয়া না লইলে, সে দেহের পুণ্য ফলভাগীও চিকিৎসক হয়। এইজন্যই পূর্ব্বে আরোগ্য করিতে পারিলে, আরোগ্যস্নান কালে চিকিৎসককে অন্ন বস্ত্রাদিসহ অর্থ দানের ব্যবস্থাছিল, ঔষধের মূল্য দান ছিলনা। ইহাতে তাহার বৈশ্যত্বের পোষণ হইত এবং আত্মচেষ্টায় অর্থার্জ্জন নাই বলিয়া, ক্রমে তাহার অর্থ-কামনা নষ্ট হইয়া, পূর্ণব্রাহ্মণত্বই জাগিয়া উঠিত। এমনই মঙ্গল চিন্তা বর্ণ-ধর্ম্ম নির্দ্দেশে নিহিত আছে।

গুণমত কর্ম্ম-বিভাগের সুবিধাজন্যও এই বর্ণধর্ম্ম রক্ষায় মানবজাতির অশেষ মঙ্গল সাধন করিত। প্রহরীকর্ম্ম ক্ষত্রিয়-স্বভাবের মানবের উপর পড়িলেই, ঠিকমতে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়; ব্রাহ্মণ-স্বভাব কৃপাপরবশ হইয়া, চোরকে ছাড়িয়া দিবে; বৈশ্যস্বভাব চোরের সঙ্গে ভাগের ব্যবসা জুড়িবে আর শূদ্রস্বভাব শ্রম ও জাগরণে অশক্ত হইয়া নিদ্রালস্যে কর্ম্ম পণ্ড করিবে, অথচ মিথ্যাচার বা পদ-সেবাদির গুণে কর্ম্ম বজায় রাখিবে। এই গুণমতে কর্ম্মবিভাগ জন্যও ঋষি এই গুলিকে পৃথক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গুণে কর্ম্ম-বিভাগ নষ্ট হইয়াই হিন্দুসভ্য-তার পতন হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানেও কর্ম্মরাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইয়াছে। তাই বর্ত্তমানে কর্ম্মের উপযোগী লোকের বড়ই অভাব হয়, অনেক কর্ম্মেই মনোমত লোক মিলেনা। যদি বলেন, এক বর্ণে কেবল সেই স্বভাবের লোকই জন্মিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কচিৎ তাহার ব্যত্যয় হয়বটে, কিন্তু একই পাখীর কতটী শাবক ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ও শিক্ষায় যেমন ভিন্নভাষা ও ভিন্নস্বভাব লাভ করে, একসঙ্গে একরূপই

হয় তেমন মানব-শিশু মাতাপিতার ও শৈশবের সঙ্গগুণে সেই বর্ণের স্বভাবশালী হইবারই কথা। তাই পূর্ব্বে এক এক বর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক স্থানে বাস করিবার নিয়ম ছিল। আজকাল নানা জাতীয় লোকের একত্র বাসে, সকল বর্ণেরই বর্ণধর্ম্ম নষ্ট পাইয়া যাইতেছে। বহু শূদ্রমধ্যে এক ব্রাহ্মণ-শিশু জন্মিয়া আহার বিহার সঙ্গ প্রভাবে শূদ্র-তুল্য গুণ ও স্বভাবশালী হইয়া যাইতেছে, সে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মধ্যে থাকিলে ব্রাহ্মণই হইত।

একটী বৃহৎব্যপারে, অনেকমানব মিলিয়া যদি প্রত্যেকে এক এক দিকের কর্ম্মভার নির্দ্দিষ্ট করিয়া নেয়, তবে যেমন সেই কর্ম্ম অতি সহজে, সুশৃঙ্খলায় ও সুখে সম্পাদিত হয়, ঋষি মানবের সর্ব্বপ্রয়োজনকে তেমনি বিভাগ করিয়া মানবকে নানা জাতিতে বিভাগ করতঃ পৃথক পৃথক কর্ম্মভার দিয়া, মানব জাতির সংসার-যাত্রাকে সহজ শৃঙ্খলাময় ও সুখ শান্তির আগার করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই কর্ম্মবিভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকায়, ভারতে কখনও বর্ত্তমানের মত বেকার-সমস্যা ও কর্ম্মপ্রতিযোগিতার দারুণ-যুদ্ধ উপস্থিত হয়নাই; কর্ম্ম বিভাগিত থাকায় বর্ত্তমানের মত এত লোক কর্ম্মহীন হইয়া কর্ম্ম-চেষ্টায় নানাদিকে ধাবিত হয় নাই। আর আজ যেমন একটী কর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণ হইতে সর্ব্ববর্ণের লোক স্ত্রী ও পুরুষে সহস্রাধিক প্রার্থী হইয়া ধাবিত হয় এবং পশুপালের আহারজন্য প্রতিযোগিতার-যুদ্ধের মত, পরস্পারে আপনজন ভ্রাতাদির সঙ্গেও বিরোধে মত্তহয়, হীন উপায়েও তাহা গ্রহণের চেষ্টাকরে, এইরূপ মানবত্ব বিসর্জ্জন দিয়াও মানব চাকরী গ্রহণের চেষ্টায় ব্রতী হয় নাই; আর একজন চাকরী পাইলে, তাহাকে অভিশাপ করিতে করিতে, নবশত-নবনতি-জন দুঃখ পাইয়া ফিরিতও না। ভারতের সকলেই কর্ম্ম বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ লাভ করিত, তাই কখনও ভারতে অর্থ-সমস্যারও উদয় হয় নাই; সামান্যঅর্থে লোক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

এই আদান প্রদান প্রচলনে, প্রত্যেক মানব প্রত্যেক মানবের সঙ্গে প্রীতিরবন্ধনে বদ্ধ ছিল। পিতা মাতা ভ্রাতাদি আত্মীয় ভরণকে কেহ অনাবশ্যক পরসেবাভার বলিয়া মনে করিত না। আইন করিয়া পুলিস-বলে ভিখারী দরিদ্র তাড়াইতে মহত্ত্ব বোধ করিত না; নিজে না খাইয়াও পরকে খাওয়াইতে আনন্দ পাইত। রুগ্ন আত্মীয় ও দাসাদিকে শুশ্রূষার জন্য হস্পিটাল বা সেবাশ্রমে পাঠাইয়া, নিজের সুখশান্তির ব্যাঘাত দূর করিত না। এমনকি দোষের বিচারজন্য বিচারালয়ের ও মাহিনাকরা-বিচারক রাখা, শাস্তিরজন্য কারাগারের ও প্রহরীরও প্রয়োজন ছিল না। শাস্ত্র-বাক্যই বিচারক ছিল, দোষ দেখাইয়া শাস্ত্র-ব্যবস্থা বলিলে, মানব দোষের জন্য প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণ করিত—তপ্তঘৃত-পান, এমনকি সর্ব্বঅঙ্গে ঘৃতসিক্ত দাহপদার্থ লেপিয়া, অগ্নি জ্বালাইয়া তুষানলে প্রাণাহুতি দিত। সেকালের লোক দণ্ডকে শাস্তি না বলিয়া, পাপনাশক পরকালের যাতনানিবারক, পবিত্রকারী, প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ঋষি-ব্যবস্থা জানিত। ঋষিও ভ্রমবশে অপরাধ করিলে, রাজার নিকট যাইয়া তাহা বলিয়া শাস্তি গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইত। রাজাও অপরাধী হইলে, শাস্ত্র বচনে সিংহাসন ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখাযায় দেবগণও পাপ করিয়া শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের অশ্বমেধ করেন, শ্রীরাম রাবনের মত আততায়ী শত্রুবধ করিয়াও, ব্রহ্মহত্যা বলিয়া রামেশ্বর শিব স্থাপনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়াও মাতুল হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন, যুধিষ্ঠীর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে অশ্বমেধ করিয়া জ্ঞাতি ও গুরুহত্যাদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন।

হস্ত, পদ, অঙ্গুলী, মস্তক, ইন্দ্রিয়বর্গ মিলাইয়া এক দেহ গঠনের মত, পৃথক পৃথক বর্ণ-সমষ্টি দ্বারা এক হিন্দুসমাজ গঠিত হইয়াছিল। ইহার

একজনকে পরিত্যাগ মানবের অঙ্গচ্ছেদন তুল্যই অপরাধ মনে করিত। দেহের মস্তকাদি শ্রেষ্ঠঅঙ্গ হইলেও, হীন গুহ্যস্থান, হাতের সামান্য বৃদ্ধাঙ্গুলীটি না থাকিলেও যেমন, মানব হীনাঙ্গ, সমস্ত-কর্ম্ম সম্পাদনে অশক্ত হয়, তেমন বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব থাকিলেও সকলেরই বিদ্যমানতা প্রয়োজন, এই কথা হিন্দু সকলেই জানিত। তাই পরাস্পরে হিংসাভাব ছিল না; ছোট বড় ভাবও ছিল না। শ্রেষ্ঠবর্ণের জ্ঞানময় বিশুদ্ধাচারের নিকট, হীনবর্ণ অজ্ঞতা ও হীনাচার লইয়া স্বভাবেই সঙ্কোচিত থাকিত, শ্রেষ্ঠের সম্মান করিত। আজ সকলবর্ণই শুদ্ধাচারহীন বলিয়াই, হীনবর্ণ এখন শ্রেষ্ঠের সম্মান দিতে চাহিতেছে না। তাতে প্রত্যেকবর্ণ প্রত্যেকবর্ণের বৃত্তি-অপহারী হইয়া, আর প্রতিযোগিতার যুদ্ধে ব্রতী বলিয়া, এখন স্বার্থ নাশে প্রতি বর্ণের পরস্পরে সত্যই শত্রুভাব হিংসাদ্বেষই জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই এখন কেহই কাহাকে শ্রেষ্ঠের সম্মানদিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু শুদ্ধাচারের নিকট হীনাচারীর স্বভাবেই নত হওয়ার ভাব, আজও নষ্ট হয় নাই। তাই হীনবর্ণের শুদ্ধাচারীকেও অনাচারী শ্রেষ্ঠবর্ণের লোক, সাধু বলিয়া সম্মান না করিয়া পারে না। প্রত্যেকবর্ণ যার যার বর্ণাচার গ্রহণ করিলে এই বর্ণদ্বেষ, ছুৎমার্গ আর থাকে না। বর্ণ ধর্ম্মের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে ও বর্ণবিকাশ অধ্যায়ে আরও আলোচিত হইবে। তাহাতে দেখিতে পাইবেন, ঐ জাতিগত বর্ণ-ধর্ম্মাচারকেও ঋষি কত কল্যাণ মাখিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। এই ধর্ম্মও অসম্প্রদায়ী সমস্ত মানবের পালনীয় সত্য-ধর্ম্ম সংবাদ।

মানবের স্বার্থ-অন্বেষণের দিকদিয়া, ঋষি আরও একপ্রকারে মানবত্বের সার্থকতা রূপ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার নাম চতুবর্গ সাধনা-পথ। মানব চায় কি? দেহেন্দ্রিয়ে চায় **অর্থ,** অর্থাৎ ধন, সম্পদ, প্রভুত্ব, পরের সেবা, জনাধিপত্য, প্রাসাদ, শয্যা, ভোজনাদি দ্রব্যময়-সুখ। মন চায় **কাম,** ইন্দ্রিয়

চতুর্বর্গভাবে ধর্ম্ম নির্ণয়।

প্রবৃত্তির বাসনাপূরণ। মলিনআত্মা চায় ধর্ম্ম, সৎকর্ম্মের যশ, মান, কৃতিত্ব, ব্রত, যজ্ঞ, দান, তীর্থ, দেশহিতকর, জনহিতকর কর্ম্মাদি, আর শুদ্ধ আত্মা চায় মোক্ষ, জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন ছেদন, জীবত্বের নাশ, প্রাণেশ্বর ভগবানের সঙ্গে মিলন। মানব-জীবন এই চারিপ্রকারের প্রার্থীতকামনার পূরণ দ্বারা সার্থক হয়। তাই এই চারিটীকে লাভ করিবার উপায় জানাই মানবের শিক্ষার সার্থকতা। তাই পূর্ব্বে গুরু এই চারিকে ভাল করিয়া চিনাইয়া, তাহা লাভের কত পন্থা, তাহার প্রত্যেকটী শিক্ষাদিয়া শিক্ষা শেষ করিতেন। ইহার অর্থ, কাম ও ধর্ম্ম লাভ, বিষয়-রাজ্যের সংগ্রহের দ্রব্য, আর মোক্ষ, বিষয়ের অতীত ভগবৎ-রাজ্যের ব্যপার। তাই প্রথম তিনটী প্রবৃত্তিরাজ্য সংসারে থাকিয়া ভোগ করিতে হয়, আর মোক্ষলাভার্থীর সব ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি-পথে যার যার মোক্ষ, একাই অর্জ্জন করিতে হয়। নিবৃত্তপথী সন্ন্যাসীই কেবল মোক্ষ পান তাহা নহে! প্রবৃত্ত-পথীও যখন সন্ন্যাসীর মত সর্ব্ববিষয়ে বিরক্ত হইয়া একমাত্র ঈশ্বরের আশ্রয় নেয়—সং+ন্যাস=সম্যকরূপে তাহাতে সকল ন্যস্ত করে, তখন মোক্ষ অর্থাৎ জীবত্ব-মুক্তি লাভ করে।

অর্থ ও কাম হইতে ধর্ম্ম অনেক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হইলেও, কেবল সেই সব সৎকর্ম্মদ্বারাও, ঈশ্বর-গুরু-ভক্তিরূপ মোক্ষসাধনা বিনা মুক্তি লাভ হয় না। ধর্ম্মের সৎকর্ম্ম ফলে, এইজন্মে সংসার-সুখ, বিপদ, রোগ ও দুর্ভাগ্য-নাশ ও পর জন্মে শ্রেষ্ঠকুলে, ধনবানাদির গৃহে, রূপবান, গুণবান, জ্ঞানবান, ধনবান হইয়া জন্ম, স্বর্গভোগ দেবত্বাদি পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। অর্থ ও কাম লাভের সাধারণতঃ চারিটী পন্থা; একটী সাম—সমতা, সাধারণ চেষ্টায় লাভ। দান—কিছু দিয়া প্রার্থীত গ্রহণ। ভেদ—বাধাকারীদের মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া প্রার্থীত পূরণ। দণ্ড—দারুণ চেষ্টার-যুদ্ধে বধ করিয়াও প্রার্থীত পূরণ।

অপর লোক হইতে স্বার্থ সাধন করিতে কে সমতার পাত্র, কে দানের, কে ভেদের ও কে দণ্ডেরপাত্র সে বিষয়ের জ্ঞান ও প্রয়োগের কৌশল কায়, মন ও বাক্যকে শিক্ষাদানের প্রয়োজন; পূর্ব্বে গুরুগণ যুবক যুবতিগণকে ব্যবহার করাইয়া এই চারি উপায় শিক্ষাদিয়া শিক্ষা সমাপন করিতেন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহার প্রয়োজনীয়তাও কেহ জানে না।

কর্ম্ম-কৌশলে শ্রেণী ভেদ

কেবল অপরজনই নহে, আপনজন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী ও সন্তানাদি হইতেও এই সাম দানাদি চারি প্রকারে, স্বার্থরূপ অভীষ্ট উদ্ধার করিতে হয়। এমনকি সন্তানাদিকে মানুষ করিতেও এই চারি কৌশলের প্রয়োজন পড়ে। কখন সমতা অর্থাৎ বন্ধুত্ব স্থাপনে, মনের কথা জানিয়া বুঝাইয়া সৎপথে আনিতে হয়, কখন দান—নানা দ্রব্য অর্থাদি দানে বাধ্য করিয়া, কখন বা ভেদ—তাহার কুসঙ্গীগণের মধ্যে ভেদ লাগাইয়া তাহাকে আয়ত্ব করিতে হয়, আবার কোথায়বা দণ্ডরূপ—শাসন ক্লেশদান দ্বারা বশীভূত করিতে হয়; তাই প্রত্যেক কর্ম্মেরই এই চারিকৌশল শিক্ষাকরা প্রত্যে মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য।

ঋষি প্রত্যেকটী কর্ম্মবিধান প্রণয়নে, পূর্ব্বোক্ত মানবত্ব সার্থকতার ঋণশোধ, জাতিকুলাদি-সাধন, চতুবর্গসাধন, বর্ণাশ্রমসাধন যাহাতে পূরণ হয়, তাহা মিশাইয়া কর্ম্মবিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এইজন্যই তাঁহাদের বিধানের প্রত্যেক কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সকলে বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হয় না। যেমন বিবাহব্যপার,

কর্ম্ম বিধানে ঋষি-চিন্তা

অন্যান্য সমাজে তাহাকে আনন্দোৎসব মাত্র নির্ণয়ে, প্রিয়সম্মিলন, প্রীতি-ভোজনাদি দ্বারাই ইহা সম্পাদিত হয়। কিন্তু হিন্দুর বিবাহ এক বিরাট ব্যপার। তাহাতে পাত্র পাত্রীর কতরূপ সংস্কার, কত ব্রত উপবাস, তাহাদের পিতা মাতার কত দেব-আরাধনা, পিতৃশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন,

জ্ঞাতি দরিদ্র-ভোজন, গুরুপূজা, সম্প্রদান, গোত্রান্ত, যজ্ঞ ইত্যাদি ও কতদিন ব্যাপী স্ত্রী-আচার, নানা ক্রিয়া, এই সমস্ত গুলিই মানবত্ব সার্থকতার— ঋণ শোধাদি সাধনার সমস্ত কর্ম্ম-সম্পাদন, একটীও নিরর্থক বা বৃথা কর্ম্ম নয়। এই সব ক্রিয়ার যোগ না থাকিলে, বিবাহ একটী তামাসা অর্থাৎ তামসকর্ম্ম পশু পাখীর ভোজনানন্দ মাত্র হইয়া পড়ে।

দেবঋণ শোধজন্য বিবাহে দেবপূজা; পিতৃঋণ শোধে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; ঋষিঋণে—তাহাদের ব্যবস্থিত বিধানে ও মন্ত্রে বিবাহ সমাপন, নৃঋণে—ভূস্বামীকে দান, ভূতঋণে—গ্রামের মানব ও পশু পাখীকে আনন্দ ও ভোজনদান, আত্মঋণে—দশজন লইয়া আনন্দোৎসব ও যশ কীর্তিত্ব লাভ। আবার জাতিধর্ম্ম-পোষণে অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীকে দান, কুলধর্ম্মে—স্বর্ণ জ্ঞাতি আদির সেবা, শাশ্বতধর্ম্মে—ব্রত, উপবাস, দেবআরাধনা, ঈশ্বরপথী ব্রাহ্মণ ভক্তাদির সেবা। বর্ণাশ্রম পোষণে বাদ্যকর, ভূঁইমালী, ফুলমালী নাপিত, ধোপা হইতে ব্রাহ্মণপর্য্যন্ত পৃথক পৃথক বর্ণের সেবা ও তাহা-দিগকে দান। চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্মজন্য—দান দেবপূজাদি, অর্থজন্য—আনন্দ তৃপ্তি উৎসব, যশলাভ ও আত্মীয় হইতে শিয়লীরূপ অর্থলাভ, কামজন্য—উত্তম ভোজন গীতনৃত্যাদি, আর মোক্ষজন্য—বিষ্ণুকে কর্ম্মসমর্পণ। এইরূপ, ব্রত, তীর্থ, শ্রাদ্ধাদি সর্ব্বকর্ম্মেই ঋষি এই সমস্তের সার্থকতা মিলাইয়া কর্ম্মবিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানব প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলে ইহার একটীকেও ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

ঋষিমতে প্রকৃতমানব, সর্ব্বদা দেহের জীবভাবকে নিগ্রহ করিয়া, ত্যাগ, দয়া ভালবাসা মাখা পরোপকার ও পর-সেবাময় কর্ম্ম করিবে। কিন্তু দেহের গুণ-প্রাধান্যরূপ প্রকৃতির বিভেদে সমস্ত মানবই তাহা পূর্ণরূপে সম্পাদনে সক্ষম হয় না। কেবল সত্ত্বগুণ প্রধান মানবই মাত্র তেমন ভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়। রজোগুণ প্রধান কর্ম্ম করিতেই

কিছু লাভের ফলসন্ধান না মিশাইয়া পারিবে না, আর তামস ব্যক্তির আত্মসুখ বিনা পরের সেবায় মতি আসেই না, কখনও পরের যশে ঈর্ষান্বিত হইয়া, অজ্ঞানতা ও অশ্রদ্ধা লইয়া, দর্পভরে সেইসব কর্ম্মের চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা দান ও পরোপকারের নামে কর্ম্মে ও বাক্যে অপরকে অপমান ও ব্যথাই দান করিয়া বসে। তবু দান করে বলিয়া ইহারাও তৃতীয়-শ্রেণীর কর্ম্মকর্ত্তা; আর যাহারা মোটেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, পরোপকার, দান, দয়া বর্জ্জিত কর্ম্মরত হয় তাহাদের কর্ম্ম মানবের কর্ম্মই নয়। তাহাদের কৃত-কর্ম্ম পশুকর্ম্ম ও তাহাদের কর্ম্মোৎসব পশুপাখীর মৃতদেহ ভোজনোৎসব মাত্র। এই কর্ম্মকর্ত্তা বিভেদ গীতায় ১৭শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছেন।

কর্ম্মকর্ত্তা বিভেদ

ঋষি কর্ম্মশক্তির অপব্যবহার রূপে আরও এক প্রকারে মানব-কর্ত্তব্য রূপ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানব তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, শক্তি, ধন, সম্পদাদির যাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অপব্যবহার না করিলেই মানবত্ব সার্থক হইল। আরবে মোহম্মদী সাধকগণ মধ্যেও এই তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। তেজকর আউলীয়ায় লিখিত আছে, ইস্লামের গৌরবের যুগে একবার হজ যাত্রায় চারিশত জন ইস্লাম-আচার্য্য সশিষ্য একত্রিত হইয়া, তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তখন মানব কিরূপে ঈশ্বরের নিকট যথার্থরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে, এই প্রশ্নের আলোচনায় কেহ নাম জপ, কেহ ধ্যান, কেহ স্তব, কেহ দান ইত্যাদি বলিলেন, কিন্তু সে সব কথা সকলের মনোগত হইতেছিল না। তখন আচার্য্যের আদেশে, জুনিদ বগদাদী নামক ষোড়শ বর্ষীয় বালকশিষ্য দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ঈশ্বর দত্ত সম্পদকে পাপের মূল্যে বিক্রয় না করিলেই বুঝি

সেবাকর্ম্মের প্রকার-ভেদ

প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়।" এই পাপের মূল্যই অপব্যবহার"। এই বাক্যকে সমবেত সমস্ত আচার্য্যই একবাক্যে সমর্থন করিয়া, সেই বালককে আশীর্ব্বাদ করেন। এই বালক পরে একজন শ্রেষ্ঠ ইস্লামাচার্য্য পীর বলিয়া স্বীকৃত হন। ইস্লাম মতে পয়গম্বর প্রেরিত-পুরুষ ও পীর ধর্ম্মের আদর্শ-পুরুষ শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ও সংস্কারক। ( তাপসমালা )

মানব দেহেন্দ্রিয়াদিকে পরোপকারের জন্য পরসেবায় ব্যবহার করিতে পারিলেই তাহাদের যথার্থ ব্যবহার হইল, আর এই সবকে পরের অপকার, পর-পীড়ায় ব্যবহার করিলেই অপব্যবহার হইল। এই তত্ত্ব হইতেই হিন্দুর মঠ প্রতিষ্ঠা, জলাশয়, পথ ও পোলাদি প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পূণ্য কর্ম্মের সৃজন হইয়াছে। প্রাসাদ-নির্ম্মাণের কৃতার্থতা, যদি দেব-আয়তন, বিদ্যালয় বা অতিথিশালা নির্ম্মিত হয়। জলাশয় খননের কৃতার্থতা যদি সাধারণে জল ব্যবহারের অধিকার পায়, বৃক্ষরোপণের কৃতার্থতা যদি দশের উপকারে তাহার ব্যবহার হয়, বিদ্যার কৃতার্থতা যদি অপরের অজ্ঞতা না হয়। অর্থের কৃতার্থতা যদি পরের উপকার হয়—দশের গমনাগমনের পথ বা পোল নির্ম্মাণ জন্য ও তাহাদের ক্ষুধা পিপাসা মিটাইতে ব্যয় হয়! হিন্দু প্রতিষ্ঠারূপ ক্রিয়া করিয়া, দশজনকে তাহার ফলভোগ অধিকার দান করিতেন। এই দান প্রতিষ্ঠা না হইলে সেই জলাশয়, বৃক্ষ ও মঠাদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়, তাই অন্যে ব্যবহার করিলে সে পরদ্রব্য হরণের অপরাধী। এই জন্যই অপ্রতিষ্ঠিত জলাশয়ের জলে, স্নান ও তর্পণাদি দেব-কর্ম্ম বিফল ও অপরাধজনক বলিয়া হিন্দু-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

এই সদ্‌ব্যবহার ও অপব্যবহার হইতেই, মানব নিজের জীবনের সুখদুঃখ গঠন করিয়া জগতে বিচরণ করে। পদের অপব্যবহারে পদদুঃখী, চক্ষের অপব্যবহারে অন্ধ বা টেরা ইত্যাদি চক্ষু দুঃখী,

পিতা মাতার প্রতি অপব্যবহারে পিতৃ মাতৃ দুঃখী ও সন্তান দুঃখী, পত্নীকে কষ্ট দিয়া পত্নীদুঃখী, ধনের অপব্যবহারে দরিদ্র ইত্যাদি হয়। এই কর্ম্মজগতে কর্ম্মের দান দ্বারাই মানব পরজন্মে নিজের প্রাপ্তি নির্দ্দেশ করিয়া যায়। তাই হিন্দুঋষি এই দান-অধ্যায় লইয়া অধিক গবেষণা করিয়াছেন। গীতায়ও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বলিয়া ত্রিবিধ দানের বিভাগ করিয়াছেন। (গীতা সপ্তদশ অধ্যায়।) পুরাণে তাহার আরও অনেক বিস্তার পাওয়া যায়। ঋষিমতে দান প্রধানতঃ তিন প্রকার, দান, দয়া ও মমতা। প্রকৃত দান—ঈশ্বর উদ্দেশে বা ঈশ্বর-সম্বন্ধে তাহার উপাসক ও ভক্তগণকে দান; এই দানে মানব সহস্র গুণ ফল লাভ করে, ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হয়। তার পরে দয়া-দান। পরোপকার জন্য, দুঃখীর দুঃখ দূরজন্য যে প্রতিদানের সম্বন্ধ না রাখিয়া দান তাহাই দয়া-দান। আর আপন সম্বন্ধিত আত্মীয়গণকে ভালবাসিয়া যে দান তাহাই মমতা-দান। হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যে ঋষি এই ত্রিবিধ দান-মাখিয়া বিধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, পূজা, তীর্থকর্ম্ম হইতে, নূতন ফলাদি-ভোজন, নূতন চাউলের অন্ন-ভোজনে পর্য্যন্ত এই ত্রিবিধ দান ব্যবস্থা ছিল। দেবমন্দিরে, সাধুসন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকে দানই দান, দীন দুঃখীকে দান দয়াদান, আর আত্মীয়কে দানই মমতাদান। এই তিন স্থানে দ্রব্য দান করিয়া হিন্দু নিজে দ্রব্য ব্যবহার করিত। আধুনিক শিক্ষায় কবল দীন দুঃখীকে দানেই দানের সার্থকতা মনে করেন।

দান অর্থই পরোপকার—গীতায় সেই পরোপকারকে তিন গুণে ত্রিবিধ নির্ণয় করিয়াছেন। গীতা ১৭ অঃ ২০।২১।২২ শ্লোক।

১। দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে হনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০

২। যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১

৩। আদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামস মুদাহৃতম্ ॥২২

অনুপকারী অর্থাৎ কোন প্রকার স্বার্থ সম্বন্ধহীন ব্যক্তিকে দেশ, কাল, পাত্র নির্ণয়ে যে দান তাহাই সাত্বিক-দান। দেশ—প্রার্থীর যাহা প্রয়োজন নির্ণয় করিয়া তাহাই দান করিবে, ক্ষুধাতুরকে অন্নই দিবে, বস্ত্র বা অর্থাদি দিবে না। কাল—ক্ষুধার কালে না দিয়া, বসাইয়া রাখিয়া পরে না দেওয়া। পাত্র—সে বৃদ্ধ কি বালক, সুস্থ না রুগ্ন, ধনী না দরিদ্র নির্ণয় করিয়া, তার উপযোগী দান করিবে। রুগ্নকে অন্নদিয়া বধেরভাগী হইবে না, ধনীকে দীনেরখাদ্য ও দীনকে ধনীরখাদ্য দিয়াও তাহার রোগের কারণ হইবে না। এমন ভাবে আত্মপর বিচারহীন হইয়া, আনন্দে ও ভালবাসার সহিত প্রার্থীর যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা রাখিয়া যে দান, তাহাই পূর্ণমানবের সাত্বিক-দান। ভবিষ্যৎ উপকারাদির আশাবন্ধন সহিত, অর্থদানে ক্লেশবোধ করিয়াও যে, দেশ, কাল, পাত্র নির্ণয়ে দান, তাহাই মধ্যম-মানবের রাজস-দান। আর দেশ, কাল পাত্র বিচারহীন, অবজ্ঞার সহিত গৃহীতাকে সৎকার, স্নেহ বা সম্মান না দেখাইয়া যে দান, তাহাই অধম-মানবের তামস-দান। পুরাণে এই তামস দানেরও প্রকার-ভেদ বর্ণিত আছে। ১। দর্পদান—আমি দানে সক্ষম, কৃপণ নহি, দরিদ্র নহি, এই দর্পেরভাব লইয়া, গৃহীতাকে হীনবোধে তাহাকে মর্য্যাদা না দিয়া, বাক্যে ও ব্যবহারে প্রাণে ব্যথা দিয়া যে দান বা উপকার করা তাহাই দর্প-দান। ২। লজ্জাদান—অপরে দিলেন, আমার না দেওয়া লজ্জার কথা হয় বলিয়া, লজ্জা রাখিতে যে দান, অথবা

পরে এই ভিক্ষার কথা বলিয়া তাহাকে লজ্জা দেওয়া যাইবে বলিয়া যে দান, উপকার তাহাই লজ্জা-দান। ৩। ব্যবসা-দান—আদান-প্রদান সম্বন্ধ-স্থাপন, হাওলাতেতে বা অল্পসুদে ঋণদান ইহাই ব্যবসা-দান। ৪। ভয়-দান—চোর, দস্যু রাজার ভয়ে অর্থদান বা কাহারও সর্ব্বনাশ উদ্দেশ্যে বা ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য যে ঋণাদি দান তাহাই ভয়-দান; ইহারা ক্রমে নিকৃষ্ট দান। ইহার উপরেও সৎপথে-উপার্জ্জিত দ্রব্যদান, অসৎপথে-উপার্জ্জিত দান এবং স্বোপার্জ্জিত ও পরোপার্জ্জিত দানেরও ফলের পার্থক্য হয়। হিন্দু-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, দানের প্রকার ভেদেই মানব পরজন্মে কেহ ধার্ম্মিক, উচ্চকুলে ধনীগৃহে, কেহ বা হীনকুলে অধার্ম্মিক-ধনী-কুলে জন্মিয়া তাহার ফলভোগ করে। কেহ বাল্যে সুখভোগী হইয়া পরে দুঃখী হয়; কেহ প্রথমে দুঃখভোগ করিয়া পরে সুখী হয়। অসৎউপায়ে অর্জ্জিত দানে পশুজন্ম লইয়া ভোগবিলাস ও সম্মান ভোগ করে—রাজার কুকুর, রাণীর বিড়াল, ইন্দুর হয়, রাজভোগ খায়, রাজা-রাণীর ক্রোড়ে শয়ন করে, রাজ-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরে। আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে জগৎ-সেবার মহাধ্বান উত্থিত হইয়াছে। সকলের মুখেই দরিদ্র-নারায়ণের সেবার আগ্রহ শ্রবণ করা যায়, নিমন্ত্রণ পাওয়া যায়। কিন্তু যাইয়া, প্রাণের আর্ত্তিতে অকপট-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা-মাখা, আন্তরিক সেবাত কোথাও দেখি না। কেবল দর্প-দান ও লজ্জা-দানই দেখিতে পাই। প্রকৃত সাত্ত্বিকভাব ও ঈশ্বরসম্বন্ধ বিনা, যথার্থ দান পরোপকার মানবে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়! তাই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—"নামে রুচি জীবে দয়া।" ঈশ্বরে শ্রদ্ধা হইলে প্রকৃত জীবে দয়া লাভ হয়। (চরিতামৃত)।

ঋষিমতে কর্ম্মের পূর্ণতা ও সার্থকতার মূল যদি কর্ম্মের প্রারম্ভে শ্রদ্ধা-সহিত করিতে আর্ত্তির উদয় হইল এবং কর্ম্মান্তেও, অন্ত সত্যভাবে

মানুষের মত ঈশ্বরের অভিপ্রেতভাবে একটী কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছি, বলিয়া ভগবানকে মনে পড়ে, তবেই কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল। তমোগুণের দর্প, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞায় যাহার আরম্ভ, সেই তমের পূর্ণতাই তাহাতে আনয়ন করে; তাহাতে মানবকে উপকারের নামে অপকারী, পরপীড়কই করিয়া তোলে। হিন্দু জানিত, মানবের ভোজন-শক্তির সার্থকতা, পশুপাখী আদির মত কেবল স্বয়ং-ভোজনেই নহে, অপরকে ভোজন করাইয়া ভোজনে। মানবের জ্ঞান, শক্তি ধন ও দ্রব্যের আধিপত্যের সার্থকতা যদি পরকে তাহা ভোগ করাইতে পারে। পরের কার্য্যে এইসব ব্যবহার করিতে না পারিলে এই সবের ব্যবহার অসার্থক, অর্থাৎ মানবের মত সেই সবের ব্যবহারই হইল না; সেই জন্য সে কর্ত্তব্যভ্রষ্টতা জন্য ঈশ্বরের নিকট অপরাধী, শাস্তি পাইবার যোগ্য। তাইত তাহারা প্রাণের সত্যশ্রদ্ধা ও আর্ত্তি লইয়া পরোপকার করিতে ধাবিত হইতে পারিত, এবং গৃহিতাকে অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা না করিয়া, আর্ত্তিহারী অপরাধহারী, কর্ম্ম-সার্থকতার সহায়, মহাউপকারী বোধে, শ্রদ্ধায় পূজা করিতে সক্ষম হইত। এই জন্যই তাহারা গৃহিতাকে কৃপাপাত্র হীন ভিখারী ভাবিবার সুযোগই পাইত না, বরং সেবা গ্রহণ বা না করেন, ভাবিয়া প্রাণে ভীতিই জাগিত। দিতে সক্ষম, আমি গৃহিতার মত অভাবগ্রস্ত নই বলিয়া, দর্পভরে দান করিতে যাইয়া, তাই তাহারা বাক্যে ও ব্যবহারে গৃহিতার প্রাণে আঘাত দিয়া উপকার করিত না। আমি শৈশবে দেখিয়াছি, গৃহ হইতে ভিক্ষার্থী-ভিখারী ভিক্ষা না পাইয়া ফিরিয়া যাইলে, তাহাকে খুজিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করাইতে বাটীর গ্রামের সকলে ধাবিত হইয়াছে। তাহাকে খুজিয়া না পাইলে, তাহাকে গ্রহণ করাইতে না পারিলে, সেই গৃহকর্ত্তা সেদিন উপবাসী থাকিয়া

দান গৃহিতাই প্রকৃত দাতা।

ভিক্ষা না দিবার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র মতে গৃহিতাই যে প্রকৃত দাতা এবং দাতাই সত্য-গৃহিতা। যাহার গৃহ হইতে যাচনাকারী কিছুই না পাইয়া ফিরিয়া যায়, সেই যাচক সেই গৃহীরকৃত সমস্ত পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া, তাহার পাপরাশিই গৃহীকে দান করিয়া যায়। আর দান গ্রহণ করিলে, সে আশীর্ব্বাদ সহিত নিজের সমস্ত পুণ্যরাশি গৃহীকে দান করিয়া যায়, গৃহীকে ঈশ্বরকৃপা-ভাজন করে হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে। ভাগবতে সনকাদির প্রতি ভগবৎবাক্যে বর্ণিত আছে, ব্রাহ্মণ ও গাভী যেমন ঈশ্বরের প্রিয় ও আত্মস্বরূপ, যার কেউ নাই, এমন দীন দুঃখীও তেমন। তাই দীনের সেবায় ভগবান স্বয়ং তুষ্ট হন। দরিদ্রসেবনে সত্যই নারায়ণের সেবন হয়; আবার তাহাদিগকে অবজ্ঞা বা ক্লেশ দিলেও ভগবান রুষ্ট হইয়া ভীষণ শাস্তিদান করেন। যাহাকে যত্ন করিবার আর কেহ না থাকে তেমন ছেলেকে, মা নিজেই স্বয়ং দেখিয়া থাকেন; সুখের সময় না হইলেও রোগ দুঃখে মা তারই, সেবা করিয়া থাকেন। সেইকালে যদি কেহ মায়ের সহায়তা করিতে যায়, মায়ের সেই ছেলের একটু যত্ন সেবার ভার গ্রহণ করে, মাতা তাহাতে মহাতুষ্ট হন, মনেপ্রাণে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। নিরাশ্রয়কেও জগন্নাথ, জগত-মাতাই স্বয়ং সেবা করেন, তাই কেহ দীনের সেবার ভার লইলে, তাঁহারা তাহাকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ দান করেন, সেই অনাথের সেবাই তখন তাহাদের সেবা তুল্য হয়, দুঃখ দিলেও সেই দুঃখও তাহাদেরই হয়।

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া ভূতান্য-লব্ধশরণানিচ ভেদবুদ্ধ্যা।
দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যহিমন্যবস্তান্ গৃধারুষা মম কুশন্ত্যধিদণ্ডনেতুঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত্ ৩য় স্কঃ ১৬ অঃ ১০ শ্লোঃ।

যে আমার অভিন্নতনু ব্রাহ্মণবর—দুহতী—গাভী ও অলব্ধশরণপ্রাণী—

নিরাশ্রয়-প্রাণীকে আমার মত না দেখিয়া ভেদবুদ্ধিতে দেখে, আমার দণ্ডনায়ক যমের দূত গৃধ্রগণ মহারোষে চঞ্চুদ্বারা তাঁহাদের সেই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দুঃখদেয়।

কেবল পরোপকার উদ্দেশ্যেই হিন্দুর দানের ব্যবস্থা নহে, আত্ম-শোধনই তাহার মূল। দান বিনা যে দ্রব্যের বিশুদ্ধতাই হয় না। যেমন ময়লাহীন-দর্পণে নিজের ছায়া স্পষ্ট পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, তেমনি বিশুদ্ধ দেহমধ্যে পরমাত্মারূপ ভগবৎসত্তা, পূর্ণ শুদ্ধ-রূপে জ্ঞান, গুণ ও ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন। এই সূত্র ধরিয়া দেহের উপাদানের বিশুদ্ধতা জন্য, শুদ্ধ সত্ত্বগুণবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন ও রাজস তামস দ্রব্য ত্যাগ করিবার একরূপ সাধনা ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায়ও ভোজন-দ্রব্যের এই বিভাগ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। এই দ্রব্য-বিশুদ্ধতা জন্যও দানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সাধনা হইতেই হিন্দুর ভোজনের ছুৎমার্গ ও স্পর্শদোষের উদ্ভব হইয়াছে। ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যোগ-বিভূতিবর্ণন মধ্যে পাইবেন, অনিমা, লঘিমা ইত্যাদি অষ্টমহাসিদ্ধি ব্রহ্ম যুক্ততায় জীব লাভ করে, আর ক্ষুৎপিপাসা-রাহিত্য, দূর-শ্রবণ, দূর-দর্শন মনোবেগে-গতি, অভিলসিত-রূপধারণ, পরকায়-প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু, অপ্সরা-ভোগ, সঙ্কল্পিত লাভ, অপ্রতিহত আজ্ঞা, এই দশটী সত্ত্বগুণের ফল; দেহ সত্ত্বগুণময় হইলেই এইসব শক্তি দেহে প্রকাশিত হয়। দেহে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধন চেষ্টায়ই, হিন্দুর আহারে, বিহারে, আলাপে ও লোকসঙ্গে এত বিধি নিষেধের বেড়া সৃজিত হইয়াছিল। দ্রব্যকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণীয় করিতে একমাত্র দানই শ্রেষ্ঠ অসন্দিগ্ধ উপায়।

হিন্দুর ভোজনে সাধন

শাস্ত্রে দ্রব্য-শোধন-উপায় মধ্যে দ্রব্যের জন্ম, মূল্য, সংস্কার ও দান এই চারি উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার জন্ম—ক্রীত দ্রব্যের শুদ্ধভাবে,

শুদ্ধস্থানে জন্ম কি না তাহা নির্ণয়ের উপায় নাই। মূল্য—দ্রব্য চুরির দ্রব্য কি না, উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিল কি না, তাহারও নির্ণয় অসম্ভব। সংস্কার—অনেক দ্রব্যই একা নিজে সংস্কার করিয়া লওয়া অসম্ভব। যেমন তণ্ডুল বা শর্করা ইত্যাদি কিনিয়া আনিতে হয়; তাহা শুদ্ধভাবে প্রস্তুত কি না জানা অসম্ভব। কিন্তু দান-পথ—অসন্দিগ্ধ-ভাবে নিজেই দেখিয়া করিয়া লওয়া যায়। তাই দান করিয়া দ্রব্য শোধনই হিন্দুগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। প্রত্যহই ভোজন-দ্রব্য চাউল, ডাইল, তরকারী ইত্যাদি অন্যকে দান না করিয়া কোন হিন্দুই ভোজন করিত না। হিন্দুর রাজা ও রাজতুল্য ধনীগণ, প্রত্যহ একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে অন্ন, বস্ত্র হইতে শয্যা-দ্রব্য ও একটী গাভী পর্য্যন্ত ষোড়শ-দান করিতেন; সামান্য ধনীগৃহে প্রত্যহ একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ভোজন করিত, আর সামান্য-গৃহস্থ তাহাই মুষ্টি-ভিক্ষা রূপে দান করিয়া সমাধা করিত। আজ কালও প্রাচীন হিন্দু-ধনী ও জমীদার-ঘরে সন্ধান করিলে, সেই প্রথার ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাইত অন্যকে ভোজন না করাইয়া একা ভোজন হিন্দুর গালি সদৃশ ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে বিনাদানে ভোজন করাকে, অখাদ্য মল-ভোজন তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।" যে কেবল নিজের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করে, সেই পাপাত্মা অখাদ্যই ভোজন করে! (গীঃ ৩অঃ ১৩ শ্লোঃ)

হিন্দুর এই দানের পাত্র প্রথমে ভগবান্ ও ভগবৎপথা-মানব, দ্বিতীয়ে আত্মীয় স্বজন; তৃতীয়ে সাধারণ দীন দুঃখী। যাহারা ঈশ্বর-আরাধনা কর্ম্মকে রক্ষা করিতেছেন—যাহাদের দর্শনে সংসারবন্ধন, ভোগবিলাসের আবরণ ভেদ করিয়াও সেই ভগবৎ-রাজ্যের আলোর আভাস উঁকি দিয়া উঠে; যাহারা কৃপা করিয়া আসিয়া, বিষয়মত্ত জনগণের রুদ্ধদ্বারে ভগবানের

নামের আঘাত করিয়া, সেই রাজ্যের মহিমাগানে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন, ভোগের সম্মুখে ত্যাগের-মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণবাদি ভিক্ষুক-রূপ সেই গুরুগণই দানের প্রথমও শ্রেষ্ঠপাত্র ছিল। ইহার পরে জ্ঞাতিআদি স্বকুলের আত্মীয় স্বজন। শ্রাদ্ধে ভোজন করানের ফল মধ্যে দেখিতে পাইবেন, চারি জন অনুপবীত-ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল, একজন পৈতাসংস্কৃত-ব্রাহ্মণ ভোজনেই সেই ফল। শাস্ত্রজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ভোজনে দশজন-তুল্য, ব্রহ্মজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ভোজনে শতজন-তুল্য ফল লাভ হয়। জ্ঞাতিভোজন সম্বন্ধেও পণ্ডিতব্রাহ্মণ-তুল্য দশব্রাহ্মণ ভোজনের-ফল বর্ণিত আছে; হিন্দু আত্মীয়পোষণকে এমনি শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিলেন। জগতে সকলেই যদি যার যার আত্মীয় গণের সেবা ও পোষণভার গ্রহণ করে, তবে কি আর জগতে দুঃখী দরিদ্র অনাথ থাকিতে পারে? এই আত্মীয়পোষণ কুলধর্ম্ম ছিল বলিয়াই, ভারতে আধুনিক সভ্যতার অনাথ আশ্রম সেবাশ্রম, ইত্যাদি গঠনের প্রয়োজন পরে নাই। ভারতে মাত্র ঈশ্বরপথী বিনা আর কাহারও ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ঈশ্বর-পথীও মাত্র এক বেলার সামান্য-খাদ্য ভিক্ষা করিতেন। বৌদ্ধ-যুগে তাই এই ঈশ্বর পথীর নাম হইয়া ছিল ভিক্ষু। তাঁহারা ভগবানের স্তোত্র গাহিয়া পথে চলিয়া যাইতেন, আর তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া কে জীবন ধন্য করিবে, সে জন্য গ্রামের গৃহস্থগণ ভিক্ষা লইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিত। বহু লোক কি করিয়া এককে ভিক্ষাদিবে, তাই সকলে ভিক্ষুগণের উপরে তণ্ডুলাদি ছুড়িয়া ফেলিত—দুই একটীও ত তাঁহার ভিক্ষা পাত্রে স্থান পাইবে। এই রূপেই ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া ভিক্ষু চলিয়া যাইত; পথের তণ্ডুল পশুপাখী খাইত। আজ আত্মীয়-পোষণ আলস্যতার প্রশ্রয় ও ঈশ্বরপথীকে দান মূর্খতা ও অজ্ঞানের প্রশ্রয় দেওয়া বিবেচিত হয়।

কিন্তু কুলপোষণের অভাবেই আজ পৃথিবীতে ভিখারী ও দুঃখীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, মানবেরও অপরাধ প্রবণতা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাই মানবের সেবার জন্য এখন অনাথ-আশ্রম, সেবাশ্রম, হস্পিটাল আদি না গড়িলে চলেনা; রাজধন দ্বারা পুলিশের সহায়তায় ভিখারী হইতে ও অপরাধী হইতে গৃহস্থকে রক্ষা না করিলে চলে না। তাই কুলের স্বজনই দ্বিতীয় দানের পাত্র। তৃতীয় পাত্র জগতের সকল দুঃখী প্রাণী। এখন এই স্থানেই গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডের সমাপ্তি করিয়া, অন্তঃভাগে এই ধর্ম্ম-আচরণকারী নারী ও নরের কর্ম্মাধিকার কিরূপ, তাহারা কিরূপভাবে চলিয়া, সুখে শান্তিতে এই ধর্ম্মসাধন-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেই সব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পূর্ব্বখণ্ড সমাপ্তম্।

---

# মনুষ্যত্বের সাধনা।

বা

## আর্য্য-ঋষিমতে নরত্ব ও নারীত্বের সার্থকতা।

## অন্তর্ভাগ।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### নর নারীর কর্ম্মাধিকার।

জগতে কর্ম্মকারী নারী ও নরের বিষয় আলোচনা করিতে হইলেই এই কতকটী বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমে বিচার করিতে হইবে নর ও নারীর কর্ম্মাধিকার পৃথক না একরূপ। দ্বিতীয়ে দেখিতে হইবে উভয়ে পৃথক পৃথক স্বাধীনভাবে কর্ম্মকরিলেই মঙ্গল, না একত্র হইয়া একসত্তায় কর্ম্মকরিলে মঙ্গল। তৃতীয়ে মিলনটী কেমন হইলে মঙ্গল, জগতে কতরূপে স্ত্রী পুরুষে মিলন ঘটে, কাহার কি ফল। চতুর্থে মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি লাভের কারণ কি, পিতৃশক্তি না মাতৃশক্তি; সেই বিকৃত-প্রকৃতির মার্জ্জনা কেমনে হয়। পঞ্চমে মানবের জীবভাব

দেহেন্দ্রিয়-তোষণ-প্রবৃত্তিকে কি সাধনায় সহজে নষ্ট করিয়া পূর্ণমানবত্ব জাগাইতে পারা যায়, সেই সাধনার সংবাদ। সেই সাধনায় হিন্দু কি হইয়াছিল, তাহা হারাইয়া বর্ত্তমানে কি হইয়াছে, বর্ত্তমান-সভ্যতার আদর্শ জীবন দ্বারা কতটুক মানবত্ব সার্থক হয়, তাহার সংবাদ। ষষ্ঠে হিন্দু কি করিয়া বহু সহস্র বৎসর অন্যধর্ম্মের অত্যাচার রোধ করতঃ, স্বধর্ম্ম-সভ্যতা রক্ষায় সক্ষম হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে কি হারাইয়া আজ সব হারাইতে বসিয়াছে, তাহার সংবাদ—হিন্দুসভ্যতায় মানবের সুখের মূল গৃহধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম-শাসনের সংবাদ। অন্তঃভাগ এই ছয় অধ্যায়ে। তাই এই সব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ঋষিমতে—একটী পুরুষ ও একটী নারী মিলিত হইলে, ঈশ্বরের অভীপ্সিত একটী কর্ম্মী-মানব গঠিত হয়। অমিলিত নর ও নারী অর্দ্ধমানব মাত্র, তাই তাহারা ধর্ম্মরূপ ঈশ্বরের অভীপ্সিত কর্ম্মের অযোগ্য।

আর্য্যঋষি বিচারে—

মানবত্বের পূর্ণকারী, নর নারীকে কর্ম্মাধিকার দাতা, এই মিলনরূপ বিবাহ-ব্যাপার তাই মানব নর নারীর অবশ্য-করণীয় পবিত্র ধর্ম্ম-সংস্কার। এই মিলন অচ্ছেদ্য অপরিবর্ত্তনীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তাহাই মানবের পরম কল্যাণকর।

আধুনিক মতে—নর ও নারী প্রত্যেকেই পৃথক দেহের মত, পৃথক আকাঙ্খা, কর্ম্মশক্তি ও স্বাধীনইচ্ছা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা, কেন একজন অন্য জনের সহিত অধীনতার-বন্ধনে বন্দী হইয়া,

আধুনিক জ্ঞান বিচারে

নিজের স্বাতন্ত্র্যরূপ পার্থক্যকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে? প্রত্যেকে পৃথক থাকিয়া স্বাধীন ভাবে, ঈশ্বরের কর্ম্ম সাধন করিতে পারিবে না কেন? স্ত্রী পুরুষের মিলনব্যাপারে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? সুখ সম্ভোগের জন্য মিলিত হওয়া, তাহা আনন্দ-সম্মিলন মাত্র। তাতে চাই শুধু মনের মিলন, তাতে ধর্ম্মের

দোহাইর কি প্রয়োজন? তবে সমাজ-শৃঙ্খলার জন্য বৈধতা-সাধনের প্রয়োজন আছে বটে। এই আনন্দ-মিলনে নর ও নারী উভয়েরই স্বাধীন মতামতের অধিকার থাকার প্রয়োজন। মিলন অসুখকর হইলে বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার থাকারও প্রয়োজন, এবং আবার নূতন মিলনের অধিকারও থাকার প্রয়োজন। নর নারী উভয়েই এক এক জন মানব, উভয়ের একরূপ শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম্মাধিকার হওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক জ্ঞানে, ঋষি নির্দ্দেশিত নর নারীর কর্ম্মবিভাগ, পুরুষ কর্ত্তৃক নারীর অধিকার হরণ। তাহারা নারীকে যত কষ্টকর হেয় কর্ম্মের ভার দিয়া, অন্তঃপুর রূপ কারাগারে, অধীনতা, নির্য্যাতনের মধ্যে, চিরদাসীত্বে নিরোধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা ইহাও বলেন, ঋষি সর্ব্বদা নারীকে অবজ্ঞারচক্ষে দেখিত। তাইত "নারী নরকের দ্বার, যত্নে নারী সঙ্গ পরিহার কর্ত্তব্য।" বলিয়া ব্যখ্যা করিত। তাই তাহারা নারীকে এমনি ভাবে নির্য্যাতিত করিয়া রাখিয়াছেন।

## ঋষি মতে কর্ম্মরাজ্যে নারীর স্থান।

যেই আর্য্যঋষি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গেই প্রথমে নারীরূপা বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর ধ্যান করিয়া শয্যাত্যাগ করিতেন—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া নারীরূপা সরস্বতী দেবীর ও ভাব, সৌন্দর্য্য, ভালবাসার অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া লক্ষ্মীদেবীর, সর্ব্বদা রক্ষা-কারিণী শক্তি বলিয়া জগদ্ধাত্রী, জগন্মাতা ভগবতীর নারীরূপেই আরাধনা করিতেন 'যত্র নারী তত্র গৌরী" বলিয়া যাহাদের নারীকে ভাবিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহারা নারীর সম্মান জানিতেন না, নারীকে হেয় হীন ভাবিতেন, ইহাও কি বিশ্বাস করিবার কথা? তবে নারীকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন! সেই উপদেশ কাহাকে করিয়াছেন? নিবৃত্তি-পথের সন্ন্যাসী-পুরুষ, যাহারা পূর্ণরূপে জীবত্বকে

ধ্বংস করিয়া, একমাত্র অদ্বৈত-ভগবান্‌কে লাভ করিতে চাহেন—ব্রহ্ম বিনা বিশ্বজগতের অন্য দ্বিতীয়বস্তু যাহার প্রার্থনীয় নয়, সেই অদ্বৈত-ব্রহ্মপথী-পুরুষের নারীসঙ্গ, বিষয়াসক্তিরূপ নরকের দ্বার, বলিয়াছেন। ধর্ম্মপথী প্রত্যেক হিন্দু নর নারী জানেন, এই উক্তি উভয়তঃ বলা হইয়াছে। নিবৃত্তিপথী-পুরুষের রমণী-সঙ্গ ও সেইপথী রমণীর পুরুষ-সঙ্গ ত্যাগই এই বাক্যের যথার্থ অর্থ; উভয়ের সঙ্গ হইতে প্রবত্তি-রাজ্যের উদ্ভব হয়, নিবৃত্তির অদ্বৈত-ভক্তির বাধা জন্মে, তাই নিবৃত্তি-পথীর জন্য এই সঙ্গ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু প্রবৃত্তিপথে নারী পুরুষের শক্তিবর্দ্ধিনী, সহধর্ম্মিণীরূপ পরম সহায় বলিয়াই ঋষিগণ সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন ও শতমুখে নারীর জয়গান করিয়াছেন। পুরাণে বর্ণিত সেই বিষয়ের ঋষিবাক্যই শ্রবণ করুন।

জগতে পূর্ণ মানবত্ব স্থাপন করিতে, সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার মনন মাত্র, তাহার অঙ্গ উপাঙ্গ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও দক্ষাদি কয়জন প্রজাপতির উদ্ভব হইল; তাঁহারাই আদি আর্য্য-মানব। তাহাদেরই একজন প্রজাপতি মহর্ষি কর্দ্দম পিতার আদেশে প্রজাপালন ও আদর্শ প্রজাসৃজন জন্য, দশ সহস্রবর্ষ কঠোর তপস্যায় বিষ্ণুর আরাধনা করিলেন। পরে বিষ্ণুর বরদমূর্ত্তির সাক্ষাত পাইয়া, তাহার নিকট কি বর চাইতেছেন শ্রবণ করুণ। (শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ তৃতীয় স্কন্ধ একবিংশ অধ্যায়) কর্দ্দম বলিলেন—হে ভগবন্, তোমায় পাইয়াও যেই ব্যক্তি, তোমার পাদপদ্মের ছায়া না চাহিয়া, অন্য কিছু প্রার্থনা করে, সে যে নিতান্ত মূঢ় তাহা আমি জানি। তবু আজ আমি আপনার নিকট, গৃহাশ্রমের কামধেনু, ত্রিবর্গ-দোহনশীলা পত্নীই প্রার্থনা করিতেছি। আমি লোকানুগত—(গৃহাশ্রমের সুখ কামনায়) ভার্য্যা কামনা করিতেছি না। ভার্য্যাবিনা দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ

এই ত্রিঋণ হইতে মুক্তি লাভের আর সম্ভাবনা নাই, সেই জন্যই ভার্য্যা প্রার্থনা করিতেছি। সেই ভাগবতেই আর এক ঋষি পত্নীকে কি বলিয়াছেন তাহাও শ্রবণ করুন। তৃতীয় স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ে অদিতী প্রতি কশ্যপ বাক্য।

আদি নব-প্রজাপতিগণ মধ্যে মহর্ষি মরীচি একজন। তিনি মহর্ষি কর্দ্দমের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র মহর্ষি কশ্যপ, তিনি প্রজাপতি দক্ষের দিতি আদি এয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। ইন্দ্রাদি দেবতা, হিরণ্যকশিপু আদি অসুর, মুণিচি আদি দানব, বাসুকী আদি নাগ, গরুর আদি পন্নগ ইঁহারই সন্তান। এই মহর্ষি কশ্যপের নিকট অসুর-জননী দিতি অসময়ে—সন্ধ্যাবেলায় সন্তান প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিতেছেন—হে ভীরু! আমি এখনি তোমার প্রার্থিত বাসনা পুর্ণ করিব। প্রিয়ে, যাহা হইতে ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয়, কে তাহার কামনা পূর্ণ না করে? জলজানে যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায়, সেইরূপ গৃহিণীবিশিষ্ট গৃহী আপন আশ্রমীদিগের দুঃখ নাশ করিয়া, নিজেও সংসারের দুঃখ-জলধি সুখে পার হয়। হে মানিনি! স্ত্রী পুরুষের যজ্ঞাদিকর্ম্মে সমান অধিকার থাকায়, যাহাকে শাস্ত্রে শ্রেয়কাম ব্যক্তিদিগের দেহার্দ্ধ বলিয়া থাকে, এবং পুরুষ আপনি দেখুক বা না দেখুক, যাহার প্রতি সকল কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বিচরণ করিতে পারেন; অধিক কি বলিব, দুর্গপতি যেমন দুর্গাশ্রয়ে দস্যুদিগকে অবহেলায় জয় করে, আমরা তেমনি যাহার আশ্রয় লইয়া অবলীলাক্রমে অন্য আশ্রমীদিগের অতি দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিয়া থাকি, হে গৃহেশ্বরি! তুমি আমার সেই অশেষ উপকারকারিণী গৃহিণী। আমি প্রাণ দিয়া, অথবা জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার দ্বারা তোমার অনুকরণ করিতে পারিবনা—অর্থাৎ তুমি

যেরূপ উপকার করিয়াছ, আমি তোমার তেমন উপকার করিতে পারিব না, গুণপ্রিয় ব্যক্তিরাও তাহাতে সক্ষম হয় না। নারীর মহিমা ব্যঞ্জক এমন স্তুতির সত্যবাণী, আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও দেশে কেহ করিয়াছেন কিনা জানিনা। নারী-সঙ্গ নরকের দ্বার মাত্র হইলে, মহর্ষির মুখে এমন বাক্য বাহির হইত কি? মহর্ষি কর্দ্দম সহস্র বর্ষের চেষ্টায় বিষ্ণু-লাভ করিয়া, বিষ্ণুকে গ্রহণ না করিয়াও নারি পত্নী যাচ্ঞা করিতেন কি? নারী নিবৃত্তি-পথের মহাবিঘ্ন হইলেও প্রবৃত্তি-পথির মহামঙ্গল স্বরূপ প্রধান আশ্রয় ও সহায়।

হিন্দুঋষি নারীকে কখনও হীনভাবে দেখেন নাই। তবে কি না, বর্ত্তমানে ঋষি বাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, এমন লোকেরই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। কেন যে মহর্ষি কর্দ্দম নারীকে গৃহাশ্রমের কামধেনু, ত্রিবর্গ-দোহন-শীলা ও পিতৃ-ঋণাদি শোধের প্রধান আশ্রয় বলিয়াছেন এবং মহর্ষি কশ্যপ নারীকে ত্রিবর্গ-সাধক, সংসার জয়ের সুখময় স্থান, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিবর্গ জয়ের সুদৃঢ় দুর্গ বলিয়া, পত্নীর প্রত্যুপকার কিছুতেই পুরুষ করিতে পারে না বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দিবার লোকেরই অভাব এবং বুঝিতে চাহে এমন লোকেরও অভাব। প্রবৃত্তি রাজ্যে নারী পুরুষের কতবড় সহায় ও কল্যাণ বিধায়িনী, ঋষিকৃত পত্নীর নামকরণের মধ্যেই তাহা জানা যায়। প্রাচীন-সংস্কার হীন হইয়া আজ আমরা সেইগুলি অর্থজ্ঞানহীন শব্দমাত্র উচ্চারণ করিতেছি। তাই আমরা নাম মধ্যেও ঋষি কি মহাভাব রাখিয়াছেন, তাহা বুঝিতে অক্ষম।

সুন্দর কেশর আছে বলিয়া, সিংহের নাম কেশরী; বিশেষ তীব্র ঘ্রাণ আছে বলিয়া আর এক পশুর নাম রাখিয়াছেন ব্যাঘ্র। এইরূপ বিশেষ

গুণের-প্রাধান্য ধরিয়াই ঋষিগণ জগতের প্রত্যেক দ্রব্য, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিআদির পর্য্যন্ত নামকরণ করিয়াছেন। প্রাণী-

ঋষির নামকরণ

বর্গের মধ্যে পক্ষ আছে বলিয়া পাখী; পিশুণতা পরস্পর হিংসা প্রতিযোগিতার প্রাধান্য ধরিয়া পশু; তেমনি অন্য প্রাণীবর্গ হইতে মানসিকশক্তির চালনার প্রাধান্য ধরিয়া, মানবের নাম মানুষ বা মানব। এইরূপই পৌরষের প্রাধান্যে পুরুষ ও রমণীয়তার প্রাধান্যে নারীর নাম রমণী রাখা হইয়াছে। এই পুরুষত্ব ও রমণীত্বকে পৃথকত্বে রক্ষা না করিলে, বিধাতার পৃথক সৃজনের উদ্দেশ্যই যে নষ্ট হইয়া যাইবে; নর নারীর সুখ শান্তি সমাজ, শৃঙ্খলা ধ্বংস হইয়া যাইবে; বিশেষ নারীত্বের পতনে জাতির পতন অনিবার্য্য।

নারীর একনাম প্রকৃতি। উপনিষদ ও ভগবদগীতায় পাইয়াছেন, এই কর্ম্মজগতের কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু, পুরুষ মাত্র সুখদুঃখ ভোগের হেতু।

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥

(গীতা ১৩—২০)

এই প্রবৃত্তিরাজ্যের কর্ম্মপথে নারী সত্তাই এমন কর্ম্ম, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধির হেতু। তাহার পতনে এই তিন বিষয়েরই পতন হইয়া যায়। নারীই নিরস কর্ত্তব্যময় কর্ম্মক্ষেত্রকে রমণীয় করিয়া তোলে, তাই তাহার এক নাম রমণী। দেহেন্দ্রিয়ের সর্ব্বকামনাকে পূরণ করে, তাই তাহারা কামিনী। পত্নীরূপা নারী সদা ত্রিবর্গ ভোগ করায়, তাই তার এক নাম স্ত্রী, সদা পতন হইতে রক্ষা করেন, তাই আর এক নাম পত্নী, অর্দ্ধ-অঙ্গ স্বরূপা হইয়া সদা কর্ম্মে সহায়তা করেন বলিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী; সদা ধর্ম্মের সহায় বলিয়া সহধর্ম্মিণী, সহায়রূপে সদা শক্তি দান করেন

বলিয়া পত্নীকে ঋষি শক্তিও বলিয়া থাকেন, তাই নারীর পতন ও বিকৃতিতে মানব জাতিরই পতন ও মহা অকল্যাণ হয়।

নারীর সপ্তধাতুর বিশুদ্ধতায় যে মানব-বংশধরের সপ্তধাতুর বিশুদ্ধতা। মানবের প্রথম আশ্রয় নারীর গর্ভ—গর্ভকালে মাতার আহার নিহার চিন্তা হইতে সন্তানের দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির পূর্ণতা। তারপরে শিশুকালেও মাতার অতি সাবধানতার যত্ন, চেষ্টা ও স্তন্যের বিশুদ্ধতায় শরীরের গঠন ও প্রাণ রক্ষা। সন্তানের প্রথম জ্ঞান ও প্রবৃত্তির উন্মেষ এই নারী মায়ের হস্তে। এই জন্যই ঋষি বলিয়াছেন—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনং।" এমন পুত্র চাই, যেমন পিতা মাতাকে উদ্ধার করিতে পারে; এমন পত্নী চাই যেন সৎসন্তান প্রসব ও পালন করিতে পারে। নারী কেবল মাতৃ-রূপেই নহে—ভগ্নিরূপে বাল্য ও কৈশোরে স্নেহ সেবা ও খেলাদিয়া, মানব নর নারীকে মানব করিয়া গঠন করে। যৌবনে দূরযাত্রী পথিক যেমন পথমধ্যে ভারে-পীড়িত, শ্রমে শ্রান্ত, রৌদ্রে তপ্ত হইয়া অতি কাতরভাবে ফল জল সমন্বিত ছায়াযুক্ত একটু আশ্রয় স্থানকে সন্ধান করিতে থাকে, পুরুষও কর্ত্তব্য ভারে পীড়িত, খাটিয়া শ্রান্ত ও সংসারের দুঃখ, দরিদ্রতা, অকৃতকার্য্যতা অপমানআদির জ্বালায় অবসন্ন হইয়া, তেমনি যৌবনে একটী বেদনা বুঝে এমন স্নেহময়ী, সেবারতা নারি-পত্নীর আশ্রয় পাইতে অতি ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেইকালে যুবককে প্রীতি সেবাদিয়া শ্রান্তি ঘুচাইয়া দিতে, অভয় সান্ত্বনা উৎসাহ দিয়া, সকল বেদনা ও অবসাদ ডুবাইতে, স্নেহের ধারায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে, একমাত্র নারি-পত্নী দ্বারাই সম্ভব হয়! তার পরে বার্দ্ধক্যে, যখন মানব নর নারীর পূর্ণ কামনা ও আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকিতেও, দেহেন্দ্রিয় কর্ম্মচেষ্টায় অশক্ত হইয়া, সর্ব্বসময় অপরের সেবা ও

নারীর পতনে জাতির পতন

সাহায্য সন্ধান করিতে থাকে—সেই কালেও পুত্রবধূ বা পৌত্রীরূপা নারীই তাহাদের দুঃখ ঘুচাইয়া বার্দ্ধক্য সার্থক করিয়া দিয়া থাকে। মানবের চারি কালের আশ্রয় রূপা, দেহ প্রবৃত্তি গঠনের কারণ নারীত্বের পতন হইলে, কি করিয়া সেই জাতির কল্যাণ ও সুখশান্তি রক্ষা হইতে পারে?

এই জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভে হিন্দুর আদর্শ-পুরুষ, নরনারায়ণ অর্জ্জুন, পুরুষ-নিধনে খেদ না করিয়া, পুরুষ-শাসক অভাবে যে নারীর পতন হইবে ও তাহাদ্বারা মানব জাতির সর্ব্ব কল্যাণ নষ্ট হইবে, সেইজন্য খেদ করিতে করিতে যুদ্ধ-বিমুখ হইয়াছিলেন—সেই দুঃখ চিন্তায় তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ, গাত্র কম্পিত হইয়া, হস্তের গাণ্ডিব খসিয়া পড়িয়াছিল। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—এই যুদ্ধে পুরুষগণ নিহত হইলে, (শাসক ও রক্ষকের অভাবে) কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হইবে; তাহাতে বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হইবে, পিণ্ড ও উদক-ক্রিয়া লোপ পাইবে, আর জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও শাশ্বত-ধর্মের পতন হইবে। তখন লোক সকল নিয়ত নরকে বাস করিবে। কুলক্ষয়ে প্রনশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ। ধর্ম্মেনষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়াঃ। স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ সঙ্করঃ॥ সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ। পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥

গীতা ১ম-৩৯ হইতে ৪৩।

**জাতিধর্ম্ম**—মানব জাতিরমত পূর্ণ দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির বিকাশ, **কুলধর্ম্ম**—পিতামাতাদি সংসারের লোকগণ, প্রতিবেশী, সমাজ ও জগতের প্রাণীবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যতার নীতিধর্ম্ম চেষ্টা, **শাশ্বতধর্ম্ম**—

জীবত্বের মুক্তির চেষ্টা ও ঈশ্বরলাভের সাধনা আকাঙ্ক্ষা। নারীর পতনে, জাতিধর্ম্ম-হীনতায় মানব নর নারীর দেহেন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির পতন হয়; তাতে কুৎসিৎ হীনাঙ্গ রুগ্ন বিকৃতপ্রবৃত্তিবান্ দুঃখীসন্তান জন্মে; কুলধর্ম্মের পতনে সত্য, দয়া, শীলতাদি নীতিধর্ম্মের হীনতায়, সংসার ও সমাজে অকল্যাণ ও দুঃখ আনে; আর শাশ্বতধর্ম্মের হীনতায় আত্মার প্রসন্নতা, সন্তোষ ও ঈশ্বর-সাধন শক্তিহীন করে। তাই নারীর পতনে মানব এই তিনধর্ম্ম হীন হইয়া সর্ব্বদা নরকের মত, অশান্তি ও দুঃখের মধ্যেই বাস করিতে থাকে।

নারী যে সত্যই মানবের রক্তবাহী নাড়ীর মত, কর্ম্মজীবনের শক্তি-প্রবাহিণী নাড়ী। দেশের জল ও বায়ু দূষিত হইলে যেমন সেই দেশের প্রাণীবর্গের আর বাঁচিবার আশা থাকে না, নারীর পতনে তেমন মানব জাতির সর্ব্বদিকের কল্যাণ নষ্ট হয়। তাই ঋষি নারীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য এত বিধি নিষেধের বেড়া রচিয়া, সদা এক জনের তত্ত্বাবধানে, উপদ্রব প্রলোভনহীন, পবিত্র অন্তঃপুরে স্থান দান করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই তত্ত্বাবধানতা যাতে পরাধীনতার কষ্টময় হইয়া না উঠে—অন্তঃপুরে অধিষ্ঠান যাতে কারাগার হইয়া না উঠে, সে জন্য—নারীর স্বভাবতঃ প্রিয়, স্বভাবমিত্র, ভালবাসার আধার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও নিজ-সন্তানের করেই সেই ভার দান করিয়া দিয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষার জ্ঞানে স্নেহ মমতা হীন হইয়া, আজ পবিত্রতা-রক্ষার সাবধানতা নির্য্যাতন—পবিত্র অন্তঃপুর অবরোধের কারা-গৃহ—ভালবাসা অধীনতার বন্ধন-শৃঙ্খল,—পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রের স্নেহের রক্ষণাবেক্ষণ দারুণ নির্য্যাতন, পরাধীনতা হইয়া নারীর প্রাণে বাঁধিতেছে।

নারীর স্বভাব—লতিকার মতন। লতাগাছ যেমন, অন্যকে আশ্রয় করিতে না পারিলে বাঁচিতে পারেনা, সুন্দর ফুল ফলও প্রসব

করে না; নারীও তার ভালবাসার আশ্রয়ের অভাবে বাঁচে না, পূর্ণ নারীরমত হইয়া তাহার দেহ, প্রবৃত্তি, সৌন্দর্য্য ও কর্ম্মশক্তি লইয়া ফুটিয়াও উঠে না। নারীর ঈশ্বর-দত্ত স্বভাব, সে একজন পুরুষের সঙ্গে হয় পিতৃত্ব, না হয় ভ্রাতৃত্ব, নয় স্বামিত্ব বা পুত্রত্ব সম্বন্ধ-বন্ধন করিয়া, সেই রসের ভাবে নিজ দেহ প্রবৃত্তি দ্বারা সেবা করিয়া, নিজকে অপরে ভোগ করাইবে; এই আশ্রয় বিনা নারী বাঁচিতেই পারে না। স্বভাব-সম্বন্ধের এইসব আশ্রয় না পাইলে, নারী অবৈধভাবে অন্যের সঙ্গেও এই সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়াও তাহার ধন, মান, ধর্ম্মপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া বসে। আর আজ স্বভাব-সম্বন্ধ পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের আশ্রয়, অধীনতা ও নির্য্যাতনের কারাগৃহ, যে তাহা বুঝিতে পারেনা সে এখন নিতান্ত জ্ঞানহীনা দুর্ভাগা নারী।

কর্ম্মরাজ্যে যেই কর্ম্মভার পুরুষের সাধ্যের অতীত, ঋষি সেই দুরূহ-কর্ম্মের ভারই নারীকে দান করিয়াছেন; হীন বা হেয় কর্ম্মভার দান করেন নাই। অবহেলা, নিপীড়ন, নির্য্যাতন সহিয়াও, অপরকে সুখতৃপ্তি দান—নিজের দুঃখ লুকাইয়া, বিষণ্ণমুখে হাসি ফুটাইয়া, স্নেহ প্রীতির সেবা ও সান্ত্বনাভরা উৎসাহেরবাক্যে, অপরের দুঃখতাপ ডুবাইয়া, উৎসাহ ফুটাইয়া তুলিতে, একমাত্র নারীই পারে; এই গুণই নারীতে ঈশ্বর-দত্ত রমণীত্ব; পুরুষত্বের দ্বারা ইহা সমাধা হইতেই পারে না। জগতের সর্ব্বপ্রাণীর নারী-জাতির জীবন সন্ধান করিয়া দেখুন, নারীজাতি ঈশ্বর-বিধানেই পুরুষ হইতে অনেক অধিক কষ্টকর কর্ম্মভার লাভ করিয়াছেন। নিজে কষ্ট সহিয়া অপরকে সুখসেবা দান, পীড়ন-সহিয়া আপন-সর্ব্বস্ব ভোগকরান নারীর স্বাভাবিক কর্ম্ম-বিভাগ। সন্তান-গর্ভধারণে রোগীরমত আহারে, বিহারে, শয়নে ও ভোজনে যন্ত্রণা, সর্ব্বপ্রাণীর নারীজাতিরই ভোগ করিতে হয়

ঋষি নারীকে হেয়-কর্ম্মের ভার দান করেন নাই।

না? তারপরে প্রসবের প্রাণান্ত-বিপদ ও দারুণ-বেদনা নারীরই কর্ম্ম-বিভাগ। প্রসবান্তেও, এত কষ্টের কারণ সন্তান, সেই নারীর স্তনপীড়ন করিয়া বুকের রক্ত-চুষিয়া খাইবে, কোলে মলমূত্র ত্যাগ করিবে, হাসিতে হাসিতে স্তনে দংশন করিয়া রক্তপাত করিবে ক্রোধে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া, পদাঘাত করিয়া কত ব্যথা দিবে, দিবসে আহারে, বিহারে বিঘ্ন, নিশায় নিদ্রায় বিঘ্ন; নারীকে বিনা মাহিনার চাকরাণী, মেথরাণী করিয়া দিনরাত খাটাইবে—কেবল রমণী বলিয়াই নারী বাৎসল্যের স্নেহগুণে, এত দুঃখের কারণ সন্তানের সমস্ত দোষ মুছিয়া ফেলিয়া, অতি নিরাশ্রয় কীটতুল্য শিশুকে, মাতৃত্বের অমৃতময় স্নেহসেবায় একটী মানুষ করিয়া তোলে।

কেবল মাতৃত্বেই নয়? একটী বালিকা ভগ্নী, বিনা শিক্ষা ও শাসনেই ছোট ভাইটীর আবদার অত্যাচার সহিয়া, নিজের খাদ্য ও খেলনার অংশ দান করিয়া, ভাইকে স্নেহের সহিত প্রীতিসেবা দান করিবে। পুরুষ-দাদা কিন্তু শিক্ষা ও শাসনেও তাহা করিবে না। সে ভাই বোনের দ্রব্য ও খাদ্য কাড়িয়া লইবে, প্রহার করিয়া কাঁদাইবে। আবার পত্নীত্বে—দুঃখী, দরিদ্র, রুগ্ন, শ্রান্তিতে অবসন্ন, স্বামীর মলিন মুখেরদিকে চাহিয়া, একটী নিতান্ত অশিক্ষিতা, বালিকা নব-বধূও নিজের দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া, বিষণ্নমুখে প্রফুল্লতার হাসি ফুটাইয়া, শ্রান্তদেহে বলধারণ করিয়া, প্রীতি-সেবা সহ সান্ত্বনা ও উৎসাহবাক্য ঢালিয়া, স্বামীর সর্ব্ব যাতনা, অবসাদ ডুবাইতে চেষ্টা করিবে। এই মহাগুণ ও এই মহাশক্তিই নারীর রমণীত্ব গুণ; নারীর প্রতি ঈশ্বর-দত্ত কর্ম্ম-বিভাগ। আর্য্যঋষি ঋষিত্বশক্তি প্রভাবে, নারীত্বের সেই স্বভাবকেই প্রকাশ করিয়া, নারীর কর্ম্ম-বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন মাত্র; তাঁহারা নারীর অধিকারহারীও নহেন, নির্য্যাতনকারীও নহেন।

**নারীর ইন্দ্রিয় নিরোধ**-ধর্ম্মও ঈশ্বর-বিধান। মানব বিনা অন্য সমস্ত প্রাণীবর্গের দিকে চাহিয়া দেখুন। সমস্ত প্রাণীরই স্ত্রীজাতির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি নিয়ন্ত্রিত; কেবল গর্ভধারণ জন্য নির্দ্দিষ্ট কতদিন মাত্র নারী তাহাতে সক্ষম হয়; পুরুষ-প্রাণীতে তাহার বাঁধন নাইত! পুরাণ-বর্ণনা মতে মানবীতেও তেমন বিধান ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র হইতে ব্রহ্মহত্যা পাপের অংশ গ্রহণ করিয়া, মানবী সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়-বিহার-শক্তি দেবরাজ হইতে লাভ করেন। কিন্তু তাহা আচরণ করিলে, নারীকে যে ব্রহ্মহত্যাকারীর মতই দারুণ রোগযাতনা লাভ করিয়া দুঃখী হইতে হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অধিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে যাইয়া, জঘন্য রোগগ্রস্ত ও জঘন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নারী দেহ-সুখ, সংসার-সুখ, ধর্ম্ম-সুখ, সব বিনাশ করিয়াও তাহার তৃপ্তি করিতে সক্ষম হয় না। নারীর প্রধান গুণই জননীত্ব, তাহার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির মধ্যে তাই তাহার এই জননেন্দ্রিয়ের পবিত্রতা ও সংযম অধিকতর রক্ষার বিষয়। তাই আর্য্যঋষির একপাতিব্রত্যরূপ **সতীত্ব-ধর্ম্মানুশাসন**। আর্য্যঋষি ইন্দ্রিয় বিলাসের জন্য স্ত্রীপুরুষ মিলিত করেন নাই। সেকালে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ব্রহ্মচর্য্যরক্ষণে শিক্ষা লাভ করিত। সন্তানার্থ বিনা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সেকালে বেশ্যাগমন-তুল্য নিন্দিত ছিল। স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাহা নিতান্ত নিন্দার বিষয় ও অবৈধ বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা পাইত। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে ঋষি, মঙ্গলময়, পূর্ণজ্ঞানী নর নারীর স্বভাবকেই, সাধারণ নর নারীর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার আচরণে নিশ্চয় নরনারী সর্ব্বপ্রকারের অজ্ঞতা, অপূর্ণতা বিনাশ করিয়া, পূর্ণ মানবের জ্ঞান, শক্তি ও সুখাদি লাভ করিতে সক্ষম হয়।

শাস্ত্রোক্ত নারীত্বের উদ্ভব বৃত্তান্ত মধ্যেই নারীর প্রকৃত স্বরূপ ও

কর্ম্মবিভাগের সংবাদ পাওয়া যায়। পূর্ণ ভগবান পূর্ণাপ্রকৃতির সহিত লীলারস আস্বাদন করিয়া, সেই লীলা কর্ম্মকে নানা দেহে নানা রূপে অভিনয় দেখিতে, এই বিশ্বজগত সৃজন করিয়া দর্শন করেন। পরে সেই সৃষ্টিকে কতকদিন ধরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন ও তাহাতে প্রাণীবর্গের সৃজন, রক্ষণ ও পালন জন্য নিজের ঐশ্বর্য্যসত্তা হইতে তিন পুরুষসত্তার বিকাশ করেন বা তিনিই তিন গুণাবতার রূপে আবির্ভূত হন। সৃষ্টিজন্য ব্রহ্মা, সংহারজন্য রুদ্র, ও পালনজন্য বিষ্ণু দেবস্বরূপ, তিন পুরুষত্বের সৃজন হয়। কিন্তু বিকাশ পাইয়াও এই তিন জনই ঈশ্বর-সমাধি মগ্ন হইলেন, কর্ম্মরত হইলেন না। তখন সেই পুরুষ ত্রয়কে কর্ম্মরত লীলারত করিতে, আদি প্রকৃতিদেবী তাহার ঐশ্বর্য্যাংশে, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই চারিজন নারীর বিকাশ করিলেন। দাস্যে—সাবিত্রী, বাৎসল্যে—ভগবতী, সখ্যে—সরস্বতী, আর মধুরে—লক্ষ্মী-দেবীর বিকাশ হইল, তাহাই নারীত্বের উদ্ভব। দাস্য আলোড়নে ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া সৃজনে ব্রতী হইলেন। বাৎসল্যে রুদ্রদেবের ধ্যান গেল, তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়া সংহরণরূপ সংহারে ব্রতী হইলেন আর সখ্যও মধুর আলোড়নে বিষ্ণু কর্ম্ম রত হইয়া পালন তোষণ ও রক্ষাকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, ও তাহাদের সঙ্গে লীলাকর্ম্মে ব্রতী হইলেন। নিরস নিষ্কর্ম্মা পুরুষকে স্নেহ-সেবার আলোড়নে কর্ম্মরত, লীলারত করিতেই, নারীর উদ্ভব, তাহাই তাহাদের ঈশ্বর-দত্ত ও স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগ। এই জন্যই নারী এখনও জগতের সকল প্রাণীবর্গকে, শৈশবে বাৎসল্যভরা মাতারূপে, কৈশোরে সখ্যভরা ভগ্নিরূপে, যৌবনে মধুরভরা পত্নীরূপে, ও বার্দ্ধক্যে দাস্যভরা পুত্রবধু বা নাত্নীরূপে, সদা কর্ম্মালোড়ন দান করিয়া বিষয় পথে বিচরণ

ঋষি মতে নারীত্বের উদ্ভব

করাইতেছে। মানবের জন্মের কারণ নারী, পালনের আশ্রয় নারী, সংসার-কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ নারী, সুখের আশ্রয় নারী, তাই ঋষি নারীর নাম রাখিয়াছেন জীবপ্রকৃতি। নারী মুক্তির বাধক হইলেও প্রবৃত্তি-রাজ্যের সুখাশ্রয় ও প্রধান সহায়।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## নর নারীর দৈব স্বাধীনতার ফল ও ঋষিমতে প্রকৃত স্বাধীনতার সংবাদ।

আজকাল সকলের মুখেই স্বাধীনতা স্বাধীনতা একটী ধ্বনি উঠিযাছে। কিন্তু স্বাধীনতা কাহাকে বলে, স্বাধীনতা ব্যাপারটী কি, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানে না। আহারান্বেষণে নর, নারী, বালক, যুবক, বৃদ্ধ পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া, যাহার যাহার দেহেন্দ্রিয় প্রবৃত্তির তৃপ্তি আদি স্ব-সুখ সংগ্রহ করিবে সুখের বাধক হইলে, ভালবাসার বন্ধন, সমাজের নীতিবন্ধন, শাস্ত্রানুশাসন, সদাচার, শীলতাদি লঙ্ঘণ করিয়াও স্বার্থলাভের চেষ্টায় পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রের সঙ্গেও প্রতিযোগিতার যুদ্ধে ব্রতী হইবে, ইহার কারণ কি মানবের স্বাধীনতা? তবে মানবে আর পশুতে পার্থক্য রহিল কি? একটী সামান্য কুকুরওত একটু খাদ্য বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, প্রতিযোগিতার যুদ্ধে অনায়াসে প্রাণত্যাগ করে; তবে তারাই কি সুখী ও শ্রেষ্ঠ মহৎপ্রাণী! ঋষিমতে ইহার নাম

পিশুনতাময় পশুত্ব বা উচ্ছৃঙ্খলতা ( উৎ+শৃঙ্খলতা=শৃঙ্খলার উচ্ছেদ করা )। ইহার নাম স্বাধীনতা নহে ; উচ্ছৃঙ্খলতার অধীনতা ; দেবত্ব বিধান ছাড়িয়া অসুরত্ব বিধানের অধীন হওয়া।

মানবের স্বাধীনতা কোথায় ? হীনাঙ্গ হউক, রুগ্ন কুৎসিত হউক, ঈশ্বর দত্ত দেহই তাহার বহন করিয়া চলিতে হইবে। পিতামাতা ভ্রাতা পুত্র, নিজের বাসনা মত না হইলেও, তাহাদিগকে লইয়াই চলিতে হইবে ; ইচ্ছামতে বাছিয়া লইবার সুবিধা আছে কি ? অনিচ্ছায়ও দাঁতগুলি পড়িয়া যাইবে, চুলগুলি সাদা হইয়া যাইবে, পলে পলে দেহ বিরূপ হইয়া বাল্য, কৌশোর, যৌবন গত হইয়া বার্দ্ধক্যের জরায় কুৎসিত ও অচল হইবে ; রক্ষা করিবার স্বাধীনতা জীবের আছে কি ? তার উপর অনিচ্ছায়ও রোগ শোক, ক্ষুধা তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির উপদ্রব,—আনন্দ ভোগের কালে নিদ্রায় দেহ অবশ করিবে, আবার নিদ্রার সাধ না মিটিতে, নিদ্রা পালাইয়া যাইবে। হাতটী তোমার ইচ্ছামত ঘুড়িবে না, চক্ষু তোমার ইচ্ছামত দেখিবে না,—পদ বিনা চলিতে পার না, মুখ বিনা খাইতে পার না, তবু তুমি স্বাধীন হইতে চাও ?

জীবের স্বাধীনতা

মানব-দেহ যে, কতগুলি ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির সমষ্টি। তাহাদের প্রত্যেকের সত্ত্বা, গুণ ও কর্ম্মশক্তি পৃথক পৃথক ; তাহাদের প্রত্যেকের তৃপ্তি বাসনা পৃথক ; আবার একের তৃপ্তি অন্যের কষ্টকর। এই অবস্থায় কি করিয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির স্বাধীন বাসনা পূর্ণকরা যাইতে পারে। জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্গ অসীম, আর কর্ম্মেন্দ্রিয় বর্গ সসীম। সসীমদ্বারা অসীমের তৃপ্তি কি করিয়া হইতে পারে। তাইত পেটে না ধরিলেও আহার প্রবৃত্তির তৃপ্তি হয় না ; পা অক্ষম হইলেও হাটিবার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায়না। দেহে না কুলাইলেও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির উদ্দাম বাসনার আকাঙ্ক্ষা

স্বাধীনতার তৃপ্তিচাই কাহার ?

মিটেনা। তাহার উপরেও অধিক ভোজনে পেটের অসুখ; অধিক দর্শনে চক্ষে জ্বালা, সঙ্গীত শুনিতে রাত্রি জাগিয়া পরদিন শরীরের গ্লানি, অধিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিয়া ঘৃণ্যরোগ; জিদের বসে যুদ্ধ করিতে যাইয়া অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু লাভ। তাই জিজ্ঞাসা করি মানব স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে কাহাকে লইয়া?

একটী নৌকার প্রত্যেক কাষ্ঠ ও লৌহগুলি যদি যার যার সুখ সন্ধানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তাহাতে যেমন নৌকার নৌকাত্বই আর থাকে না, সে আর জলে ভাসিয়া থাকিতে পারেনা এবং কাহাকেও পার করিতে পারে না—অজ্ঞান মানব প্রতি ইন্দ্রিয়ের স্বাধীন বাসনা তৃপ্তি করিতে যাইয়া, তেমনি নিজের দেহও শেষ করে, সমাজেরও কল্যাণ নষ্ট করে।

অজ্ঞতার স্বাধীনতার ফল।

এইরূপ দেহের মত সংসারের, সমাজের প্রত্যেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, সংসার ও সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে, মানবের সুখশান্তিও অন্তর্হিত হইবে।

বনের বৃক্ষলতা, মানবের অধীনতায় ও তত্ত্বাবধানে উদ্যানে আসিয়া, আজ কত শোভায় সৌন্দর্য্যময় হইয়াছে, কত সুগন্ধ সুস্বাদু ফল প্রসব করিয়া জগতের সেবা করিতেছে, জীবের সেবায় ও ভগবানের ভোগে লাগিতেছে। বন্য হিংস্রপশু মানবের অধীনতা ও শাসনে শিক্ষিত হইয়া, কৃষি ও বাণিজ্যের সহায়তা করিয়া জগতের সেবা করিতেছে। অজ্ঞ মানব-শিশু গুরুর অধীনতায় শিক্ষালাভ করিলে, একজন শ্রেষ্ঠ মানব হইয়া, নিজের, সংসারের সমাজের ও জগতের কল্যাণ করিতে সক্ষম হয়। নচেৎ বন্য বৃক্ষ যেমন আলো বাতাস রোধ করিয়া কৃষির অমঙ্গল করে, সেই অজ্ঞান মানবও তেমন জগতের অকল্যাণের কারণ হয়, বন্যপশুর মত জগতের ভয়

পরাধীনতার মঙ্গল শক্তি

ও উদ্বেগ বর্দ্ধক হইয়া জগতে বিচরণ করে। স্ব+অধীনতা=স্বাধীনতা। জ্ঞান দ্বারা প্রথমে স্ব কি তাহা নিশ্চয় করা হইলে তবে তাহার স্বাধীনতায় স্বাধীন হইতে পারিবে।

প্রথমে খাজায় লিখিলে যেমন ভাবে স্বাধীন লিখার শক্তি পায় বাঁধা নিয়মে কুস্তি শিখিয়া পরে স্বাধীন কুস্তি-যুদ্ধের শক্তি পায়, তেমনি, শাস্ত্র বিধান, সদাচারের অধীনতায় মানব স্বাধীনতা-শক্তি লাভ করে। গীতায় পাঠ করিয়াছেন প্রকৃত জ্ঞানী অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্ম দর্শন করে। সেইরূপ জ্ঞানী জগত ধ্বংস করিয়াও হিংসাদোষ বা বধ পাপের ভাগী হয় না,—সে সর্ব্বপৃথিবী ভোগকরিয়াও ত্যাগী থাকিতে পারে, সন্তান জন্মদিয়াও ব্রহ্মচারী থাকে। ঋষিমতে সেই জ্ঞানীই প্রকৃত স্বাধীন, সে শাস্ত্রের বিধি নিষেধের অতীত; কর্ম্মফল বন্ধনের অতীত। সেইরূপ সত্যজ্ঞান বিকাশের পূর্ব্বে যেইজন কর্ম্ম-রাজ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে, সে আত্মঘাতীর মত সর্ব্বকল্যাণ ভ্রষ্ট হইয়া, অকালে বিনষ্ট হইবে। মহা তাপস, ঋষিকুমার, দেবশক্তি-ধর হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদির মত ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া সর্ব্ব দেবজ্ঞান আচ্ছাদন করতঃ ঘৃণ্য পশুর মত তাহাকে নাচাইবে, তাহারা জগতের সাক্ষাৎ উৎপাত স্বরূপ হইয়া জগতে অকল্যাণ বিতরণ করিবে। অজ্ঞতা ও উশৃঙ্খলতা লইয়া মানব স্বাধীন হইতে পারে না।

কেবল আর্য্য-ঋষি নহে, আরবের ইস্লাম-তাপসগণও ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। উন্নতি অন্বেষণ করিয়াছিলাম, দীনতায় (বিনয়ে) তাহা লাভ করিয়াছি। পুরুষকার (পৌরষ প্রকাদশ) অন্বেষণ করিয়া সত্য গ্রহণে পাইয়াছি। গৌরব অন্বেষণ করিয়াছিলাম, ঈশ্বর ভয়ে তাহা লাভকরি। শান্তি অন্বেষণ করিয়া বৈরাগ্যে প্রাপ্ত হই, সম্পদ অন্বেষণ করিয়া ঈশ্বর নির্ভরে তাহা পাইলাম (তেজকর আওলিয়ার

অনুবাদ তাপস মালায় বেয়াজিদ উক্তি।) সত্যই জ্ঞান ও ঈশ্বর যুক্ততা বিনা, মানব কিছুতেই অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির অধীনতা কাটাইয়া স্বাধীনতারূপ পূর্ণমানবত্ব লাভে সক্ষম হইতে পারেনা। নাবিকশূন্য ও বন্ধনহীন নৌকাকে যেমন, বায়ু প্রবাহ নানা দিকে ঘুড়াইয়া, নানাস্থানে আছড়াইয়া, অকালে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ডুবাইয়া দেয়—জ্ঞান-নাবিক ও শাস্ত্র-বিধান বন্ধন ছিন্ন নরনারীকেও তেমন ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির লালসায় টানিয়া নানা তৃপ্তি পথে ঘুড়াইয়া, নানা কুস্থানে নিয়া নানা দুঃখের আছাড়ে রুগ্ন জীর্ণ করিয়া অকালে বিনাশ করিবে।

অসীম জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আধার জীবের পরমাত্মারূপ ভগবৎ সত্তা, সীমাবদ্ধ কর্ম্মাধিকারের কারণ দেহের অধীনতাকে ভাঙ্গিয়া যে তাহার অসীম-শক্তিকে আবার জাগাইয়া তুলিতে চাহে, তাহাই জীবের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার সত্যমূল কারণ, যাহার জন্য সত্বগুণ সম্পন্ন দেবপ্রকৃতি মানব এই বিষয় জগতের সকল সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া, নিজের সকল ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়াও প্রাণপণে ঈশ্বর-সাধনায় নিযুক্ত হন সেই মুক্তিলাভ চেষ্টা জীবের স্বাধীনতা স্পৃহার প্রকৃত মূল কারণ। অজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির মোহে বা রজো ও তমোগুণ আচ্ছাদনে সেই স্বাধীন প্রবৃত্তি নানাজনে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইজন্যই স্বাধীনতাকে নানাজনে নানা প্রকারে প্রকাশ করিতেছে। ঋষিগণ সেই বিভিন্ন স্বাধীন প্রবৃত্তির কারণ ও তাহাদের প্রত্যেকের স্বরূপও সুন্দর রূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কান্দে।" এই ফাঁদের বন্ধন ছিন্ন না হইলে, জীব তাহার স্ব কে চিনিতেও পারেনা, স্বাধীন হইবার জ্ঞানও লাভ করেনা। সাধক কবি, সদ্ভাব শতক রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একটী গানে বলিয়াছেন—

স্বাধীনতা ইচ্ছার মূল

স্বাধীনতা মহারত্ন স্নেহে মোরে দিয়া তুমি,
পাঠালে ভবের হাটে সুখ কিনিতে।
হায় আমি কি করিলাম বলিতে বিদরে হিয়া,
কিনিলাম সেই রত্নে পাপতাপ দুঃখরাশি॥

আত্মার নিত্য শুদ্ধজ্ঞানকে প্রবৃত্তি ও গুণের অধীনতায় বিনষ্ট করিয়াই, মানব প্রকৃত স্বাধীনতা হারাইয়া, পাপ তাপ ও দুঃখের মধ্যে ডুবিয়া আছে। পুনরায় সেই স্বাধীনতার উদ্ধার সাধনই হিন্দুর মুক্তি-লাভ বা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ। পূর্ণ দেবপ্রকৃতিরূপ শুদ্ধসত্ত্বগুণের অর্জ্জন বিনা, কিছুতেই মানব সেই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না। ভগবদ্ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে শেষ শ্লোক দ্বয়ে বর্ণিত আছে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবংবুদ্ধেঃ পরংবুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহিশত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।

দেহতত্ত্বের পরে ইন্দ্রিয় তত্ত্ব, তার উপরে মনস্তত্ত্ব, তার উপরে বুদ্ধিতত্ত্ব ইহার উপরে যে তত্ত্ব তাহাই অর্থাৎ জীবের আপনতত্ত্ব। এই বুদ্ধির উপরের তত্ত্বকে জানিয়া পরমাত্মায় জীবাত্মাকে যুক্ত করিয়া, কামরূপ দুরাসদ অতিদুর্জ্জয় শত্রুকে জয়কর। এক কথায় দেহতৃপ্তি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, মনতৃপ্তি, কামনার অধীনতা হইতে বুদ্ধিকে পরমাত্মারূপী ভগবৎতত্ত্বের যুক্ততায় মানবত্বের পূর্ণজ্ঞান শক্তির উন্মেষ কর, তবেই জীবত্বস্বভাবের কাম ও ক্রোধ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

এই দেহেন্দ্রিয়-মন-যুক্ত বুদ্ধি ও পরমাত্মা-যুক্ত বুদ্ধি এই দুই অবস্থা ধরিয়াই শাস্ত্রে মানবের সাধারণতঃ দ্বিবিধ প্রকৃতি বিভেদ করা হইয়াছে। দেহেন্দ্রিয়-মনগত বুদ্ধিই আসুর প্রকৃতি জীব-স্বভাব, আর পরমাত্মা

যুক্তবুদ্ধি দৈব-প্রকৃতি মুক্ত-স্বভাব। দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ। গীতা ১৬-৬। আসুর-স্বভাব রজোমিশ্রসত্ত্বগুণে, শুধু রজোগুণে ও শুধু তমোগুণে আবরিত হইয়া, তিনটী বিভিন্ন প্রকৃতির সৃজন করে। শুধু তমো-আবরণে মোঘ-আশা রাক্ষসী-প্রকৃতি, শুধু রজো-আবরণে মোঘকর্ম্মা আসুর-প্রকৃতি ও রজোমিশ্রসত্ত্বগুণে মোঘজ্ঞানা মোহিনী-প্রকৃতি। এই ত্রিবিধ আসুর-প্রকৃতির আবরণেই মানবজন্ম পাইয়াও মানুষ ভূত-মহেশ্বর ভগবানের পরম ভাবকে জানিতে সক্ষম হয় না বলিয়া, তাই গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

গীতা ৯ম অধ্যায়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

ইস্লাম-সাধক জনিদও এই তিন জীবত্ব স্বভাবকে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পশু-জীবনের বন্ধন, সংসার-জীবনের বন্ধন ও মানবত্ব-জীবনের বন্ধন ছেদন করিতে পারিলে, মানব ইস্লামরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাসীর জীবন লাভ করিয়া ধন্য হয়। পশুজীবনই মোঘআশা, সংসার-জীবনই মোঘকর্ম্মা ও মানবত্ব-বন্ধনই মোঘজ্ঞানা প্রকৃতি।

মোঘআশা—আশাসম্বন্ধে অজ্ঞ, অর্থাৎ যাহারা দেহ-ইন্দ্রিয়াতীত সুখের আশাই জ্ঞাত নয়, তাহারাই মোঘআশা প্রকৃতিবান। ইহারা রাক্ষস বা পশুর মত দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তিকেই জীবনের স্বার্থকতা ভাবিয়া, যথেচ্ছাচার পথে তাহার সন্ধানে ধাবিত হয় ও সেজন্য পিতা মাতা পুত্রাদির সঙ্গেও

প্রতিযোগীর যুদ্ধ ঘোষণায় কুণ্ঠিত হয় না; একটু দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভালবাসা, দয়া, মায়া, সমাজ বন্ধনের নীতিধর্ম্ম, শাস্ত্র-শাসন, ঈশ্বর ভয়কে পর্য্যন্ত অনায়াসে বলিদান করিতে পারে। **মোহকর্ম্ম**—কর্ম্মসম্বন্ধে অজ্ঞ; জ্ঞানলাভ করিয়াও যাহারা কর্ম্মাচরণকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আচরণ করে। দয়া মায়া, ক্ষমা, ভালবাসা ইত্যাদিকে, ইহারা পরিবারে বা জাতিতে বা দেশে সীমাবদ্ধ করিয়া, মাত্র তাহাদের প্রতিই ব্যবহার করে। পরের দ্রব্য কাড়িয়া আনিয়া আপনজনে দেয়, পরের পত্নীর অলঙ্কারে নিজের পত্নী সাজায়, পরের পুত্রের মুখগ্রাস আনিয়া নিজপুত্র তোষণ করে, পরজাতি পরদেশ ধ্বংস করিয়া নিজের জাতি, নিজের দেশ সাজায় এই ভাবই আসুর-প্রকৃতি বা সংসার জীবনের বন্ধন। **মোহজ্ঞান**:—জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ; জ্ঞানলাভ করিয়াও ঈশ্বর-ভক্তি ও মুক্তি চেষ্টার প্রয়োজন বুঝে না। জ্ঞানকে বর্দ্ধিত করিয়া ইহারা নিজের তৃপ্তি যশ, মানলাভ সহিত পরসেবা, জগৎসেবা, দান যজ্ঞ, তীর্থাদি উৎসব ব্যাপার সম্পাদনে জীবনের স্বার্থকতা নির্ব্বাচন করে, এই ভাবই মোহিনীপ্রকৃতি বা নরত্ব-জীবনের বন্ধন। এই তিন আসুর-প্রকৃতির উপরে শুদ্ধ সত্ত্বগুণীয় দৈবপ্রকৃতির জীবন। সেই ঈশ্বরযুক্ত জীবনই ঋষিমতে বিশুদ্ধ পূর্ণ মানবত্ব; এই প্রকৃতিবানগণই ঈশ্বর-সাধনা-পরায়ণ হন। তাই ইস্লাম-সাধক বলিয়াছেন, পশুত্ব, সংসার ও নরত্ববন্ধন মুক্ত হইলে, মানব ইস্লামত্ব লাভ করিতে পারে। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এই ত্রিবিধ আসুরপ্রকৃতির অতীত দৈবপ্রকৃতিবানগণই মহাত্মা বলিয়া, আমাকে নানা ভাবে ভজনা করে। গীতা ৯ অঃ ১৩ হইতে ১৯ শ্লোঃ পর্য্যন্ত, দৈবপ্রকৃতি কতরূপে ভগবানের ভজনা করে তাহা বর্ণিত আছে।

শাস্ত্রে সৃষ্টিপ্রকরণে বর্ণিত আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাপুরুষ, নিজের এক এক অংশশক্তি ও জ্ঞানশক্তি হইতে দেবতা, অসুর হইতে পশু, পাখী

কীটাদি পর্য্যন্ত এক এক রূপ প্রাণিবর্গের সৃজন করেন। তাই তাহারা প্রত্যেকে বিভিন্নজ্ঞান ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম-শক্তি সম্পন্ন হয়; কেহই অন্যের মত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না। পরে সকলের মিলিতজ্ঞান ও শক্তির আধার দেহ ও প্রাণীর সৃজন করিতে যাইয়া, বিধাতা নিজের পূর্ণ দেহ ও শক্তি দিয়া আদি পূর্ণ মানব স্বায়ম্ভুব মনুর সৃজন করেন। কেবল হিন্দুশাস্ত্র নহে খ্রীষ্টিয় ও ইস্লাম শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে, আদি মানব আদমকে ভগবান নিজের মত করিয়া সৃজন করেন। তাই মানবদেহ ঈশ্বরের মত পূর্ণ দেহ, মানব ঈশ্বরের মত জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির অধিকারী। এই জন্যই জগতের সর্ব্বপ্রাণীর স্বভাবই নরের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, তাহার চিত্তকে সেইভাবে আলোড়িত করে এবং তাই ইচ্ছা করিলে মানব হীন পশুস্বভাব হইতে, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বভাব পর্য্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই জন্যই মানব-মধ্যে কেহ স্থাবর ও বৃক্ষস্বভাবে বসিয়া বসিযা থাইতে চাহে, কুক্কুর-স্বভাবে জ্ঞাতি দ্বেষী হয়. সর্প-স্বভাবে খল হিংসুক হয়, শৃগাল-স্বভাবে চোর, ব্যাঘ্র-স্বভাবে হত্যাকারী দস্যু, ইন্দুর-স্বভাবে বৃথা অনিষ্টকারী, এইরূপ আসুর-স্বভাবে দারুণসাহসী শূর বীর হয়, পিশাচ স্বভাবে পিশাচকর্ম্মা হয়. এবং দেব-স্বভাবে মহত্বভরা জগন্মঙ্গলকর কর্ম্মভাব লাভ করে। বিভিন্ন প্রাণীর স্বভাব, অপূর্ণজ্ঞান মানবকে আলোড়ন করিয়া নানা ভাবে তাহার মানবত্বকে স্বার্থক করিতে মতি দানকরে বলিয়াই, এক মানব মধ্যে বহু কর্ম্মবাদের মত সৃজন হইয়াছে। আজ কালের নর নারীর জাগরণের মূল সন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, অনেক ভাবই মানবকে পূর্ণ মানবত্বের দিকে না টানিয়া, অপূর্ণতা পশুত্বাদির দিকে লইয়া চলিয়াছে।

মানবের বিভিন্ন প্রকৃতির কারণ

... মানব বিনা জগতে কোন প্রাণীতেই আচ্ছন্ন বিবাহ-বন্ধন, নারীর

পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম নাই, স্নেহ মমতা-বন্ধন নাই ; আজ কাল নর নারীর মধ্যেও তেমন অবাধ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, স্নেহ-বন্ধনহীনতা প্রচারে তাই মতি দেখা যাইতেছে। অন্য প্রাণীতে শাস্ত্রানুশাসন, সমাজ-বন্ধন, পিতা মাতাদিসহ সংসার-বন্ধন ও ঈশ্বর-সাধনা নাই,সকলেই কর্ম্মক্ষেত্রে নিজের দেহেন্দ্রিয়-সুখ ও জীবিকা জন্য সকলের সঙ্গে, এমন কি পিতা মাতা, পুত্র পত্নীর সঙ্গেও প্রতিযোগিতার যুদ্ধে ব্রতী হয় ; তাই আজ মানব সমাজকেও তেমন করিতে মানবের মতি জন্মিতেছে। কীট-নারী যে কোন পুরুষ হইতে তৃপ্তি ও গর্ভাধান লইয়া ডিম্বপ্রসব করিয়াই মাতৃকর্ত্তব্য শেষ করে. কোকিলাদি পাখী পরের বাসায় ডিম পাড়িয়া বংশরক্ষা করে, সন্তান পালনের কষ্ট স্বীকার করে না, তাই আজ অনেক নারী যে কোন পুরুষ হইতে তৃপ্তি ও গর্ভ লইবার ডিম্বপ্রসবের মত গর্ভস্রাবে বা সন্তানত্যাগে ও পরবাসায় সন্তান পালনের মত, আশ্রমে বা দাসীর দ্বারা সন্তান পালনের পক্ষপাতী হইতেছে। পশু পাখী যত দিন মনের মিলন, একে অন্যের সুখের কারণ তত দিনই একটা স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া থাকে ; দুঃখের কারণ উদ্ভব হইলে, একে অন্যের দুঃখের অংশ বহিতে হইলেই সে বন্ধন ছেদন করিয়া নূতন সুখসঙ্গ সন্ধানে ব্রতী হয়. আজ নর নারীও এই সুখ-মিলনকেই সমাজে প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ঋষিমতে ইহার একটীও মানব নর নারীর পূর্ণ স্বভাব নহে, ইহার একটা দ্বারাও মানবের মানবত্বের সার্থকতা হইবে না, এইগুলি মানব জীবনে পশুত্বের স্বার্থকতা।

ঋষিমতে পশ্বাদির মত, একটী ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি তৃপ্তির জন্য ধর্ম্মবন্ধন ছিঁড়িয়া, যার তার সঙ্গেই উদ্দাম প্রতিযোগিতার যুদ্ধে ব্রতী হওয়া, মানবের স্বাধীনতা প্রকাশ নয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির উদ্দাম বাসনাকে জ্ঞানের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, নিয়ন্ত্রিত করিয়া চালাইবার শক্তিই মানবের স্বাধীনতা ; সর্ব্ববিধ অজ্ঞতার আলোড়ন, পশুত্বাদি আসুরত্বের আবরণ হইতে

বুদ্ধিকে উদ্ধার করিয়া, দেবত্বজ্ঞান ও সংযম আদি শক্তির সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়াই, মানবের স্বাধীনতার স্বার্থকতা। মানবের দেহে—বহু ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি, গৃহে—মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্রাদি বহু জন, কর্ম্মক্ষেত্রে—অধিপতি, সহকর্ম্মী আদি বহুজন, এই সকল বহুকে পৃথক্ত্বে রক্ষা করিয়া, কাহাকেও বিনাশ বা পক্ষপাতে বর্দ্ধিত না করিয়া, যথাযথ ভাবে পোষণ, তোষণ ও চালনার শক্তিই মানবের স্বাধীনতার স্বার্থকতা; তাইত দেহ-প্রবৃত্তি-তোষণ, পিতা মাতার সংসার-তোষণ ও ঈশ্বরের জগত্-তোষণ ও ঈশ্বর-তোষণ, ইহার একটীকেও ত্যাগ না করিয়া, সকলের তোষণে মানবত্বের যথার্থ স্বার্থকতা। এই সব কর্ম্ম সম্পাদন জন্য যে সংযম ও কর্ম্মচেষ্টা গ্রহণ করা; তাহাই মানবের যথার্থ বীরত্ব প্রকাশ রূপ যথার্থ স্বাধীনতার প্রকাশ।

সমস্ত মানবজাতির নর নারীর চরিত্র সন্ধান করিয়া দেখুন, আজ-পর্য্যন্ত যত দেশে যত প্রাতঃস্মরণীয় মানবের আদর্শজীবনী প্রচারিত আছে, যাহাদের জীবন স্বজাতিগণ গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিয়া, শত শত বর্ষ ধরিয়া আদরে পাঠ করিয়া, অভিনয় করিয়াও তৃপ্ত পাইতেছে না, সেই সমস্ত জীবনী আলোচনা করিয়া দেখুন ত, তাহা কোন্ প্রকার নর নারীর জীবন; আত্মসুখপরায়ণ আসুর-প্রকৃতির জীবন না আত্মসুখ-চিন্তাহীন ত্যাগ ভালবাসা ও ঈশ্বরযুক্ত দৈবপ্রকৃতির জীবন! আরবের লয়লামজনু হইতে ইউরোপের রোমিও জুলয়েট, ওথেলো, ডেসডিমনা, ভারতের রাম সীতা, সাবিত্রী সত্যবান, সতী মালাবতী, রাজপুত নারী পদ্মিনী ইত্যাদির জীবনী, একরূপই স্বদেহেন্দ্রিয় তৃপ্তিরহিত, পূর্ণ জীবভাব-বর্জ্জিত, ভালবাসায় আত্মাহুতির জীবন। তাইত জগতের সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ভিন্নভাষী জনগণেরও, এই সব লীলা একরূপ প্রাণতোষক, অতি আদরের পবিত্র চরিত্র হইয়া রহিয়াছে; সমস্ত জগতের নর-নারী তাই ত আজও

সর্ব্বদা এই সব জীবনী পাঠ করিয়া, অভিনয় করিয়া তাহাদের চরিত্রের পূজা করিতেছে। এমন নর নারীর জীবনই আর্য্য ঋষির নর নারীর পূর্ণতা ভরা দৈবজীবন; এইরূপ জীবনই ঋষিমতে মানব নরত্ব ও নারীত্বের সার্থকতাময় জীবন; ইহারাই প্রকৃত স্বাধীন-মানব। ঈশ্বরভয় হীন, ধর্ম্মবিধানের অধীনতাহীন, ভালবাসার বন্ধনহীন স্বাধীন-জীবন মানব জীবনই নহে; তাহা পশুজীবন মাত্র। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া, নিজের কামনামত যথেচ্ছাচার পথে বিচরণ করে, তাহা ঈশ্বর সাধনা কর্ম্ম হইলেও তাহার চেষ্টা সফল হয় না, সে ইহকালেও সুখী হয় না, পরকালেও গতি পায় না।

গীতা ১৬ অঃ

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কাম চারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ শ্লোঃ

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## ঋষিমতে আর্য্য-বিবাহ ব্যাপার ও নর নারীর পৃথক কর্ম্মবিভাগ সংবাদ!

আধুনিকভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকেই বলিতেছেন, প্রাচীন আর্য্যগণ মধ্যে একটীমাত্র বিবাহ-বিধান নির্ণীত ছিল না! কেন না, তাহা হইলে তাহারা ব্রাহ্ম, দৈব আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বলিয়া অষ্টপ্রকার বিবাহকে স্বীকার করিতেন না। ইহাতে মনে হয়, আর্য্যগণের জ্ঞানের পরিপক্কতার সঙ্গে পৈশাচ, রাক্ষস হইতে ক্রমে বিবাহ-বিধান পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান বিবাহ আকার ধারণ করিয়াছে। তাই বিবাহ বিধান পরিবর্ত্তনে হিন্দুর ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা নাই! কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই নরসমাজে জ্ঞান ও বিদ্যাসম্পন্ন মানবত্ব-স্থাপন করিতে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যখন নিজ-অঙ্গ হইতে কতজন ঋষি ও মনুর সৃজন করিলেন, সেই আদি আর্য্যমানব প্রজাপতিগণের বিবাহে, স্বয়ং বিধাতা যেই বিবাহ-বিধান মন্ত্র ক্রিয়াদির উপদেশ দান করেন, সেই এক মাত্র বিবাহ-বিধানেই, আজপর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবাসী হিন্দু-নামধারী জনগণের বিবাহকর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে। হিন্দুর বিবাহ-বিধান সেই দিনই সৃজিত হইয়াছে।

হিন্দুর বিবাহ-বিধান

স্ববর্ণ পাত্র পাত্রীর অভিভাবক মিলন নির্ণয় করিয়া, উভয়ের মিলনের শুভ অভ্যুদয় জন্য, ইষ্টরূপ ভগবান, দেবতারূপ গণেশ হইতে ইন্দ্রাদি লোকপাল, প্রজাপতি দেবতাগণের পূজা করিয়া, বংশবর্দ্ধন জন্য মাতৃকাগণ সহ পিতৃদেবতা পূজা করিবে, জগতের ব্রাহ্মণ ভক্তাদি, জ্ঞাতি স্বজন, প্রতিবেশী মানব সহ দীনদুঃখী, অন্য প্রাণীর তোষণ ও ভোজনাদি করাইয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে, পরে

পাত্র পাত্রীর মঙ্গল সংস্কার গাত্রহরিদ্রা অধিবাসাদি করাইবে, পরে কন্যার পিতা পাত্রের করে কন্যাকে, সহধর্ম্মিণী করিয়া গ্রহণ করিতে সম্প্রদান করিয়া দিবেন ; বিষ্ণুচক্র শালগ্রাম, জলন্ত অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিগণ সেই দানের সাক্ষী থাকিবেন। পাত্র সেই দানকে স্বীকার করিবেন, এবং পাত্রপক্ষ কন্যাকে যজ্ঞদ্বারা গোত্রান্তরিত করিয়া পাত্রের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ নিজ কুলের গোত্র ও সম্পদের অধিকারিণী করিয়া গ্রহণ করিবেন। এই সবের কর্ম্মবিধান ও মন্ত্রবিধান হিন্দুর প্রতিবর্ণের নর নারীরই মিলনরূপ বিবাহ-ব্যাপারের একমাত্র বিবাহবিধান। ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণে এইসব বিধান পূর্ণরূপে আচরিত হয়, অন্য হীনবর্ণে, সামান্যভাবে পুরোহিত দ্বার সেই সব কর্ম্ম সম্পাদিত হয় মাত্র, কিন্তু সকলেরই এই এক মাত্র বিধানা আদর্শ, ইহার আর প্রকারান্তর নাই।

বিবাহ একরূপে সম্পাদিত হইলেও, পাত্র পাত্রীর মিলনকে নির্দ্ধারণ করিতে কতগুলি কারণ উপস্থিত হয়। পাত্র ও পাত্রীর অভিভাবকগণ নানাপ্রকার কারণে, পাত্র পাত্রীর মিলনে স্বীকৃত হয়। তাহাই ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ হইতে রাক্ষস পৈশাচ পর্য্যন্ত অষ্ট কারণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি বিবাহের প্রকার ভেদ নহে, মিলন-স্বীকারের কারণ-বিভেদ সংবাদ। বিবাহের এই অষ্ট কারণ নিত্য ; সর্ব্বদাই জগতে, এই অষ্টপ্রকারে মিলনকর্ম্ম স্বীকৃত হইতেছে, আজ কালও হয়। এই অষ্ট কারণের মধ্যে ব্রাহ্ম্য কারণে বিবাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তারপরে দৈব, আর্ষ ; প্রজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্বা, রাক্ষস ও পৈশাচ কারণের বিবাহ ক্রমে নিকৃষ্ট, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে।

বিবাহের অষ্ট কারণ

ব্রাহ্ম দৈব স্তথাবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথা সুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসাশ্চৈব পৈশাচাষ্টমোধমঃ॥ মনুসংহিতা।

কর্ম্মমাত্রই কোথায় প্রাকৃতভাবে—মানবের জ্ঞানবোধ্য কর্ম্ম-চেষ্টায় সম্পন্ন হয়, আবার কোথায় বা দৈব—অপ্রাকৃতভাবে সম্পাদিত হয়। যেমন জন্মরূপ কর্ম্ম, পিতা মাতা হইতে সাধারণ জীবের মত জন্ম প্রাকৃত জন্ম, আর খ্রীষ্টিয়ধর্ম্ম স্থাপয়িতা যিশু অঋতুমতি বালিকার গর্ভে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে জন্মিলেন, কবীরপন্থী স্থাপয়িতা কবীরজীকে একজন পদ্ম-মধ্যে প্রাপ্ত হইলেন, রাজপুত বংশ স্থাপয়িতা চারিজন অগ্নিপুত্র ক্ষত্রিয়-বীর যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে; এইরূপ জন্মই অপ্রাকৃত দৈবজন্ম। এই দৈবসত্তা আবার দ্বিবিধ। কতকগুলি স্বতঃই দেবসত্তার বিকাশ, আর কতকগুলি ঋষিরূপ ভক্তশক্তির আশ্রয়ে পরতঃভাবে দেব-সত্তার বিকাশ। তাহাই দৈব ও আর্য্য নামে অপ্রাকৃত কারণ দ্বয়। পুরাণোক্ত পৃথিবীগর্ভ হইতে জানকীদেবীর ও গঙ্গাগর্ভ হইতে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব, এবং যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রৌপদীদেবী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, দেবতা হইতে পাণ্ডবের জন্ম, দ্রোণ মধ্যে দ্রোণাচার্য্য এবং শরস্তম্ভে কৃপাচার্য্যের জন্মই শুদ্ধ দৈব-জন্ম; আর ঋষিগণ যজ্ঞ করিয়া আশীর্ব্বাদ চরু প্রসাদ বা ফলাদি দিলেন, তাহা সেবনান্তে, স্ত্রীপুরুষযোগে সন্তান জন্মিল তাহাই আর্ষাজন্ম; এই উভয়ই অপ্রাকৃত দৈব-কারণ। বিবাহ মধ্যেও এই অপ্রাকৃত মিলন কারণ ঘটে। দৈব ও আর্ষা বিবাহই সেই অপ্রাকৃত কারণ, আর ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ কারণে মিলনই প্রাকৃত মানব-বুদ্ধি চেষ্টার বিবাহ-কর্ম্ম।

১। বিবাহের প্রাকৃত কারণ মধ্যে পৈশাচ কারণ অতি হীন। পিশাচের মত হীন উপায়ে যে বিবাহে বাধ্য করা হয়, অর্থাৎ ঋণ দানে বা বিপদে ফেলাইয়া, বা কন্যাকে গোপনে দোষিত করিয়া, পণে ঠেকাইয়া যে বিবাহে বাধ্য করা হয় তাহাই **পৈশাচ**

কারণে বিবাহ। ২। রাক্ষস কারণ ইহা হইতে কিছু শ্রেষ্ঠ। নির্ম্মম রাক্ষসের মত বলে পিতাকে নিগ্রহ করিয়া কন্যা-হরণে যে বিবাহে বাধ্য করা হয়, তাহাই **রাক্ষস** কারণে বিবাহ। কন্যার পিতাকে জয় করিয়া কন্যাহরণ করিলে, কন্যার পিতা আশীর্ব্বাদ সহ কন্যা দান করে না, কন্যাও তেমন তুষ্ট হয় না, তাই এ বিবাহও পৈশাচতুল্য হয়। তাই পরে সমাগত রাজন্য-বর্গকে বিজয় করিয়া রাক্ষস বিবাহ সম্পন্ন হইত। তখন সেই বিজয়ীকে আনন্দে কন্যার পিতা ও কন্যা বরণ করিত। ৩। ইহার উপরে গান্ধর্ব্ব কারণ। পিতার নির্ব্বাচিত পাত্রগণ মধ্যে, কন্যা যাহাকে বরণ করিবে, তাহার সঙ্গেই বিবাহ সম্পাদন এইটিই **গান্ধর্ব্ব** কারণে বিবাহ। ৪। ইহা হইতেও আসুর কারণ শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বাচিত নিমন্ত্রিত পাত্রগণের মধ্যে কোনও গুণ, বল, বিদ্যাদির পরীক্ষা লইয়া যে পাত্র নির্ণয়ে বিবাহ সম্পাদন, তাহাই **আসুর** কারণে বিবাহ। লক্ষ্যভেদ, বৃষাদির সহ নিরস্ত্রাবস্থায় যুদ্ধ, কোথায়ও জ্ঞানের বিচারাদির পণে এই বিবাহ নির্ণয় হইত। বর্ত্তমানে, মাত্র কুল, ধন, বা বিদ্যাবল দেখিয়া যে বিবাহ স্বীকৃত হয়, তাহাও এই আসুর বিবাহ। ৫। ইহা হইতে প্রাজাপত্য কারণ শ্রেষ্ঠ। উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ ও পাত্র পাত্রীর সম্মতিতে যে বিবাহ স্বীকৃত হয়, তাহাই **প্রাজাপত্য** কারণে বিবাহ।

রূপে, গুণে, সম্পদে সর্ব্বদিকে ভাগ্যবান্ নর নারীরই এই প্রাজাপত্য কারণে বিবাহ সম্পাদিত হইতে পারে। আসুরেও লোভনীয় নারীর জন্য গুণবান্ নর পণাদি পূরণের চেষ্টা করে। গান্ধর্ব্বেও শ্রেষ্ঠ পাত্র পাত্রীর মিলন সম্ভব হয়। রাক্ষস ও পৈশাচেও সুন্দরী লোভনীয়া পাত্রীর জন্য তেমন চেষ্টায় মানব ব্রতী হয়। তাই এই পাঁচটীর একটীও সকল মানবের সাধারণ বিবাহ হইবার উপযোগী নয়; তাহাতে

কুৎসিত গুণহীন নর নারীর বিবাহের উপায় হয় না। এই জন্যই ব্রাহ্ম কারণের মিলনকে ঋষিগণ হিন্দুর সাধারণ বিবাহ-বিধান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ৬। ভারতের সার্ব্বজনীন সাধারণ বিবাহ পদ্ধতিই সেই ব্রাহ্ম কারণ-ভূত মিলন। ব্রহ্মার আদেশে, আদি প্রজাপতিগণ ইচ্ছা না থাকিলেও, যেমন পত্নীগ্রহণে স্বীকৃত হন ও তাঁহার দত্ত নারীকেই সহধর্ম্মিণী করিয়া সংসার কর্ম্মে ব্রতী হন; তেমনি পিতার আদেশে, বিনা বিচারে পত্নীগ্রহণই ব্রাহ্ম কারণভূত বিবাহ। এই বিবাহের প্রচলনে হিন্দুমধ্যে অবিবাহিত নর নারী থাকিত না; তাই কুৎসিত, নির্গুণ অবিবাহিত থাকিয়া, ব্যভিচার দ্বারা সমাজকে আলোড়ন করিতে অবকাশ পাইত না। বিবাহ মিলনে পিতা মাতার প্রাধান্য থাকায়, কন্যার বিবাহ দুর্ঘট হয় নাই; নারীর নর-ধরিবার কৌশল শিক্ষার প্রয়োজন পরে নাই, নারীজাতিতে এত ব্যভিচার, স্ত্রীরোগ ও ভ্রূণহত্যা প্রবৃত্তিরও অবকাশ হয় নাই। আধুনিক সভ্যতায় পুত্র কন্যার উপর পিতার অধিকার লোপ পাওয়ায়, জগতে পৈশাচ ও আসুর বিবাহেরই প্রাধান্য হইয়াছে এবং অন্য সমস্ত কারণ লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহাতে নারী-জাতীরই দুঃখ ও দুর্গতি বর্দ্ধিত হইবে, কেন না তাহারাই যে এই সংসার ক্ষেত্রের ভিত্তি—প্রধান আশ্রয়।

এই ছয়টী যে ছয় প্রকার বিবাহ বিধান নহে, মিলনের কারণ মাত্র, তাহার প্রমাণ এইসব বিবাহের দৃষ্টান্ত মধ্যে পাওয়া যায়। এইসব কারণে বিবাহ নির্ব্বাচিত হইয়া পরে পিতাকর্ত্তৃক বিবাহ সম্পাদন হইয়াছে বলিয়া পুরাণে দেখিতে পাইবেন। আসুর মতে লক্ষ্যভেদে দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া, পাণ্ডবগণ বিবাহ করেন। রাক্ষস মতে রুক্মিণী দেবী ও সুভদ্রাকে হরণের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিবাহ করেন। ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে বিচিত্রবীর্য্যের জন্য হরণ করিয়া আনেন।

বিবাহ কালে জ্যেষ্ঠাকন্যা বিবাহ অস্বীকার করে, তাই তাহাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পরিত্যাগ করেন ; অন্য দুই জনের বিবাহ হয়। গান্ধর্ব্ব মতে দময়ন্তী নলকে বরণ করিলে, পরে পিতা কন্যা সম্প্রদান করেন। তাই বলিলাম, আসুর, গান্ধর্ব্ব ইত্যাদি মিলন-স্বীকারের প্রকার-ভেদ, বিবাহকর্ম্ম পিতা কর্তৃক কন্যা সম্প্রদান ও পাত্রপক্ষের গোত্রান্তর করিয়া গ্রহণ। এখন দৈব কারণের বিবাহ-প্রকার শ্রবণ করুন।

১। দেবযোনির সহিত অর্থাৎ দেবী আসুরী অপ্সরা গান্ধর্ব্বী, নাগিনী রাক্ষসী ইত্যাদির সহিত যে নরের সংযোগ, তাহাই **দৈব** কারণের বিবাহ। এই দৈব বিবাহ সম্প্রদান গোত্রান্ত বিনাও সিদ্ধ হইত। দেবযোনি কোনও শ্রেষ্ঠমানবকে কৃপা করিতে, এইরূপ ভাবে তাহার নিকট আগমন করেন ; কোথা বা পূর্ব্বজন্মে সে সেই দেবীকে পত্নীভাবে চাহিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই আসিতেন। এই দেবীকে গ্রহণ না করিলে, তিনি ক্রোধে অভিশাপ দিয়া অনিষ্ট করিতেন। তাই এই বিবাহ সর্ব্বকালেই স্বীকারের বিষয় ছিল। এই জন্যই রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমের পত্নীত্ব কামনা করিলে, যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠের বিবাহের পূর্ব্বেই ভীমকে রাক্ষসীকে বিবাহ করিতে আদেশ করেন। দেবীগণ দান গোত্রান্ত বিনাও ধর্ম্মপত্নী হন এবং ইহাদের সন্তানও বংশাধিকারী হয়। উর্ব্বশী পুরুরবা, গঙ্গা শান্তনু, হিড়িম্বা ভীম, উলুপী অর্জ্জুন ইত্যাদির মিলনই এই দৈব বিবাহ। ২। আর পূর্ব্বজন্মের বা এইজন্মেরই বিশেষ কর্ম্মের ফলে, ব্রহ্ম-শাপাদি নিমিত্তে বা বিশেষ প্রয়োজনে ঋষিব্যবস্থায় যে অশাস্ত্রীয় বিবাহকেও হিন্দুগণ স্বীকার করিয়াছেন, সেইগুলিই **আর্য্যকারণের** বিবাহ। কচের অভিশাপ-জন্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা রাজা যযাতির সহিত ব্রাহ্মণধর্ম্মা

ঋষির শাপজন্য শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্ত বিস্মৃত হইয়া, আর বিবাহ সম্পাদন না করিলে, সন্তানসহ উপস্থিত শকুন্তলা বৈধপত্নী নয় ও তাহার পুত্রও বৈধ রাজ্যাধিকারী পুত্র হইতে পারেনা বলিয়া, রাজা শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু উভয়ে উভয়ের শোকে মরিতে বসিলেন তখন ঋষিগণ ব্রহ্মশাপ কারণ নির্ণয়ে, সে বিবাহকে আর্য্যমতে বৈধ করিয়া দেন। এইরূপ রাজা যযাতির অশ্বমেধ পূরণ জন্য, তাঁহার কন্যা মাধবীদেবী চারিজন রাজাকে পুত্রদান জন্য, চারিবার বিবাহ করেন; পাণ্ডবের মাতৃবাক্য রক্ষণজন্য দ্রৌপদী দেবী পঞ্চ পাণ্ডবকে পৃথক পৃথক বিবাহ করিয়া, একটী করিয়া পুত্রদান করেন। ঋষিব্যবস্থায় আর্য্যমতে সেই বিবাহ সম্পাদিত হয়। দৈবাৎ এমন বিবাহকেও স্বীকার করিবার কারণ, মানব সমাজে উপস্থিত হয়, এইগুলি তাহার দৃষ্টান্ত মাত্র। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণই সেই সব বিবাহ সম্পাদনের অধিকারী। এই স্থানেই প্রচীন আর্য্য বিবাহ বিধানের কথা শেষ করিয়া ঋষিমতে মিলনের উদ্দেশ্য আলোচনায় ব্রতী হই।

এই পৃথিবীতে আর্য্য-ঋষি বিনা অন্য কোনও ধর্ম্মাচার্য্যই নর নারীর মিলন ব্যাপারকে, মানবের অবশ্যকরণীয়, অপরিবর্ত্তনীয় একটী পবিত্র ধর্ম্মসংস্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। অবিবাহিত নারী ও নর অসম্পূর্ণ মানব, তাহারা প্রবৃত্তি রাজ্যের, ঈশ্বর অভিপ্রেত কর্ম্ম সাধনের অযোগ্য, অনধিকারী, তাই অপবিত্র এমন কথাও আর কেহ বলেন নাই। হিন্দু বিনা প্রায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নর নারীই স্ব স্ব সুখের লালসায় পরস্পরের সুখতৃপ্তি দানের চুক্তিতে মিলিত হয়, এবং সেই মিলনকে সমাজ ও রাজ-শক্তি দ্বারা বৈধ করিয়া লওয়াকেই বিবাহ মনে করে। তাই সে মিলনে দুঃখের উদ্ভব হইলেই, মিলিয়া থাকিতে

অন্যপথী ও হিন্দু বিবাহের পার্থক্য

একে অন্যের দুঃখের অংশ বহিতে হইবে বুঝিলেই, অথবা মনের অমিল হইলেই কোন দোষ দেখাইয়া, রাজ-শক্তির সহায়তায় সেই বিবাহ মিলন ভঙ্গ করতঃ, আবার উভয়ে নূতন সুখের সঙ্গ সন্ধানে ব্রতী হয়। হিন্দুর বিবাহ-ব্যপার এইরূপ ভূসম্পদ ভোগের বৈধ অধিকার গ্রহণের উপরেই স্থাপিত নয়। তাহাদের বিবাহ একটী অতিপবিত্র ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরক, অচ্ছেদ্য ধর্ম্মবন্ধন। প্রবৃত্তি রাজ্যে চলিতে মানবের বিবাহ না করাই পাপরূপ অপরাধ, মিলন ছিন্ন করাও তেমন অপরাধ। এই ব্যপারের নামকরণ সন্ধান করিলেই, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিবাহ ব্যাপারের উদ্দেশ্য নির্ণয় করা যায়। অন্য সম্প্রদায়ের বিবাহ শব্দের অর্থ প্রায়ই আনন্দ-সম্মিলন বুঝায়। কিন্তু হিন্দুর বিবাহ শব্দের অর্থ বি+বহ +ঘঞ উভয়ে উভয়কে বিশেষরূপে বহনার্থে গ্রহণের নাম বিবাহ। বিশেষরূপে—নিজের গোত্রে তুলিয়া লইয়া, আপনার অর্দ্ধাঙ্গের মত করিয়া বহন বুঝায়। বিশেষরূপে—সুখে দুঃখে রোগে শোকে ইহ ও পরকালে উভয়ে উভয়কে বহন করিবে বলিয়া, অভিভাবক, ব্রাহ্মণ, দেববিগ্রহ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রহণও বুঝায়। এই বিবাহ ব্যাপার লইয়া আর্য্যঋষি যেমন গভীর গবেষণা করিয়াছেন, অন্য কোনও ধর্ম্মাচার্য্যগণ বুঝি তেমন ভাবে চিন্তা করেন নাই; অথবা সেই দেশ, সেই জাতীয় মানবের তাহা ধারণা ও পালন করার শক্তির অভাব বুঝিয়া, সে ব্যবস্থা দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই বিষয়ে ঋষির চিন্তার ধারা একটু শ্রবণ করুন।

ভগবানের একটি ইচ্ছার পূরণ করার কর্ম্ম সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষণ, অর্থাৎ সন্তান জনন। এই কর্ম্মটী একা নর কিম্বা নারী দ্বারা সম্পাদন হইতে পারে কি? বৃক্ষবীজের দুইটী অংশ একত্র থাকিলেই যেমন, সেই বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর আবির্ভাব হয়, নর ও নারীর মিলন কালেই

বংশধরের উদ্ভব। অংশদ্বয় পৃথক হইলেই বীজের মৃত্যু, কোন অংশ হইতেই বৃক্ষের উদ্ভব হয়না, তেমনি ঋষি মতে অমিলিত পৃথক নর নারী ঈশ্বরের অভীপ্সিত কর্ম্ম-সাধনের অযোগ্য, অর্দ্ধবীজ তুল্য মৃত। এই জন্যই পূর্ব্বে সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণের বিধান ছিল, অপত্নীক রাজাও যজ্ঞ করিতে পারিতেন না।

অমিলিত নর ও নারী অপূর্ণ

নর ও নারীর কর্ম্মাধিকার ভগবান্ই পৃথক করিয়া দিয়াছেন, সেই পৃথকত্ব রক্ষায়ই মানব জাতির মহাকল্যাণ ও সুখ শান্তির বর্দ্ধন হয়। সৃষ্টি কর্ম্মে পুরুষমাত্র গর্ভদান করে। আর নারী গর্ভধারণ করিয়া, নিজের শরীরের রসরক্তে দেহগঠন ও গর্ভকালের চিন্তা, কর্ম্ম, আহার বিহার দ্বারা অঙ্গের মাংসপেশী, ইন্দ্রিয় দৃঢ়তা ও মস্তিষ্কের জ্ঞান-কোষের ও প্রবৃত্তিবর্গের উন্মেষ করিয়া তোলে। আবার প্রসবান্তে পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণতায় ও সাহায্যে স্তন্যদান ও অতি সাবধানতায় স্নেহ-সেবায় পালন করিয়া, মানব প্রবৃত্তির ও কর্ম্মশক্তির প্রথম উন্মেষ করিয়া দেয়। এই পৃথক কর্ম্মবিভাগ জগতের সর্ব্বপ্রকার প্রাণীরই ঈশ্বর-দত্ত কর্ম্ম-বিভাগ। এইগুলির বিপরীত করিবার শক্তি কোনও স্ত্রীপুরুষের সাধ্যায়ত্ত কি? স্ত্রী দ্বারা পুরুষের কর্ম্মভাগ গর্ভদান ও পুরুষ দ্বারা নারীর গর্ভধারণ কর্ম্মবিপর্য্যয় করা যায় কি' তাই নর ও নারীকে পৃথকত্বে রক্ষা করা ও প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্ম্মসম্পাদন শক্তির উন্মেষ জন্য পৃথক্ শিক্ষা, দীক্ষা রক্ষা করাই জগতের মহা কল্যাণের কারণ।

নরনারীর কর্ম্মাধিকার পৃথক

জগতে এমন অনেক কর্ম্ম আছে কেবল নারীত্ব বা নরত্ব দ্বারাই সম্পাদন হয়, বিপর্য্যয় চলেনা, যেমন গর্ভদান গর্ভধারণ, আবার এমন অনেক কর্ম্ম আছে, নারীত্ব বা নরত্ব এক সত্তার দ্বারা যেমন

সহজে ও সুখে সম্পাদন হয়, বিপরীত করিতে যাইলে তেমনভাবে সম্পাদন হয় না। যেমন সেবা, শুশ্রূষা, সন্তান পালন, পরিবেষণাদি পুরুষ দ্বারা নারীর মত সম্পাদন হয় না, আবার যুদ্ধ, হিসাবাদি নির্ণয়, পৌরুষপূর্ণ শ্রমপ্রধান কর্ম্ম, নারী করিলেও পুরুষের মত সহজে, সুখে শৃঙ্খলায় পারে না। ঋষি তাঁহাদের পূর্ণজ্ঞান দ্বারা নারী ও নরের সেই কর্ম্মগুলি নির্ণয় করিয়া এই নর নারীর কর্ম্মবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম্মবিভাগ এমনি সুচিন্তিত, এত দিকের মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিয়া নির্ণীত, যে না বুঝিয়াও যদি সেই শাস্ত্রবর্ণিত কর্ম্মবিভাগ রূপ সদাচার আচরণে ব্রতী হয়, নারীর দেহে ও প্রবৃত্তিতে নারীত্বের সৌন্দর্য্য, গুণ ও কর্ম্মশক্তি এবং পুরুষের দেহে প্রবৃত্তিতে পুরুষের সৌন্দর্য্য, গুণ ও কর্ম্মশক্তি স্বভাব হইতেই সহজে পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিবে ; সেই নর ও নারীর কর্ম্ম ও জ্ঞানশক্তি তাহাদের দেহ মনের, সংসার-জীবনের, সমাজের ও জগতের কল্যাণের কারণ হইবে।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ ও তাহার অতিরিক্ত আদি পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধার চতুঃষষ্টি গুণের বর্ণনা দ্বারা, পুরুষত্বের স্বভাব, কর্ম্মশক্তি ও রমণীত্বের কর্ম্মশক্তি স্বভাবকে পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা, এই পৃথক পৃথক প্রত্যেক গুণকে উন্মেষের চেষ্টায়ই বিদ্যাদান হইত ; নারীতে নারীর গুণ ও নরেতে পুরুষের গুণ উন্মেষ করিয়া দিত। তাই পূর্ব্বের আর্য্য নর নারী দেবতাদের সঙ্গে অভেদভাবে এই ভারতে লীলা করিতেন, দেবী ও মানবপত্নী হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন, আর্য্যদের সংসার তাই স্বর্গের মতই পবিত্র ও সুখময় হইয়াছিল।

প্রজাপতি কর্দ্দম ও কশ্যপ ঋষি কেন পত্নীর এত গুণগান

করিয়াছিলেন,—ঋষি প্রদর্শিত নারী ও নরের কর্ম্ম বিভাগযুক্ত সংসারের একটুকু সংক্ষেপ পরিচয় শ্রবণ করুন, তখন নিজেই বুঝিবেন—ঋষি কত সহজ, সুখময়, জগতের কল্যাণকর স্ত্রী পুরুষের কর্ম্মবিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কোমলতাময়ী নারী যেন জল ও কঠোর স্বভাব পুরুষ যেন মৃত্তিকা; এই জল ও মৃত্তিকা একত্র মাখিয়া, ঋষি একজন কর্ম্মী মানব গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। দারুণ কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ত্তব্যের চাপে ও দুঃখ যাতনার তাপ যেন নারীর কোমলতা রূপ জল শুকাইয়া না দেয় এবং পুরুষের পৌরুষরূপ মাটী মরুভূমির বালুকা হইয়া না যায়, সেই জন্যই এই মিলন-বন্ধনের বিশেষ প্রয়োজন তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে এক দেহের দুই হস্ত, দুই পদ, দুই চক্ষুর মত, নর ও নারী দুই হইয়াও যাহাতে এক কর্ত্তব্যে, এক প্রাণতায়, উভয়ে উভয়ের সমদুঃখী হইয়া, পরস্পরের কর্ম্মে পরস্পরে সহায়তা করিয়া, জগতে কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারে; সেই জন্যই কোনও সংস্কার হীন, পৃথক অহঙ্কার রূপ নিজসুখাভিমান না জাগিতেই, পবিত্র বাল্য-কালে, পরমেশ্বরের নামে, অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনে নর নারীকে বাঁধিয়া দিবার তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন।

নিবৃত্তি-পথী নারী ও নরের মাত্র একটী কর্ম্মক্ষেত্র, একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা। প্রবৃত্তি-পথীর প্রধানতঃ দুইটী কর্ম্মক্ষেত্র, একটা প্রত্যক্ষ জন্মদাতা, পালন কর্ত্তা, জ্ঞানদাতা পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, আরটি জগন্নাথ, প্রাণের অধিপতি ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য।

নরনারীর কর্ম্ম বিভাগ

এক নারী বা এক নর দ্বারা যথার্থ রূপে এই কর্ত্তব্য দ্বয় সম্পাদন হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাই ঋষি এই দুইকে সাধারণতঃ দুইভাগ করিয়া, পিতৃ-কর্ত্তব্য নারীর করে ও ঈশ্বর-কর্ত্তব্য পুরুষের করে দান করিয়া দিয়াছিলেন। একেবারে বিভাগ নয়, অধিকাংশ কর্ম্মভার

দেওয়া হইয়াছে; পরস্পরের সহায়তায় উভয়ে উভয়-ক্ষেত্রের কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। পুরুষের সহায়তায় নারী সংসার-কর্ত্তব্য পিতৃ মাতৃ সেবাদি সম্পন্ন করিবে, নারীর সহায়তায় পুরুষ ঈশ্বর-কর্ত্তব্য ঈশ্বর আরাধনা ও জগতসেবা সম্পাদন করিবে। পুরুষ বাহির হইতে ধন ও দ্রব্য আনিয়া নারীর হাতে তুলিয়া দিবে, আর নারী-পত্নী, তাহার রমণীত্ব-গুণে সংসারের পিতা, মাতা, ভ্রাতা পুত্রাদি প্রত্যেকের রুচি বুঝিয়া, সেই দ্রব্য ও ধনে নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, আব্দারাদি সহিয়া, প্রীতি স্নেহ দিয়া সকলে ভোগ করাইবে; আবার স্বামীর দেব সেবার, অতিথি সেবার আয়োজন করিয়া, স্বামীর হাতে তুলিয়া দিবে; অনুপস্থিতি ও অসামর্থ্যে নিজেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। বহির্জ্জগতে পুরুষের বহু লোকের মনোরঞ্জন, প্রভুত্বের পেষণের মত, নারীও সংসারে শ্বশুর, শাশুরী আদি ও প্রতিবেশীর মনোরঞ্জন, তাহাদের প্রভুত্ব-পীড়ন সহ্য করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে। ইহার উপরেও পুরুষ কর্ত্তব্যভার স্বামী যখন, ভ্রাতা, ভগ্নী ও সন্তানকে শাসন ভৎসনাদি করিবে, নারী-পত্নী রমনীত্বের কোমলতামাখা স্নেহ ও প্রীতিব্যবহার দিয়া, তাহাদের শাসনের তাপাদি জুড়াইয়া তাহাদের বিষণ্ণমুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া দিবে। স্বামী ভ্রম বা ক্রোধ আদি বশে পিতা মাতার প্রতি অকর্ত্তব্য করিয়া বসিলে, পত্নী নারীকেই নির্য্যাতন সহিয়াও, সেই দোষে পিতার অভিশাপ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিতে হইবে; স্বামীকেও আবার কর্ত্তব্য পথে ফিরাইয়া আনিবে। স্বামীর যত্ন সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণে সন্তানটিকে গর্ভেধারণ ও পালন করিয়া, বড় হইলে শিক্ষার জন্য স্বামীর হাতে ধরিয়া দিবে। এই ত সংসারের দিকে, ইহার উপরেও শুধু স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যের কর্ম্মভারই বা কত।

কর্ত্তব্য বিমূঢ় স্বামীকে অধীন মন্ত্রীর মত, তাহার পুরুষ অভিমানে

আঘাত না দিয়া, বিনয়, দীনতা মাখা ভালবাসার মধ্যদিয়া, কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগাইয়া তুলিতে হইবে ; দুঃখ, দারিদ্র, অকৃতকার্য্যতায়, সমদুঃখী প্রাণের দরদী বন্ধু হইতে হইবে—সহানুভূতি, ভালবাসাপূর্ণ অভয়, উৎসাহ ও সান্ত্বনা দ্বারা স্বামীকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। রোগের যাতনায়, শ্রান্তির অবসাদে স্বামীর দাসীর অধিক হইয়া, স্নেহমাখা প্রীতির সেবায় বেদনা ডুবাইয়া, আরোগ্য ও বল বর্দ্ধন করিতে হইবে। শাসন ও উপদেশ পালনে অতিবিনীতা শিষ্যা হইবে, মঙ্গল চিন্তা ও ভোজনে মায়ের মত স্নেহ, আবদার সহিয়া সেবা করিবে, আনন্দ-উল্লাসে ভগিনীসম সাহচর্য্য ও উৎসাহ দান করিবে, আবার ইন্দ্রিয় বিলাসাদিতে নিজের অনভিপ্রেত কষ্টকর হইলেও বেশ্যার মত স্বামীর অভিপ্রায় পূরণ করিবে। এক কথায় পত্নী নারী একা, পুরুষের মাতা, বন্ধু, মন্ত্রী, ভগ্নী, শিষ্যা, দাসী ও বেশ্যা সম হইয়া, সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে সহায়তা ও প্রীতি সেবা দান করিবে ; নারীর সংসার-কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কর্ম্ম-বিভাগ এই। কেহ বলিতে পারেন নারীকে মাত্র মানুষা সেবা দান করিয়া ; ঈশ্বর ও জগত-সেবায় বঞ্চিত করা কি নারীর প্রতি সুবিচার হইল ? নারী ও নর মিলিয়া যে একটি মানব ! মানব যেই হস্তেই কর্ম্ম করুক, তাহা যেমন একজনেরই করা হয়—চক্ষে দেখি, পায়ে চলি তাহা যেমন আমি দেখিয়াছি, আমি চলিয়াছি বলি, তেমনই স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকের কর্ম্মফল ভাগী উভয়েই হয়। নারীর শ্বশুর শাশুরী সেবায়ই যে স্বামীর পিতৃ মাতৃ সেবা, তাই স্বামীর জগত সেবা ও ঈশ্বর সাধনাই নারীর জগত ও ঈশ্বর সেবা হয়। মানব যেমন ঘোড়া ও গাভীকে সেবা যত্ন করিয়া রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া, ইচ্ছামত কৃষি বা গাড়ী টানাইয়া, তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থাদি ভোগ করে। নারীও তেমন সেবা ও যত্ন দ্বারা পুরুষকে বলবান করিয়া, স্নেহ ভালবাসার রজ্জুতে বাঁধিয়া সংসারে খাটায়, কর্ত্তব্যতার বোঝা বহন করায় তাই তাহার

উপার্জ্জিত কর্ম্মফলেরও ফলভাগী হয়। গাড়োয়ান ও কৃষকের পশুসেবা ধর্ম্মের মত, তাই নারীর স্বামী সেবাই মাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তবে ঋষি ঈশ্বর সাধনে নারীকে বঞ্চিত করেন নাই, জগত সেবামাত্র পুরুষের ভাগে; ঈশ্বর উপাসনা তাঁহার স্তব ধ্যান, নামজপ, ঋষিমতে সর্ব্ব নর নারীরই সাধারণ কর্ত্তব্য। প্রবৃত্তি-পথী নর ও নারীর যার যার কর্ম্মাবসরে তাহা করিবেন, আর নিবৃত্ত পথীর তাহাই মুখ্য, অন্য কর্ম্ম না করিলেও চলে।

নারীর এই কর্ম্ম-বিভাগ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, মহর্ষি কর্দ্দম সংসার সুখের কল্পবৃক্ষ ও ত্রিবর্গ দোহনশীলা নারী বিনা সংসার কর্ত্তব্য সম্পাদনের আর উপায় নাই কেন বলিয়াছেন এবং মহর্ষি কশ্যপও কেন পত্নীকে সংসার-দুঃখ-জলধি পারের সুখময়-যান, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি জয়ের সুদৃঢ় দুর্গ স্বরূপ, অশেষ উপকারিণী গৃহিণী বলিয়াছেন। ঋষি নারীকে ইন্দ্রিয় বিলাসের খেলনাই মাত্র না করিয়া, মানব-কর্ত্তব্য সাধনের সদা সহায়তা করিতে, পুরুষের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে মিলিত করিয়াছিলেন। নারী পত্নী হইয়া পুরুষের পিতৃ ঋণ, দেব ঋণাদি শোধ করিবার সহায়তা করিতে নিজের কুল, পিতা, মাতা, গৃহ সম্পদ এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছারূপ সর্ব্বপ্রকার পৃথক স্বাতন্ত্র্যকে ডুবাইয়া মিলিত হইত। স্বামীর উপস্থিতি অনুপস্থিতি, জীবনে মরণে, সে স্বামীর কর্ত্তব্য প্রতিপালনকেই জীবনের ব্রত ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া লইত।

নারী কেবলি দান করিবে আর পুরুষ কেবল গ্রহণ করিবে, নারীকে পুরুষের দানের কিছুই নাই, এমন ব্যবস্থা ঋষি করেন নাই। পত্নীর নিকট স্বামী যেমন সাক্ষাৎ নারায়ণ,—ভগবান সদৃশ, পুরুষেরও নারীকে

নারী নির্য্যাতনের ফল

লক্ষ্মীদেবীর মত, যত্র নারী তত্র গৌরীর মত ভাবিবার ব্যবস্থা ঋষি করিয়াছেন। নারীর অবমাননা হইলে, সে সংসারের সমস্ত সুখশান্তি ও পুণ্যবল নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ঋষি পুরুষকে

শাসন করিয়াছেন! মনুর অনুশাসনে আছে। সর্ব্ববর্ণের পুরুষের উত্তম ধর্ম্ম আমি বলিতেছি। ভার্য্যা দুর্ব্বলাদি দোষে দোষিত হইলেও যত্নের সহিত রক্ষা করিবে; যে সংসারে নারীগণ পূজাপায় ( সম্মান পায় ) সর্ব্বদেবতা তাহার প্রতি তুষ্ট হন। আর যে সংসারে নারীর পূজা নাই, তাহাদের দেব-সাধনাদি সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়। যে সংসারে নারী সম্মান না পাইয়া অভিশাপ করে ( দুঃখের নিঃশ্বাসফেলে ) তাহার কৃত সমস্ত সৎকর্ম্ম নিষ্ফল হয় ও তাহার সমস্ত কল্যাণ বিনষ্ট হয়।

ইমংহি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলাঅপি। (মনুসং ৯ম ৬ শ্লো
যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে অত্র দেবতাঃ।
যত্রতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
জাময়োযানি গেহেনি শপন্ত প্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যা হতানীব বিনশ্যন্ত সমন্ততঃ॥ মনুসং ৩য় ৫৬'৫৮ শ্লো

যেই নারী আপনার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, পুরুষের কর্ত্তব্য সাধনের সহায়তা ভার গ্রহণ করিয়াছে; সর্ব্ব প্রযত্নে নিজের সুখ দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়া, পুরুষের পিতা মাতাদি সংসারের সর্ব্বজনকে প্রীতি সেবা দয়া তৃপ্ত করিতেছে, তাহাকেও বিনা মাহিয়ানায়, প্রাণাধিক ভালবাসা দিয়া, মাতা কন্যাদির অসাধ্য প্রীতি সেবা দান করিতেছে; তাহার বংশরক্ষার সহায় দেব-সাধনা অতিথি-সেবার সহায়, গৃহের শোভা, কর্ম্মের শৃঙ্খলা, রোগের সেবা, শোকের সান্ত্বনা, শ্রান্তির বল, অবসাদে উৎসাহ, বিমূঢ়তায় মন্ত্রণা, যাতনায় শান্তি, আকাঙ্ক্ষায় তৃপ্তি স্বরূপ হইয়া, কঠোর কর্ত্তব্যময় কর্ম্ম সংসারকে রমণীয় সুখশান্তিময় ধাম করিয়া তুলিয়াছে—সেই নারীকে যে পুরুষ কৃতজ্ঞতা সহ, প্রীতিসেবা দান না করে, তাহার ভালবাসার ও তাহার সেবার প্রতিদান না করে সে

পত্নী পুরুষের কি ?

নিশ্চয়ই মানব নয়, নিশ্চয় সে নরদেহে পশুরও অধম ; কেন না—প্রীতি সেবা ও স্নেহ পাইলে, বনের হিংস্র-পশুও সেই স্নেহ প্রীতি দাতার জন্য, অনায়াসে প্রাণদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, মানব কি করিয়া পারিতে পারে? যদি মানব হয়, তবে নিশ্চয় কশ্যপ ঋষির মত বলিবেন প্রিয়ে, তোমার জন্য প্রাণ দান করিয়া বা শতজন্মের কর্ম্মদ্বারাও আমি তোমার উপকারের অনুকরণ করিতে পারিব না।

কুৎসিতা পতিতা নারীও ভালবাসামাখা প্রীতির সেবায়; জীবনদাতা পিতা মাতা প্রাণপ্রিয়া পত্নী ও প্রাণাধিক সন্তানের বন্ধন হইতে কতজনকে কাড়িয়া লইয়া যায় ; তখন সেই পতিতার জন্য পুরুষ তাহার সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্যরূপ ধর্ম্ম, ঈশ্বর ভয়, সমাজ ভয়, লোকলজ্জা-শীলতা. স্নেহের বন্ধন, ধন মান এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হয় না—সেই অবস্থায় পত্নীরূপা নারীর স্নেহ সেবায় পতিরূপ পুরুষ, অভিভূত না হইয়া কিরূপে স্থির থাকিতে সক্ষম হইতে পারে? যে নারী স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে অক্ষম, সে নিশ্চয় নারীত্ব গুণ বর্জ্জিতা, তাহাকে কিছুতেই প্রশংসা করা যায় না। তবে দৈবাৎ ইহার ব্যত্যয় হয় বটে। গুণবতী সতী-রমণীকেও কদাচিৎ স্বামীসুখে বঞ্চিতা হইতে দেখা যায়, গুণবান স্বামী অনেক হীনতা স্বীকার করিয়াও পত্নী-সুখে বঞ্চিত হইতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ঘটনা; ঋষি তাহাকে দৈব-দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সাধারণ হিন্দুগণ ইহাকে পূর্ব্বজন্মের দারুণ পাপফল জন্য অদৃষ্টের দুঃখ বলিয়া থাকে। গীতায় কর্ম্মের এই অমানুষ দৈবকারণের কথা, শ্রীকৃষ্ণও স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম্মের লৌকিকী কারণ চারিটি অধিষ্ঠান—দেহ, দ্বিতীয় কর্ত্তা—কর্ম্মাভিমান, তৃতীয়ে পৃথকবিধ করণ—ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি, দেহ, চতুর্থে বিবিধ পৃথক চেষ্টা গুণাবরণ ; ইহার উপরেও অলৌকিক আরো একটি কারণ আছে, তাহাই দৈব ; তাহাই

কর্ম্মের পঞ্চম কারণ। শরীর বাক্য মনের দ্বারা মানব ন্যায্য বা বিপরীত যত কর্ম্ম আরম্ভ করে এই পঞ্চটিই তাহার হেতু। গীঃ ১৮।১৪।১৫ শ্লো।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগবিধম।
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

পুরুষ তাহার কর্ম্ম সহায়তার জন্য নারীকে গ্রহণ করিয়া তাহার বাটিতে লইয়া আসে। তাই কি করিতে হইবে, সে না বলিয়া দিলে, শিখাইয়া না লইলে, সহায়তা না করিলে সর্ব্বরূপে অজ্ঞা নারী কি করিয়া তাহার কর্ম্ম-সাহায্য করিতে সক্ষম হয়? পুরুষ যেমন নারীর সেবা, সাহায্য ও উৎসাহে বহির্জগতের কর্ম্ম সম্পাদন করে, নারীও পুরুষের সেবা, সহায়তা উৎসাহেই অন্তঃপুরের কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম হয়। তবে সাহায্য সেবা দিতে, নারী কমনীয়, বিনয় ও দীনতা মাখা কোমল ভাবে করিবে, আর পুরুষ সাহায্যাদিতে, একটু নীরস, পুরুষত্বের পৌরষ ও গৌরব মাখা ভাবে করে। নারী স্বামীর বিমূঢ়তায় অধীন মন্ত্রীর মত বুঝায়, পুরুষ গুরুর মত বুঝাইবে। নারী কনিষ্ঠের মত সমবেদনা দিয়া দুঃখে শ্রমে সহায়তা করে, পুরুষ জ্যেষ্ঠের মত সহায়তা করে; নারীর দাসীর সেবা; পুরুষের চিকিৎসকের সেবা; নারী মায়ের মত রক্ষা করে; যত্ন করে; পুরুষ প্রভুর মত পিতার মত পালন করে এই মাত্র প্রভেদ।

পুরুষই নারীরূপা লতিকার শোভার ও সুখের আশ্রয় বৃক্ষ; স্বামীরূপ পুরুষের মিলন হইতেই, নারীর দেহে ও স্বভাবে নারীত্বের জাগরণ, ও সংসার বাসনার উন্মেষ হয়। পুরুষই নারীর শোভার মূল, সুখের মূল।

পতি নারীর কি?

পিতা মাতাই ত শৈশবে তাড়াইয়া দেয়; তাহারা ধনী হইলেও নারীকে দরিদ্র পতির দারিদ্রই ভোগ করিতে হইবে। স্বামীর পরিচয়েই নারীর পরিচয়, স্বামীর গৃহ তার আশ্রয়,

স্বামীর সম্মানে তার সম্মান, স্বামীর সুখে তার সুখ। স্বামী থাকিলে নারী যেন সম্রাজ্ঞী, স্বামী বিনা তাহাকে আর কাহারই কিছু বলিবার অধিকার নাই, স্বামীহীনা নারী সর্ব্বদিকে ভিখারিণী। নারীর-দুঃখ বলিতে পতি, বাসনা মিটাইতে পতি, রক্ষা করিতে পতি। পুরুষের যেমন সংসারে পত্নী বিনা সাহায্য করিতে আর দ্বিতীয় নাই—সংসারে সকলেই তার নিকট তৃপ্তি সেবা গৃহীতা, নারীরও পতি বিনা আর কর্ম্ম সহায় নাই, সকলেই সেবা গৃহীতা। গাভীর ভার বহন ও দুগ্ধ দানের মত, পতিই নারী ও তাহার গর্ভস্থ-সন্তানগণকে বহন করে ও কষ্টার্জ্জিত অর্থে ভরণপোষণ করে; নিজে না খাইয়া খাওয়ায়, নিজে না পরিয়া পরায়, অভিলাষ মত বস্ত্রালঙ্কারে সাজায়; নামে মাত্র প্রভু হইয়া দাসের অধিক সেবা যত্ন করে; এমন স্বামীকে যে নারী পতির ভালবাসা ও প্রীতি সেবা দান করে না, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সম্মান দেয় না সে নিশ্চয় মানব রমণী নহে; দারুণ হতভাগিনী ও পশুর অধমা।

নর ও নারীর সুখাশ্রয়

ভগবানই নরত্ব ও নারীত্বকে এমন ভাব দিয়া সৃজন করিয়াছেন; নারী একটা পুরুষের ভালবাসা ও সাহচর্য্য জন্য সদা পিপাসিত এবং পুরুষও একটী নারীর ভালবাসা ও সাহচর্য্য জন্য সদা পিপাসিত; তেমন না পাইলে জীবনকে অকৃতার্থ মনে করে, কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষ অকৃতকার্য্যতা, অপমান, দরিদ্রতার দুঃখ, শ্রম ও হতাশার অবসাদে অবসন্ন হইয়া, শত শত পুরুষের সেবা উৎসাহেও তেমন বল, তেমন উৎসাহ বোধ করিবেনা; একটী ভালবাসার আশ্রয় নারী—সে অজ্ঞ বা বালিকা কেন না হক, তাহার বুকে মাথা রাখিয়া তাহার ভালাবাসা ভরা, সমবেদনা মাখা উৎসাহের সান্ত্বনা বাক্য শুনিতে পাইলে যেমন বল উৎসাহ পাইবে; তাহা অমৃত ভোজনের মত তাহার সর্ব্ব যাতনা অবসাদ ডুবাইয়া তেমন শত শত দুঃখ অবসাদ

সহিবার শক্তি আনিয়া দিবে। আবার সেই নারী যদি পুরুষকে দুঃখ দেয়! সর্ব্বজগতের স্নেহেও সেই পুরুষকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। এইরূপ নারীও সংসারে শ্বশুরাদির শাসন ভর্ৎসনাদি, প্রতিবেশীর উৎপাত, সাংসারিক দুঃখ দরিদ্রতাদিতে অবসন্ন হইলে, একটি ভালবাসার আশ্রয় পুরুষের বুকে মস্তক রাখিয়া, কাঁদিতে আকুল হইয়া উঠে। যদি সেই বুকে মাথা রাখিয়া, সেই পুরুষের সমবেদনা মাখা, স্নেহ-ভরা সান্ত্বনা ও উৎসাহের বাক্য শ্রবন করিতে পায়, তবে নিজের দুঃখ লুকাইয়া, বিষন্ন-মুখে হাসি-ফুটাইয়া তেমন শতশত দুঃখকেও আনন্দে বহন করিবার শক্তি সে লাভ করে, তখন সে নারী একাই জগতের সকলকে প্রীতি সেবা দিয়া তৃপ্ত করিতে পারে। ঋষি এই শক্তির সন্ধান পাইয়াই নারী ও নরকে ঈশ্বরের নামে, পবিত্র ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করিয়া ছিলেন। সেই বাঁধনে যাহাতে দৃঢ় ভালবাসা জাগিয়া, পরস্পরের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহে ও সুখে দুঃখে এক দেহের দুই অঙ্গের মতই সত্য সত্য সহকারী হইয়া উঠে, সেই জন্যই অচ্ছেদ্য অপরিবর্ত্তনীয় করিয়া বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছিলেন; উভয়ের স্বাধীন তৃপ্তি-বাসনার উদ্ভবের পূর্ব্বে, কৈশোরে মিলনকেই তাই ঋষি সমর্থন করিয়াছিলেন।

নারী ও নরের কর্ম্মবিভাগে নারীত্ব নরের নিকটে যাহা যাহা কামনা করে, যাহা পাইলে নারীত্ব সার্থক হয়, পুরুষ-স্বভাব জাগিয়া নারীর নারীত্বকে বিকৃত করিতে না পারে, তাহা নির্ণয় করিয়া নারীর শিক্ষা, আশ্রম, কর্ম্মবিভাগ ও কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুরুষেরও এই সব বিচার করিয়া, তাহার পুরুষত্বের জাগরণ, সার্থকতা ও বিকৃতির বাধা করিয়া, শিক্ষা ও কর্ম্মবিভাগাদি নির্দ্দেশ হইয়াছে; ঋষি কাহারও প্রতি পক্ষপাত বা নির্য্যাতন বুদ্ধি করিয়া এই কর্ম্ম বিভাগ গঠন করেন নাই।

## কর্ম্মবিধানে ঋষির চিন্তার ধারা।

শৈশব ও কৈশোরই মানবের স্বাভাবিক শিক্ষার কাল! শিশু স্বভাব হইতেই হাটা শিখিতে, কথা কহিতে, এটি ওটি কি জানিতে কত চেষ্টা করে। শিশু শত আছাড় পড়িয়া ব্যথা পাইয়াও হাটিতে চেষ্টা করিবে, শত বার ধমক খাইয়াও এটি কি, ওটী কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহিবে—ঈশ্বর-ইচ্ছারূপ এই স্বভাবই তাহাকে শিক্ষার দিকে টানিতেছে। এইরূপ যৌবনে যশ, সম্মান ও অর্থার্জ্জন-প্রবৃত্তি ও বার্দ্ধক্যে প্রভুত্ব ও সেবা ভোগের মতি সমস্তই মানবের স্বাভাবিক ঈশ্বরদত্ত ভাব। ঋষি, শিশু ও কিশোরের জ্ঞান পিপাসাকে সত্যই সার্থক করিতে, তাহার বালস্বভাব গল্প প্রিয়তা ও খেলিবার মতিকে শিক্ষা মাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই হিন্দুর গল্প ও খেলার শিক্ষা।

হিন্দুদের সন্তান পালন মধ্যে পুত্র ও কন্যার পালনের পৃথক ব্যবস্থা ছিল। পুত্রকে অধিক যত্ন ও ভোগাদি দিয়া, কন্যাকে শৈশব হইতেই কষ্ট সহন, অনাদর সহন, ভোগত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হইত। ঘরে ঘরে ছড়া বলিয়া, গল্প বলিয়া শিশু পালন হইত। খাইবার সময় শুইবার সময় বৃদ্ধগণ এই গল্পের ছলে, নারীত্ব কি, নারী স্বামীকে কেমন ভালবাসিবে পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুরীকে কেমন ভাল বাসিবে, তাহাদের সেবা করিয়া, নির্য্যাতন সহিয়া পরে কত কল্যাণ, কতসুখ লাভ করে এবং পুরুষত্ব কি, সে কেমন সাহসী, ত্যাগী, দৃঢ়-কর্ম্মা হইলে, শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়, শ্রেষ্ঠা পত্নী পায়, পিতা মাতার আশীর্ব্বাদে দুঃখ বিপদ মুক্ত হইয়া যশে সুখে জীবন সার্থক করে, সর্ব্বদা তাহাই শ্রবন করান হইত। সে সব গল্প শ্রবনে সেই কালের বালক বালিকা, শৈশবেই নিজে সাজাইয়া গল্প বলার শক্তি অর্জ্জন করিত, আর গল্প হইতে তাহাদের আদর্শ সম্বন্ধে

গল্পে শিক্ষা

ধারণার ধ্যান নির্দ্দিষ্ট হইত। কন্যাদিগকে মেয়েলী ব্রত ছলে ভোগ-বর্জ্জন, উপবাস সহন, ঈশ্বর-চিন্তন ও স্বামী, পিতা মাতার মঙ্গল কামনা-জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা শিক্ষা করান হইত। পূর্ব্বে হিন্দু-পুরুষের অষ্টম হইতে ষোড়শ বর্ষ মধ্যেই দীক্ষা লইয়া ঈশ্বর সম্বন্ধিত হইবার নিয়ম ছিল।

খেলাঘর একটি স্কুল-ঘর তুল্য ছিল! পুতুল দিগকে পিতা মাতা, পুত্র বধূ আদি করিয়া সেই স্থানে সংসার লীলাই খেলাভাবে সম্পন্ন করিত। ছেলে মেয়ের বিবাহ হইতেছে, হিন্দুর পূজা উৎসব হইতেছে, পাকশাক, নিমন্ত্রণ আনন্দাদি সবই অভিনয় হইতেছে, ঠিক না হইলে দিদিমা ভুল দেখাইয়া দিতেছে। খেলার মধ্যে শিশুর মনে কেবল আত্মভোগের জল্পনা না জাগিয়া, দশজন লইয়া সংসার করিবার লালসা জাগাইয়া, সকল কর্ত্তব্য শিক্ষাদান হইত। খেলাঘরেই বালিকা, নারীর কর্ম্ম, লেপাপোছা—তরকারী প্রস্তুত, মসলা পেশা, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুতের ক্রম মিষ্ট পিষ্টকাদি প্রস্তুতের আকার রচনা, বিবাহাদির আলপনা জয়ধ্বনি গীত, সন্তানের যত্ন পর্য্যন্তও শিক্ষা পাইত; আবার পুরুষও, পুরুষ-কর্ম্মভার লইয়া কেহ মুদী, কেহ কুলী, কেহ পুরুত ইত্যাদি হইয়া পুরুষ কর্ত্তব্য শিক্ষা পাইত। ইহার উপরেও পুরুষের ব্যায়াম-সাধন খেলাও ছিল। তাহাতে প্রায়ই শ্বাস-জয় সহ ক্রিয়াছিল, আজ কালের তাস বা ফুটবলাদির মত বৃথা খেলা ছিল না; গল্পের মধ্যেও বর্ত্তমানের উপান্যাসের মত বৃথা গল্প পূর্ব্বে ছিল না। তাহাদের গল্পের বিষয় ছিল, মানব হৃদয়ে ভালবাসার জাগরণ ও ঈশ্বর সম্বন্ধিত সত্য মানবত্বের জাগরণ করিয়া, যাহাতে হীনতায় ঘৃণার উদয় জন্মায় এমন চরিত্র প্রদর্শন।

খেলায় শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষিতগণের বিশ্বাস, সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা অক্ষর পরিচয় দান করিতে পারিলেই, দেশের কল্যাণ হইবে, সকলে জ্ঞানবান হইবে। অক্ষরজ্ঞান বিনা মানব জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারেনা বটে, কিন্তু

অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে জ্ঞানের কোনও সম্বন্ধই নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞানী মহাপুরুষই অধিক অক্ষরজ্ঞানী ছিলেন না বলিয়া শুনা যায়। যিশুখৃষ্ট, মোহাম্মদ, কবির, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবাদি ও আকবর, শিবাজী, রনজিৎ সিংহ, কেহই পণ্ডিত ছিলেন না বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়, আবার অনেক লিখাপড়া জ্ঞানীকে, প্রকৃত জ্ঞানহীন পাষণ্ড হইতে, দেশের, সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে দেখাযায়, তাই ঋষি জ্ঞানোপদেশ শুনাইয়া সাধারণকে জ্ঞান দানের ইচ্ছায়, মানবের সঙ্গিতপ্রিয়তা গল্পপ্রিয়তাকে শিক্ষা মাখিয়া প্রচার করিতে যত্নবান হইয়া ছিলেন। হিন্দু-ভিখারী তাই ঈশ্বরের গুণ বা বেদান্তের তত্ত্ব সঙ্গীত করিয়া ভিক্ষাকরে। হিন্দুর কথক, কীর্ত্তনকারী ও যাত্রা অভিনেতা হিন্দুশাস্ত্রের বর্ণিত আদর্শ চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া, হীনাচার পাপের দ্বারা মানব কেমন জগতের সর্ব্বদিকে অশান্তি ও দুঃখের কারণ হয়, নিজেও দুঃখভাগী হয় এবং মহত্ত্ব পুণ্যাচার কেমন তাহার, তাহার সংসারের ও জগতের কল্যাণ ও সুখকর হয়, তাহা প্রদর্শিত হইত, আর এই সংসার-রাজ্যের অতীত ঈশ্বর-রাজ্যের সংবাদ—ভক্তের প্রতি ভগবানের অমানুষ কৃপা-বর্ষণে দুঃখ তাপ ও বিপদনাশ বর্ণনা করিয়া, সর্ব্ব মানবকে পাপে ঘৃণা ধর্ম্মে ও ঈশ্বরে প্রবৃত্তি উদয়ের চেষ্টা করিত। এই উপায়ে ভারতের সাধারণ হিন্দু অক্ষর জ্ঞান হীন হইয়াও সকলেই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন করিতে সক্ষম হইত। নিজে ভাষা শিখিয়া নিজে পড়িয়া শাস্ত্রের তেমন যথার্থ বোধ অনেক সময়েই অসম্ভব হয়, তাই ঋষি এই সঙ্গীতে জ্ঞান দানকে অতিমহৎ কর্ম্ম বুঝিয়া ছিলেন। শাস্ত্রের এইকথা কীর্ত্তন ও অভিনয় দানকে ঋষি মহাপুণ্যদ, নানা কল্যাণ ও ঈশ্বর কৃপা লাভের উপায় বলিয়া, গৃহস্থগণকে এই সব করিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই এইগুলি মহাকল্যাণ-জনক মানব-সেবা। আধুনিক-

সঙ্গীতে শিক্ষা।

জ্ঞানে বালককে কষ্ট পাইতে দিও না, শিক্ষাকালে বালক বালিকাকে বিনা শাসনে শুধু স্নেহের দ্বারা শিক্ষা দান উচিত বলেন। ঋষিমতে, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।" মাত্র পঞ্চবর্ষই কেবল স্নেহ দিয়া পালন করিয়া, তার পরের দশবর্ষ কেবল তাড়না দ্বারা শিক্ষাদান কর বলা হইয়াছে। ষোড়শ বর্ষের পরে আর তাড়না করিও না, কেন না, তারপরে শিক্ষা কাল কিশোর গত হইয়া গেল, যৌবনের প্রভু-স্বভাব আগমন করিল; তখন তাড়নায় তাড়না পাইতেই হইবে। "প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ॥ তাড়না বিনে বালকের শিক্ষাই পূর্ণ হইতে পারে না! তাই ঋষি তাড়নার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহারা এই শিক্ষার কাল দশবর্ষের মুহূর্ত্তও শিক্ষাবিনা বৃথা ব্যয়ে প্রস্তুত ছিলেন না; তাইত তাঁহারা সেকালে ষোড়শবর্ষেই মানবকে কর্ম্মীমানব করিয়া গড়িতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। যৌবনাগমে জীবের হৃদয়ে দেহেন্দ্রিয়-ভোগের কর্ম্মবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাহার পূর্ব্বেই কর্ত্তব্যবিষয়ে জ্ঞানবান না করিতে পারিলে, যুবকের কর্ম্মোদ্যম-পূর্ণ হৃদয়ে কর্ত্তব্যের দাগ অঙ্কিত করা বড়ই কঠিন হইয়া পরে; আর যৌবনে অধীনতা ও শাসন-সহন বড়ই কষ্টকর—অথচ মানবের শিক্ষনীয় বিষয়ই অধীনতা, শাসন ও কষ্ট-সহন; তাই হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ ভাগবতে তিরস্কার সহন একটী অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ১১শস্কন্ধ ১৩শ অঃ

কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর চাই—দেহেন্দ্রিয় সংযম করিয়া কর্ম্মসম্পাদনের জন্য দৃঢ় প্রযত্নে চেষ্টা, শ্রম, ধীরতা, সম্পাদন-কৌশল, বিঘ্নবাধায় স্থিরতা, বিঘ্ন উত্তীর্ণের কৌশল, এবং অকৃতকার্য্যতার আঘাত—প্রভুত্বের পীড়ন, পর-নির্য্যাতন, নিন্দা, অপমান, দুঃখ ও দারিদ্রতা সহিয়াও কর্ত্তব্য পথে চলিয়া যাইবার শক্তি-অর্জ্জন।

মানবের শিক্ষায় বিষয় কি

দুঃখ ভোগ বিনা ইহার শিক্ষা হয় কি? এই জন্যই কেবল দুঃখ, অধীনতা

নির্য্যাতনাদিই মাত্র শিক্ষনীয় বিষয়। তাই ঋষি, নর নারীর শিক্ষাকাল এই কিশোর বয়সকেই বহু দুঃখ, অধীনতা, ভোগত্যাগ, তাড়না ভৎর্সনা-ময় করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋষি ব্যবস্থায় রাজপুত্রও সুখের পিতা মাতার আদর, রাজপ্রাসাদের সুখ ছাড়িয়া, দুঃখের গুরু-গৃহ বনে অধীনতা, দারিদ্র্যাদি ভোগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনে যাইতে হইত। এই জন্যই নারীও কৈশোরেই পিতৃগৃহ ছাড়িয়া শ্বশুর গৃহে বধূজীবনের অধীনতা, নির্য্যাতন, দুঃখের মধ্যে যাইবার ব্যবস্থা ছিল; শিশু কালের নির্য্যাতন দুঃখাদি সহিয়া, শিক্ষাপ্রাপ্ত পূর্ব্বের হিন্দু কর্ম্মী-নর নারী সংসারের শত দুঃখ বিপদেও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে নাই বা কর্ত্তব্য ভ্রষ্টও হয় নাই, শত প্রলোভনেও বিমুগ্ধ হয় নাই।

শিক্ষা বিপর্য্যয় ও নরনারীর কর্ম্ম বিপর্য্যয় অর্থাৎ শিক্ষা ও কর্ম্মাধিকার পৃথক করিয়া না লইলে, নরত্ব ও নারীত্বের সর্ব্বনাশ হয়। প্রত্যেক জীবদেহে একই আত্মাসত্তা প্রবেশ করিয়াও, কর্ম্মপ্রকাশক দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির বিভেদে, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর স্বভাব প্রকাশ করে। একই আত্মা নারীদেহে নারীভাবে ভোগের প্রবৃত্তি, পুরুষ দেহে পুরুষ ভাবে ভোগের প্রবৃত্তি লইয়া প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক দেহেই লজ্জা, দীনতা, ভালবাসা ইত্যাদি কোমল-বৃত্তিরূপ রমণীপ্রকৃতি ও সাহস, বীরত্ব, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি কঠোর পৌরষ বৃত্তিরূপ পুরুষ-প্রকৃতি প্রকাশক মস্তিকের মগজকোষ ও দেহের মাংশ-পেশীও শিরায় গ্রন্থি আছে। কৈশোরবয়সে চিন্তা ও কর্ম্মদ্বারা সেইগুলির পুষ্ট করিয়া তোলাই শিক্ষা দানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পুরুষ ভাবের আলাচনা ও কর্ম্মদ্বারা পুরুষপ্রকৃতির উন্মেষে, পুরুষ-মস্তিষ্ক-কোষ, পেশী ও গ্রন্থীআদির পূর্ণতা বিকাশ হয়, আর নারীভাবের আলোচনা ও কর্ম্মে নারীত্বের পূর্ণতা ও বিকাশ হয়। তাই নারী যদি কৈশোরে

শিক্ষা বিপর্য্যয়ের ফল

পুরুষত্বের আলোচনা ও কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহাতে তাহার দেহে, মনে, স্বভাবে নারীপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া, আকারে স্বভাবে পুরুষত্বই জাগিয়া উঠে, তখন তাহা দ্বারা সংসারের নারীকর্ম্ম সম্পাদন কষ্টকর হইয়া উঠে। তেমন নারী সন্তান প্রসব করিতে যাইয়া, অপূর্ণ জননেন্দ্রিয় জন্য রোগে পড়ে, সন্তান রুগ্ন হয় বা শৈশবেই মারা যায়; নারীও প্রসব করিয়াই রুগ্ন হইয়া পড়ে, চিরকাল যোনি-রোগী হয়; নারীর স্তন-পেশীর অপূর্ণতায়, তাতে দুগ্ধ হয় না, রোগ হয়। এই সব ত দেহের কষ্ট, প্রকৃতিতেও নারীত্বের স্নেহ সেবা, পরের মনোভাব, সুখ দুঃখ চিন্তাকরিয়া চলার শক্তি, অধীনতা শাসন সহিয়া, নিজের দুঃখ লুকাইয়া প্রীতি সেবা দান-শক্তির বিনাশ হইয়া যায়। তখন সেই নারী ভালবাসার সেবার মধ্যে যে, স্বর্গসুখ হইতেও একটী আত্মভোলান সুখাস্বাদ আছে—যাহার আস্বাদ পাইলে, দাস প্রভুর সেবায় আত্ম-প্রাণপর্য্যন্ত দান করে; মাতা সন্তান হারাইয়া উন্মাদিনী হয়, সখা সখার বিপদ স্বমস্তকে তুলিয়া লয়, পত্নী মৃতপতির চিতায় ঝাপাইয়া পরে, সেই আনন্দের আস্বাদই পায় না। তখন সংসারের সেবা করিয়া সে নারী সুখী হয় না; আর যাহাদের সেবা করে তাহারও সেবা পাইয়া সুখী হয় না। নারীর পৃথক শিক্ষা ও কর্ম্মবিভাগ শৃঙ্খলার উচ্ছেদ হওয়ায়, নারীর দেহ সুখ—সৌন্দর্য্য গৌরব, নারীত্বের গৌরব, ভালবাসা ও প্রীতি দান শক্তি ও কর্ম্মের গৌরব পরসেবা শক্তি প্রায়লোপ পাইতে বসিয়াছে; জগতের আধুনিক শিক্ষিতা নারীগণেরদিকে দৃষ্টি করিলেই তাহার সত্যতা বুঝা যায়। এই নারীর বিকৃতি ঘটায় পুরুষেরও সকল মানব জাতিরই সর্ব্বদিকে অকল্যাণ অশান্তি ও দুঃখের কারণ হইয়াছে; জগত স্নেহ, মমতা দয়া ত্যাগ হীন হইয়া জীবন যাত্রার কারখানা গৃহ বা স্বার্থান্বষণের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; মানব পশুপালের মত পিতামাতা, সমাজ, ঈশ্বরকে ভুলিয়া, কেবল নিজের সুখ স্বার্থ সন্ধানে

ধাবিত হইয়াছে ; পশুপালের মতই পিতামাতা ভ্রাতাদিকে কষ্ট দিতেও এখন দুঃখিত নয় ; সকলেরই মাত্র দেহেন্দ্রিয় তোষণই জীবনের কাম্য হইয়া উঠিয়াছে আজ নারীত্বরে পিতা মাতা ভ্রাতার স্বামীর কল্যাণের অনুশাসনকে দুর্ব্বল অধীনের প্রতি প্রবলের প্রভুত্ব প্রকাশক শাসন ও নির্য্যাতনই বোধ করিতেছে। সেই জন্য কি পিতৃগৃহে, কি ভ্রাতৃ গৃহে বা স্বামি পুত্র -সঙ্গে কোথায়ও মিশিয়া থাকিতে সক্ষম হয় না ; যে স্থানে থাকে তথায়ই কলহ, মতদ্বৈধ, অশান্তি, অসুখ ময় করিয়া তোলে ; অথচ স্বাধীন ভাবে স্বার্থ অর্জ্জন করিতে যাইয়া, আজ নারী পরের নিকট গোপনে কত হীনতাপূর্ণ অধর্ম্মের অপমান, অধীনতার নির্যাতনই না নীরবে সহ্য করে ; নারীত্বের বিকৃতিই নারীর এই দুরবস্থাও দুঃখের কারণ।

জীবের বয়সের মধ্যে ঋতুবিভেদের মত একটা স্বাভাবিক বিভিন্নতা আছে। বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের আকৃতি প্রকৃতি আকাঙ্খার বিভেদের মত, রসসঞ্চার বিষয়েও বিভেদ আছে। বাল্য বাৎসল্যের মূর্ত্তি —তাই পশু শিশু হইতে মানব-শিশু পর্য্যন্ত দেখিলেই সকলের মনে বৎসলভাব স্নেহ ও পালনের মতির উদয় হয় ; আর প্রত্যেক শিশুরই বাৎসল্যের সেবা গ্রহণের শক্তি ও স্বভাব থাকে। কৈশোর সখ্যের মূর্ত্তি —তাই কিশোর বালকের সঙ্গে মাতা পিতা, এমন কি বৃদ্ধ ঠাকুর দাদা পর্য্যন্ত সখ্যের খেলার পরিহাসে মাতিয়া যায়! কিশোর কিশোরীও সকলের সঙ্গে সখার মত অসঙ্কোচে মিশে, সখ্যভাবে খেলা করে, এটা তাহার স্বাভাবিক কিশোর স্বভাব। যৌবন দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি ভোগ সংযুক্ত মধুর রসের-মূর্ত্তি তাই যুবতি দর্শনে বৃদ্ধেরও চিত্তচঞ্চল হইতে চায়, যুবক দর্শনে বৃদ্ধেরও ভোগ বাসনার আলোড়ন জাগে ; যুবক যুবতির ভোগশক্তি স্বাভাবিক। বার্দ্ধক্য দাস্যরসের মূর্ত্তি-তাই যে কোনও বৃদ্ধ দর্শনেই প্রভুর মত সম্মান ও সেবা করিতে মতি আসে ; বৃদ্ধ হইলেই

সে মূর্খ কেন না হউক, বালক ও যুবককে উপদেশ ও শাসন করিতে ইচ্ছা করিবে, এইটী তাহার বৃদ্ধ স্বভাবের গুণ। তাই বাৎসল্য বা সখ্যের মূর্ত্তি কালেই বালিকাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠানকে ঋষিগণ অধিক সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে সেই বধূ স্ব স্বভাবেই সেই পরিবারের বাৎসল্য ও সখ্যের অধিকারী হইতে পারিত। যুবতি তাহার যৌবন-স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন-মতে ভোগেচ্ছাকে দমন করিয়া, কিছুতেই নূতন সংসারের সকলের শাসন মানা ও তাহাদের প্রীতিসেবায় মন দিতে সক্ষম হইবে না; অধীনতা, শাসন, ভোগেবাধা, দারিদ্রতাদি কষ্ট-সহন যৌবন-দেহের বড়ই কষ্টের বিষয়।

পুরুষ যেই জন্য পত্নীগ্রহণ করে কর্ত্তব্যে অর্দ্ধাঙ্গিনী, সংসারধর্ম্ম পিতৃঋণ দেবঋণাদি শোধের সহায়, সহধর্ম্মিণী হইয়া, কর্ম্ম পথকে সুখময় করিয়া যথার্থরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইবে; তাহা না হইয়া যুবতি পত্নী, বিশেষ আধুনিক পুরুষের মত শিক্ষিতা-পত্নী তাহার বাধকই হইয়া উঠিবেন। যুবকের যৌবন দেহে, দেহেন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির ভোগের আধার যুবতি-পত্নীকে হাতে পাইয়া, স্ব স্বভাব ভোগকে ত্যাগ করতঃ সংসারের কর্ত্তব্যনীতি আদি রক্ষা করা, অতীব কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে, তাই ঋষি যুবক যুবতির মিলনকে তত সমর্থন করেন নাই, নিষেধও করেন নাই; কেন না, শাস্ত্রে যুবতি-বিবাহের প্রমাণও পাওয়া যায়। যেমন দ্রৌপদী, সুভদ্রা বিরাট কন্যা উত্তরা, অনিরুদ্ধ-পত্নী ঊষা দেবীর বিবাহের অল্প সময় পরেই সন্তান হওয়ার সংবাদ দেখা যায়। তবে ইহাও প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সব কন্যাকে পিতা মাতা, অতি সাবধানতাসহ রক্ষা করিতেন; শ্রেষ্ঠ রাজা, প্রসিদ্ধ গুণবতী রূপবতী কন্যাকেই তেমন যত্নে রাখিয়া বড় করিয়া বিবাহ দান করিয়াছেন তাই সে ব্যবস্থা অসাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্গত, সার্ব্বজনিন বিধান নহে।

হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, লতা-জাতিয় বৃক্ষের যেমন, চারা অবস্থায়ই অপর বৃক্ষাদি আশ্রয়জন্য আঁকড়া নামে একরূপ প্রশাখা দেখা দেয় ও সেই প্রশাখা যাহাই সম্মুখে পায় তাহাকেই বিশেষরূপে আঁকড়াইয়া ধরে, সে বিচার করে না, সেই আশ্রয় তাহার ভার সহিবে কি না বা তাহাকে তাহার বিকাশের ও কল্যাণের পথে টানিয়া নিবে কি না—নারীরও তেমন কৈশোরেই পুরুষ আশ্রয়ের জন্য মনোবৃত্তিতে ভালবাসার একটী স্বভাব জাগিয়া উঠে ও যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই সেই ভালবাসা আশ্রয় করিয়া বসে, তাতে সে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তার অবসর পায় না। সেই সময়—আছশ্বতুর পূর্ব্বে, সেই কালে বিবাহ না দিলে—লতা যেমন আঁকড়াইয়া ধরিয়া একদিকে ধাবিত হইলে, আঁকড়া ছিড়িয়া অন্যদিকে টানিয়া লইলে, লতার সজীবতা ও বৃদ্ধিসহ ফল ফুলাদির হানি হয়, নারীও কিছু আশ্রয় করিয়া বসিলে, তাহাকে ত্যাগ করাইতে তাহার নারীত্বের অনিষ্ট হয়। এই জন্যই ঋষিমতে কিশোর বিবাহই সাধারণ বিবাহ বিধান ছিল। তবে যাহারা বিশেষ ভাবে কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিতেন ও কন্যাগণও বিশেষ গুণবতী হইতেন, তাহাদের অনেক বয়সে বিবাহে নিষেধ ছিল না। এই জন্যই একদিন হিন্দুর সর্ব্ববর্ণ নমস্কৃত কুলিন-ব্রাহ্মণ-বংশে নারীগণ বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিলেও তাহা নিন্দার ছিল না; তাঁহারা বিশুদ্ধ স্বভাব দ্বারাই সকলের পূজা ও সম্মান পাইতেন। যে দিন সেই বিশুদ্ধতা হইতে তাঁহারা পতিতা হইলেন, তখনি তাহাদের মধ্যেও বাল্য-বিবাহ স্থাপনের প্রয়োজন পরিল। সেই ত্যাগের মূর্ত্তি কুলিন-কুমারী-জীবন আজ হিন্দুর কল্পনার সামগ্রী হইয়াছে, আধুনিক জ্ঞানী তাহাকে অসম্ভবই মনে করে। নিজ দেহের স্বতন্ত্র ভোগ-প্রবৃত্তির উন্মেষের পূর্ব্বে বিবাহ হইলে, নিষ্কামভাবে মিলন ও সতী

সত্য ভালবাসার উদ্ভব হয়। চারা-গাছকে তুলিয়া লাগাইলে সে বেশ সতেজ হইয়া বর্দ্ধিত হয় ও পূর্ণ ফলাদি প্রসব করে। বড় বৃক্ষকে অন্যত্র তুলিয়া লাগাইলে, হয়ত মরিয়াই যায়, নচেৎ ক্ষাণজীবী হইয়া হীন ফল পুষ্প প্রসব করে; তাই পর সংসারে বধূ নিতে হইলে বাল্যকালই শ্রেষ্ঠকাল। চাড়া-গাছ ইচ্ছামতে বক্রাদি করা যায়, তাই নূতন গৃহে কিশোরী বধূই নূতন রূপে গঠিত হইতে পারে। দুইটী চাড়াগাছ না মিলাইলে জোড় কলমই হয় না, তাই মিলাইবার নর নারী উভয়েই কিশোর হইলে ভাল মিলন হয়। এই সব কারণেই নারীর স্বতন্ত্র বাসনা জন্মিবার পূর্ব্বে, যে স্থানে যাহাদিগকে লইয়া তাহার জীবন কাটাইতে হইবে, যে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্য-সাধন করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে পরিচয় করিতে ঋষি কিশোরী-কন্যা ব্যবস্থা দিয়াছেন। পুরুষও যাহাতে স্বভাব-মিত্র পিতা, মাতা ভ্রাতাদির মতই পত্নীকেও ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া লয়, পিতা, মাতা, পুত্র, কুৎসিৎ নির্গুণ হইলেও যেমন ত্যাগের নহে, তাহাদের দোষ ত্রুটী সারিয়া লইয়াই সংসার-কর্ত্তব্য সাধন করে, তেমন ভাবে পত্নীকেও গ্রহণ করিতে ঋষি পুরুষের কিশোর বিবাহই সমর্থন করিয়াছেন।

আধুনিক নর নারীর মিলন শুধু ভোগার্থে, কিন্তু ঋষিমতে হিন্দু-বিবাহ তাহা নয়। উভয়ের সহায়তায় উভয়ে সদা কর্ত্তব্য-পথে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সকল প্রকার অভাব, বিঘ্ন, শ্রম, দুঃখ, যাতনাকে পদদলিত করিয়া, আনন্দের সহিত জীবন-সার্থকতার কর্ম্ম সমূহ সম্পাদন করিতে যাহাতে শক্তি পায়, সেইজন্য নর নারী মিলিত হইত। নর ও নারী স্বদেহ ইন্দ্রিয় তোষণ, ভালবাসা ভোগ করিয়াও পিতৃঋণ—সংসার কর্ত্তব্য, ভূতঋণ—দেশ ও জগত সেবা, দেবঋণ—ঈশ্বর-সাধন করিয়া

ইহকালে সুখ, যশ, পুণ্য ও পরকালে মুক্তি এবং ঈশ্বরকৃপার অধিকারী হইতে পারে, ঋষি সেই জন্য বিবাহ ব্যবস্থা সৃজন করিয়াছেন। তাই যাহাতে এই সমস্তের অনুকূল হয় তেমনভাবে মিলনাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশিক্ষিতা, জ্ঞানহীনা বালিকাকে শ্বশুর গৃহে, নিরাশ্রয় অধীনতার মধ্যে না ফেলাইলে; সেই সব উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। কাহাকেও অগাধ জলরাশিতে ফেলিয়া পালাইলে, সে সাঁতার না জানিলেও সাঁতরাইতে চেষ্টা করিবেই, সম্মুখে যাহাই আশ্রয় পাইবে তাহাই ধরিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইতে, চুবুনি খাইয়াও চেষ্টা করিবে—হিন্দু পিতামাতাও তেমনি শ্বশুরগৃহরূপ অগাধ-দুঃখ-জলে অজ্ঞ বালিকা কন্যাকে ফেলিয়া দেয়; কন্যা জীবন রক্ষার চেষ্টায়, সেই গৃহের শাশুরী আদি যেমন কেন না হউক, তাহার আশ্রয়েই সে স্থানে দাড়াইতে ও সেই সাগরে সাঁতরাইতে দারুণ চেষ্টা করে ও অল্প সময় মধ্যে শিক্ষিত হইয়া উঠে; দুঃখ তাহার জ্ঞানলাভের গুরু হয়।

বালিকা বধূর প্রথম জীবন, জ্ঞানময় চিন্তায় অতীব দুঃখ, নির্য্যাতন ও দাসীত্ব ভোগ মনে হয়। কিন্তু সেই বধূ তাহার অজ্ঞতা, দীনতা, সরলতা ও স্নেহময় বালস্বভাব হইতেই, তথায় যথাযথ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, সে স্থানের সমস্ত দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতন ঝাড়িয়া ফেলিয়া, আনন্দের সুখ-শয্যা করিয়া লয়।

হিন্দুর বালিকা বধূ।

বহু জ্ঞানবতী যুবতী কিন্তু তেমন জীবনের মধ্যে, বিচার দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেও সক্ষম হইবে না। বালিকা-বধূ বিবাহের আনন্দ কোলাহলের পর দিনই দেখিতে পায়, তাহার আপন জন—স্নেহময় পিতা মাতা ভ্রাতা বোন এখানে কেউ নাই, সম্পূর্ণ নূতন স্থানে, নূতন পর জনের মধ্যে সে একা রহিয়াছে। আশ্রয়ের পিতা মাতার কোল নাই, খেলিতে স্নেহের ভাই বোন প্রতিবেশী নাই, তাতে এখানে জোড়ে হাটিতে মানা,

উচ্চস্বরে কথা কহিতে মানা, সকলের সঙ্গে কথা বলিতে দোষ; তাহার উপরে এ বাটীর প্রত্যেক জন—দাস দাসীটী পর্য্যন্ত কিছু না কিছু সেবা পাইতে হাত পাতিতেছে, না পাইলেই নিন্দা ও গালি দিতেছে; তাহাকে দিবার কেউই নাই। এ ত গেল বাহিরের লোক, তাহার উপরে স্বামীধন—পিতা যাহার করে তাহাকে সঁপিয়া বলিয়া দিয়াছেন, এই জন তোমার অতি আপন জন, সেই স্বামী, সকলকে লুকাইয়া তাহার নিকট কত কিছু চাহিতেছে। একটু গোপন ইঙ্গিত না বুঝিলে, নিকট দিয়া কর্ম্মে ব্যস্তভাবে যাইতে, একটু না চাহিয়া যাইলে, কত মান অভিমানের পালা অভিনয় হইয়া যাইবে। জ্ঞানবতী যুবতির সাধ্য কি এই কালে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া চলে। অজ্ঞা বালিকা-বধূ বলিয়া, সে বাটীর সকলেই সে না পারিলেও হাসিয়া উঠিবে, পারিলে আনন্দে প্রশংসা করিবে; যুবতির ক্রটী ইচ্ছাকৃত দোষ, স্বেচ্ছায় অসম্মান ধরিয়া সকলের প্রাণে বাঁজিবে। জ্ঞান সংস্কার-হীনা বালিকা-বধূ তাহার সত্তা বালিকা স্বভাব হইতেই, ভালবাসার মধ্যদিয়া সে জীবনের উদ্বেগ, আশঙ্কা, নির্য্যাতনাদিকে আরও নূতন নূতন সুখের কারণ করিয়া তুলিবে; সেই স্বভাবের গুণেই নিরাশ্রয় নিতান্ত পর বালিকা, সেই গৃহের সকলের আপনজন প্রাণ-তোষিণী বধু হইয়া উঠিবে; শ্বশুর শাশুরীর কন্যা, দেবর ননদের ভগ্নী, দাস দাসীর সখী, কুকুর বিড়ালের প্রভু হইয়া, সে স্বামীর হৃদয়রঞ্জিণী গৃহলক্ষ্মীও আশ্রয় হইয়া উঠিবে; সেই বাটীর সকলেই তখন সেই বধূর তোষণে ব্যস্ত হইবে; নিরাশ্রয় দাসীর জীবন বধূকে গৃহের সকলের সত্তা-প্রভুতায় তুলিয়া দিবে।

মনুষ্যকুলে অমানুষসত্তা ত্রিপুরা জিলার শ্রীযুত্ বসন্তদাদা বলিয়াছিলেন, "কি করিয়া ভগবানকে আপন জনের মত লাভ করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিতে শাস্ত্র সন্ধান করিয়া মরি কেন! ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ঘরেই

পড়িয়া আছে! ঘরের বধূই তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কোন প্রকার সম্বন্ধ-হীন, নিতান্ত পর, নিরাশ্রয়, এ বালিকা এ বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল! কয়েক বর্ষের পরে, সে সেই বাটীর কর্ত্রীঠাকুরাণী; পতির উপরেও কর্ত্তৃত্ব করে, স্বামীও তার কথা রক্ষা করে কিসের গুণে? বধূ কিসে এই অবস্থালাভ করিল? সে জ্ঞানহীনা অবস্থায় আমিত্বহীনা হইয়া, নিজের গৃহ পিতা, মাতা, আপনজন ছাড়িয়া, নিজের গোত্র-সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, প্রকৃত নিরাশ্রয় হইয়া স্বামিকে আশ্রয় করিয়া ছিল, তার মুখাপেক্ষী হইয়াছিল, সর্ব্বপ্রকারে অধীন হইয়া, কিছু না পাইয়াও হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়া স্বামী ও স্বামীর জন তোষণই জীবনের ব্রত করিয়াছিল। তাই আজ বধূ স্বামীকে পূর্ণরূপে লাভ করিয়া, স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে। ঈশ্বর পাইতেও এমনি আপনার সব ত্যাগ করিয়া, অজ্ঞ, দীন, নিরাশ্রয় হইয়া তাঁর নিকট কিছু না চাহিয়া, ভালবাসা সহিত শরণ লইতে হইবে, তাঁহাকে ও তাঁহার জনের সেবা ও তোষণই জীবনের কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই আপনজন হইয়া ঈশ্বরও তাহাকে ধরা দিবেন। তাই বলিলাম বালিকা বধূর কষ্টময়-জীবন তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখময় কল্যাণময় করিতেই ঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন নারী-নির্য্যাতন নয়।

আর্য্যঋষি-প্রদত্ত নারী-জীবন কেবলে দুঃখ ও পরাধীনতার জীবন, আধুনিক শিক্ষিতগণ বলিয়া থাকেন। হিন্দুর গৃহ সন্ধান করিয়া দেখুন বধূরূপ মাতাই সন্তানের কর্ত্তা ও আশ্রয়, বধূঠাকুরাণীই দেবর ননদের আবদারের স্থান, বধূমাতাই বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুরীর বার্দ্ধক্যের যষ্টি, আর পত্নীই পতির সর্ব্বদিকের গতি, আশ্রয় ও বুদ্ধিদাতা ; তবে কোথাও ইহার ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, তাহা সকল দেশে সকল সমাজেই

হয়, গুণবতী সতীও পতি—নির্জ্জিতা হয়, আবার পত্নীবৎসল স্ত্রৈণ পতিও পত্নী-নির্জ্জিত হয়, মাতাও সন্তান বধ করে, সন্তানও মাতা বধ করে, সতের ভাগ্যে কষ্ট, অসতেরও সুখ দৃষ্ট হয়; এই সব সাধারণ নহে কদাচিৎই হয়; হিন্দু-মতে এগুলি দৈবদুঃখ পূর্ব্বজন্মের বিশেষ পাপের ফল।

**বিবাহ ক্রিয়ায় চিন্তা।** এ জগতে পিতা, মাতা ভ্রাতা সন্তানাদি সুন্দর কুৎসিত গুণহীন বা গুণবান হওয়া কাহারও ইচ্ছাধীন কি? নিজের দেহ ও স্বভাবের উপরেও নিজের হাত নাই, আর পত্নীটী নিজের পসন্দমত না হইলেই জীবন অসার্থক হইল, এই কথা কেন উঠে? দেখিতেছি বাছিয়া আনিলেও কোন রোগাদিতে কুৎসিতা হইয়া যায়; ইউরোপে কত দিন দেখিবা, একত্র থাকিয়া বিবাহের পরই দেখি, একত্র থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তাই হিন্দু লটারীর মত, পিতা মাতার উপরে পত্নী নির্ব্বাচণ ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। এখন পিতা মাতা কিভাবে উভয়কে মিলন করেন তাহাও শুনুন।

যাহাতে প্রথম দর্শনেই দুই আত্মার বিশেষ ভাবে মিলন হয়, সে জন্য উভয়ে উভয়কে দেখিতে দেওয়া হইত না। মিলন হইবে সংবাদ পাইয়া উভয়ে উভয়কে দেখিতে অধিক আগ্রহবান হইয়া উঠিত। পরে দর্শনের পূর্ব্বে উভয়কে না না মঙ্গল সংস্কার দ্বারা, পবিত্র ঈশ্বরযুক্ত ভাবে নিয়া, উপবাসী রাখা হইত—ভোজন-তৃপ্তের কর্ম্মে আলস্য আসে, আলস্যের আগ্রহ হানি হয়। পরে দেখাইবে বলিয়া, পাত্রকে কাপড় দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়া, পাত্রী আনিয়া দেখাই দেখাই বলিয়া সপ্তবার ঘুড়াইবার ছলে, দর্শনবঞ্চনায় আগ্রহ বাড়াইয়া, উভয়কে সুশ্রীবেশে অলঙ্কারাদিতে সাজাইয়া দর্শন করিতে দেয়। দর্শনকালে পাত্রী

বিদ্যুৎ-উৎপাদক হস্তকৌশল প্রদর্শনে পাত্রকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র দর্শন করিতে সুযোগ দেয়। পরে সম্প্রদান গোত্রান্ত করিয়া, সারা রাত্রি এক বিছানায় রাখিয়াও উভয়কে দর্শন ও কথার সুবিধা দেওয়া হয় না; উভয়কে হাস্য পরিহাসে বাসরে জাগাইয়া রাখে। পরদিন কালরাত্রি বলিয়া উভয়কে বিশেষ ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া, তৃতীয় রাত্রিতে উভয়কে ফুলসাজে সাজাইয়া পুষ্পশয্যায় দর্শন ও আলাপ করিতে দিবার ব্যবস্থা ছিল। যাহাতে উভয়ের মিলনে সত্যই প্রাণের বন্ধন হয়, উভয়ে উভয়কে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, বিবাহটী খেলার মত—ভাললাগে খেলাইবে, না হয় ভাঙ্গিয়া দিবে তেমন না হইয়া উঠে সেই জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। হিন্দুর বিবাহের প্রত্যেক ক্রিয়া স্ত্রী আচারটী পর্য্যন্ত যথার্থ মিলন ও তাহার দৃঢ়তাজন্য ঋষি ব্যবস্থা। নব্যজ্ঞানে আজকাল এই সব অনাবশ্যক আচার, অসভ্যতা প্রকাশ মাত্র হইয়াছে। হিন্দু পুত্র কন্যার অভিভাবক, এই মিলনের কল্যাণ কামনায়, স্থান কাল পাত্র ও দৈবের দিকে কত লক্ষ্য করিতেন. স্থান—পবিত্র স্থানে কর্ম্ম নির্ব্বাহ, কাল—তিথি নক্ষত্র বিচার, পাত্র—বর কন্যায় বংশ ও লক্ষণাদি; দৈব—ইষ্টদেব দেবদেবী পিতৃদেবাদি হইতে ব্রাহ্মণ আত্মীয় ও গ্রামের লোকের আশীর্ব্বাদ. দীন দুঃখীকে পর্য্যন্ত সেবা করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা অপব্যয়, এই অর্থে বিলাস-দ্রব্য বা বন্ধু মাত্র তোষণ হইলেই যথার্থ সদ্ব্যয় হয়। হিন্দুর জগত-সেবন ও ঈশ্বর-সম্বন্ধময় কর্ম্মোৎসবকে আধুনিক-জ্ঞানে আজ পশুর তামস-উল্লাস তাণ্ডবতার তামাসায় পরিণত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক বিচার করিলে ঋষি ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; ঋষির চিন্তার ধারা কেবল জীবের কল্যাণ-সাধন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## নারীর বিকৃতিজাত বর্ণধর্ম্মের সংবাদ।

আর্য্যদের ইতিহাসরূপ পুরাণ-শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, ঋষিগণ সমস্ত নারীর একরূপ জীবন যাপনই নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রবৃত্তি-ভেদে নারী জাতিকে দশটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, কি উপায়ে প্রত্যেকে নিজের প্রকৃতিকে মার্জ্জনা করতঃ পূর্ণ নারীত্বের সার্থকতায় পৌছিতে সক্ষম হয়, তাহার অনুকূল কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্রমতে প্রথমে বিধাতা দেবী-অংশে একরূপ নারীর সৃজন করেন, তাহারাই পূর্ণনারী, প্রকৃত আর্য্য-রমণী। পরে ময়দানব অসুর-অংশে ত্রিবিধ নারী সৃজন করেন, তাহারাই বিকৃত-স্বভাবা কামপরতন্ত্রা নারী, ইহাদের নাম কামিনী, সৈরিন্ধ্রী ও বারবিলাসিনী। ( ভাগবত ) পরমহংসদেব, ইহাকেই বিদ্যা ও অবিদ্যা-নারী বলিয়াছেন।

দেব-প্রকৃতি রমণীর ছয় প্রকার জীবন ও অসুর-প্রকৃতি কামিনীর চারি প্রকার জীবন, মোট দশ প্রকার নারী-জীবন। দেব-প্রকৃতির প্রথম জীবন নিবৃত্তিপন্থীর ১। **সন্ন্যাসিনী** জীবন ; গার্গী আদির জীবন তাঁহার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় জীবন প্রবৃত্তি-পথের প্রধান জীবন। ঈশ্বর-সাধনকে লক্ষ্য রাখিয়া,

দশ প্রকার নারী।

সামান্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বিষয়-ভোগেচ্ছায়, কোনও পবিত্র তাপসকে আশ্রয় করিয়া তাপস-জীবন গ্রহণ, এই ২। **কুলীন-ব্রত** জীবনই দেব-প্রকৃতি রমণীর দ্বিতীয় জীবন : ঋষিপত্নীগণই তাহার দৃষ্টান্ত। এ জীবনে ভোগস্পৃহার বিনাশ চেষ্টাই প্রবল বলিয়া, এক জন কঠোর সাধক তাপসকেও বহু রমণী পতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন, ভোগ

নাশের শঙ্কায় পরস্পরে দেখাদি হইত না। এই জীবন পরে কুলীন-ব্রত বলিয়া হিন্দু-সমাজে প্রচলিত হয়। শ্রেষ্ঠ স্বভাবা রমণী আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ ও দান পরায়ণ কোনও মহৎ পুরুষকে বিবাহ করিয়া, পিতৃ বা ভ্রাতৃ গৃহে থাকিয়াই, নিজে পবিত্র তাপসভাবে জীবন যাপন করিতেন; কখনও পতি আগমন করিলে তাহা হইতে গর্ভধারণ করিয়া কুলপাবন, কুলীন-মানব জগতে দান করিতেন। এইগুণে কুলীন-ব্রতধারী নারী সর্ব্ব গৃহস্থের পূজ্যা ও সম্মানীয়া ছিলেন, তাঁহার সন্তানও তেমন পূজা পাইতেন। কেবল দেব প্রকৃতি নারীই এই ব্রতের অধিকারিণী, সেই সম্মানে প্রলুব্ধ হইয়া বা পিতা ভ্রাতাদির আগ্রহে অসুর-স্বভাবা নারী সেই ব্রত আচরণ করিতে যাইয়া, সে পথকে কলুষিত করিয়া দিলেন; তাই আজ সমাজ হইতে সেই জীবন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। রাজা বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের সময়, কুলীন-ব্রতের সংস্কার হয়। তেমন পাত্র ও পাত্রীর অভাবে প্রাচীন কুলীন-রমণীর সন্তানগণকে কুলিন-পদ দান করিয়া, তাহাদের পবিত্রতা রক্ষায়, কুলিন-সমাজ-শাসন-বিধান প্রবর্ত্তিত হয়।

তৃতীয় জীবন নারীর ৩। **পণ-বিবাহ বা নিয়োগ বিবাহ।** ১। একটী পুত্র হওয়ার পরে আর উভয়ের সঙ্গে উভয়ের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, এইরূপ পণে বিবাহই পণ-মিলন বা নিয়োগ-মিলন। মনুকন্যা দেবহূতি ও কর্দ্দম ঋষির বিবাহ এবং ভীম ও হিড়িম্বার বিবাহ ইহার দৃষ্টান্ত। এই পণ-বিবাহ অনেক প্রকার ছিল। ২। কন্যার সন্তান কন্যার পিতার পুত্র হইবে পণে, পিতা কন্যাকে পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম কন্যা আকূতিকে রুচি ঋষির করে, মণিপুরের রাজা তাহার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে এই পণে অর্জ্জুন-করে দান করেন। ৩। সন্তান না জন্মিলে বিধবা-নারী একটী সন্তানের জন্য একজনকে

এই বিবাহ করিতে পারিতেন ; বিধবা উলুপী অর্জ্জুন হইতে সন্তান গ্রহণ করেন, কৌরব—বধূগণ ব্যাস হইতে ধৃতরাষ্ট্রাদি সন্তান গ্রহণ করেন। ৪। সধবা নারীও পতির বংশরক্ষার জন্য স্বামীর আদেশে অন্যকে পুত্রপণে বিবাহ করিতে পারিতেন ; কল্মষপাদ রাজা ব্রহ্মশাপে নারী সহবাসে বঞ্চিত হইলে, পত্নীকে গুরু বশিষ্ঠ হইতে সন্তান গ্রহণে নিয়োগ করেন। ৫। বিশেষ প্রয়োজনে এক নারী বহু পুরুষ হইতে বহু পুত্র গ্রহণ করিতেও পণে বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেই নারীগণের কাম-জীতার পরীক্ষা দিতে হইত। রাজা যযাতির নিকট এক ব্রাহ্মণ অষ্টশত সুলক্ষণ অশ্ব যাজ্ঞা করিলে, রাজা তাহা দানে অক্ষম হন, কেননা তিনি তখন সব দান করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। কিন্তু এই দান দিতে না পারিলে রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়। তখন ঋষি ব্যবস্থায় তাহার কন্যা মাধবী দেবী চারি রাজাকে চারিটী পুত্র দানে, সেই অশ্ব-দান পূর্ণ করিয়া পিতার যজ্ঞ পূর্ণ করেন ; কিন্তু পরে তিনি ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী হইয়া জীবন কাটান। পাণ্ডবের মাতৃবাক্য-রক্ষণ ব্রত পালন জন্য দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবকে পুত্রপণে বিবাহ করেন ও পঞ্চ বৎসরে পঞ্চ পাণ্ডবকে পঞ্চটী পুত্র দান করিয়া, সারা জীবন ব্রহ্মচারিণী হইয়া জীবন যাপন করেন। মাতা কুন্তী পতির আদেশে তিন জন দেবতা হইতে তিনটী পুত্র গ্রহণ করিয়া, আর সন্তান গ্রহণে অস্বীকার করেন।

পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ মধ্যে শৈশব বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও সে কালে নর নারীকে ব্রহ্মচর্য্য সাধনে বিশেষ ভাবে শিক্ষাদান করা হইত। পূর্ব্বে ঋতু-সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত, স্বামী ও স্ত্রীকে একত্র হইতে দেওয়া হইত না। যৌবনেও নারীর বিশুদ্ধ আর্ত্তবস্রাব হইলে, উভয়ে সুস্থ থাকিলে, ঋতুকালে—দশম-রাত্রি হইতে ষোড়শ-রাত্রি মধ্যে, যুগ্ম দিনে, শুভ তিথি আদি যোগ দেখিলে, সুসন্তান জন্য পুত্র ও বধূকে অভিভাবক

মিলন অধিকার দান করিত। সে কালে যুবক যুবতি পুত্রার্থে বিনা ইন্দ্রিয়-লালসাকে দূষ্য ও নিতান্ত নিন্দনীয়, দুর্ব্বলতা জ্ঞাপক বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইত। তাই সে কালের নিয়োগ-বিবাহ আধুনিক জ্ঞানে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব হয়। তবে নিয়োগ-বিবাহের স্ত্রী পুরুষের চরিত্র আলোচনা ও তাহার ফল স্বরূপ পুত্রের চরিত্র আলোচনা দ্বারা, তাহার পবিত্র স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। রাক্ষসী হিড়িম্বা, ভীম-সংসর্গে রাক্ষসী-স্বভাব ভুলিয়া, পবিত্র ব্রহ্মচারিণী হইয়া জীবন কাটাইল। ভীমের সঙ্গহীনা হইয়াও ভীম-পত্নীর গৌরব লইয়া জীবন কাটাইল। উলুপী নাগ-কন্যা ও মণিপুরী চিত্রাঙ্গদা চিরব্রহ্মচারিণী হইলেন। অর্জ্জুন সঙ্গহীনা হইয়াও, তাঁহার পত্নীত্বের গৌরব লইয়া পবিত্র জীবন কাটাইলেন। মাধবী দেবী ও দ্রৌপদী দেবীর ভোগের মধ্যে ত্যাগ ভরা জীবন আলোচনা করিয়া বুঝিতে হইবে, তাঁহারা পবিত্রভাবে কি কামভাবে এই পণ-বিবাহ গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর দেখিতে হইবে ইহাদের সন্তানগণ কেমন হইয়াছিল।

চতুর্থ প্রকার জীবন, ৪। সবর্ণ স্বামী গ্রহণ করিয়া **শ্বশুর গৃহে বাস**, এইটী হিন্দু নারীর সাধারণ জীবন। পঞ্চম প্রকার জীবন— ৫। সবর্ণ-স্বামী গ্রহণ করিয়া নিজের, **পিতৃগৃহে বাস**, পুরুষের ঘর-জামাতৃজীবন। ষষ্ঠ জীবন ৬। পিতাকর্ত্তৃক দত্ত হইয়া **শ্রেষ্ঠ বর্ণের পুরুষকে স্বামীভাবে গ্রহণ** করিয়া জীবন কাটান। এই নারী পতিগৃহে স্বামীর সবর্ণাপত্নীর মত সহধর্ম্মিণীর আসন ও সম্মান না পাইলেও, সমাজের নিকট পতিতা বা অসম্মানীয়া ছিলেন না। পিতৃকুলে ও পিতৃবর্ণে ইহারা গৌরবের আসন পাইত। ইহাদের সন্তানগণ, মাতুল-কুলে বাস করিতে আসিলে কুলীনের আসন পাইত; এইটি ঋষি মতে অসবর্ণ বিবাহ।

হিন্দুর বিবাহ দুইটী ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হয়। একটী কন্যা-পক্ষের সম্প্রদান, অন্যটী বর-পক্ষের গোত্রান্তরিত করিয়া গ্রহণ। সবর্ণা নয় বলিয়া, এই অসবর্ণ বিবাহে গোত্রান্তর ক্রিয়া হইত না; তাই ইহারা সহধর্ম্মিণীর পদ পাইত না; ইহাদের সন্তান পিতৃবর্ণ বা বংশাধিকারও পাইত না। এই জন্যই ব্রাহ্মণে সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মানব-স্ত্রী পুরুষের দেহ-পিণ্ডের প্রকৃত দানের অধিকার, তাহার জন্মদাতা ও পালনকর্ত্তা পিতা মাতার; ইহাদের অমতে কোনও নর নারী অপরকে দেহ দান করিলে, তাহা অবৈধ ও অগ্রাহ্য। তাই পিতামাতার অমতে নারী সবর্ণের কাহাকে পতিত্বে বরণ করিলেও সেই নারী পতিতা, সমাজচ্যুতা হইত; আর পিতা অসবর্ণে সম্প্রদান করিলেও, তাহা অবৈধ অগ্রাহ্য হইত না; গোত্রান্তর ক্রিয়া হীনেও তাহা বিবাহ-তুল্য সমাজে গ্রাহ্য হইত এবং সেই নারী সমাজের নিকট পত্নীস্বরূপা পবিত্র ও সম্মানীয়া থাকিত; সন্তান পিতৃকুলে একটী হীন শ্রেণী বা মাতৃকুলেই কুলীন শ্রেণী হইয়া মিশিয়া যাইত। এই বিবাহই ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা পত্নী, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা পত্নী ও বৈশ্যের শূদ্রা পত্নী গ্রহণ। মাতৃগণ হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মিলিয়া, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ব্রাহ্মণ বৈশ্যে অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণ শূদ্রে পারশব, ক্ষত্রিয় বৈশ্যে সূত, ক্ষাত্রিয় শূদ্রে উগ্রক্ষত্রিয় বা মাহিষ্য, বৈশ্য শূদ্র হইতে বণিক জাতির উদ্ভব হয়। এইরূপে জাত ছয়টী মিশ্র দ্বিজবর্ণ ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই নয় দ্বিজ জাতির সহিত শূদ্র মিলনে নবশাখ আদি ষট্‌ত্রিংশৎ শূদ্র জাতির উদ্ভব হয়। পুরাণ মতে দেখা যায় নন্দ-ঘোষ ক্ষাত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভস্থ হইয়াও, বৈশ্য সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সেই বৃত্তি গ্রহণ করেন, ইহাই মাতুলকুলে মিশিবার দৃষ্টান্ত। এই ছয় প্রকার নারী-জীবনই দেবী-অংশ-জাতা আর্য্য-রমণীর পবিত্র জীবন। এর পরে অসুর-অংশ জাতা নারীর চারি প্রকার জীবন ও স্বরূপ শ্রবণ করুন।

৭। **কামিনী বা দ্বিচারিণী-জীবন**, মলিনা প্রকৃতির প্রধান জীবন ; ঋষিমতে **বিধবা-বিবাহ**। ঋষিমতে নারীর সহায়তা বিনা পুরুষ তাহার সর্ব্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন, কিছুতেই সমাধা করিতে পারে না। তাহাদের মতে পুরুষের গৃহের নাম গৃহ নহে, পত্নীরূপা গৃহিণীই পুরুষের প্রকৃত গৃহ—বিপদের আশ্রয়, সুখশান্তির অবলম্বন ; তাই পত্নীহীন পুরুষকে গৃহ-হীন বলা হয়। "নগৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে।" তাই নারীর অভাব হইলে পুরুষের নারী গ্রহণ রূপ, দ্বিতীয় বার বিবাহের প্রয়োজন হইতে পারে ; কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য-সাধনে পুরুষের সহায়তা বিনাও নারী তাহা সম্পাদন করিতে পারে। স্বামীর মৃত্যুতে এক মাত্র ইন্দ্রিয়তোষণ বিনা, নারীর অন্য কোন কর্ত্তব্য-সাধনের বাধাইত হয় না। সেই নারী যে যে কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া, প্রতিজ্ঞা করতঃ স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, এতদিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার প্রতিনিধির মত স্বামীগৃহ, তার সংসার পরিজনের সেবা, দেবতা অতিথি সেবা চালাইয়া আসিয়াছে, স্বামীর মৃত্যুতে তাহার কোন কর্ত্তব্য স্বামী লইয়া গেলেন না ? সে এই সব কার্য্যভার কাহার হাতে দিয়া অন্য স্বামীগৃহে গমন করিবে ? নিজের স্বতন্ত্রতা বলি দিয়া যে নারী স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে এক হইয়াছিল, স্বামীর কর্ত্তব্য ও তাহার কর্ম্মকেই নিজের কর্ম্মভার করিয়া ছিল, সেই কর্ম্মভার ফেলিয়া নারীর আবার পৃথক স্বাতন্ত্র্য জাগানকে, ঋষি দেবী-স্বভাব বলিয়া সমর্থন করিতে পারেন নাই, মলিনা আসুর-প্রকৃতি বলিয়াছেন। বৈধব্যের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, সকল নারীর অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য হইতে পারে না, ঋষি তাহা স্বীকার করিয়া, সেই রূপ নারীর পত্যন্তর গ্রহণ বিধান দিয়াছেন। এই বিবাহ পিতার সম্প্রদান বা গোত্রান্তর-কৃত বিবাহ নহে ; সমাজ-স্বীকৃত বিবাহ,

নারীর পত্যন্তর গ্রহণ। এই বিবাহিত বিধবা, বিবাহিত সধবা-নারী। ব্রহ্মচর্য্যশীলা বিধবা ও অসবর্ণা পত্নী হইতেও সম্মানে হীনা থাকিত। ইহাদের সন্তান কয়ণ ক্ষত্রিয়, করণ বৈশ্য, করণ শূদ্র নামে প্রত্যেক বর্ণে একটী নূতন সম্প্রদায় গঠন করিত, ব্রাহ্মণে এই বিবাহ ছিলনা।

৮। **সৈরিন্ধ্রী জীবন** মলিনা-প্রকৃতির দ্বিতীয় জীবন। একটী পুরুষ সঙ্গে যে লালসার তৃপ্তিতে অক্ষম হইয়া, শ্রেষ্ঠ বা সবর্ণের বহু গামিনী হইয়া থাকিতে পারিত, তাহারাই সৈরিন্ধ্রী। এই জন্যই পঞ্চ স্বামী পরিচয়ে দ্রৌপদী দেবী নিজকে **সৈরিন্ধ্রী** বলিয়া পরিচয় দান করেন। ইহারা গৃহস্থ-গৃহে স্থান পাইত, ইহাদের বিবাহও নিজের স্বামী-বরণে সম্পাদিত হইত। ইহারা গৃহস্থ রমণীর সাজ সজ্জাকারিণী ও সন্তানগণ নট হইত; তাই নটে বহুশ্রেণী দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত-ব্যবসায় ও পর-দাসত্ব নটদের জীবিকা।

৯। **বারবিলাসিনী** নবম জীবন। যাহারা পূর্ণরূপে অসংযতেন্দ্রিয় হইয়া, সর্ব্ববর্ণের বহু পুরুষগামী হইত, তাহারাই বারবিলাসিনী বা বেশ্যা-শ্রেণী হইত। ইহারা গৃহস্থ-পল্লী হইতে দূরে বাস করিতে বাধ্য হইত। ঋষি ইহা দিগকেও সমাজের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া, যথাযোগ্য সম্মান ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং ইহারাও কিরূপ ভাবে তাহাদের কর্ম্মকে চালনা করিলে, সপ্রকৃতির মার্জ্জনা করিয়া, নারীত্বের সার্থকতারূপ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দেব-প্রকৃতি নারীগণ না হয় নারীরূপ সমাজ-দেহের মস্তক ও হৃদয়, আর বেশ্যা না হয় তাহার মলস্রাব-দ্বার গুহ্যদেশ। গুহ্যদেশ না থাকিলে কি দেহ রক্ষা হয়? সমাজের মল-স্বরূপ যে বেশ্যা-প্রকৃতিমান্ কত গুলি হীন-পুরুষ আছে, তাহাদের উৎপাত ও পীড়ন হইতে নারী সমাজকে এই

বেশ্যাগণই রক্ষা করিয়া থাকে। তাই ইহাদের দ্বারা মানব সমাজের কল্যাণই সাধিত হয়; এই জন্য ঋষি বেশ্যাকেও সমাজে স্থান দান করিয়া রক্ষার বিধান করিয়াছেন। হিন্দুর দুর্গোৎসব ও যজ্ঞাদি কর্ম্মে এই বেশ্যার দ্বারের মৃত্তিকাদির প্রয়োজন হয় এবং যজ্ঞাদিতে ভক্ত ব্রাহ্মণাদি ভোজনের মত, এই বেশ্যা ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিয়া তোষণের ব্যবস্থা দান করিয়া ছিলেন। ইহার উপরেও আর একটী অসুর-প্রকৃতি নারী আছেন, তাহারাই সমাজ-বহিস্কৃতা পতিতা নারী।

১০। **পতিতা জীবনই** নারীর দশম জীবন। যেই নারী আত্মসুখ-পরতন্ত্র হইয়া, পিতা মাতার স্নেহবন্ধন, সমাজ ও শাস্ত্র-শাসন ও ঈশ্বর ভয় উপেক্ষা করিয়া, যথেচ্ছাচারপথে সুখ সন্ধানে ধাবিতা, তাহারাই পতিতা-কামিনী, ইহারা সমাজ-বহিষ্কৃতা। এক বর্ণেই অবৈধগামী স্ত্রী পুরুষ, পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া মিলিত স্ত্রী পুরুষ, হীন-বংশের পুরুষ-গামিনী উচ্চবংশীয়া-নারী, অসতী সধবা, অসতী বিধবা ইত্যাদি, এই পতিত-শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ বর্ণকে নিম্ন বর্ণ পিতা মাতার মত ভাবিত। তাই শ্রেষ্ঠ বর্ণ গমনে মাতৃ গমন-তুল্য মহাপাপ বোধ ছিল। এই জন্যই পুরুষের শ্রেষ্ঠবর্ণা গমন ও নারীর হীন-বর্ণ গমন জনিত সন্তান, অতিহীন চতুর্ব্বর্ণাতীত পঞ্চমবর্ণ অন্ত্যজ ও অন্ত্যাবসায়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায়ে ৩৯শত শ্লোকে পঞ্চমবর্ণ শঙ্কর-জাতি অন্ত্যজ ও অন্ত্যাবসায়ি শব্দের টীকায়, শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, অন্ত্যজেতি রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটোবরুড় এবচ। কৈবর্ত্তমেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাস্মৃতাঃ। অন্ত্যাবসায়িনশ্চ চণ্ডাল পুক্কশ মাতঙ্গাদয়ঃ॥ রজক চর্ম্মকার, নট, বরুড় কৈবর্ত্তক মেদ ও ভিল সপ্ত জাতি অন্ত্যজ এবং চণ্ডাল পুক্কশ ও মাতঙ্গাদি জাতি অন্ত্যাবসায়ী॥

ঋষি পতিতার সন্তানগণকেও সমাজ হইতে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহাদের মুক্তির উপায় ধর্ম্ম-সাধন ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই পঞ্চমবর্ণগণ গ্রামের বাহিরে বাসস্থান পাইত।

বিভিন্ন নারী-প্রকৃতি হইতেই মানব-কুলে বিভিন্ন প্রকৃতির নর নারীর উদ্ভব হয়। বেদান্ত-শাস্ত্র ও গীতায়ও বলিয়াছেন, পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণকে ভোগকরে, তাহাই তাহার সৎ ও অসৎ জন্মের কারণ হয়।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু॥ গীঃ ১৩শ ২১ শ্লোক

মাতারূপ প্রকৃতি হইতে কর্ম্ম—ক্রিয়াশক্তি, কারণ—ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মকারক অহঙ্কারের কারণ দেহরূপ ক্ষেত্রের উদ্ভব ও পিতারূপ পুরুষ হইতে জীবাত্মারূপ ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষের সঞ্চার হয়। তাই নারীর বিকৃতিজাত দেহই, মানবের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বুদ্ধি ও কর্ম্মাশক্তির কারণ। এই জন্যই মাতার শ্রেণীভেদ হইতে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানব জন্মে। মানবের এই শ্রেণীভেদ নির্ণয়ই হিন্দুর বর্ণরূপ জাতিভেদ নির্দ্দেশ, আর তাহার মার্জ্জনার উপায় নির্ণয়ই হিন্দুর বিভিন্ন বর্ণধর্ম্ম- একই মানব জাতির মধ্যে কর্ম্মাধিকারের বিভেদ।

বর্ণ ও বর্ণধর্ম্ম।

এই জগতে নর ও নারী যার যার ভিতরস্থ সত্তার আলোড়নে, সেইরূপ প্রকৃতির পথে সুখের সন্ধানে ধাবিত হয়। শত শাসন বা উপদেশেও তাহাকে সেই পথ হইতে ফিরান যায় না। ঋষি বর্ণ-ধর্ম্মাচার নির্দ্দেশ করিয়া তাহার অতি সুন্দর সহজ মার্জ্জনা-পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ণ-ধর্ম্মরূপ পথে প্রকৃতিকে চালনা করিলে স্বভাব হইতেই প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। সেই প্রবৃত্তি-মার্জ্জনার পথের সংবাদই ঋষি-প্রণীত মানবের অতি প্রয়োজনীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংবাদ। সহস্রবারের শাসন ও

যাতনাদিতেও চোরের চৌর-প্রবৃত্তি ও নারীর বেশ্যা-প্রবৃত্তির সংযম আনিতে পারিবে না। জ্ঞানোপদেশ ও শাসনে চোর ও দস্যুগণ চতুর ও কর্ম্মঠ হইয়া, আরও ভীষণ অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। তবে যাহারা কুসঙ্গে নষ্ট হয় দেব অংশজাত মানব, তাঁহারা উপদেশ ও শাসনে কুকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ মহৎ হইতে পারে। তাই ঋষি দেহের হীনতা মার্জ্জনা-জন্য বর্ণ-ধর্ম্ম নামে একটী পৃথক ধর্ম্ম-বিধান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঋষি-প্রণীত চৌর-ধর্ম্মাচার পথে, যদি চোর কৃপণ ধনীর ধন মাত্র হরণ করিয়া, তাহার নির্দ্দিষ্ট অংশ অনাথ-দরিদ্র সহায়তায় ব্যয় করে ও ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হয়, কুলধর্ম্ম পিতৃমাতৃ সেবা করে; আর বেশ্যা বেশ্যাধর্ম্মাচারে, পণ-বিবাহের মত নির্দ্দিষ্ট কালজন্য এক জনকে পতি করিয়া গ্রহণ করিয়া, সতীর মত তাহার সেবা করে সেকালে অন্য পুরুষকে পর পুরুষের মত দেখিতে পারে। সেই পথে উপার্জ্জিত অর্থের নির্দ্দিষ্ট-অংশ দীন দরিদ্রের সেবায় লাগায়, শাশ্বতধর্ম্ম ঈশ্বর-সাধন। কুলধর্ম্ম-মাতৃসেবা স্থির রাখে, চোরের চৌর-প্রবৃত্তি, বেশ্যার বেশ্যা-প্রবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া যাইবে। এমন কি তাহারা দেব-প্রকৃতি লাভ করিয়া, তাহাদের গতি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে। এই কথার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্কন্দপুরাণে বর্ণিত পিঙ্গলা নামক বেশ্যার উপখ্যান শ্রবন করুণ। এই বেশ্যা ঋষি-ব্যবস্থিত বেশ্যাধর্ম্ম আচরণ করিয়া পতিব্রতার প্রাপ্য গতি ও সাক্ষাৎ ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিল। তাই যেই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে দেবতা ঋষি ও মনুবংশীয় রাজর্ষিগণের জীবনী মাত্র লিখিত হয়, সেই পুরাণশাস্ত্রে তাহার বেশ্যাজীবন লিখিয়া রাখিয়া, মহর্ষিগণ পিঙ্গলার পূজা করিয়া গিয়াছেন।

---

## পিঙ্গলা বেশ্যার উপাখ্যান।

পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বহু গুণবতী, সুন্দরী ও ধনবতী ছিল। সে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া যেমন বহু ধন অর্জ্জন করিত, তেমন দান আদি সৎকার্য্যেও যথেষ্ট ধনব্যয় করিত। নিয়মিত ঈশ্বর সাধনাদি, মাতৃ সেবাদি করিত। প্রাতে স্নান করতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনা ও শিবপূজা করিয়া, দরিদ্রকে দান ও ক্ষুধাতুরকে আহার দান না করিয়া, নিজে ভোজন করিত না। বেশ্যাবংশে জন্ম বলিয়া বেশ্যাবৃত্তিই জীবনের ব্রত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ঋষি-বিধানমতে তাহা আচরণ করিত। প্রত্যহ একজনকে পতি বলিয়া বরণ করিয়া, পতিব্রতার ন্যায় তাহার সেবা মনোরঞ্জন করিত। সেইকালে বহু গুণবান্ কেহ আসিলে, বহু অর্থ দিতে চাহিলেও সে আর কাউকে পতিত্বে গ্রহণ করে নাই, পরপুরুষের মত বর্জ্জন করিয়াছে। একদিন একজন বণিক, স্ফটিক-সাজে সজ্জিত হইয়া, তাহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। পিঙ্গলা তাহার স্ফটিক-কঙ্কণ দেখিয়া লুব্ধ হইল এবং বণিককে বলিল, সাধু এই কঙ্কণ আমায় দান কর, আমি তিন দিনের জন্য তোমার পত্নীত্ব স্বীকার করিব। বণিক বলিল, তাহা কি পারিবে? আচ্ছা তবে বরণ কর, আমি কঙ্কণ দান করিব। পিঙ্গলা বলিল, এযে আমার জাতিগত ধর্ম্ম, পারিব না কেন? নিশ্চয় পারিব। এই বলিয়া সে বণিকের পদাদি ধৌত করিয়া, মালা ও চন্দন দান করতঃ, তাহাকে তিন দিনের পণে পতিত্বে বরণ করিল। তখন বণিক কঙ্কণ দান করিয়া বলিল—আমারওত তোমায় পত্নীত্ব দান করিতে হইবে? এস তাহা দান করি! পত্নীত্ব দান কি?—গুপ্ত-সেবা দান, গুহ্য-কথা বলা ও গুপ্ত-দ্রব্য রক্ষণে নিযুক্ত করা; এস তাহা দান করি! এই বলিয়া, বণিক পিঙ্গলাকে মালা ও চন্দন পরাইয়া পত্নী স্বীকার করিল ও বক্ষঃপ্রদেশে

গোপনে রক্ষিত, একটী স্ফটীকের শিব-লিঙ্গমূর্ত্তি বাহির করিয়া, গোপনে তাহার করে দিয়া বলিল—এই শিবলিঙ্গ আমার প্রাণের অধিক বলিয়া জানিও। ইহার পূজা না করিয়া আমি জল-গ্রহণও করিব না এবং কোনরূপে যদি এইটী বিনষ্ট হয়, আমারও প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। আমার প্রাণ-স্বরূপ এই দ্রব্য যত্নে ও গোপনে রক্ষা করিতে তোমার হস্তে দান করিলাম। পিঙ্গলা মহানন্দে ও অতি আদরে সেই শিবলিঙ্গ গ্রহণ করিল ও বহুমূল্য হীরক কোটরায় ভরিয়া, তাহার রঙ্গমহলের এক সজ্জিত থাকে গোপনে রাখিয়া দিল।

দৈবে দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে রঙ্গমহলে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পিঙ্গলা শত চেষ্টায়ও সেই শিবলিঙ্গ রক্ষা করিতে পারিল না, অগ্নি-তাপে লিঙ্গ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। সেই খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া বণিক কান্দিতে কান্দিতে বলিল, "আমারযে যাইতে হইবে; শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও?" পিঙ্গলা চন্দনকাষ্ঠে চিতা সাজাইয়া দিল; বণিক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ কলিলেন। পিঙ্গলাও তখন স্নান করিয়া পতিব্রতার সহমরণের বেশ পরিধান করিল, এবং সকলের নিকট বিদায় চাহিয়া বলিল—তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দান কর আমি তিন দিনের জন্য ইহার পত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছিলাম। যখন সেই তিন দিন মধ্যে ইহার মৃত্যু ঘটিল, তখন ইহার সহিত সহমৃতা না হইলে, আমার পতিব্রত্য-ধর্ম্ম রক্ষা হইল কৈ? পত্নীর একটী কর্ত্তব্য স্বামীর গুপ্তদ্রব্য-রক্ষণ, আমি তাহাতে অক্ষম হইয়াছি; এখন যদি সহমৃতা না হই তবে আমার গতি কি হইবে? পত্নীত্ব-স্বীকার বাক্য কি করিয়া পালিত হইবে? এই বলিয়া পিঙ্গলা, অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পতিব্রতার মত প্রশান্তভাবে সেই বণিকের চিতায় ঝাপাইয়া পড়িল; অমনি অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সকলে দেখিল, পিঙ্গলার জারপতি বণিক,

পিঙ্গলার ইষ্ট মহাদেব-মূর্ত্তি ধরিয়া, কন্যার মত পিঙ্গলাকে বুকে জড়াইয়া আদর করিতেছেন। তাহার দগ্ধ রঙ্গমহল পূর্ব্ব হইতেও উজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মায়ার মত মহাদেব অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সেই দিন হইতে পিঙ্গলা বেশ্যা হইয়াও, সকলের সম্মান পাত্রী হইয়া বাঁচিয়া রহিল। ঋষিগণও সেই মহাদেব-অনুগৃহীতা মহিয়সী নারীর জীবনী, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিয়া রাখিয়া তাহাকে অমরত্ব দান করিয়া রাখিলেন। ( স্কন্দপুরাণ গোকর্ণ তীর্থ মাহাত্ম্য )

সত্যই ঋষি-ব্যবস্থার মধ্যে এমন অমানুষ মঙ্গল-শক্তি নিহিত আছে। বিধানের মর্ম্ম না বুঝিয়াও যদি কেহ, খাঁজায় লিখার মত এই সব বিধান আচরণ করে, নিশ্চয় সে সর্ব্বদিকে মঙ্গল লাভ করিবে। জ্ঞানের অপূর্ণতা প্রবৃত্তির বিকৃতা আপনা হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে। যেমন নিদ্রাকালে দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের অবস্থা যাহা হয়, দেহকে তেমন নিষ্ক্রিয় শয়ান ও ইন্দ্রিয় মন ক্রিয়াহীন করিলেও তেমন নিদ্রাকে লাভ করা যায় ; ভালবাসিলে যে ব্যবহার করি, যে সম্বোধন করি, সেই সম্বোধন ও ব্যবহার করিলেও, পরের সঙ্গে তেমন ভালবাসার সঞ্চার হয় ; ঋষি প্রদর্শিত আচারও সেইরূপ—সত্য মানবের আচরণ ও জ্ঞানপথ গ্রহণ করিয়া পূর্ণ মানবত্বের জাগরণ উপায়। নিদ্রায় যেমন ইন্দ্রিয় মনের চঞ্চলতা রোধ করিতে না পারিলে শয়ন করিলেও নিদ্রা আসে না—সম্বন্ধ-স্থাপন ভালবাসায়ও যেমন, আচরণে কপটতা থাকিলে, অর্থাৎ লোক দেখান প্রকাশ্যে ভাই কি বন্ধু বলে, হৃদয়ে স্বীকার যায় না, অগোচরে নিন্দা করে, বন্ধুর মত গুপ্ত বলে না, ভোগের অংশ দেয় না, তাহাদের যেমন জীবনেও ভালবাসা জন্মে না, ঋষিবিধান আচরণেও কপটতাহীন হওয়া চাই—প্রাণের শ্রদ্ধা ও আচারের বিশুদ্ধতা চাই ,তাহা বিনা বহুবর্ষ আচরণেও জীবনের পরিবর্ত্তন হইবে না।

## ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান।

এক পিঙ্গলা বেশ্যাই নহে, স্বধর্ম্মাচারের এমন মুক্তিফলের সংবাদ শাস্ত্রে আরও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্ম-পুরাণাদির পঞ্চোপাখ্যানে, এক ঋষিকুমার দেখিয়াছিলেন, তিনি কঠোর সন্ন্যাস ও তপস্যায় যে অমানুষ দৈবশক্তি ও ঈশ্বরকৃপা লাভ করিয়াছেন, গৃহস্থ-বধূ সতি মালাবতী স্বামী-সেবায়, এক চণ্ডাল গৃহস্থ-পুত্র পিতৃ সেবায়, এক বণিক তৌলকার সত্য তৌল করিয়া, এক গৃহস্থ সকলের সহিত সত্য বন্ধুতায় ও এক ব্যাধ তাহার ব্যাধধর্ম্মাচার রক্ষা করিয়াও সেই তপঃ-শক্তির ঈশ্বর-কৃপার অধিকারী হইয়াছে। মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধ-উপাখ্যানে বর্ণিত আছে—এক ব্রাহ্মণকুমার, পিতা মাতা গৃহ সংসার ত্যাগ করতঃ, নিবৃত্তি-ধর্ম্ম গ্রহণে সন্ন্যাসী হইয়া, কঠোর তপস্যায় যোগ শক্তিলাভ করিলেন। একদিন একটী পাখী তাঁহার উপর বিষ্ঠাত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অপবিত্র করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তি দিবার ইচ্ছায় পাখীর দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র, পাখী ভস্ম হইয়া গেল। ইহাতে ব্রাহ্মণ-কুমার নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া, প্রবৃত্তিপথী বিষয়-কর্ম্মরত মানবগণকে, অতি মূঢ় ও হেয় মনে করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ভিক্ষাজন্য এক গৃহস্থ-গৃহে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন, গৃহস্থ-বধু ভিক্ষা দান-জন্য পাত্রহস্তে আগমন করিতেছে। কিন্তু এমন সময় গৃহস্থকে শস্যভার লইয়া আসিতে দেখিয়া, ভিক্ষা না দিয়াই সে তাহার দিকে ধাবিতা হইয়া গেল এবং যত্নে তাহার ভার নামাইয়া লইল। তারপরেও অতি আদর ও স্নেহের সহিত তাহাকে নানা প্রীতি বাক্য বলিয়া, তাহার হাত পা ধোয়াইয়া দিয়া, ব্যজন করিতে লাগিল; ভিক্ষাদানের কথা যেন ভুলিয়াই গেল।

সতীর এই পতিতোষণ-ব্রতকে, কামবিমূঢ়া নারী পুরুষাসক্তিতে, অতিথি ও সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেরমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছে ভাবিয়া, ব্রাহ্মণের মনে দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তখন সেই মূঢ়া নারীকে প্রতিফল দানের জন্য, তাহার ভস্মকারী ক্রোধ-দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে সেই গৃহস্থ রমণীর কিছুই হইল না! সেই সতী যেন তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়াই, স্বামীর অনুমতি লইয়া ভিক্ষাদান জন্য তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং সহাস্য-মুখে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বলিল, —ঠাকুর আমিত সেই পাখী নই, ক্রোধদৃষ্টিতে ভস্ম করিয়া ফেলিবে? আমায় ক্ষমা কর! গৃহস্থ-নারীর প্রধান কর্ত্তব্য স্বামীর সেবা ও তোষণ; তারপরে স্বামীর কল্যাণ জন্য অতিথি ও দেবতাদি তোষণ ও সেবনও সে করিয়া থাকে। তাই স্বামী-সেবা ফেলিয়া তোমার সেবায় আসিতে পারি নাই; তোমার অসম্মান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ব্রাহ্মণ জ্ঞানহীনা গৃহাসক্তা নারীর অন্তর্য্যামিত্ব তপঃশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তুমি কি করিয়া আমার মনের গোপন উদ্দেশ্য ও যাহা আমি বিনা জগতে আর কেহই জানে না, সেই পাখী ভস্মের সংবাদ জানিলে? সতী বলিল, আপনি বাজারে যাইয়া সাধু ধর্ম্মদাসের নিকট তাহার কারণ শ্রবণ করুন।

ব্রাহ্মণ ভিক্ষা লইয়া ধর্ম্মদাস সাধুর সন্ধানে যাইয়া দেখিলেন, সে এক জন ব্যাধ, ওজন করিয়া সে মাংস বিক্রয় করিতেছে। মাংস বিক্রয় করা, এমন হিংসাপরায়ণ কর্ম্মরতকে, ব্রাহ্মণ কিছুতেই সাধু বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না, তাই তাহাকে সম্ভাষণ না করিয়াই তিনি ফিরিয়া চলিলেন। ব্যাধ কিন্তু তাহা বুঝিয়াই, ডাকিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল— ঠাকুর! কিছু না বলিয়াই যে চলিলেন? গৃহস্থবধূ কি করিয়া আপনার মনের গোপন-কথা,—পাখী ভস্মের সংবাদ জানিল, তাহা জিজ্ঞাসা

জন্য না আসিয়া ছিলেন? ব্রাহ্মণ ব্যাধের তপঃশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ফিরিলেন ও কি করিয়া তাহার এই শক্তি লাভ হইয়াছে জানিতে চাহিলেন। ব্যাধ বলিল, আমার প্রতি আপনার অশ্রদ্ধা হইয়াছে, তাই আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হইবে না। আপনি রাজর্ষি জনকের নিকট গমন করুণ, সেই স্থানে এই কথার প্রকৃত উত্তর লাভ করিবেন।

ব্রাহ্মণকুমার জনক রাজার নিকটে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, সে সদা রাজকর্ম্মাসক্ত, অতুল রাজ্য সম্পদ ভোগ বিলাস ও প্রভুত্ব-ভোগী একজন রাজা, তাহাকে শত শত যুবতী কন্যাগণ সেবা করিতেছে, সে প্রজাগণকে দারুণ দণ্ডদান করিতেছে। বিনা ত্যাগ সন্ন্যাস ও কঠোর তপস্যায় কেমনে এই রাজা ঋষিত্ব লাভ করিল, ব্রাহ্মণ ভাবিয়াই পাইলেন না। কর্ম্মাবসরে রাজা ব্রাহ্মণসহ মিলিত হইয়া, তাহার আগমনের কারণ বলিয়া দিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া রাজার শরণ লইলেন। রাজর্ষি জনক বুঝাইয়া দিলেন, নিবৃত্ত-পথীর ত্যাগ তপস্যা যেমন স্বধর্ম্মাচার, প্রবৃত্তপথী সতী-নারীর পতিসেবন পুরুষের জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্মাচার রক্ষণও তেমন স্বধর্ম্মাচার। প্রত্যেক মানব ঋষি-ব্যবস্থিত স্বধর্ম্মাচারণ করিতে পারিলে এমন একরূপ তপঃশক্তি ও ঈশ্বর কৃপা লাভের অধিকারী হইতে পারে। প্রকৃত সতীধর্ম্মের সাধনায়, গৃহস্থ-বধূ তাই তাপসের তপঃশক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে। ব্যাধ, নিজে বধ না করিয়া পর হইতে মাংস আনিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া, পিতামাতা ও সংসার পালন করে এবং ভক্তির সহিত ভগবানের অর্চ্চনা সহ দীনের সেবায় অর্থের সৎব্যয় করে, তাই সেও তপঃশক্তি, ঈশ্বর-কৃপা লাভ করিয়াছে। আমার রাজভোগ ও রাজকর্ম্মও তেমন, মাত্র কুলধর্ম্ম রক্ষার্থেই আচরণ করিতেছি; আমি

জানি, এই রাজকর্ম্মই আমার স্বধর্ম্মরূপ ঈশ্বর সাধনা। এই ধর্ম্ম সাধনায়ই আমি রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়াছি।

গীতায় অর্জ্জুনকেও ভগবান ঠিক এই কথাই উপদেশ দান করিয়াছেন। নিবৃত্তি-পন্থীর সাংখ্যজ্ঞান-পথ ও প্রবৃত্তি-পন্থীর কর্ম্মযোগ-পথকে অজ্ঞজনেই পৃথক বলিয়া বোধ করে, পণ্ডিতজনে বলে না। জ্ঞান-পথের সাধনায় যাহা লাভ হয়, কর্ম্মপথের সাধনায় ও তাহাই লাভ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বহুস্থানে বর্ণধর্ম্মাচার অবশ্য কর্ত্তব্য ও তাহাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীঃ ২ অঃ ৩১ হইতে ৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত অর্জ্জুনকে তাহার বর্ণধর্ম্ম ক্ষত্রিয়াচার রক্ষার্থে উত্তেজনা দান করিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হইতে মহৎ কর্ত্তব্য আর নাই। সেই স্বধর্ম্ম দেখিয়া তুমি কম্পিত হইও না। আপনি স্বর্গদ্বার খুলিয়া স্বধর্ম্ম আজ তোমায় আহ্বান করিতেছে, তুমি স্বেচ্ছায় তাহা পরিত্যাগ করিতেছ। যুদ্ধে মরিলে স্বর্গ-পুরির রাজত্ব, আর জয়লাভ করিলে ইহলোকে যশ সম্পদ লাভ, এমন সুযোগ হারাইও না! এ যুদ্ধ না করিলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি-বিনাশের পাপভাগী হইবে। গীঃ ৩অঃ ৩৬ শ্লোকে বলিয়াছেন, পরধর্ম্ম পূর্ণরূপে সম্পাদন করা হইতেও, অপূর্ণভাবে স্বধর্ম্মাচরণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। এমন কি স্বধর্ম্মাচরণ করিতে যাইয়া, দেহত্যাগ ঘটিলেও কল্যাণ লাভ হয়, পরধর্ম্ম আচরণের ফল প্রায়ই ভয়াবহ। বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে, বর্ণাশ্রমাচার পালনই পুরুষের পরম পবিত্র কারক ধর্ম্মসাধন। জগত পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর আরাধনা ও তোষণের তাহা হইতে আর দ্বিতীয় পথ নাই।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরোধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ( গীতা )

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ কারণম্॥ বিষ্ণুপুরাণ॥

দেহের হীনতা ধরিয়া কর্ম্মাধিকারের তারতম্যে, যদিও বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট সংজ্ঞা স্থাপন হইয়াছে, কিন্তু মূলতঃ কোন বর্ণেরই জন্মমধ্যে গৌরব বা হীনতা, ঋষি নির্দ্দেশ করেন নাই। তাই হীনাচারী ব্রাহ্মণকে পূজা দানাদি গ্রহণের অনধিকারী পতিত নির্দ্দেশ করিয়া, হীনকুলের মহৎকে ব্রাহ্মণের মত শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইয়া ভোজন ও দান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মস্থাপয়িতা ঋষিগণের ঋণ-শোধের জন্য, তাঁহাদের বংশধর ব্রাহ্মণগণকে জন্ম দ্বারাই সম্মান করিতে ব্যবস্থা দিয়া, অন্য সমস্ত বর্ণেরই গুণদ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাই ব্রাহ্মণ জন্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ, অন্যবর্ণের শ্রেষ্ঠগণ মহৎ, সাধু, বৈষ্ণব নামে ব্রাহ্মণ-তুল্য হইয়া মানব-সমাজে পূজা পাইত। তাহাই হিন্দুর শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণসহ সাধু বৈষ্ণবের সেবা করাইবার বিধান। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণ দ্বারা তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াও পাপহীন হইতে পারিলেন না, যখন অন্ত্যজ ভুইমালী ( হাঁড়ি ) ভক্তকে, নিজে যাইয়া নিমন্ত্রণ ও সম্মান করিয়া আনিয়া ভোজন করাইতে পারিলেন, তখন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল, রাজা পাপহীন হইলেন। তাই বলিলাম, বর্ণমধ্যে মূলতঃ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টতা নাই, মহৎ চরিত্র ও কর্ম্ম-সম্পাদন-শক্তির মধ্যেই সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান ও পূজার অধিকার; আর চরিত্র ও কর্ম্মশক্তির হীনতাই মাত্র অসম্মান ও নিকৃষ্টতার কারণ। ভাগবতে ভগবানের বাক্য আছে, চণ্ডাল-বর্ণে জন্মিয়াও যদি আমাতে ভক্তিপরায়ণ হয়, সে দ্বিজশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-তুল্য। সে আমার মত পূজ্য, তাহাকেই দ্রব্য দিবে, তাহাকেই গ্রাহ্য করিবে অর্থাৎ গ্রহণ যোগ্য,

বর্ণের শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতা

সম্মান যোগ্য মনে করিবে। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, ভগবৎভক্ত শূদ্রকুলে জন্মিলেও সে শূদ্র নয়, ভাগবত বলিয়া জানিবে। আর সর্ব্ব বর্ণমধ্যে, ব্রাহ্মণ কেন না হউক তাহারাই শূদ্র, যাহারা ভগবান জনার্দ্দনে ভক্তিবিহীন।

চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহ্যং সচপূজ্য যথাহ্যহম্॥
নশূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেতু ভাগবতামতা।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে নভক্তা জনার্দ্দনে॥

একটি দেহেরই মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিলে, তাহা মহা সম্মানের নমস্কার বুঝায়, আর পদদ্বারা স্পর্শ করিলে পদাঘাত করা, মহা অসম্মান বোধহয়। কিন্তু মস্তক ও পদ এক দেহেরই দুই অঙ্গ, হীন বলিয়া পদ ফেলাইয়া দিলে দেহের গতিশক্তি বিলোপ হয়। চক্ষুআদি শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দেহে মলস্রাব-দ্বারও রক্ষার প্রয়োজন, তাহা না থাকিলে দেহরক্ষাই অসম্ভব; অথচ মলদ্বার স্পর্শ করিলে হাত ধুইয়া হাত পবিত্র করিতে হয়। ঋষি এমনি শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বর্ণগণ মিলাইয়া মানবসমাজ নামে একটি দেহ গঠন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই বর্ণগুলি সেই সমাজদেহের পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি-বর্গস্বরূপ। সমাজের দেহরক্ষায়, তাহার গুণ, শক্তি ও সুখবর্দ্ধনে এই প্রত্যেক বর্ণেরই সমান প্রয়োজন আছে। দেহের এক অঙ্গের বা ইন্দ্রিয়ের রোগ বিরূপতা, যেমন সমস্ত দেহেরই রোগ ও বিরূপতার তুল্য, দেহের শক্তি, গুণ ও সুখের হানিকর; এক বর্ণের অজ্ঞতা বিরূপতাও তেমন মানব-সমাজের অকল্যাণ ও দুঃখ কষ্টের কারণ হয়। তাই ঋষি প্রত্যেক বর্ণকে ধর্ম্ম-নীতি কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দিতে, তাহাদের গুরু ও পুরোহিত নামে, একদল ব্রাহ্মণকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া

দিয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষা ও উপদেশের বলেই, হিন্দুর হীনকুলের মধ্যেও ধর্ম্মব্যাধ, শিবাচণ্ডাল, পিঙ্গলাবেশ্যার মত মহৎ চরিত্র প্রকাশ হইতে পারিয়াছিল।

রঙ্গমঞ্চে যেমন অভিনেতার শ্রেষ্ঠত্ব, ভালরূপে অভিনয় প্রদর্শনের মধ্যে, নচেৎ শ্রেষ্ঠঅংশ রাজার অভিনয়ও ভাল না করিতে পারিলে, শ্রেষ্ঠবেশে, শ্রেষ্ঠাংশের অভিনেতা বলিয়া, তাহার নিন্দা করিতে কেহ ছাড়িবে না! আবার সামান্যঅংশ, সামান্য-সাজে প্রহরী পাগলাদির অভিনয়ও ঠিকমত করিতে পারিলে, লোকে প্রশংসা করিবে, পুরস্কার দান করিবে। বিশ্বমঞ্চের অভিনেতা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণগণও যার যার বর্ণমত কর্ম্মসম্পাদন করিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ, নচেৎ, রাজ-পুত্র ঋষিপুত্র হইয়াও স্বকুলের মহত্ত্বাচার প্রদর্শন না করিতে পারিলে, সে নিজকে, পিতামাতাকে, স্বকুল ও স্বজাতিকে অযশ, কলঙ্ক, দুঃখ দিবে। আর হীন চণ্ডালাদিকুলে জন্মিয়াও যদি তাহার হীন বর্ণাচারকে মহৎভাবে আচরণ করিতে পারে, সে নিজকে, পিতা-মাতাকে, স্বকুল ও স্বজাতিকে পর্য্যন্ত যশ, গৌরব ও কল্যাণে মণ্ডিত করিবে। তাহার দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ কুলের রাবণ, মনুবংশীয় রাজকুলের বেণ, জরাসন্ধ, কংস, দুর্য্যোধনাদি শ্রেষ্ঠকুলে জন্মিয়াও আচার-হীন-তায় সদা নিন্দিত, আর হীন-ব্যাধকুলের ধর্ম্মব্যাধ বেশ্যাকুলের পিঙ্গলাবেশ্যা হীন ব্যবসায় ব্যাভিচার-বেশ্যাচারকেও মহৎভাবে সম্পাদন করিয়া, হিন্দুর সর্ব্ববর্ণের সম্মানীয় হইয়া রহিয়াছে। তাই বলিলাম, হিন্দুর বর্ণের মধ্যে মূলতঃ শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টতা নাই। শ্রেষ্ঠবর্ণও আচারহীন হইলে পতিত ও পাপী হয়, ভগবানের নিকট শাস্তি পায়, হীনবর্ণও তাই। আবার শ্রেষ্ঠাচার ও সাধন ভজনে সর্ব্ববর্ণই, ঈশ্বর-কৃপার ও মুক্তির অধিকারী হয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সাধন ভজন ও

সদাচার গ্রহণে কোন বর্ণেরই বাধা নাই। সর্ব্ববর্ণই এক মন্ত্রে এক বিধানে ভগবানের পূজার অধিকারী, কেবল ব্রাহ্মণভিন্ন অন্যবর্ণ অপরের প্রতিনিধি হইতে নিষেধ। আর উচ্চ সাধনাধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রণব ও বেদমন্ত্রে শূদ্রকে অধিকার দেওয়া হয় না, সেও পরে তাহা লাভ করে। ব্রাহ্মণের মত ত্যাগ, শৌচ এবং শক্তি হইলে ব্রাহ্মণ আদরে তাহাকে সেই অধিকার দান করেন।

যে কোনও দেশের নারীচরিত্র সন্ধান করিলেই, এই অধ্যায়ের বর্ণিত নারী-বিভাগ যে নিত্য সত্য তাহা বোধ করিতে পারা যায়। দেহেন্দ্রিয়-সুখত্যাগী সাধারণতঃ নীতি-শীলতা-মণ্ডিত, ঈশ্বরে ভক্তিমান কতগুলি নারী পাইবেন, তাহারা এক পতিবিনা, বিধবা হইয়াও অন্যপতি গ্রহণকে নারীর হীনতা বোধ করে, সে মিলনকে কাম-মিলন বোধ করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠা দেবী-অংশজাতা রমণী-শ্রেণীর নারী। একটু ইন্দ্রিয় পরা সর্ব্বদা একটা পুরুষ-বিনা জীবন যাপন কষ্ট বোধ করে, তাই বিধবা হইলেও এক জনকে আশ্রয় করিয়া, পাতিব্রতার মতই জীবন কাটায়, তাহারাই দ্বিতীয়া কামিনী শ্রেণীর নারী। যাহারা আরও কিছু ইন্দ্রিয়-পরা, একজনে তুষ্টা নয়, দুই চারি জনের অধিকও চাহে না, অবৈধ গমনও ইচ্ছা করে না, তাহারাই সৈরিনী নামে তৃতীয়া শ্রেণী। আর যাহারা অধিক ইন্দ্রিয়-পরা, সে জন্য গৃহের স্নেহ-বাঁধন ছিঁড়িয়া, সমাজের অপমান, দারুণ যোনিরোগ ভয় ত্যাগ করিয়া, সর্ব্ববর্ণের বহুপুরুষ গামী হয়, তাহারাই চতুর্থশ্রেণীর বার-বিলাসিনী নারী। আর যেই নারীগণ, মানবসমাজ হইতে, সংসার-বন্ধন সমাজের নীতি শীলতা, ঈশ্বর ভয় সদাচারকে তুলিয়া দিয়া, পশুর মত ব্যভিচার-পথে যথেচ্ছাচারে নিজের দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি

নারীর শ্রেণীভেদ নিত্য।

করিতে চাহে, তাহারাই পঞ্চম শ্রেণীর মহা অকল্যাণমূর্ত্তি পতিতা-নারীগণ।

অন্যধর্ম্ম-পন্থীগণ যেমন ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক মানবের মাত্র এই দুই শ্রেণী করিয়াছেন, নারীকেও শুদ্ধা ও পতিতা মাত্র দুই শ্রেণী করিয়া থাকেন; এই পঞ্চ প্রকার বিভেদ আর কোথাও নাই। বর্ত্তমানে সাধারণ হিন্দুগণও সতী ও অসতী এই দুই প্রকারে নারী ভেদ করিয়া থাকে; এক পবিত্রতাগণই সতী, আর বিবাহিতা বিধবা হইতে স্বৈরিণী বারবিলাসিনী ও অবৈধচারিণী সকলকেই পতিতা মনে করে। ইহাতে হিন্দু-সমাজের মহা অকল্যাণ হইতেছে, সমাজে গোপনে ব্যভিচার প্রবেশ করিতেছে। কেন না, দেব-প্রকৃতির নারীবিনা হিন্দু-বিধবার তপোময় ব্রহ্মচর্য্যাচরণ, অসুর-প্রবৃত্তি নারীর দ্বারা কখনও সম্ভব হইতেই পারে না। অথচ অসুর-প্রকৃতির নারীও অন্যপতি গ্রহণ করিলে, অসতী নামে পতিতাতুল্য অসম্মানীয়া ও পুণ্যহীনা হইতে হইবে বলিয়া, বলপূর্ব্বক স্বভাব নিরোধের চেষ্টা করে; পরে স্বভাব নিরোধে অক্ষম হইয়া ব্যভিচার করিয়া থাকে; এমন কি সত্যই পতিতা হইয়া গৃহত্যাগ বা ভ্রূণ-হত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বসে। তাই ঋষি অসুর-প্রকৃতির নারীর মধ্যেও চারিপ্রকার শ্রেণীভেদ করিয়া, সবকে যথা যোগ্য সম্মান দান করতঃ সমাজে স্থান দান করেন ও তাহাদিগকে স্বধর্ম্মাচার নির্দ্দেশে মার্জ্জনা করিয়া, উচ্চস্বভাবে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন।

নারী হইতে কর্ম্মসম্পাদক দেহ ও পুরুষ হইতে জীবাত্মার উদ্ভব হয়। দেহ উৎকৃষ্ট হইয়া জীবাত্মা হীন হইলে, সেই মানবের জীবন-যাপন বড়ই কষ্টকর হয়। কেন না, দেব-দেহদ্বারা অসুর-কর্ত্তার বাসনার তৃপ্তি হইতেই পারে না; অবৈধ-বাসনা পূরণের চেষ্টায় দেব-দেহ অক্ষম

রুগ্ন হইয়া অকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। আর দেহ নিকৃষ্ট হইয়া জীবাত্মা উত্তম হইলে, দেব-কর্ত্তার কামনাকে পূরাইতে অসুর-দেহের প্রথমে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে দেহের তাহা পূরণ অসাধ্য নয়; তাই পরে অভ্যস্থ হইয়া উঠে; কোথাও বা দেব-বাসনাকে অসুরের মত অমানুষ ভাবে সম্পন্ন করায়। যেমন, অসুরগণ প্রতিজ্ঞারক্ষণ, দান ও তপস্যাদিতে যেরূপ কঠোরতা আত্মত্যাগ, কষ্ট-সহনতা দেখাইয়াছেন, দেবতা বা ঋষিও তেমন পারেন নাই। এই জন্যই ঋষি নারীর উচ্চবর্ণে মিলনকে সমর্থন করিয়াছেন, হীন-গমনকে সর্ব্বদা রোধের চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই প্রতিলোমজ সন্তানগণকে অন্ত্যজ ও অন্ত্যাবসায়ী নাম দিয়া, চতুর্বর্ণাতীত হীনবর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

নারীর নীচ ও উচ্চ গমনের ফল।

উচ্চকুলের নারীর হীনসংযোগ জাত সন্তান লইয়া ঋষি গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত শূদ্রসন্তানের গাত্রচর্ম্ম, দন্ত ও মস্তকাস্থি লইয়া তাঁহারা দেখিলেন, তাহা প্রেতনামক উপদেবগণের সদা বিহার স্থান। ঐ অন্ত্যজাদি জাতির চরিত্র সন্ধান করিলেও দেখা যায়, তাহাদের জীবন সেই প্রেতের মতই অশুচী, অবৈধাচার, আলস্য ও তমোগুণ প্রধান, কাম ক্রোধ পর। তন্ত্রের প্রেত-সাধন অধ্যায়ে, ব্রাহ্মণীগর্ভের শূদ্রজাত-সন্তানের গাত্রচর্ম্ম সুখাসন, দন্ত মহাশঙ্খমালা, মাথার খুলি মহাপাত্র। নায়িকা-সাধন অধ্যায়ে সেই হীনজন্মা অন্ত্যজ রজকী ও চণ্ডালী শ্রেষ্ঠ আশ্রয় করিয়া সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন প্রেত আকর্ষণ কর্ম্ম অন্য কোনও বর্ণের দেহর চর্ম্ম দন্তাদি দ্বারাত হয় না? ইহাতেই বোধ হয় উচ্চনারীর হীনপুরুষ সহ মিলন জগতের মহা অকল্যাণের কারণ।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদেরমত, হীনকুলেও মহতের আবির্ভাব দেখা

যায়, আবার শ্রেষ্ঠকুলেও হীনস্বভাবের দুষ্ট সন্তান দৃষ্ট হয় বলিয়া কুলের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সাধারণ মানবের মনে সন্দেহ আসে বটে, কিন্তু ঋষি তাহার বিষয়ও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কোনও দেবতা বা ঋষিগণ, অভিশাপাদি বশতঃ হীনকুলে জন্মিলেই পূর্ব্ব-স্বভাব ও আচার বিস্মৃত হয় না। আবার পূর্ব্ব স্বরূপ লাভজন্য তাই সে দারুণ চেষ্টা করে; কুসঙ্গ, কুশিক্ষা, সবর্ণের শাসন তাড়নাও তাঁহাকে সে পথ হইতে নিরস্ত করিতে পারে না; তাঁহারাই হীনকুলের শ্রেষ্ঠগণ। তেমনি হীনকুলের কেহ কোনও সৎকর্ম্মবলে বা মহতের আশীর্ব্বাদে শ্রেষ্ঠকুলে জন্মিলে, সে তাহার পূর্ব্ব-জন্মের স্বভাব হীনতাকে সহজে ভুলিতে পারে না। তাহাদের যদি হীনসঙ্গ কুশিক্ষাদি যোগ হয়, তবে পূর্ব্বহীনস্বরূপই ধরিয়া উঠে, আর সৎসঙ্গ ও শিক্ষা পাইলে ইহারা ক্রমে উন্নত হয়; ইহারাই উচ্চকুলে হীন-কর্ম্মাগণ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ আত্মাও মাতৃজাত হীনদেহের মোহ সহজে জয় করিয়া উঠিতে পারেন না। তাহার প্রমান প্রহ্লাদ ও বিশ্বামিত্রের জীবন।

দেহভেদে কর্ম্মশক্তির বিভেদ

কশ্যপের বরদানে একটী ভক্তসত্তা ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া হিরণ্য-কশিপুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন; তিনিই শিশুকাল হইতে স্বভাবতঃ মহাজ্ঞানী ও বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ। তিনি অসুর দেহের মোহে নৃসিংহ-দেবের নিকট মুক্তি না চাহিয়া, বিষয়-ভোগ গ্রহণ করিলেন। পরে অসুর-সঙ্গ, উত্তেজনা ও খাদ্যবলে, সে বিষ্ণুকেই পরাজয় করিয়া, বৈকুণ্ঠ ও লক্ষ্মীকে লাভের জন্য, বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে বৈকুণ্ঠে যাইয়া উপস্থিত হন; গুরু নারদ আসিয়া তাঁহার সেই মোহ বিনাশ করেন। ঋচিক-মুনি পত্নীর

সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দানে উদ্যত হইলে, রাজকুমারী পত্নী নিজের জন্য ও অপুত্রক পিতার জন্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ঋষি ব্রহ্মলোক হইতে এক ঋষি-সত্তাকে পত্নীর জন্য ও এক ক্ষাত্র-শক্তিধর বিষ্ণুঅংশকে শ্বশুরের জন্য, তপোবলে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া চরুতে নিরোধ করিলেন। সেই চরু, পত্নী ও শ্বাশুরীকে ভোজন করিতে দেখাইয়া দিলে, মায়ের প্রার্থনায় কন্যা নিজের ভাগ মাকে দিয়া, নিজে মায়ের ভাগ ভোজন করিলেন। তাহাতে ঋষিসত্তা ক্ষত্রিয় মায়ের দত্ত দেহ লইয়া, বিশ্বামিত্র নামে রাজসন্তান রূপে জন্মিলেন, আর ক্ষাত্রদেবসত্তা ব্রাহ্মণপুত্র বিষ্ণু-অবতার ক্ষত্রান্তক পরশুরাম হইলেন। পত্নীর আর্ত্তিতে ঋচিকের বরে তিনি তাহার পুত্র না হইয়া, পৌত্ররূপে পরে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র ঋষি-সত্তা হইয়াও ক্ষাত্র-দেহের উগ্রতা বিরোধ-প্রীতির হাত এড়াইতে পারেন নাই; ঋষিত্ব ফুটাইতে দেহ-মোহে বহুবার সাধনপথ ভ্রষ্ট হইয়া তিনি নানা দুঃখ পাইয়াছেন; পরে তাঁহার ঋষিসত্তা দেহ-মায়া জয়ে সক্ষম হইয়াছিল। পরশুরামও আত্মা ক্ষত্রিয় বলিয়া, দেহ-ধর্ম্মে ঋষি না হইয়া, সারা জীবন ক্ষত্রিয়-কর্ম্মই সম্পাদন করেন। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি মাতৃজাত-দেহের প্রভাবে ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া এবং ব্রহ্মত্ব শিবত্ব লাভ করিয়াও রাক্ষস ও অসুর স্বভাবেরবলে অবৈধাচারী রাক্ষস ও অসুর হইয়া উঠিয়াছিল। এই টুকুই জন্মভেদে কর্ম্মাধিকারভেদ। হিন্দু-শাস্ত্রের বর্ণ-বিভাগ স্বীকার ও সেই স্বভাব-বিজয়ের আচরণই হিন্দুর বর্ণধর্ম্মানুশাসন; এইটি মানব-সমাজের একটি মহাকল্যাণের সংবাদ।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## পূর্ণ নরত্বের মূল রসতত্ত্ব বা ভালবাসার সাধনা সংবাদ।

মহর্ষি কর্দ্দম ও কশ্যপ কেন পত্নীকে সংসার-সুখের কল্পবৃক্ষ, ত্রিবর্গ-দোহনশীলা, সংসারে দুঃখ-জলধি পারের সুখময় যানাদি বলিয়াছেন, বুঝিয়াছেন ত? বিষয় জগতের সর্ব্ববিধ সংসারসুখ-বাসনা নারী-রূপ পত্নীই পুরুষকে পরিবেশন করে, পুরুষে যে সুখ চাহে নারী কল্পতরুর মত তাহাই পুরণ করে, তাই কল্পবৃক্ষ। পুরুষের ত্রিবর্গের যত বাসনা—ধর্ম্ম, অর্থ, কামসুখ, ইহা এই নারীই পুরুষ হইতে দোহন করিয়া বাহির করে ও ভোগ করায়, তাই ত্রিবর্গদোহ-শীলা। দুঃখ, দরিদ্রতা, শ্রান্তি, অবসাদ, রোগ ও শোকের যাতনার ক্লেশাদি হরণ করিয়া, নারীই পত্নীরূপে সংসারকে সুখময় করিয়া ভোগ করায়, তাই সংসারে দুঃখ-জলধি পারের সুখময় যান। দেহেন্দ্রিয়ের যথাযথ তৃপ্তি দিয়া, সন্ন্যাসী ইত্যাদি অপর আশ্রমী দিগের অতি দুর্জ্জয় কাম, ক্রোধ, লোভ আদির আক্রমণ হইতে গৃহীকে নারীই রক্ষা করে, তাই ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি বিজয়ের সুদৃঢ়-দুর্গ। ষড়ঋণ শোধ ব্যপারে ও আত্মঋণ শোধে—পুরুষের দেহেন্দ্রিয় একটী নারীর সাহচর্য্য বিনা কিছুতেই পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইবে না। পিতৃ-ঋণ শোধে—বংশ-রক্ষণ ও পিতৃ-সেবা নারী বিনা শুধু পুরুষের দ্বারা সুখে শৃঙ্খলায় সমাপন হইবেই না। এইরূপ, রাজঋণ—অতিথি-সেবনে ভূতঋণ—প্রাণী সেবনে, এবং ঋষিঋণ শোধনেও একা পুরুষদ্বারা কিছুতেই সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। তাই কর্দ্দম বলিয়াছিলেন, আমি লোকানুগত (ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-আদি জন্য) পত্নী চাহিতেছি না, পত্নীবিনা পিতৃঋণ, দেবঋণ

আদি শোধের আর উপায় নাই দেখিয়াই পত্নী-কামনা করিতেছি। হিন্দুর বিবাহ-ব্যাপার তাই অন্য ধর্ম্মসমাজের বিবাহ-ব্যাপার হইতে পৃথক-ব্যাপার। এবং ইহার বিধান সমূহ অন্য-ধর্ম্মির ও হিন্দু-সংস্কার-হীন আধুনিক-শিক্ষিতের বুদ্ধির অতীত। হিন্দুর বিবাহ-মধ্যে ঋষি আরও একটী বিষয়ের দিকে অধিক যত্নবান ছিলেন। তাহার সাধনাই প্রকৃতপক্ষে মানবত্ব সার্থকতার ও মানবত্ব জাগাইবার মূল সাধনা। বাল্য ও কৈশোর বিবাহ-বিনা যৌবন-বিবাহে সেই সাধনা প্রায়ই পণ্ড হইয়া যায়। আর বিবাহ-মিলন বিনাও তাহার সাধনা অসম্ভব।

পূর্ব্বখণ্ডে ঋণ-শোধ-ধর্ম্মাধ্যায়ে মানবত্ব কি, তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পক্ষের বিশেষত্বে পাখী, পিশুনতা (হিংসার) প্রাধান্যে-পশু, তেমনি মনঃশক্তির প্রাধান্যেই মানবত্ব। সেই মন চালনায় কোন্ শক্তিকে বর্দ্ধন করিবে? পশুও আত্মতৃপ্তি করে, সন্তান পালন করে, যুদ্ধাদি করে। নর ভিন্ন বিনাস্বার্থে পরসেবা সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা, ঈশ্বর-উপাসনা আর কোন প্রাণীই করিতে পারে না, তাই সেই দিকে মানসিক শক্তির চালনাই মানবত্ব; এক কথায় সেবাধর্ম্মই মানবের মানবত্ব। এই সেবাধর্ম্মের মূল কি? কি সত্তার বিকাশে, মানবের জীবভাবরূপ আত্মতৃপ্তি ডুবাইয়া, দেহেন্দ্রিয়ে কষ্ট দিয়াও পর-সেবায় জীবের ক্ষমতা জন্মে, সে জন্য তাহার কষ্টবোধ হয় না? তাহার নামই **রসতত্ত্ব বা স্নেহরূপ ভালবাসার জাগরণ**; ইহারই নাম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব। হিন্দু-শাস্ত্রমতে ঈশ্বরাভিমুখী স্নেহমাত্র প্রেম ও ভক্তি-পদবাচ্য, আর সৃষ্টি-রাজ্যের স্নেহই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

এই কর্ম্ম-জগতে কর্ম্মচেষ্টার, আত্মত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম-শক্তির, কর্ম্ম-ফলের ও জীবের তৃপ্তি ও সুখের মূল এই শ্রদ্ধারাজ্য। এই জন্যই

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরো সংযতেন্দ্রিয়ঃ,' শ্রদ্ধা হইলে উপদেশ শ্রবণে রুচি হয়, মনোযোগপূর্ব্বক গ্রহণ করে, আদেশ পালনে তৎপর হয় ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আচরণ করিতে পারে। তাই শ্রদ্ধাবানই মাত্র জ্ঞানলাভ করে। আরও বলিয়াছেন—অশ্রদ্ধার সহিত দান, আহুতি তপস্যাদি যাহা কেন না করে সমস্তই অসৎকার্য্যতুল্য; তাহাতে ইহকালে বা পরকালে কোথায়ও কোন মঙ্গল লাভ হয় না। শ্রদ্ধাবিরহিত কর্ম্ম তামস-কর্ম্ম। অশ্রদ্ধাবান পুরুষের ধর্ম্মসাধনে ভগবান মিলে না, তাহাতে মৃত্যু ও সংসারের পথেই লইয়া যায়।

অশ্রদ্ধয়াহুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চযৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ নচতৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ১৭ | ২৮
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞ তামস পরিচক্ষতে ॥
অশ্রদ্ধাধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি ॥ ৯। ৩

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ২য় ৩য় শ্লোকে আরও স্পষ্ট বর্ণিত আছে মানবের স্বভাবতঃই ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যার যার সত্ত্বানুরূপ এই শ্রদ্ধাজন্মে এবং যার যেরূপ শ্রদ্ধা সে তেমন ভাবে কর্ম্মরত হয়; তাই বলিলাম শ্রদ্ধাই সর্ব্ববিধ কর্ম্মের মূল। ব্রহ্মপুরাণে বিশ্বামিত্র তষ্টাকে বলিয়াছেন, এই শ্রদ্ধাজনিত ভাবই এক কর্ম্মের পৃথক ফলের কারণ, এই শ্রদ্ধার ভাবই কর্ম্মদ্বারা বন্ধন ও মুক্তির কারণ। ব্রঃ পুঃ ১৭৩ অধ্যায়।

ভাবস্থিতং ভবেৎকর্ম্ম মুক্তিদং বন্ধ কারণম্।
স্বভাবানুগুণং কর্ম্ম স্বসোবেহ পরত্রচ ॥
ফলানি বিবিধান্যাহু, করোতি সমতানুগম্ ॥

তাই বলিলাম শ্রদ্ধাই কর্ম্মফলের কারণ। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এই শ্রদ্ধা-অধ্যায় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার প্রথমরূপ ঈর্ষাত্যাগ অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভাবের নাশ। দ্বিতীয়রূপ বিশ্বাস অর্থাৎ মঙ্গলকারক শক্তিতে আস্থা। তৃতীয়রূপ শ্রদ্ধা অর্থাৎ তাহাকে সম্মানের ইচ্ছা, কর্ম্মে চেষ্টা। চতুর্থরূপ ভালবাসা অর্থাৎ গুণাদি শ্রবণে আনন্দ বোধ ভাল লাগা। এই ভালবাসা জন্মিলে লোকের শান্তত্ব লাভ হয়, সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ আলোড়নের শেষ হয়। ইহার পূর্ণ পরিণতি সমাধির মত বিষয় ছাড়িয়া চিত্ত ঈশ্বরে লাগিয়া যাওয়া। পঞ্চমরূপ ভক্তি অর্থাৎ সেই গুণবানকে কোন প্রকার আপন জন করিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা সেবায় মতি। ভক্তিতে সাধারণতঃ দাস্য ভাবই জাগে; মহত্ত্বের মহিমায় নত হইয়া সেবার সাধই দাস্য-ভক্তি। ষষ্ঠ অবস্থায় ভক্তি প্রেম হইয়া সেই গুণবানকে সন্তানের মত, বন্ধুর মত বা স্বামীর মত আপনজন করিয়া সেবায় মতি হয়। বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে এই ভাব ভগবানে জাগিলেই জীবত্বের পূর্ণনাশ হয়। তাই এই রসতত্ত্বই মানব-জ্ঞানের ও কর্ম্মচেষ্টার চরম ফল।

শ্রদ্ধাহীনকর্ম্ম—জিহ্বার তৃপ্তিকর, সুশ্রী, সুগন্ধযুক্ত বহু খাদ্য দ্রব্য, স্বর্ণপাত্রে ভরিয়া সম্মুখে দিয়া, রাজসিংহাসন-তুল্য আসনে বসাইয়াও, যদি একটি অশ্রদ্ধার বাক্য বলে, বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তখনি এত লোভনীয় সেই খাদ্য গ্রহণের মতি চলিয়া যাইবে, ভোজনে বিস্বাদ বোধ হইবে; আর শ্রদ্ধাদত্ত সামান্য ফল জলে কত তৃপ্তি বোধ হইবে! ভালবাসা মাখা না হইলে সেই সেবা যেন প্রাণহীন দেহ, নুনহীন ব্যঞ্জন। এই ভালবাসার অভাবেই কর্ম্মরাজ্যে কর্ম্ম করিয়াও মানব সুখ পায় না, যাহার কর্ম্ম করে সেও সুখী হয় না। এই ভালবাসার বন্ধনেই মাতা সর্ব্ব-প্রকারে আপনসুখ বিসর্জ্জন দিয়া, পুত্রকে সেবা করিয়াই আনন্দ পায়।

পুত্র পিতার জন্য, বন্ধু সখার জন্য, পত্নী স্বামীর জন্য দেহ-সুখ, মন-সুখ আদি সর্ব্বস্বার্থসহ প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে। ইহার অভাবেই আজ মাতা সন্তান-পালনে কষ্ট বোধ করে, আয়া দ্বারা সন্তান পালন করিয়াই সুখী হয় ; পুত্র বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আপদ বা অনাবশ্যক বোধ করে ; পত্নী পতিব্রতার স্বামীসেবাকে নারীত্বের মর্য্যদাহীন, পুরুষের অধীনতা মনে করে ; বন্ধুর জন্য, ভ্রাতার জন্য স্বার্থত্যাগ আজ মূর্খতা প্রকাশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যদি দৈবাৎ কাহারো মধ্যে এই ভালবাসা ফুটীয়া উঠে, তাহার প্রেমের পরশে মরুভূমিতে জলের-বন্যার মত এই অসম্ভব ব্যাপারও হয়। এইরূপ পত্নীর পরশে পাষাণ হৃদয়, পাষণ্ড পুরুষ স্বামীর জীবন পরিবর্ত্তিত হয় ; মাতার পরশে পাষণ্ড নির্গুণ পুত্র, ভগ্নির পরশে নির্গুণ মূর্খভ্রাতা দেব-চরিত্র, গুণবান, জ্ঞানবান, মহৎ হইয়া যাইতে দেখাযায়। তাই বলিলাম এই ভালবাসা রাজ্যই মানবের কর্ম্ম জগতের মূলসত্তা।

হিন্দু-শাস্ত্রের সৃষ্টিপ্রকরণে বর্ণিত আছে জ্ঞানহীন জীব দেখিয়া দুঃখিত হইয়া, জ্ঞানময় জীব সৃজন করিতে ব্রহ্মা সব প্রজাপতিগণ সৃজন করিলেন। তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর আরাধনা বিনা অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। তখন বিষ্ণু অংশ স্বয়ম্ভুব মনুরূপে আবির্ভূত হইলেন ; তিনিও কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন বিষ্ণু ব্রহ্মার মনকে মন্থন করতঃ মন্মথরূপে প্রকাশিত হইয়া, সকলকে কুসুম-শরের আঘাত করিলেন, শরের শক্তিতে বাধ্য হইয়া সকলেই কর্ম্মরত হইলেন। এই মন্মথ-দেবকে চিনিলেন কি ? ইনিই এই শ্রদ্ধাদেবতা, ভালবাসার অধিপতি কামদেব। গুণাবরিত হইলেই তিনি বিষয়-রাজ্য-বিহারী কামদেব, তাহা হইতে আত্মতৃপ্তি লালসার বাসনা জন্মে, আর গুণাবরণহীন বিশুদ্ধতা পাইলেই ইনি

শাস্ত্রে শ্রদ্ধার জন্ম।

ঈশ্বরভক্তি ও প্রেমের কারণ হন ; জীব ভগবানকে ভালবাসিয়া মুক্তির অধিকারী হয়। কি অসুর কর্ম্ম কি ভগবৎ কর্ম্ম সকলের মূল এই শ্রদ্ধা বা ভালবাসার আকর্ষণ।

ঋষিমতে জীবের কর্ম্ম ত্রিবিধ, আত্মনেপদী, পরস্মৈপদী ও উভয় পদী। মানব কর্ম্ম করে হয় নিজের জন্য, না হয় পরের জন্য, না হয় উভয়ের জন্য। **আত্মনেপদী** শুধু নিজের জন্য, তাহাতে অপরের কষ্ট ইত্যাদির দিকে নিজের সন্ধানই থাকে না ; নিজের স্বার্থ সাধনই মোক্ষ উদ্দেশ্য অপরের প্রাণ গেলেও ক্ষতি বোধ নাই। **পরস্মৈপদী** পরের জন্য, তাহাতে নিজের ক্ষতি কষ্টের চিন্তাই নাই, আত্মাহুতি দিয়াও পরসেবা চাই। **উভয়পদী** উভয়ের জন্য, ইহাতে উভয়ের স্বার্থ বিজড়িত, যেমন ঋণ দান করিলাম পরেরও অর্থ কষ্ট গেল নিজেরও সুদে অর্থলাভ হইল, পুকুর-খনন নিজেও ভোগ করিবে পরেও ভোগ করিবে ইত্যাদি। এক দেহেও ত্রিবিধ কর্ম্ম আছে ! শুধু আত্মার তৃপ্তি, শুধু প্রবৃত্তির তৃপ্তি, আর আত্মা ও প্রবৃত্তির তৃপ্তি। আত্মার তৃপ্তি আত্মনেপদী, প্রবৃত্তির তৃপ্তি পরস্মৈপদী ও উভয়ের তৃপ্তি উভয়পদী। মানব কেবল আত্মার তৃপ্তিজন্য এমন কর্ম্মেও ব্রতী হয়, সে জন্য দেহ প্রবৃত্তির কষ্ট, অতৃপ্তি কোন দিকেই তাহার দৃষ্টি থাকে না, তাহা এই শ্রদ্ধারাজ্য ভালবাসার জন্যই মানব দেহ-সুখ, প্রবৃত্তি-সুখ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্ম করিতে পারে। আবার মানব প্রবৃত্তির সুখের জন্য অনেক সময় আত্মার বেদনার রোদনরূপ বিবেক-বাণীর মানা না শুনিয়াও, অতি হেয় পথে কোন ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির তৃপ্তি করিয়া বসে। ইহাই তাহার পরস্মৈপদী কর্ম্ম, আর আত্মাও প্রবৃত্তির তৃপ্তিকর কর্ম্ম ত্যাগ মহত্বাদি প্রদর্শনে পরসেবা, দান আদিদ্বারা আত্মারও তৃপ্তি এবং যশ, মান, পূজা, প্রভুত্বাদি লাভ দ্বারা প্রবৃত্তিরও তৃপ্তি, তাই এই সব উভয়

স্নেহই আত্মার কর্ম্ম।

পদী কর্ম্ম। তাই বলিলাম ভালবাসা-রাজ্যই মানবের আত্মার এক মাত্র স্বকীয় আস্বাদনের আত্মনেপদী কর্ম্ম; তাই ইহার জাগরণেই মানবত্বের পূর্ণতা, আত্মার পূর্ণ জাগরণ হয়; তাই এই ভালবাসার সাধনই মানবের মোক্ষ কর্ম্ম সাধনা, তাহার ধর্ম্ম সাধনা ও মানবত্বের স্বার্থকতার মূল কারণ।

এই শ্রদ্ধারাজ্য জীবাত্মার আত্মনেপদী প্রিয়-কর্ম্ম বলিয়াই, পরমাত্মা-রূপী পরমেশ্বরেরও আত্মনেপদী, নিতান্ত প্রিয় সাধনা—তাইত এই ভক্তির সাধনে অব্যক্ত অরূপ ব্রহ্ম ব্যক্ত্য মোহনরূপ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া উঠেন, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় মহাগুণবান ও ক্রিয়ারত হইয়া, ভক্তের সঙ্গে খেলা রত হন, অপক্ষপাতী ভক্তের শত্রু বধ করেন, যোগ ক্ষেম বহন করেন, বুদ্ধি দেন, পাপ তাপ ধুইয়া দেন, ভক্তিদত্ত জড়-দ্রব্য সামান্য পত্র পুষ্প ফল জলও সাদরে ভোজন করেন। তাই গীতায় বলিয়াছেন—সেই পরমপুরুষ ভগবান মাত্র অনন্য-ভক্তি লভ্য—জ্ঞান যোগ আদি অমিশ্রিত শুধু ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ ও অনন্য ভক্তি। আবার বলিয়াছেন—অন্য-দেবতাকে শ্রদ্ধায়-ভজন করিলেও, অবিধি পূর্ব্বক আমার পূজা হয়। যে কোনও তনুকে শ্রদ্ধা করিলেই, আমি তুষ্ট হইয়া সেই বিষয়ে অচলা শ্রদ্ধা দান করি। তাই এই শ্রদ্ধারাজ্যই ভগবানের প্রীতির স্বকীয়-রাজ্য।

> যেঽপ্য-দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। ৯। ২৩
> তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধিপূর্ব্বকম্॥
> যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি।
> তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ৭—২১

মানব কোন্ চিত্রটি আদরে দর্শন করে? হয় দাস্য, নয় সখ্য, কিবা বাৎসল্য, অথবা মধুর রসের উদ্দীপক যে চিত্র। কোন্ গান যত্নে

শ্রবণ করে? পূর্ণ ভালবাসা প্রকাশের গান। কোন্ চরিত্র আদরে শ্রবণ করে, কোন্ অভিনয় শতবার দর্শন করিয়াও প্রাণের পিপাসা মিটে না? আত্মত্যাগভরা, পূর্ণ ভালবাসার প্রকাশ যাহাতে হইয়াছে। মানব সুন্দর দ্রব্যটী, সুস্বাদী দ্রব্যটী সংগ্রহ করে কেন? কোন ভালবাসার পাত্রকে দান করিবে বলিয়া। বৈষ্ণব-মতে জীবের কর্ম্মলীলার মূলই এই স্নেহরূপ বৈষ্ণবী-মায়া। এই মায়াসূত্রে বন্দী হইয়া, জীব সর্ব্বদা কর্ম্মপথে লীলা করিতেছে। এই মায়া যখন জীবরাজ্যে থাকে তখনি মায়া, বন্ধনের কারণ, আর যখন ব্রহ্মরাজ্যে যুক্ত হয় তখনি ভক্তি মুক্তির কারণ হয়। এই মায়া স্বয়ং ভগবানের আত্মমায়া বলিয়াই, স্বয়ং ব্রহ্মা এই মায়ার বলে কন্যার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, মহাদেব পত্নীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া শতবৎসর রোদন করিয়াছিলেন, বিষ্ণু পত্নীকে বক্ষবিহারিণী করিয়া রাখিয়াছেন; শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ হইয়াও পত্নীশোকে ধুলায় পড়িয়া কাঁদিয়া লোটাইয়া ছিলেন।

স্নেহের শক্তি পবিত্র ভগবত-মায়া বলিয়াই, এই ভালবাসার উদয়ে মানবের হৃদয় হইতে জীবস্বভাব – আত্মতৃপ্তি ও দেহেন্দ্রিয়-সুখ-মতি নষ্ট হইলা, পূর্ণ মানবের ত্যাগ, মহত্বভরা দেব-চরিত্র আপনা হইতে জাগিয়া উঠে; তাই বলি ভালবাসাই মনুষ্যত্বের মূল।

নারী হৃদে ভালবাসা জাগয়ে যখন।<br>
আপনি জাগিয়া উঠে সন্তান পালন॥<br>
ভ্রাতালাগি বন্ধুলাগি প্রাণ-বিসর্জ্জন।<br>
প্রভুলাগি দাস করে সর্ব্বস্ব অর্পণ॥<br>
পতিলাগি সতী যাই অনলে প্রবেশে।<br>
আপনি জাগয়ে ভালবাসার বিকাশে॥

তাই বলিলাম ভালবাসার জাগরণই মানবের পূর্ণতার কারণ, জীবন

সার্থকতার মূল সাধনা। তাই মানবের শিক্ষা-অধ্যায়ের মধ্যে ও মিলন ব্যাপারে সর্ব্বদা যাহাতে এই ভালবাসা জাগরণের অনুকূল হয়, সেরূপভাবে করাই বিশেষ প্রয়োজন।

না জাগিলে ভালবাসা কিছুতে কখন।
আত্মতৃপ্তি লালসার না হয় পতন॥
আত্মতৃপ্তি থাকিলেই রহে স্বার্থজ্ঞান।
স্বার্থজ্ঞানে পরপীড়া মিথ্যাদি সন্ধান॥

ভালবাসার জাগরণ বিনা কিছুতেই কখনও মানব পশুতার হাত এড়াইতে পারে না।

একদিন এই ভালবাসার সাধনায়ই ভারতবাসী হিন্দু জগতের সর্ব্বমানবের আদর্শ ও পূজনীয় হইতে সক্ষম হইয়াছিল। অন্যদেশের মানব তাহাদের সৌন্দর্য্য মহত্ত্বাদি দর্শনে, হিন্দুদিগকে দেব-আখ্যা দান করিয়াছিল; তাহাদের পবিত্র সুখ শান্তির সংসারকেই স্বর্গ বলিত। সত্যই স্বর্গের মত হিন্দুর দেহ, গৃহ, সমাজ সর্ব্বাদিক সর্ব্বপ্রকারে অভাবহীন ও দুঃখ-বর্জ্জিত হইয়াছিল। আজ জগতের আপামর সকলকে সুখী করিতে সোভিয়েট নামে যে মহাআন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ভালবাসাকে জাগাইয়া একদিন ভারতবাসী সত্যই তাহা স্থাপন করিয়াছিল। ভালবাসার জাগরণ বিনা, শত শিক্ষা ও কঠোর শাসনে কখনো মানব-সমাজ তেমন সুখ-শান্তিময় জীবন লাভ করিতে পারে না। পুরাণের বর্ণনা ছাড়িয়া দিলেও, বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ হিন্দু-সভ্যতার পতনের যুগেও, ভারতবাসী হিন্দু-চরিত্রের, তাহাদের দেহের ও গৃহ-সংসারের যে সুখময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কোন সভ্যতারূপ ধর্ম্মসাধনায়, জগতের আর কোনও দেশের মানবকে তেমন মহৎ, তেমন সুখময় করিতে পারিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় না।

গ্রীস পরিব্রাজক ও চীন পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় পাওয়া যায়—এদেশে হিন্দুগণ সকলেই অতি সুশ্রী সবল এবং রোগ ও সর্ব্বপ্রকার হীনতা বর্জ্জিত ছিল। কাহারও কপটতা, প্রবঞ্চনা বা চুরি করিবার প্রয়োজনই ছিল না। কেন না, সকলেই পরের সাহায্যে প্রস্তুত, কিন্তু নিতান্ত অভাব বিনা কেহই গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না। গ্রহণ করিলে যে ঋণী হইতে হইবে? তাহার পরিশোধ বিনে ত, এই দুঃখ ও কর্ম্মময় জীবজন্ম হইতে মুক্তি নাই। তাই নিতান্ত ঠেকিলে কেহ গ্রহণ করিত, অতিথি হইত, পরে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পরিশোধের চেষ্টায় যত্নবান হইত। হিন্দু গৃহস্থ অপর-জন বিনা কেবল নিজের জন্য পাক করাকে কষ্ট মনে করিত; উপাদেয়-দ্রব্য অন্যকে না দিয়া নিজে ভোজনে, বিস্বাদ ভোজনের মত দুঃখ বোধ করিত। অপরাধে রাজাকে বলপূর্ব্বক শাস্তি দিতে হইত না, নিজ-দোষ নিজে বলিয়া, শাস্ত্রের ব্যবস্থা জানিয়া নিজেরাই প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণ করিত। দেশ দেবমন্দিরে পরিশোভিত; দেবমন্দির শত শত জ্ঞানী, ত্যাগী ও প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তে পূরিত, তাঁহাদের ভক্তিমাখা ঈশ্বর-স্তবে মুখরিত। হিন্দুর গৃহ পরস্পরের দৃঢ় ভালবাসার প্রীতির আলাপে, আত্মত্যাগের লীলায় শোভাময়, সমাজ হীনতা ও মালিন্য-হীন। নানা ধর্ম্ম-বিপ্লব ও নব্যশিক্ষায় আজ ভারতের হিন্দুর সেই মহত্ব স্বপ্নের কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখনো প্রাচীন হিন্দুভাব আধুনিক শিক্ষাহীন জন মধ্যে পাওয়া যায়। আধুনিক শিক্ষিত সংসারের বর্ণনা শ্রবণ করুন।

## বর্ত্তমান আদর্শ গৃহস্থ জীবন।

ঈশ্বরসম্বন্ধ আর ভালবাসা হীনে।
শিখে উশৃঙ্খলপথে সুখের সন্ধানে॥
তাই জাতি কুল-ধর্ম্ম সমাজ-বন্ধন।
আত্মসুখে বাধা-হলে ত্যজে সেইক্ষণ॥

গৃহটী হয়েছে এবে নরক আকার।
অপবিত্র হীনতা ও দুঃখের আগার॥
ঈশ্বর সাধনা নাই নাই ত্যাগ দয়া।
নাই প্রীতি প্রফুল্লতা কিবা স্নেহমায়া॥
সর্ব্বত্র বিরোধ সবে আত্ম সুখে খুঁজে॥
অপরের সুখ দুঃখ কেহ নাহি বুঝে॥
গুরুজন প্রিয়জন কাহাকে না মানে।
সদা রূঢ়কথা বলি ব্যথা দেয় প্রাণে॥
কেবল অভাব দুঃখে গর্জ্জন চিৎকার।
সামান্য স্বার্থের তরে মিথ্যা ব্যভিচার॥
যাঁহাদের রক্ত মাংসে এ দেহ গঠন।
যাঁর বক্ষরসে রাখে শৈশবে জীবন॥
সেই মাতাপিতা পানে পুত্র নাহি চায়।
আত্মসুখে বিঘ্ন দেখি ত্যাগ করে যায়॥
কি আশ্চর্য্য পুত্র-স্নেহ নারীহৃদে নাই।
প্রসবের পরে এবে পুত্র-পালে ধাই॥
করে বন্ধ্যা হইবার ঔষধ সেবন।
পালনের কষ্টে করে গর্ভেই নিধন॥
পত্নীর পতিতে প্রেম তাও নাই হায়।
ইচ্ছামাত্র পতিত্যাগে অধিকার চায়॥
স্নেহ ও মমতাহীন স্বইন্দ্রিয় পর।
পশুর অধম আজি হইলেক নর॥
সত্য-মানবত্ব যদি চাহ জাগরণ।
ভালবাসা স্থাপনের করহ সাধন॥

## আধুনিক আদর্শজীবনে মানবত্বের সার্থকতা।

পূর্ব্বে আর্য্যঋষি প্রদর্শিত নারী ও নরের কর্ম্ম-বিভাগিত সংসার-জীবন প্রদর্শন করিয়াছি। এখন বর্ত্তমান জ্ঞান ও সভ্যতা, মানবের জীবন সার্থকতার কেমন সুখ-শান্তিময় মহৎ জীবনাদর্শ আনয়ন করিয়াছে তাহাই শ্রবন করুন এবং তাহা দ্বারা মানবত্বের কতদুর সার্থকতা হয় তাহাও নির্ণয় করুন। **শৈশব-সার্থকতা**—বর্ত্তমান আদর্শে মানব-শিশু অপার্থিব স্নেহ মমতা-মাখা, স্বর্গ-সুখময় মায়ের কোলে উঠিতে পারিবে না, তাহাতে না কি মায়ের ও সন্তানের স্বাস্থ্যহানি হয়। বাৎসল্য-স্নেহে মায়ের সপ্তধাতু মথিত হইয়া স্বয়ং গলিত, অমৃতময় মায়ের দুগ্ধও আর শিশু খাইতে পাইবে না। স্নেহের প্রস্রবণ—স্নেহের উদয় মাত্র মায়ের যে স্তন স্বভাবে ক্ষীর স্রাব করিতে থাকে, যাহার স্পর্শ মাত্র শিশু-জীবেনে জীব সমস্ত দুঃখ জ্বালা বিস্মৃত হইয়া যায়, সেই মাতৃস্তনের পরশও আর মানব-শিশু পাইবে না, দোলাযন্ত্রে শুইয়া, দুগ্ধপান-যন্ত্রে পশু-দুগ্ধ বা ঔষধ পথ্য সেবন করিয়া, মানব তাহার শৈশব সার্থক করিবে। **কৈশোর-সার্থকতা**—মাতা পিতাদি গুরুবর্গের বাৎসল্য-স্নেহ, প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের মমতা-স্নেহ এবং ভ্রাতা ভগ্নি আদির সখ্যমাখা সাহচর্য্যে বঞ্চিত হইয়া, রাজতুল্য ভোগবিলাস, স্বাধীনতাময় মহাসুখের ছাত্রাবাসে, পারিবারিক স্নেহ, সমাজের নীতি শীলতাদি এবং ঈশ্বরে ভয় ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধহীন হইয়া বাস করিবে এবং শাসকহীন উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব বালক ও যুবক সঙ্গে, কেবল পশুস্বভাব দেহেন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয় জল্পনা করিতে করিতে, তাহারি সংগ্রহ করিবার বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করিয়া কিশোরের শিক্ষা-জীবন শেষ করিবে; এইরূপে মানবের কিশোরকাল সার্থক হইবে। **বর্ত্তমানে যৌবনের সার্থকতা**-যৌবনের কর্ম্মজীবনে কেবল আত্মসুখ

উন্মেষিত যুবক ও যুবতী, আসুর-স্বভাব পশু পাখী আদির মতই নিজেরা মিলিত হইবে, মিলাইয়া দিতে অভিভাবকের মধ্যস্থের প্রয়োজন থাকিবে না ; মিলনে কোন ঈশ্বর-সপথ বা শাস্ত্র বিধানেরও প্রয়োজন পরিবে না। তেমন যুবক যুবতী মিলিয়া পশুপাখীর মতই, আত্মীয়-বন্ধন ছাড়িয়া দূরে কোটরে বাসের মত দূরে যাইয়া বাসা করিয়া বাস করিবে, সে বাসায় কি আত্মীয় পর কাহারো প্রবেশ অধিকার থাকিবে না। যুবক যুবতী পাখীর মতই যার যার আহার অর্জ্জন করিয়া খাইবে, উভয়ে মাত্র উভয়ের সুখের সাথী। দুঃখের উদ্ভব হইলেই, এক জনে অন্যজনের দুঃখের অংশ বহিতে হইলেই, একে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া, নূতন সুখের সঙ্গী তালাস করিয়া লইবে। আহার কিনিয়া খাইবে, রোগে সেবাশ্রম বা হস্পিটালে থাকিবে। পশু পাখীর মতই উভয়ে সারাদিবস পৃথকভাবে চড়িয়া খাইয়া, সন্ধ্যায় স্বকোটরে একত্র হইয়া রাত্রি কাটাইবে ; ইহাতেই দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা হইবে। সন্তান বড হইলে, পাখীর মতই চড়িয়া খাইতে বাসা হইতে তাড়াইয়া দিবে, ধনী হইলে ছাত্রবাসে অর্থদানে মানুষ হইতে দিবে। কাহারও সঙ্গে স্নেহের বন্ধন বা আদান প্রদান থাকিবে না, জাতি, সমাজ, দেশ, জগত বা ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কেবল উদ্দাম স্বাধীন-পথে স্বসুখ সন্ধানে যৌবনের সার্থকতা হইবে। পরে মানবের শেষ-জীবন—যেই জীবন ভবিষ্য-জীবনের আশা-আকাঙ্খা গঠন করে, সেই **বার্দ্ধক্যের-সার্থকতার** বিষয় শ্রবন করুন। মানবের সুখ বাসনার তৃপ্তি-সাধ না মিটিতেই, যখন বার্দ্ধকের বলে তাহার দেহেন্দ্রিয় সেই তৃপ্তির উপাদান সংগ্রহে অপারগ হইয়া উঠিবে, চলিতে ফিরিতে আহারে বিহারে, দেহেন্দ্রিয় সর্ব্বদা এক জন সমবেদনা যুক্ত, ভালবাসাময় সাহার্য্য ও পরিচর্য্যা সন্ধান করিতে থাকিবে, মানবের সেই দারুণ দুঃখের কাল বার্দ্ধক্যে, মানব, সাহায্যকারী ও দেহশক্তির অভাবে, অনাথাশ্রমের

কৃপার ক্রোড়ে আশ্রয় লইবে। শক্তিহীনতাজন্য নিতান্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত সেই আশ্রমের নির্দ্দিষ্টকর্ম্ম সম্পাদন করিবে এবং মৃত্যুদেবতাকে শীঘ্র আসিয়া জীবন শেষ করিয়া শান্তি দিতে, আহ্বান করিতে করিতে বার্দ্ধক্য সফল করিবে।

আধুনিক-যুগের জ্ঞান সভ্যতা, মানবজীবনকে এমনই সুখ শান্তিময় জীবনের দিকে টানিয়া লইতেছে। আর আধুনিক শিক্ষিতগণ তাহা বুঝিয়াও, অন্ধেরমত এই জীবনের পথেই, আত্ম সমর্পন করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে লাভালাভ চিন্তা কি প্রয়োজন নহে? তাই প্রাচীন হিন্দুর আদর্শ-জীবন ও বর্ত্তমান আদর্শ-জীবন পাশাপাশি প্রদর্শণ করা হইল, কোন্ আদর্শ মঙ্গলময় ও সুখকর একটু যেন ভাবিবার সুবিধা হয়।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## ধর্ম্ম সভ্যতা বিলোপের কারণ ও তাহাকে রক্ষা করিবার উপায়।

পৃথিবীর কত কত প্রাচীন ধর্ম্ম-সভ্যতা অন্যধর্ম্ম-পন্থীর আক্রমণের প্লাবন রোধ করিতে অক্ষম হইয়া, একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—মিশর, রোম, বাবেলিয়ণ, পারস্যাদির প্রাচীন ধর্ম্মসভ্যতার সন্ধান, প্রাচীন গ্রন্থ ও ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে সামান্য মাত্র সন্ধান পাইয়া, জগত বাসী

আজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত! ভাবিয়া পায় না, এত জ্ঞানময় সভ্যতা কি করিয়া বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সেই সব ধর্ম্মসভ্যতা হইতেও অতি-প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতা আজও ভারতে, প্রায় পূর্ব্বের মতই জ্ঞান, গরিমা, সিদ্ধ-পুরুষ ও সগুণ-দেবতা লইয়া টিকিয়া আছে। তাহার উপর শক, হূণ, জৈন, বৌদ্ধ মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়গণের কত বিরুদ্ধতার প্লাবন গিয়াছে, দারুণ নির্য্যাতনের আঘাত গিয়াছে, কিন্তু এই সভ্যতা শক, হূণ, ও বৌদ্ধ দিগকেই স্বধর্ম্ম সভ্যতার কুক্ষিগত করিয়া, মুসলমানকেও তাহার পোষক, দেব মন্দির নির্ম্মাণ ও দেব সেবায় সম্পত্তি দানে বাধ্য করিয়া লইয়াছে। হিন্দু কি সাধনায় সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে, এবং কি হারাইয়া আজ সেই সর্ব্ববিজয়ী সভ্যতা বিনিষ্ট হইতে বসিয়াছে, গ্রন্থ শেষ করিবার পূর্ব্বে সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

নব্যভাবে শিক্ষিতগণ একটী যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন যে, বর্ত্তমান যুগানুযায়ী ধর্ম্মকে গঠনের প্রয়োজন। বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে মিলাইয়া, কালানুযায়ী করিয়া নব হিন্দু-সভ্যতার শাস্ত্র-গঠন করিয়া না লইলে পৃথিবী হইতে হিন্দুধর্ম্মের নামই মুছিয়া যাইবে। ইতিহাস আলোচনা করিলে কিন্তু দেখা যায়, যাহারাই নূতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া, স্বধর্ম্ম সভ্যতাচারকে রক্ষা করিতে গিয়াছে, তাহারাই স্বধর্ম্ম সভ্যতাকে একেবারে বিলোপ করিয়া বসিয়াছেন; আর যাহারা অন্ধ গোঁড়ামীরমতই প্রাচীন-শাস্ত্র ও আচারকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারাই শাস্ত্র ও সভ্যতাকে লইয়া আজও জগতে টিকিয়া রহিয়াছেন। ইহার সাক্ষী রোমানগণ বর্ব্বরতুল্য গোঁড়া খ্রীষ্টানদের দ্বারা পরাজিত হইয়া অত্যাচারে ও ভয়ে সেইমত গ্রহণ করিল। পরে তাহাদের জ্ঞান ও আচার দ্বারা খ্রীষ্টিয় সভ্যতাকে

যুগধর্ম্ম গঠন

বর্ত্তমান আকারে গঠন করিয়া, নিজের প্রাচীনকে নাম ও শাস্ত্রাচার সহিত বিলোপ করিয়া দিল। পালেষ্টাইন ও পারস্য সভ্যতাও এমনি মোহম্মদীকে মহৎ ও জগতজয়ী করিয়া দিয়া, নিজেদের প্রাচীন-সভ্যতার অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যে ইহুদিগণ দৃঢ়তার সহিত প্রাচীনকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের শাস্ত্র ও আচারই টিকিয়া আছে। এই ভারতের হিন্দুও অত্যাচার নির্য্যাতন সহিয়াও প্রাচীনকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াই, তাহার শাস্ত্র, আচার, সাধনা ও জ্ঞানকে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে।

পৃথিবী-বিজয়ী বৌদ্ধ-সভ্যতার প্লাবনে ভারতের চৌদ্দআনা লোক বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া গিয়াছিল। সে প্লাবনে হিন্দুত্বের উদ্ধার-কর্ত্তা শ্রীকুমারীল, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ আদি ত যুগানুযায়ী, কালের সঙ্গে মিলাইয়া নূতন আচার স্থাপন দ্বারা, হিন্দুত্বকে রক্ষা করেন নাই? তাঁহারা সেই অতি প্রাচীন শাস্ত্রাচারকেই হিন্দুর আচার বলিয়া স্থাপন করেন। মোহম্মদী-শাসনের প্লাবনে, হিন্দু শাস্ত্র, বিগ্রহ, তীর্থ ও আচার্য্যহীন হইয়া, আচার ও জ্ঞান হারাইয়া ডুবিতে বসিয়াছিল। শ্রেষ্ঠবর্ণ মধ্যেও বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণ মুষ্টিমেয় লোক বিনা, সর্ব্বহিন্দুই হিন্দু-দীক্ষা ও দশসংস্কার হীন নামে মাত্র হিন্দু ছিল, একতৃতীয়াংশ হিন্দু মোহম্মদী হইয়া গিয়াছিল, সেই দুর্দ্দিনেও মহাপ্রভু ও ভুইয়া-রাজগণ আবার প্রাচীন-শাস্ত্র ও স্মৃতি-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া, হিন্দুত্বকে রক্ষা করেন; যুগানুযায়ী নবশাস্ত্র ও আচার স্থাপনে হিন্দুত্বকে রক্ষা করেন নাই। তবে হিন্দু-শাস্ত্রে ধর্ম্মাচারের পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে বটে, তাহার নাম আপদ-ধর্ম্ম সাধন, যুগানুযায়ী নববিধি স্থাপন নহে। **নিত্য সত্য কল্যাণের এক পূর্ণ জ্ঞান, যাহাকে পরিবর্ত্তন করিলেই অকল্যাণ আনয়ন করিবে, সেই জ্ঞান ও**

**আচারের নামই ধর্ম্মবিশ্বাস। তাহা যে কি করিয়া পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।**

হিন্দু-শাস্ত্রের আপদ-ধর্ম্ম ব্যবস্থা, সার্ব্বজনিন যুগানুযায়ী ধর্ম্ম-বিধান গঠন নহে। কোনও ব্যক্তি আপদকালে অর্থাৎ শারীরিক অসামর্থ্য, দেশ কালাদির দোষে শাস্ত্র-ব্যবস্থা মতে কার্য্যসম্পাদনে অসমর্থ হইলে, শাস্ত্রব্যবস্থার আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়াও সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করতঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তীতাকে রক্ষা করিবে, কর্ম্মটি পরিত্যাগ করিবে না, তাহাই সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। যেমন—দ্রব্য দান মধ্যে মধু দানের ব্যবস্থা আছে। মধু না মিলিলে মধুর অভাবে গুড় দান করিবে; মধু নাই তাই দিলামই না হইতে পারিবে না, মধু বলিয়া গুড়ই দিবে। একাদশীতে সমস্ত হিন্দুরই উপবাস ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আপদ-গ্রস্তের—পিত্তশূলরোগী, গর্ভিণী, বৃদ্ধ, বালক ও রোগীর জন্য তাই অনুকল্প ব্যবস্থা আছে; তাহারা জল দুগ্ধাদি খাইয়া, মাত্র অন্নত্যাগ করিলেই, তাহাদের একাদশীর উপবাস সিদ্ধ হইবে, বলা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকে সকলেরজন্যই ব্যবস্থা দিয়া, যুগধর্ম্মরূপ নূতন বিধান করিলে, ক্রমে একাদশীর উপবাসই বিলোপ হইবে, বর্ত্তমানে হইয়াছেও তাহাই।

আপদ-ধর্ম্ম কি

আপদ-কাল কাহাকে বলে ও কেমনভাবে হীনাচার দ্বারাও তাহা পালন করিতে হয়, তাহার জীবন্ত-দৃষ্টান্ত, হিন্দুর শাস্ত্রকর্ত্তা মহর্ষিগণই আচরণ করিয়া, শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের আপদ-কাল ও মহর্ষি পরাশরের আপদ-কালের হীনাচারের প্রচার শ্রবণ করুন। তাহাদের কৃত-সংহিতায় তাহা বর্ণিত আছে

আপদ-কাল ও আপদ-ধর্ম্ম

আহার ও পানীয়হীন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বশিষ্ঠ-দেব ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া, এক চণ্ডাল কৃষককে ক্ষেত্রমধ্যে অন্নাহার করিতে দেখিলেন এবং অবস্থা বলিয়া তাহার নিকটই আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন ; চণ্ডাল নিজের উচ্ছিষ্ট অন্নই তাহাকে ভোজন করিতে দান করিল। বশিষ্ঠ অন্ন খাইয়া যখন জল যাচ্ঞা করিলেন, চণ্ডাল বলিল, এখন আর আপনাকে আমি জল দান করিতে পারি না! কেন না, ঐ যে দূরে নদী দেখা যাইতেছে, আপনি অন্ন-ভোজনে সম্প্রতি বল লাভ করিয়াছেন, এখন নদীপর্য্যন্ত যাইতে আপনার আপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তাই এখন আপনার আপদকাল নয়। এখন আপনাকে পানীয় দিলে আমার অপরাধ হইবে আপনারও চণ্ডালের জল আচরণের পাপ হইবে ; বশিষ্ঠ নদীতে যাইয়া জল গ্রহণ করিলেন। যোগৈশ্বর্য্য ও দৈব-শক্তিধর বশিষ্ঠের ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হওয়া অসম্ভব, তাতে তিনি ইচ্ছামাত্র যথা ইচ্ছা যাইতে, ফল পানীয়াদি আনিতেও শক্তি ধরেন, কেবল মানবকে আপদ-কালের সংবাদ দিতেই জীবন-রক্ষা জন্য চণ্ডাল-উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি পরাশর, তাঁহার পিতার তিথিশ্রাদ্ধ দিনে এমন স্থানে উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে তর্পণের জল ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ব্রাহ্মণের অভাব। ঋষি খুঁজিতে খুঁজিতে চর্ম্ম-কারের রৌদ্রে দেওয়া চর্ম্মমধ্যে শিশিরের সঞ্চিত জল পাইয়া, তাহাকেই তর্পণের জল করিলেন ও ব্রাহ্মণ-ঔরসে চণ্ডালিনী-গর্ভে এক বালকের জন্ম হইয়াছে জানিয়া, তাহাকেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্রাহ্মণ করিলেন ; এইরূপ হীনাচার দ্বারাও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট তিথিশ্রাদ্ধ বিধানকে তিনি রক্ষা করিলেন, বিলোপ হইতে দিলেন না। পরাশরও দৈবশক্তিধর ছিলেন, ইচ্ছা করিলেই তীর্থ ত দূরের কথা স্বর্গে যাইতেও সক্ষম

ছিলেন, কেবল আপদ-কালের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ জন্যই এই হীনাচার প্রদর্শন করিয়া, শাস্ত্রে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

আপদ-কালে হীনচার করিবে ও পরে সেই হীনাচারকে প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা বিনাশ করিতে হইবে, তাহাই হিন্দু-শাস্ত্রের ধর্ম্ম-বিধান। ভাগবতে অজামিল উপখ্যানে বিষ্ণুদূত "ধর্ম্ম কি?" জিজ্ঞাসা করিলে, যমদূত বলিয়াছিল, আপদ কাল বিনা শাস্ত্রবিধানকে কখনও লঙ্ঘন করিবে না; আর শাস্ত্র-বিধান লঙ্ঘন করিলে, জীবনান্তের পূর্ব্বেই, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট তাহার প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে, ইহাই ধর্ম্ম; তবেই জীবের শাস্তিরূপ যম-যাতনা পাইতে হয় না। এইজন্যই বিষ্ণু-অবতার পরশুরাম, পিতার অভিশাপ ভয়ে নিজের জীবন, ভ্রাতা ও মাতার জীবন রক্ষা করিতে, দারুণ আপদে ঠেকিয়াই পিতৃ আদেশে মাতার শিরচ্ছেদ করিতে বাধ্য হন। তিনি মাতা ও ভ্রাতার জীবন-দান বর গ্রহণ করিয়াও, আবার পুত্র হইয়া মাতাকে অস্ত্রাঘাতের পাপজন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পাণ্ডব আপদ-ধর্ম্ম মাতৃবাক্য লঙ্ঘন পাপ হইতে ত্রাণ পাইতে, পঞ্চভ্রাতায় এক দ্রৌপদী দেবীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু মাত্র এক বৎসর করিয়া তাহার সঙ্গে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ রাখিয়া, পরে দেবীরমত তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়া প্রত্যেকে পূজা করিয়া, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। দ্রৌপদীদেবী পঞ্চপুরুষ ভোগের অবৈধতা নাশের জন্য, পঞ্চ সন্তান প্রসবের পরে চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য লইয়া, পঞ্চবেলা সেই পঞ্চস্বামিকে কাম-সম্বন্ধহীন ভালবাসা দিয়া, দাসীর অধিক সেবা পূজা করতঃ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ-রক্ষণ কর্ত্তব্যে ঠেকিয়া, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও, অস্ত্রাগারে নির্জ্জনে উপবিষ্ট ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র গ্রহণ

আপদের হীনাচারেও প্রায়শ্চিত্ত আছে।

করিলেন। কিন্তু পরে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও তীর্থ পর্য্যটন করিলেন। এইরূপ আপদে ঠেকিয়াই স্ত্রীহরণকারী, জগতে উৎপাতকারী ব্রাহ্মণপুত্র রাবণকে, বিষ্ণু অবতার আদর্শ মানবরূপী শ্রীরামচন্দ্র বধ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তিনিও পরে ব্রাহ্মণ বধের জন্য রামেশ্বর-শিব স্থাপন ও অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণ বধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যহারী অধর্ম্মাচারী বলিয়া, জ্ঞাতি ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে, তাহার সাহায্যকারী গুরুবর্গের সহিত বধ করেন। তিনিও পরে জ্ঞাতি ও গুরুবধপাপজন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাই বলিলাম, হিন্দুর আপদ-ধর্ম্মের হীনাচার যুগানুযায়ী ধর্ম্ম-সংস্কাররূপ, নূতন আচার স্থাপন নহে, কর্ম্ম-সঙ্কটে ক্ষণিক কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।

হিন্দুর আপদধর্ম্ম হীনভাবে আচরণ করিয়াও বেদাচার শাস্ত্রবিধান রক্ষার চেষ্টা; আর নব্যের যুগসংস্কার ইচ্ছা হীনাচারকেও শাস্ত্রমতে বৈধাচার করিয়া লইবার চেষ্টা। হিন্দুর আপদ-ধর্ম্ম—বিধর্ম্মী গড়া সূতায়ও হিন্দুর যজ্ঞসূত্র গড়িয়া তাহাদের গড়া বস্ত্রে ও নামাবলী গড়িয়া, তাহাদের কাটা চামচ ভাঙ্গিয়াই কোশা কোশী পূজার পাত্র গড়িয়া হিন্দু-আচার রক্ষা করা, আর নব্য চাহেন, হিন্দুর গড়া সূতায়, বস্ত্রে বিদেশীর সাজ কোট পেণ্টুলন গড়িয়া, পূজার ছিব-কোশের ধাতুতে কাটা চামচ গড়িয়া হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে। ইহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিধর্ম্মাচার বলিয়া, তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের অনিষ্টকর পাপাচার। এখন কি করিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম এত অত্যাচার রোধ করিয়াও আজ পর্য্যন্ত টিকিয়াছিল, আর কি হারাইয়া আজ সব হারাইতে বসিয়াছে তাহার আলোচনায় ব্রতী হই।

মহাত্মা গান্ধিজি যেই অসহযোগ গ্রহণ দ্বারা ভারত-বাসীকে স্বরাজ লাভ করিতে আহ্বান করিয়াছেন, সত্যই অন্যধর্ম্মী শাসক

গণের সঙ্গে এই অসহযোগ রক্ষা করিয়াই, হিন্দু এতদিন তাহার আচার ও সভ্যতাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যেই কেন দেশপতি না হউক, হিন্দু সন্তানের শিক্ষা-অধ্যায় ও তাহাদের শাসন-শৃঙ্খলা-অধ্যায় কখনও হিন্দু তাহাদের হাতে তুলিয়া দেয় নাই। হিন্দু-বালক শিক্ষার বয়সে, স্বধর্ম্ম সভ্যতার সংবাদ বিনা অন্য ধর্ম্মের মতবাদ শ্রবণ করিতে পায় নাই, আর হিন্দু-শাস্ত্র বিধানমতে কুলপতি সমাজ-পতি ও পণ্ডিতগণের সহায়তায় হিন্দুগণ শাসিত হইত, রাজশক্তির সঙ্গে করদান বিনা সম্বন্ধ থাকিত না। এই অসহযোগ সাধনজন্যই অন্যধর্ম্মীর শাসন অত্যাচারাদি হিন্দু সভ্যতার আচার ও জ্ঞানকে আঘাত করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রাচীন কালে সকল ধর্ম্ম-পন্থীই অন্যধর্ম্মী সঙ্গে এই অসহযোগ যত্নে রক্ষা করিত। তাই প্রত্যেক ধর্ম্মপন্থীর শাস্ত্রেই, অন্য-ধর্ম্মীর শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ, অন্যধর্ম্মীর সঙ্গ, জল ও অন্নাদি গ্রহণ বিশেষ ভাবে বর্জ্জণীয় বলিয়া বর্ণিত আছে। তাহাতে মহাপাপ হয়, সেজন্য প্রায়শ্চত্ত করিতে হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে এই ব্যবস্থাই প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্য-পন্থীর সঙ্গে অসহযোগ সাধনা। আধুনিকভাবে শিক্ষা-জনিত নব্যভাব মানব-সমাজে প্রবেশ করিয়া, আজ সকল ধর্ম্ম-পন্থীরই, সেই অসহযোগ সাধনা বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। তাই আজ কোনও ধর্ম্ম-পন্থী মধ্যেই, সর্ব্ব সাধারণের স্বধর্ম্ম-আচার ও শাস্ত্রের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠা ও তৎপরায়ণতার চেষ্টা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতেও এই নব-শিক্ষা-প্রণালীর প্রচার হইতে, হিন্দুর প্রাচীন শিক্ষা ও শাসন-প্রণালীর অসহযোগ ক্রমে বিলোপ হইয়া, তাহা পতনের পথে পতিত হইতেছে। মহাত্মাজি সেই প্রাচীন অসহযোগ-সাধনা গ্রহণ করিতেই ভারতের হিন্দু মুসলমানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাই তিনি বর্ত্তমান শিক্ষালয় ও বিচারালয় পরিত্যাগ

হিন্দুর-সহযোগ সাধনা

করিতে সকলকে বলিয়াছিলেন। তাই প্রাচীনকালের শিক্ষায়-অসহযোগ ও শাসনে-অসহযোগ গ্রহণ করিতে পারিলে, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয় শাসনে বাস করিয়াও, যার যার স্বধর্ম্মের স্বরাজেই বাস করিতে পারিত।

বৃটিশ কোম্পানি-রাজত্বের শেষ কালে, বর্ত্তমান হইতে মাত্র পঞ্চাশত বর্ষ ধরিয়া নবশিক্ষার প্রচারে, ভারতের হিন্দুগণমধ্যে যেই নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত করিয়াছে, এবং যেরূপভাবে প্রাচীনের শিক্ষা ও তাহাদের শাস্ত্রপড়া সামাজিক-শাসন, সংসার-স্নেহ ও ঈশ্বর-যুক্ততাকে বিলোপ করিতেছে, পঞ্চশত বর্ষ মোহম্মদী শাসন ও অত্যাচারেও তাহা সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় নাই। এই নব্য-শিক্ষিতগণের জন-মতের সহায়তায়, রাজশক্তি শিক্ষা ও শাসন পদ্ধতির অসহযোগকে রাজবলে ভগ্ন করায়, আজ হিন্দুসভ্যতা এই হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে। তাই বলিলাম, হিন্দুর অসহযোগ-সাধনার বিলোপই হিন্দু সভ্যতার সর্ব্বনাশের কারণ। এই বিষয় পরে বিশেষরূপে আলোচনা হইবে, বর্ত্তমানে হিন্দু-শিক্ষা ও শাসন-শৃঙ্খলার বিষয় আলোচিত হউক।

শিক্ষায় অসহযোগ

পূর্ব্বকালে প্রত্যেক হিন্দু পিতা মাতা তাহাদের ধর্ম্ম-সভ্যতার ভবিষ্যৎ ভরসা, নিজেদেরও ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি সেবার আশ্রয় পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার, স্বধর্ম্মাচারী ঈশ্বরভক্ত স্বধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞানী বিনা, কখনও অন্যের হস্তে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শিশুবৃক্ষকে বেড়া দিয়া পশু হইতে রক্ষা করার মত, বালক বালিকাগণকে তাহারা সর্ব্বদা অন্যধর্ম্মের সংবাদ ও অন্য আচারীর সঙ্গ হইতে, যত্ন ও সাবধানতার সহিত রক্ষা করিত। অন্যধর্ম্ম হইতে তাহাদের ধর্ম্মের আচারের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞান দান করিয়া, স্বধর্ম্মে ও আচারে শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠতা আনয়ন করিতে চেষ্টা করিত। পিতা মাতা সংসার-নীতি স্বাস্থ্যরক্ষা, স্নেহ-মমতা ও কুলাচারে অভ্যস্ত করিতেন,

আর শাস্ত্রজ্ঞ গুরু পুরোহিত শিশুগণকে সমাজ-নীতি, শীলতা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি মানবের জ্ঞাতব্য সর্ব্ববিষয় জানাইয়া দিতেন। দেহে সত্বগুণ বর্দ্ধক আহার বিহার, মনে দেবত্বের ত্যাগ মহত্ব লালসা, আত্মায় ঈশ্বরসত্বায় যুক্ততা অভ্যাস করিয়া, প্রাচীন হিন্দুসন্তান, জীবের সাধারণ-ধর্ম্ম দেহেন্দ্রিয় তোষণ লালসারূপ জীব-স্বভাবকে বিনাশ করিয়া, ত্যাগ দয়া মহত্বময় দেব স্বভাব লাভ করিত। তাই পরে অন্যধর্ম্মী-সঙ্গ বা তাহাদের শাস্ত্র পাঠে আর হিন্দু সন্তানের পতনের আশঙ্কা থাকিত না। এই শিক্ষার অসহযোগীতাই প্রত্যেক ধর্ম্মসভ্যতার মেরুদণ্ড। ইহার বিলোপ সাধন করিতে পারিলেই, সেই জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সাধনার বিলোপ হইয়া, তাহাদের ভাষা, সাহিত্য, আকৃতি প্রকৃতির পর্য্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটিয়া যাইবে। এই শিক্ষার-অসহযোগ রক্ষা করিতে না পারিয়াই প্রাচীন সমস্ত সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের কোল, ভীল, আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি অতিপ্রাচীন জাতিসমূহ, এই অসহযোগ-সাধনা রক্ষা করিয়াই, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের ভাষা, আচার ও সাধনাকে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের সন্তান নব্য-শিক্ষা লাভ করিলেই, তাহাদের প্রাচীনকে বিসর্জ্জন করিয়া, নব্যদলে মিশিয়া পড়িতেছে। এই নব্য-শিক্ষিত হিন্দু-সন্তান হইতেও তেমনি হিন্দু-সভ্যতার বিলোপের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় চিন্তা করিলে, মহাভারতে উক্ত অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্বসন্তান শিক্ষার ব্যবস্থা ও পাণ্ডব-বধের জন্য জতুগৃহ-দাহ কৌশলের কথাই মনে পড়ে। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী ঠিক যেন দুর্য্যোধনাদির শিক্ষার ব্যবস্থা, আর বর্ত্তমান ছাত্রাবাসরূপ বোর্ডিং ব্যবস্থা যেন পাণ্ডব-বিনাশের জতুগৃহ চেষ্টা।

বর্ত্তমান শিক্ষা
মানবত্বের জতুগৃহ দাহ

কুরুবংশীয় মহাযশা সম্রাট পাণ্ডুর অকালে দেহত্যাগ ঘটিলে, শিশু পাণ্ডু-পুত্রগণের অভিভাবক হইয়া অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র দেশের রাজা হইয়া বসিলেন। তিনি পরে পুত্রস্নেহে অভিভূত হইয়া, পাণ্ডু-পুত্রগণকে বঞ্চিত করতঃ স্বপুত্রগণকে রাজ্য দিতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিলেন। সেই জন্য তিনি প্রথমে শিক্ষাদ্বারা স্বপুত্রগণকে পাণ্ডুপুত্র হইতে শ্রেষ্ঠজ্ঞানী ও গুণবান করিয়া, প্রজাগণের প্রিয়পাত্র করতঃ, গুণের প্রাধান্যে স্বপুত্রকে রাজা করিতে চেষ্টিত হন। সেই চেষ্টায় তিনি প্রাচীন-ত্যাগপথী ভীষ্ম বিদুর, কৃপাদির শিক্ষায়ই মাত্র নির্ভর না করিয়া, অর্থদ্বারা সন্তানদের যত্ন ও শিক্ষা দিতে পৃথক লোকও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অন্ধত্ব-প্রযুক্ত নিজে নীতিআদি উপদেশদান ও শাসনাদি ত্যাগ করতঃ, কেবল আদর ও ভোগ বিলাস-দান, আবদার-সহনই মাত্র নিজের হস্তে রাখিয়া ছিলেন। প্রাচীন-শিক্ষাপদ্ধতির ত্যাগ, দীনতা, ভোগ-হীনতা, দারিদ্রভোগ ও অধীনতাসহন সহিত ঈশ্বর-সাধনা ও ব্রহ্মচর্য্য-পালনে শিক্ষার স্থানে, অন্ধরাজ পুত্র-স্নেহে ভোগ, প্রভুত্ব, ধন ও বিলাসদানে, অর্থের দাসের হাতে পুত্রের শিক্ষাভার তুলিয়া দেন। পাণ্ডবগণ সম্রাট পুত্র হইয়াও প্রাচীন-ত্যাগ-পথী মাতা ও ভীষ্মাদির রক্ষণাবেক্ষণে, ভোগ স্বাধী-নতাহীন ধনহীন দীনের মত, ধর্ম্ম-সাধনা-গ্রহণে, কেবল কৃপ ও দ্রোণের নিকটেই শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। শৈশবে শিক্ষার কালে সুখ, স্বাধীনতাদি পাইয়া, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ আত্মভোগ-পরায়ণ, স্বার্থপর, অবিনয়ী, দাম্ভিক, গুরুবর্গ-অনমনীয়, কষ্টসহন-অপটু, লোভী, ক্রোধী আদি হইয়া প্রজাগণের অপ্রিয় পাত্রই হইয়া উঠিল। আর প্রাচীন শিক্ষার গুণে, ভীষ্ম বিদুরাদির শাসনে পাণ্ডবগণ অভিমানহীন, বিনয়ী, দয়ালু, নীতিপরায়ণ, ত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু, গুরুবর্গ-সেবক, ধার্ম্মিকাদি হইয়া প্রজাগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের

নূতন শিক্ষার ব্যবস্থায় তাঁহার আশা পূরণ না করিয়া, তাঁহার সর্ব্বদিকের কুশলকেই ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। এই অবিনয়ী, অসুর-প্রকৃতি, লোভী সন্তানগণের দ্বারা তিনি সারাজীবন বহু দুঃখ, অশান্তি ভোগ করিয়া, অধর্ম্ম-পথে পর্য্যন্ত পতিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ শিক্ষায়, তাঁহার সন্তান পরম ধার্ম্মিক রাজর্ষিবংশের সন্তান হইয়াও গৃহের সুখ শান্তি, কুলের সুখশান্তি, জাতির, দেশের সুখ শান্তি পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া দিয়াছিল। পরে অভাবনীয় অধর্ম্ম করিয়া সেই পুত্রগণ নিজেরাও অকালে মরিল, স্ববংশ সহিত ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুলকেই বিনাশ করিয়া দিল।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিষয় চিন্তা করিলেও দেখা যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে সেই ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান-শিক্ষার অনুরূপ চেষ্টা। এখন সমস্ত মাতা-পিতাই নিজেরা অন্ধ হইয়া, আদর, ধন, ভোগ বিলাস, প্রভুত্ব দানই মাত্র নিজেরা করিতেছেন, আর নীতিশীলতার সাধনা, স্নেহ মমতার বন্ধন, ঈশ্বর-যুক্ততাহীন কেবল অর্থকরী-বিদ্যা শিক্ষাজন্য, ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার-হীন, অর্থেরদাস-শিক্ষকের হস্তে, সন্তানের শিক্ষার ভার সঁপিয়া দিতেছেন। তাই ইহাতে সংসার-ভালবাসাহীন, পিতৃদ্রোহী কুলদ্রোহী, সমাজ স্বধর্ম্ম ও ঈশ্বরদ্রোহী, কেবল অভিমানী, লোভী ক্রোধী, আত্মসুখী দুর্য্যোধনের মতই সন্তানই গঠিত হইতেছে। যুদ্ধার্থী সৈনিকের প্রথম জিবনের, ড্রীল, শ্রম-শীলতা, লক্ষ্যভেদ, আদেশপালনের সত্বরতা, অধিনায়কের নমনীয়তা ইত্যাদি শিক্ষার দারুণ কষ্টময়-জীবনের মতই, মানবের শিক্ষাকাল কেবল কষ্ট নির্য্যাতন ও সংযমভরা হওয়া চাই। তবেই সংসার-যুদ্ধের শত শত বিপদ ও দুঃখের আক্রমণেও, নর ভীত বা যুদ্ধ-বিমুখ না হইয়া, বিজয়লাভ করিতে সক্ষম হয়। আর বর্ত্তমান ছাত্র-জীবনের মত এমন সুখ ও আরামের জীবন, এমন দায়িত্বহীন,

ভালবাসা, নীতি শীলতাহীন, ত্যাগ ও ঈশ্বর ভয়হীন, কেবল প্রভুত্ব ও ভোগময়, পশুতুল্য উশৃঙ্খল-জীবন, সমস্ত জীবন-মধ্যে মানব আর কখনও প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ শিক্ষা ও ছাত্রজীবনদ্বারা, দেব-প্রকৃতিবান মানব-গঠন কিছুতেই হইতে পারে না। তাই বুঝি মহাত্মা গান্ধিজী, স্বরাজ-আন্দোলনের প্রথমেই, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিকে বয়কট করিয়া পরিত্যাগ করিতে বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "বালকগণ শিক্ষাহীন বসিয়া থাকিলেও তত তাহাদের অনিষ্ট হইবে না, বর্ত্তমান শিক্ষায় তাহাদের যত অনিষ্ট করিবে।"

ধৃতরাষ্ট্র প্রথম চেষ্টায় পুত্রগণকে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাজ্য দিতে অক্ষম হইয়া, পরে পাণ্ডবগণকে গোপন-কৌশলে বধ করতঃ পুত্রকে রাজ্য দিতে চেষ্টা করেন। সেইজন্য কূটশাস্ত্রোক্ত "জতুগৃহ" কৌশল অবলম্বন করিলেন। কোনও প্রসিদ্ধ-স্থানে, জতু অর্থাৎ সহজ-দাহ্য-পদার্থ লাক্ষা, ধুনা, বারুদাদি ভিতরে রাখিয়া, বাহিরে অতি সুদৃশ্য-পুরী নির্ম্মাণ করিবে; তাহাকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিভোগদ রাজ-সম্ভার দ্বারা সজ্জিত করিবে; সেবা-নিপুণ চতুর দাসদাসী সেবকবৃন্দ তাহাতে নিযুক্ত করিয়া দিবে; পরে শত্রুকে অতি মিত্র-ব্যবহারে অনুরক্ত করিয়া, সেই পুরীর গুণগানে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাতে লইয়া যাইবে। কতদিন রাজ-সেবাদ্বারা নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত করিয়া, একদিন নিদ্রিত দেখিয়া, হঠাৎ দাহ্যপদার্থে অগ্নি সংযোগে পুরী-সহিত শত্রুকে মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। দাহের পরেও খুব কাতরতা দেখাইয়া শোক করিবে, অগ্নি জ্বলিবার কারণ সন্ধান করিবে ঘটা করিয়া অন্ত্যেষ্টি ও শোক প্রকাশ করিবে, শ্রাদ্ধ করিবে; ইহার নাম জতু-গৃহ-দাহ কৌশল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব-বিনাশের জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়া ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের নিকট, সুদৃশ্য

রাজপ্রাসাদ বলিয়া এই জতু-গৃহ রচনা করিয়া, তীর্থ করিতে বহু যত্ন ও আদর দেখাইয়া, পাণ্ডবগণকে মায়ের সহিত তথায় প্রেরণ করেন ; মহা জ্ঞানবান বিদুর ভীষ্মাদিও রাজার এই দারুণ উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম হন নাই। জ্ঞানবান পাণ্ডবগণ অল্পদিন মধ্যেই তাহাকে জতুগৃহ বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হইয়া, গৃহের ভোগদ্রব্য ও ভৃত্যদের দত্ত ভোগাদি গ্রহণে সাবধান হইলেন। পরে ভৃত্যগণের অগ্নিদানের সময় জানিয়া, পূর্ব্বেই নিজেরা ভৃত্য-গৃহে অগ্নিসংযোগ করতঃ মাকে লইয়া পলাইয়া জীবন রক্ষা করিলেন।

বর্ত্তমান ছাত্রাবাসরূপ বোর্ডিংহাউস্ ঠিক এই জতুগৃহের মত ; দেব স্বভাবরূপ পাণ্ডব-ভাব এবং তাহাদের মাতারূপ নিবৃত্তি-প্রকৃতিকে ধ্বংস করিয়া, অসুর-স্বভাবরূপ দুর্য্যোধনের দলের ভাব ও তাহাদের পিতা-মাতারূপী প্রবৃত্তি-প্রকৃতিকে জগতে রাজ্যাধিকার দানের দারুণ কৌশল। তাই অসুরত্বের অজ্ঞানরূপ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবার বারুদতুল্য যত দাহ্য-পদার্থদ্বারা তাহা নির্ম্মিত। অথচ বাহিরে অতি সুদৃশ্য নানা সুখের রাজপ্রাসাদ ; জীবের অতি প্রয়োজনীয় তীর্থস্বরূপ বিদ্যা-ভবন। কিন্তু এই ছাত্রাবাসে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভোগ-সাধন, রাজতুল্য ভোগবিলাস, সম্মান, প্রভুত্ব, স্বাধীনতা, শাসনহীনতা, সৎসঙ্গের হীনতা, স্নেহের বাধন, নীতিশীলতার উপদেশ-হীনতা, ঈশ্বর-সম্বন্ধ, ধর্ম্মজ্ঞান হীনতার সঙ্গে হীন-চারী হীনবর্ণ-সঙ্গতা, অন্যধর্ম্মী ভিন্নপন্থীর সঙ্গ , পশুরমত স্বেচ্ছাচার-পথে খেলা ধূলা, অশীলতা, এবং কেবল দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জল্পনা ও তাতে কুভৃত্যের আনুকূল্য ভরিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটিই মানবের দেব-স্বভাব—সংযম ও আত্মত্যাগ-ভরা মহত্ব-জ্ঞান দগ্ধকারী অগ্নিতুল্য। এই দারুণ ভোগগৃহে, চঞ্চল-মতি কিশোর বা উদ্দাম-মতি যুবক, যে ই স্বাধীনতা লইয়া বাস করিতে যাইবে এবং ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি দ্বারা

সেই সব ভোগ, কুসঙ্গ, উচ্ছৃঙ্খলতাকে ভোগ করিবে, নিশ্চয় একদিন তাহার দেহেন্দ্রিয়-তৃপ্তেচ্ছাময় পশু-স্বভাবের অহঙ্কাররূপ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে ও তাহাতে তাহার সমস্ত দেব-স্বভাব দেব-জ্ঞানকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। সত্যই তাহাদের হৃদয়-রাজ্যে দেব-স্বভাব, ঈশ্বর-ভক্ত, জগত-সেবক মহা-ত্যাগী পাণ্ডব-ভাব রাজা না হইয়া, ঈশ্বর-দ্রোহী পিতৃদ্রোহী, কুলদ্রোহী, সমাজ-দ্রোহী, কেবল স্বদেহেন্দ্রিয়-পরায়ণ দুর্য্যোধনের দলই রাজা হইয়া বসিবে।

যাহারা পাণ্ডবের মাতাকে সঙ্গে লইবার মত, সংসার-স্নেহ-বন্ধন রক্ষা করিবে, বিদুরের উপদেশ মনে রাখার মত, স্বধর্ম্ম নীতিশীলতা মনে রাখিয়া চলিবে, বিদুরের অনুচরের সন্ধানের মত, সর্ব্বদা স্বধর্ম্মী সাধক গণের সন্ধান করিয়া সঙ্গ করিবে, উপদেশমত চলিবে, তাহারাই মাত্র পাণ্ডবের অগ্নি দানের মত, জ্ঞান-দ্বারা সেই ভোগ-গৃহের সমস্ত ভোগমায়া দগ্ধ করতঃ, দেব-স্বভাব হইয়া বাহির হইতে সক্ষম হইবে। এই জন্যই আজকালও কদাচিৎ দুই চারিটী ছাত্র, এই ছাত্রাবাসে বাস করিয়াও স্বধর্ম্মবিশ্বাসী ও আচারবান হইয়া, পূর্ণ নিবৃত্তিপথী সন্ন্যাসী-পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ নব্যশিক্ষিতই দুর্য্যোধনত্ব লাভ করিয়া, স্বধর্ম্ম, কুল, মানব-সমাজের অকল্যাণ স্বরূপ হইয়া বিচরণ করে। প্রাচীন কালের ত্যাগ, সংযম, স্নেহ ও ঈশ্বর-যুক্ত, মহত্ত্ব-ভরা মানব-জীবন গঠন করিতে ইচ্ছা থাকিলে, বর্ত্তমান শিক্ষা ও ছাত্রাবাস-ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রাচীনের ত্যাগ-পরা, সংযম ও ধর্ম্মনীতি-ময় শিক্ষা-দান প্রবর্ত্তিত করিতেই হইবে।

মানবগণ যাহাতে অভাব, হীনতা ও দুঃখের কারণ, অজ্ঞানময় জীবস্বভাবের আক্রমণকে সহজে, সুখে পরাজয় করিয়া, পবিত্র, মহত্ত্ব, কল্যাণ ও আনন্দময় দেব-স্বভাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে,

সেইজন্য ঋষিগণ হিন্দুকে হিন্দু-শাসন-শৃঙ্খলা নামে একটী অতি সুদৃঢ় দুর্জ্জয়-দুর্গ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। যতদিন হিন্দুগণ এই শাসন-দুর্গকে তেমনি ভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, ততদিন অধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের বিজয়ের দারুণ প্লাবন বা অত্যাচারের আঘাতেও হিন্দু-সভ্যতাকে একটুকু কম্পিত করিতে সক্ষম হয় নাই। নব্যশিক্ষা-জনিত সভ্যতা সেই শাসন-দুর্গের দেয়ালে সংস্কার-ছলে ক্রমে ছিদ্র করিয়া দেওয়ায়ই, আজ হিন্দুর প্রাচীন-সভ্যতার ভিত্তিকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

হিন্দুর প্রাচীন শাসন শৃঙ্খলা।

সেই মানবত্ব-রক্ষার দুর্জ্জয়-দুর্গের কেন্দ্রদুর্গ, **গৃহ-শাসন**। দ্বিতীয় বেষ্টন **কুল-শাসন**। তৃতীয় বেষ্টন গ্রামের সর্ব্ববর্ণের **সমাজ-শাসন**; চতুর্থ বেষ্টন বহু-গ্রাম-সমষ্টি দেশপতি **ভূস্বামী-শাসন**। শাসনের লক্ষ্য ঋষি-প্রকাশিত শাস্ত্রবর্ণিত, পূর্ণজ্ঞানী, দেব-প্রকৃতি-মানবের আচারের অনুবর্ত্তনকে মানব-সমাজে সংস্থাপন, ইহারি নাম **শাস্ত্রানু-শাসন**। সেই শাস্ত্রানুশাসন যথার্থরূপে নির্দ্দেশ-জন্য তেমন আচারী, শাস্ত্রজ্ঞানী, বিষয়-স্বার্থহীন, কেবল ঈশ্বর-যুক্ত-তাপস, ঋষি-বংশীয় ব্রাহ্মণগণের হস্তেই মাত্র অধিকার দান ও তাঁহাদের উপদেশ, সাহচর্য্য ও শাসন স্বীকার, তাহাই হিন্দুর **ব্রাহ্মণানু-শাসন** বা ব্রহ্মণ্যতা; এই ছয় তত্ত্বই হিন্দু-সভ্যতার প্রাণ।

প্রত্যেক বাটীতে একজন জ্ঞানবান শাস্ত্রাচারীকে গৃহপতি করিয়া, তাহার আদেশ, পরামর্শ ও অনুশাসন কে মানিয়া চলাই গৃহ-শাসন। এই গৃহ-পতি গৃহের সকলের কর্ম্মসম্পাদনের কর্ত্তা হইতেন। এই গৃহ-পতি গৃহের সকলের কর্ম্মাদিতে নিয়োগের ও বিবাদাদির বিচারের, অভাব অভিযোগাদির সমাধানের, শিক্ষা, বিবাহাদি-কর্ম্ম সম্পাদনের কর্ত্তা হইতেন। এই

গৃহ-শাসন

গৃহ কোথায় স্ত্রী পুত্র মাত্র লইয়া, কোথায় বা ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনা, পৌত্রাদি-সমন্বিত বহুজন-সমষ্টিতে গঠিত হইত। গৃহপতি সেই ক্ষুদ্র গৃহরাজ্যের রাজতুল্য শাসক, পালক ও সংরক্ষক হইতেন। পরিবারের কেহ প্রতিবেশীর প্রতি অত্যাচারাদি করিলেও, গৃহপতি বিনা কুল, সমাজ বা ভূস্বামী পর্য্যন্ত তাহাকে শাসন করিতে পারিতেন না। গৃহপতি শাসনে অক্ষম হইলে, তিনি কুলপতিকে জ্ঞাপন করিতেন, তখন তাঁহারা শাসনাদি করিতেন।

প্রতি গ্রামের স্বর্ণ-গৃহপতিগণ মিলিয়া কুল গঠিত হইত, এবং তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনকে কুলপতি নির্ব্বাচনে, সকলে তাহার অনুশাসন মানিয়া চলিত; ইহারি নাম কুল-শাসন। কুলচার লঙ্ঘন, স্বর্ণের গৃহপতিগণের পরস্পরের বিবাদ-ভঞ্জন, কোন গৃহ-পতি গৃহের লোকের উপর অন্যায় করিলে, সন্তানের শিক্ষা, ধর্ম্মসংস্কার বিবাহাদি দানে অমনোযোগী হইলে, কুলপতিই সাবধান করিয়া, কুলশাসন দণ্ডাদিদানে সৎপথেনিতে চেষ্টা করিতেন।

কুল-শাসন

গ্রামের সর্ব্ববর্ণের কুলপতিগণের মিলনে সমাজ গঠিত হইত। কুলের শাসন কেহ না মানিলে বা কুলপতি অন্যায় বিচার করিলে, এই সমাজ তাহার সমাধান করিতেন, তাহাই **সমাজ-শাসন**। **ভুস্বামি শাসন**—কতগুলি গ্রাম মিলিয়া একটী প্রদেশ গঠিত ছিল, হিন্দুপুরাণে তাহাকে চক্র বলা হইয়াছে; মুসলমান-রাজত্বে তাহার নাম ছিল পরগণা। এই পরগণা বা চক্রপতি একজন ভূস্বামী থাকিতেন, তিনিই সেই দেশের বর্ত্তমান শাসক মাজিষ্ট্রেট ও কর-সংগ্রাহক কালেক্টার এবং বিচারক জজ-স্বরূপ ছিলেন। নানা দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ও তাপস-ব্রাহ্মণগণ সংগ্রহ করিয়া, ভূস্বামী সকলকে প্রতিপালন করতঃ নিশ্চিন্তে জ্ঞানলাভ ও তাপস্যার সাহায্য করিতেন, এবং তাঁহাদের সহায়তায় তিনি

অধীনস্থ গ্রাম্য-সমাজের বিচারাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ; গৃহ, কুল, সমাজ দ্রোহীকে রাজবলে নমিত করিতেন ; এই শাসনই ভূস্বামী-শাসন। বহু প্রদেশে মিলিয়া একটি দেশ বা রাজ্য গঠিত হইত। সেই রাজ্যপতিই **মহারাজা**। তিনি ভূস্বামীগণ হইতে কর মাত্র গ্রহণ করিতেন এবং ভূস্বামীগণের পরস্পরের বিবাদ ও তাহাদের অন্যায় আচরণ, অত্যাচারাদিতে শাসন করিতেন। বহু মহারাজ বিজয়ী-**সম্রাট** হইয়া মাত্র মহারাজগণ হইতে কর লইতেন। তাই কি মুসলমান, কি শক, হুন, বৌদ্ধ যে কেন ভারতের সম্রাট না হউক, প্রজার সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ থাকিত না। তাই সেইকালে শিক্ষা-অধ্যায় ও শাসন-ব্যাপার লইয়া হিন্দু তাহার সভ্যতার স্বরাজেই সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীরূপ জমিদার-শ্রেণী দেখিয়া, সেই ভূস্বামী-শাসন উপলব্ধি করা কঠিন ব্যাপার। বর্ত্তমান বৃটিশ-শাসন কোম্পানি-রাজত্বের শেষকালে, নির্দ্দিষ্ট-দিনে সদর-খাজানা না দিলেই জমিদারীসত্ব নিলাম হইয়া যাইবে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। তাহাতে অনেক প্রাচীন-ভূস্বামীগণের হাত হইতে ভূমি-সত্ব, অর্থশালী যার তার হস্তগত হইয়াছে এবং পরগণাগুলী বহু ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব কালে ভূস্বামী হওয়া শ্রেষ্ঠকর্ম্মা, শ্রেষ্ঠবংশ, কীর্ত্তিমান পুরুষ বিনা হইত না। ভূস্বামীই প্রকৃত-পক্ষে সেই প্রদেশের প্রজাপতি রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজত্বের কেদার রায়, সীতারাম রায় প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি রাজা ও ইশাখা ইত্যাদি ভূইয়াগণও সেই প্রাচীন ভূস্বামীগণ।

মানব-জাতিতে জ্ঞান বিদ্যাদি প্রকাশ করিয়া, নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ-বন্ধন স্থাপয়িতা আদি-প্রজাপতি ঋষি ও মনুবংশীয় বিষ্ণু-অবতার আদি-রাজা

পৃথুই. ভারতে এই হিন্দুশিক্ষা ও শাসন-প্রণালী স্থাপন করেন ; মনুবংশীয় রাজ-পুত্রগণ ক্ষাত্রশক্তি লইয়া কতগুলি গ্রাম-পতি ভূস্বামী হইতেন, সেই বংশের শ্রেষ্ঠজন বহু ভূস্বামী-পতি মহারাজ হইতেন, আর ঋষি-বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞান, বেদাচারের আদর্শস্বরূপ হইয়া. প্রতিগ্রামের মানব-কুলকে জাতিবর্ণে বিভক্ত করতঃ, প্রতিবর্ণের স্বধর্ম্মাচার শিখাইতে গুরু ও পুরহিতরূপে তাহাদের সঙ্গে মিশিতেন, এইরূপে মনুবংশ ও ঋষিবংশ ভারতের সকল মানবকে জ্ঞানময় আর্য্যমানব করিয়া গঠন করেন। সেই ঋষিগণের আদর্শ, সাহচর্য্য ও উপদেশে এবং মনুবংশীয় রাজার ক্ষাত্র-শাসনের বলে, হিন্দু-সভ্যতারূপ বেদাচার ভারতে স্থাপিত হইয়া. আচারবান্ আর্য্যমানব গঠিত হয়, সেই আর্যদের বাসস্থান বলিয়া ভারতের নাম আর্য্যস্থান হয়।

এই শিক্ষা ও শাসন স্থাপনকাল

পুরাণের বর্ণনায় পাওয়া যায়, মনুবংশীয় এক এক জন জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন রাজা, তাঁহার পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতস্পুত্রগণকে চক্রপতি ভূস্বামী করিয়া নিয়োগ করতঃ, নিজনামে এক একটী রাজ্যরূপ দেশ গঠন করিয়াছেন। তাহা হইতেই পাঞ্চাল, বিরাট, কোশল, বিদর্ভ, মদ্র, বঙ্গ কুরু আদি নামে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশবিভাগ গঠিত হয়। কতগুলি গ্রামে চক্র, কতগুলি চক্রে একটী অরাত্ব. কতগুলি অরত্বি যুক্ত হইয়া একটী রাজ্য গঠিত হইত। হিন্দু-রাজত্বে গৌর-রাজ্য দ্বাদশ চক্রে বিভক্ত ছিল ; তাহারাই দ্বাদশ প্রধান। মুসলমান-রাজত্বে চক্র-পতিগণই ভৌমিক বা রাজা নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই মোগল রাজত্বে বাঙ্গলার দ্বাদশ-ভৌমিক।

হিন্দুসভ্যতায় সেচ্ছাচারী রাজার শাসনে প্রজা শাসিত হয় নাই! দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন শাস্ত্র-বিধি। ঋষিরূপ ব্রাহ্মণ সেই শাস্ত্রবিধির

জীবন্ত-আদর্শ ও বিধান-উপদেশক ছিলেন। রাজা, সেই ব্রাহ্মণগণের আদর্শ ও উপদেশ, প্রজাগণকে গ্রহণে বাধ্য করিবার ক্ষাত্র-শক্তি,—শাসক ও কোষ-রক্ষক মাত্র ছিলেন। এই শাস্ত্রজ্ঞ-ব্রাহ্মণের আদর্শানুশরণ ও উপদেশ মানিয়া চলাই, হিন্দু-সভ্যতার ব্রাহ্মণানু-শাসন বা ব্রহ্মণ্যতা। তাই এই ঋষি-বংশধর ব্রাহ্মণ-বর্ণ বিনা অন্যবর্ণ ধর্ম্মবক্তা হইতে পারিত না। সেইকালে ব্রাহ্মণ ও রাজা হইতে সর্ব্ব প্রজাই শাস্ত্র-বাক্যকে অভ্রান্ত ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহাকে পালনে দৃঢ় যত্নবান হইত; তাহাই হিন্দুর শাস্ত্রানুশাসন; এই শাস্ত্রানু-শাসনই হিন্দু-সভ্যতার মূল-ভিত্তি। প্রজাপতিবংশীয় ঋষি ও তাঁহাদের সন্তানগণ এবং মনুবংশীয় রাজর্ষি ও তাঁহাদের সন্তানগণ এই বেদ-বিধি পালনে এতদূর দৃঢ় যত্নবান ছিলেন যে, একটী শাস্ত্র-বচন দ্বারা রাজা বিধিলঙ্ঘন করিয়াছেন বুঝাইয়া দিলে, অমনি রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; ব্রাহ্মণগণের নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র-বিধানে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ঋষিগণও শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া বসিলে, কেহ না জানিলেও, রাজার নিকট বলিয়া তাহার শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ মহাপাপ করিয়া বসিলে, শাস্ত্রবিধান লইয়া তপ্তঘৃত-পানে বা তুষানল অর্থাৎ ধানের খোষা তুষ-রাশিতে একস্থানে সামান্য অগ্নি ধরাইলে, যেমন ক্রমে সমস্ত তুষ জ্বলিয়া ভস্ম হয়, তেমনি শরীরে দাহ্য-পদার্থ লেপন করিয়া, পাদদেশে অগ্নিদানে ক্রমে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেন। অধিক দিনের কথা নয়! বৌদ্ধ প্রাধান্যের শেষ কালে, শ্রীকুমারীল ভট্ট বৌদ্ধধর্ম্মমত জানিবার জন্য এক বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট সেই মত অধ্যয়ন করেন। পরে ভট্ট যখন বৌদ্ধমত খণ্ডণ করিয়া, হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রমত প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করেন, বহু বৌদ্ধাচার্য্য বিচারে পরাস্থ হইয়া হিন্দুমত গ্রহণ করিতে আরম্ভ

শাস্ত্রানু-শাসন ও ব্রাহ্মণানু-শাসন

করিল, তখন তাঁহার অধ্যাপক বিচার করিতে আসিয়া এবং এই পণ করিলেন, যে পরাস্ত হইবে সে উত্তপ্ত তৈলে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে ; পরে বিচারে তিনিই পরাস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু এই মৃত্যুতে শ্রীকুমারীলের গুরুহত্যা মহাপাপ ঘটিল। এই জন্য তিনি শাস্ত্র-ব্যবস্থিত তুষানল করিয়া দেহত্যাগ করেন। শরীরের কতক দগ্ধের পরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য উপস্থিত হইয়া, অগ্নি নিবাইয়া জীবন রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি উত্তর করেন, যে বেদাচার স্থাপন করিতে আসিয়াছে, সে বেদাচার লঙ্ঘন করিলে চলিবে কেন ? আমার বেদোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে ; আমার আরব্ধ-কর্ম্ম তুমিই শেষ করিবে। এমনি কঠোর ভাবে বেদাচারকে নিজেরা আচরণ করিয়া, আদি আর্য্যমানব ঋষি ও মনুবংশীয়গণ আদর্শ, উপদেশ ও শাসন-বলে, অজ্ঞান-ময় মানবজাতিকে বর্ণ ও আশ্রমাদিতে বিভক্ত করিয়া আর্য্যত্বরূপ হিন্দু-সভ্যতার সদাচারে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। তাহাতেই দেবতা-সদৃশ জ্ঞানময় পূর্ণ-মানব গঠিত হয়, এজন্য হিন্দু-সভ্যতা স্থাপনের মূলই ব্রাহ্মণানুগত্যরূপ ব্রাহ্মণ্যতা ও শাস্ত্রানুশাসন রক্ষণ।

ভগবানের পৃথক পৃথক জ্ঞানমূর্ত্তি শাস্ত্র-প্রকাশক ঋষিগণ, জ্ঞানের তপস্যা ও ঈশ্বর-যুক্ততার শ্রদ্ধাদ্বারা জগতের সর্ব্বদা কল্যাণ-সেবা করিতে, তাঁহাদের বংশধরগণ দিয়া এক শ্রেণীর মানব গঠন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই হিন্দুর ব্রাহ্মণ-বর্ণ। আজকালের কঙ্কাল সার দুগ্ধহীনা, ক্রোধপরা গাভীগণ দেখিয়া, যেমন, শাস্ত্র-বর্ণিত ঋষিগণের যজ্ঞগাভী কামধেনুর কথা কল্পনা বলিয়া মনে হয়, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজ দেখিয়া প্রাচীন ব্রাহ্মণগণকে বোধ করা তেমন হইলেও, হিন্দু সভ্যতার গৌরবযুগ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের রাজত্ব-কালে, এই ব্রাহ্মণ-জাতির প্রায় সকলেই সর্ব্বপ্রকারে বিষয় সম্পর্কহীন হইয়া,

হিন্দু সভ্যতার ব্রাহ্মণ

সর্ব্বদা দেহেন্দ্রিয় নিরোধ করতঃ, দারুণ ত্যাগ ও কঠোরতর তপস্যায়, সত্যজ্ঞান ও ঈশ্বর-যুক্ততা অর্জ্জন করিয়া, তাহার ফলদ্বারা সর্ব্ববর্ণের মানব-সহিত জগতের কল্যাণ-সেবা করিয়া জীবন কাটাইতেন। তাঁহাদের সাধনার ফলে, তাঁহাদের সাহচর্য্যে, উপদেশের সহায়তায় ও অনুশাসনে চলিয়া, পশুতুল্য জ্ঞান বিদ্যাহীন মানব-জাতি জ্ঞান পতস্যাময়, দেবচরিত্র আর্য্যমানব হইয়া উঠিয়া ছিল। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে, জন্মদাতা পিতাও প্রাণের কর্ত্তা ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্যের ঋণের মতই, এই জ্ঞানগুরু ঋষিগণের নিকটেও মানবের অবশ্য পরিশোধনীয় কর্ত্তব্য-ঋণ আছে বলিযা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই হিন্দু-শাস্ত্রমতে, এই ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মই অতি মহাপুণ্যের ফল ধরা হয় ও ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম পাইলেই তাহাকে অন্যবর্ণ সকলের পূজাযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে।

মহাভারত ও ভাগবত পুরাণাদিতে বহু স্থানে ভগবান বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ আমার প্রকাশমূর্ত্তি। আমার উদ্দেশে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিলে আমি তেমন পরিতৃপ্ত হই না, এই ব্রাহ্মণের মুখে আহুতি দিলে আমি যেমন পরিতৃপ্ত হই। আমার বিগ্রহ-পূজনে আমি তেমন তুষ্ট হই না, এই ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তির সেবায় আমি যত তুষ্ট হই! এই জন্যই হিন্দুর প্রতি ধর্ম্ম-কর্ম্মে, দেব-পূজাদিতে, ভগবানের এই ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তির পূজা ও ভোজন ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়ায়ছে; ব্রাহ্মণহীন পূজাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব নিস্ফল। ভগবান বিষ্ণু প্রতি অবতারে এই ব্রাহ্মণ-বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে ধর্ম্মরাজের রাজসূয়-যজ্ঞে, শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রাহ্মণ-বর্ণের পদধৌতের কর্ম্মভার, স্বয়ং ধর্ম্মরাজের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণ-পূজা প্রচার করেন। শ্রীরাম অবতারে পত্নী-হারী, রাক্ষসাচারী, মহাপাপী রাবণকে বধ করিয়াও ব্রাহ্মণ-পুত্র বধের প্রায়শ্চিত্ত করেন। মহাপ্রভু অবতারে শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীগয়াধামে

গমন কালে, হঠাৎ জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া, কোনও ব্রাহ্মণ-বংশধরের পদধৌত জল আনিতে আদেশ করেন এবং তাহা ভোজন ও মস্তকে লইয়া রোগ-মুক্ত হন; ইহাও তাঁহার ব্রাহ্মণ-মহিমা প্রচার করা মাত্র। গীতায় নবম অধ্যায়ে অনন্যভাগে ভগবান ভজনের গুণ ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তাহাতে সুদুরাচর, স্ত্রী, শূদ্রাদি এমনকি পাপ-যোনিজ ব্যক্তিও ইহাতে পাপহীন হইয়া মুক্তি পায়, ব্রাহ্মণ জাতির কথা আর কি বলিব; ইহাও ব্রাহ্মণ-বর্ণের মহত্ত্বর্ণনাই করিয়াছেন। ভাগবতে ১০ স্কন্ধ ৮৬ অধ্যায়ে, মিথিলায় শ্রুত-দেবকে উপদেশ দানের কালে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ জন্মদ্বারাই শ্রেষ্ঠ, তার মধ্যে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তপস্যা, বিদ্যা, তুষ্টি ও মদীয় উপাসনাযুক্ত তাঁহাদের কথা আর কি বলিব। শ্রীকৃষ্ণের দেব-গুপ্ত শ্রীবৃন্দাবনের মধুরলীলায়ও, নিত্যা গোপিনীগণের সহিত পৌর্ণমাসী আদি ব্রাহ্মণী মধুমঙ্গলাদি কতিপয় ব্রাহ্মণ-সন্তানকে তাহা দর্শনের অধিকার দান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-জন্মেরই মহত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

ভগবান বিষ্ণুর অবতার গ্রহণের কারণ মধ্যে, গাভী ও ব্রাহ্মণের হিতসাধনকেই শ্রেষ্ঠ কারণ বলা হইয়াছে। তাঁহার নমস্কার-মন্ত্রের মধ্যেও গোব্রাহ্মণ হিতায়চ বলিয়া নমস্কার করিতে হয়। যথা—নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। এই শ্লোকে জগত-হিতায় বলিয়াও, আবার গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ পৃথক বলিয়া, তাঁহাদের বিশেষত্বই করা হইয়াছে। এইজন্যই হিন্দু গো ও ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তানকেই, জগতের অন্য প্রাণিমণ্ডলী হইতে পৃথক ভাবে দেখে ও সম্মান করে। হিন্দুশাস্ত্র-মতে একটী আত্মা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করতঃ, চৌরাশিতী প্রকার প্রাণীতে, চৌরাশিতী লক্ষবার জন্ম গ্রহণ করিয়া, পরে গো-কুলে ও তার পরে ব্রাহ্মণ-কুলে

জন্ম-গ্রহণ করতঃ, জন্মমৃত্যুর হাত এড়াইয়া যায়। তাই এই গো ও ব্রাহ্মণজন্ম, জগতের অন্যপ্রাণীর অতীত জন্ম ও তাঁহারা সর্ব্বপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ জীব। ঋষি মীমাংসায় গো আর ব্রাহ্মণ-জন্ম এক শ্রেণীর, ইহারা এক যোনিজ। বেদ-জ্ঞান-সম্পন্ন হইলেই গোত্বে বর্জ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, আর জ্ঞান-হীন ব্রাহ্মণ গাভীতুল্য সম্মান্য, তাঁহার বধে গোবধের পাতক হয়; ব্রাহ্মণ বধ পাপ হয় না।

**গোজাতি**—গাভী যেমন জীবনে মরণে আপনার দেহের সর্ব্বঅংশ ও শক্তি দ্বারা, সর্ব্বদা কেবল জগতের কল্যাণ-সেবাই করিয়া যাইতেছেন, কাহারো নিকট কখনও কিছুই প্রতিদান প্রার্থনাও করিতেছেন না—চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ আদি দেবতার মত, এমন অযাচকে সর্ব্বপ্রাণীকে সমভাবে কল্যাণ-সেবা, প্রাণী-জগতে আর কাহারও দ্বারাই সম্পাদন হইতে দেখা যায় না। মানব-শিশুর মায়ের বুকে দুগ্ধ না হইতে, এই গাভীর দুগ্ধে তাহার জীবন রক্ষা হয়। গাভীর দুধের জীবন রক্ষাকারিণী, বলদায়িণী ও সুস্বাদু ভোজন-দ্রব্য-প্রদায়িণী-শক্তি জগতের অন্যকোনও দ্রব্যেই নাই। দুগ্ধের, দধি, ঘোল, সর, ছানা, ননী, ঘৃতাদি, খাদ্যের তুলনা আছে কি? ইহার মলের বায়ু-শোধন, ভূমি শোধন-শক্তি, ভূমির উর্ব্বরতা-বর্দ্ধক-শক্তির আর তুলনা নাই। তাহার উপরেও মল শুষ্ক করিয়া তাহার অগ্নিতে খাদ্যাদি প্রস্তুত হয়, মলের ছাঁই বৃক্ষের পোকা-নাশক, মানব ও পশুআদির চর্ম্ম-রোগাদি নাশক। মুত্র ভোজনে কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য হয়, সার রূপেও বৃক্ষের উপকার সাধন করে। গাভী গায়ের বলে লাঙ্গল টানিয়া, গাড়ি টানিয়া, ভার বহন করিয়া সর্ব্বদা জগতের কল্যাণই করিতেছেন। এই সব ত জীবিত-কালের দান, গাভী মরিয়াও চর্ম্ম, শৃঙ্গ, ক্ষুর, লোম, অস্থি ও মাংস দিয়া জগতের প্রাণী-বর্গের কল্যাণ-সেবাই করিয়া থাকেন। চর্ম্মে জুতা, বেগ, বাদ্যযন্ত্রাদি,

শৃঙ্গ. ক্ষুরে, চিরুণী ও ব্রীশ-আঠা ইত্যাদি হয়, অস্থি-চূর্ণ বৃক্ষের উৎকৃষ্ট সার, চিনি আদি পরিষ্কারের সহায়তা করে, মাংস অনেকে ভোজন করে, পচিলেও মৃত্তিকার উৎকৃষ্ট সার হয়। হিন্দুর বৃক্ষায়ুর্ব্বেদে মাংস-রস ও ধৌত-জলে, অফলা বৃক্ষকে ফলবান করিয়া থাকে বর্ণিত আছে। গো-দুগ্ধ, ঘৃত-শিক্ত বীজে, বৃক্ষকে সেই জাতিয়ের নূতন প্রকার ফলাদি প্রস্তুতের কৌশল বর্ণিত আছে। গো-লেজের লোম-দ্বারা চামর-ব্যজন ও ব্রাস আদি প্রস্তুত হয় : এই নিঃস্বার্থ জগত-সেবা গুণেই পশু-জাতিয় হইয়াও গাভী, হিন্দুর নিকট দেবতাতুল্য পূজার পাত্র হইয়া রহিয়াছে। এই গাভীজাতি পৃথিবীর মতই প্রাণীবর্গের অত্যাচার সহিয়াও তাহাদিগকে কল্যাণ দান করেন। তাই বুঝি ঋষিগণ শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, গাভী সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ড মুর্ত্তি—ব্রহ্মের বিরাট রূপের মত গাভীর অঙ্গে সমস্ত লোক-পাল দেবতাগণ অধিষ্ঠীত হইয়া, তাঁহাদ্বারা জগতপালন করিতেছেন, তাই হিন্দু-শাস্ত্রমতে গাভীর-পূজায় সর্ব্ব-দেবতার পূজা হয়, তাঁহার তোষণে সর্ব্বদেবতা তুষ্ট হন। পুরাণ-শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবৎ-বাক্য আছে, ব্রাহ্মণ ও গো আমার মুর্ত্তি। হিন্দু-শাস্ত্রে গাভী-মহিমায় বর্ণিত আছে, গাভীকে বস্ত্রালঙ্কারে পূজা করিয়া, যদি উপযুক্ত-পাত্রে দান করা যায়, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ মহাদান আর নাই, তাঁহাতে সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বদ্রব্য দানের ফল তাহার লাভ হয়। এই জন্যই হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্রেই, দেবপূজা ব্রাহ্মণ-পূজার মত গো-পূজা, গো-সেবা নির্দ্দিষ্ট আছে। অপরাধের দোষ নাশক প্রায়শ্চিত্তে ও মৃত পিতাদির উদ্ধারার্থে শ্রাদ্ধকালে গো-পূজা, গো-কে ভোজন করান বিনা কর্ম্মই সুসিদ্ধ হয় না। গো ও ব্রাহ্মণ দেহে ভগবান জগতের অনেক কল্যাণ-কর্ম্ম সমাধান করেন বলিয়াই, তাঁহাদের পূজায় সহজে ভগবৎকৃপা লাভ হয়। গো সেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা, তাঁহাদের পাদোদক ও উচ্ছিষ্ট সেবনে, কতজনকে কত দুরাক্রম্য রোগ

হইতে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়াছি। এইজন্যই গাভী পশুকুলে জন্মিয়াও ঈশ্বরের প্রিয় একটী বিশেষ-প্রাণী।

**ব্রাহ্মণ জাতিও** পূর্ব্বকালে এই গো-জাতির মত কাহারও নিকট কিছু প্রতিদান না চাহিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সঙ্গ, দেহেন্দ্রিয়-ভোগ ত্যাগ করিয়া, কঠোর তপস্যায় জ্ঞান ও ঈশ্বর-যুক্ততা অর্জ্জন করতঃ, সর্ব্বদা কেবল জগতের কল্যাণ-সেবা করিয়া জীবন-যাপন করিতেন। সর্ব্ববর্ণের মানবকে অধিকার অনুরূপ সত্য-জ্ঞান ও বিদ্যাদান, সংসারের কল্যাণকর নীতি-শীলতা, স্বাস্থ্য-রক্ষা-জ্ঞান সহিত ব্রহ্ম-বিদ্যা, ঈশ্বর-ভক্তি দান করা, গ্রহ এবং প্রজাপতি দেবগণের ও উপদেবগণের রোষ হইতে জীবগণকে রক্ষা করাই, তাঁহারা জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। জীবন রক্ষার-উপযোগী সামান্য তাপসোচিত-ভোজন, লজ্জা-বারণের সামান্য বস্ত্রখণ্ড লইয়া, সামান্য পর্ণ-কুটীরে কেবল ত্যাগ, তপ, দয়া ও পরসেবা লইয়াই ব্রাহ্মণ জীবন কাটাইতেন।

**ব্রাহ্মণ** অন্যবর্ণের গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম্য-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করতঃ, ঈশ্বরেব স্তব ও নামের শব্দে আকাশকে শোধন করিয়া দিতেন; ধূপ ধূনা, যজ্ঞধূম, চন্দন ও পুষ্পের গন্ধে বায়ুকে বিমল করিয়া দিতেন; জ্যোতির ধ্যান, সূর্য্যার্ঘ্য দানে তেজ-তত্ত্বকে, গঙ্গা ও তীর্থাদি আহ্বানে, স্নান, তর্পণে ও ফুলতুলসী দিয়া জলকে এবং যজ্ঞ-মণ্ডল যন্ত্রাদি চিত্রে, যজ্ঞকুণ্ডাদি নির্ম্মাণে ও প্রণামাদিতে ক্ষিতি-তত্ত্বতে মলহীন করিয়া দিতেন। তর্পণ কালে সর্ব্ব-দেব, ঋষি, পিতৃ ও নাগ যক্ষাদি উপদেব গণকেও জলদানে পূজা করিয়া, জগতের কল্যাণই প্রার্থনা করিতেন। ওঁ মধু বাতা ইত্যাদি বেদাস্তোত্র-পাঠে, পর-ব্রহ্মের নিকট, জগতের আকাশ বাতাস হইতে ধূলিপর্য্যন্ত মধুময়, জীব-কল্যাণ ময় করিয়া দিতে প্রার্থনা করিতেন। শান্তি-মন্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক প্রাণীর কল্যাণ

প্রার্থনা করিতেন, ইহাতেই বুঝাযায় ব্রাহ্মণ কেবল জগতের কল্যাণ-জন্য জীবন রক্ষা করিতেন।

সমুদ্র-মন্থনে তীব্র হলাহল-বিষ উত্থিত হইয়া ঘ্রাণ-দ্বারাই জগত ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব যেমন জগতের কল্যাণ-জন্য তাহা পান করিয়া জগত রক্ষা করেন; এই ব্রাহ্মণও জগতের কল্যাণ জন্য হীন-সঙ্গকে কেবল আপনারা বরণ করিয়া লইয়া ছিলেন। জীবের দেহেন্দ্রিয়-পরায়ণতা জীবস্বরূপ স্বাভাবিক-ধর্ম্ম। তাই জীবের অধিভূত শক্তিগুলি জীবকে সর্ব্বদাই সেই দিকে প্রলুব্ধ করে। এই জন্যই হীন-সঙ্গ হীন-ব্যবহার জীবের বড়ই প্রিয় ও মহাআকর্ষণের কারণ। শ্রেষ্ঠ আচারী কতদিন হীনাচারীর সঙ্গে চলিলেই, সহজে হীনাচারী হইয়া উঠিবে, দেহেন্দ্রিয়ের কষ্টকর শুদ্ধাচারে তাহার কষ্ট ও অসুবিধা বোধ হইতে থাকিবে; এইজন্যই হিন্দুসভ্যতায় শুদ্ধাচারী শ্রেষ্ঠ-বর্ণগণকে তীব্রভাবে শাসন দ্বারা হীনাচারী হীনবর্ণের সঙ্গ ত্যাগ করান হইত। বর্ত্তমানে সেই শাসন হারাইয়া, আজ সকল শ্রেষ্ঠ-বর্ণ-সন্তান হীনাচারী হীনবর্ণের সঙ্গে, নিজেদের শ্রেষ্ঠ আচার ও মহত্ব বর্জ্জিত হইতেছে; হীনবর্ণও তাহাদের মত সবকেই দেখিয়া, আদর্শ বিহনে মহত্বহীন হইতেছে। এই হীনাচাররূপ বিষ ভোজন করিয়া, তাহার হস্ত হইতে জীবকে রক্ষা করিতে, আর হীনাচারীর উদ্ধারের উপায় করিতে, তাই ব্রাহ্মণ সেই বিষ নিজেরাই ভোজন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহাদেবের মত তপপ্রভাবে সেই বিষ হজম করিয়া, অমৃতময় করিয়া বিতরণের শক্তি ব্রাহ্মণের ছিল। বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ তপহীন হইয়া, নিজেরাই সেই বিষ-ক্রিয়ায় আচার রূপ ও জ্ঞান হীন, ও সাধারণের নিন্দা-ঘৃণার ও অসম্মান ভাজন হইয়া পড়িয়াছেন। সে দিনের ব্রাহ্মণ প্রতিহীনবর্ণকে দেব-স্বভাব ভুলিবার জন্য, তাহাদিগকে হীনাচার ভেদ করিয়া মুক্তি-

রাজ্যে যাইবার পথ জানাইতে, সর্ব্বদা উপদেশ, অনুশাসন ও সাহায্য জন্য তাহাদের পুরোহিত ও গুরু হইয়া, তাহাদের সেবা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য শ্রেষ্ঠবর্ণের পুরোহিত ব্রাহ্মণ-সঙ্গ ত্যাগ ও শ্রেষ্ঠবর্ণের নিকট অসম্মান গ্রহণ করিতেও, তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। এইজন্যই এক-ব্রাহ্মণ সন্তান, একই বেদ ও মন্ত্র-সাধক হইয়াও, হিন্দু-মধ্যে যত বর্ণবিভেদ, ব্রাহ্মণ প্রায় তত শ্রেণীতে-বিভক্ত হইয়া আছেন। হীনবর্ণের পুরোহিতগণ বর্ণ-ব্রাহ্মণ নামে, শ্রেষ্ঠ-বর্ণের-পুরোহিত ও শ্রেষ্ঠ-বর্ণের নিকট, ব্রাহ্মণ হইয়াও সম্মানে হীন, জল অনাচরণীয় হইয়া আছেন।

ব্রাহ্মণ নিজেরা ত্যাগপন্থী মাত্র ঈশ্বর-সাধক হইয়াও, পুরোহিতরূপে উপদেশে গুরু, পরামর্শে মন্ত্রী, ধর্ম্ম-ক্রিয়ায় আচার্য্য, বিপদে সুহৃদ, প্রেমে ভ্রাতা হইয়া. বিপদে মন্ত্রণা, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে শান্তি দিতে, হীনাচারী গৃহস্থেরও সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দৈব-দুঃখাদি দূর করিতে গৃহস্থকে ভোজন করাইয়া, ব্রাহ্মণ নিজে তাহার প্রতিনিধি হইয়া উপবাস করিতেন, কঠোর-তপে দেবতাদি তোষণ করিয়া, তাহার ফল গৃহস্থকে ভোগ করাইয়াছেন। তার উপরে গৃহপতির সকল গৃহ-কর্ত্তব্য-বিষয়ে তিনিই পরামর্শদাতা ও পরিদর্শক ছিলেন। গৃহের প্রত্যেকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হয়, সন্তানগণকে উপযুক্ত বয়সে শিক্ষা দীক্ষা বিবাহাদি দান হয় কি না, পক্ষপাত হয় কি না, অযোগ্য গুরু বা পত্নী-আদি আনা হয় কি না, ইহা পুরোহিত দেখিতেন। এমন কি, ধর্ম্মাচরণ, দান, শ্রাদ্ধ বিবাহাদির অর্থব্যয়ও পুরোহিত নির্ণয় করিয়া দিতেন—যেন অতি ব্যয় করিয়া গৃহের লোককে দারিদ্র-দুঃখে না ফেলে বা প্রতিবেশীকে প্রাপ্যদান হইতে বঞ্চিত না করে। গৃহস্থ সদাচার পালন করে কি না, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিধান মত করে কি না, তাহার প্রথম প্রদর্শক ও শাসনকারী এই পুরোহিত ছিলেন। গৃহ-পতির দোষ তিনি শোধনে

অক্ষম হইলে, পুরোহিত কুলপতিকে জ্ঞাপন করিতেন। পুরোহিতের না বলা পর্য্যন্ত গৃহস্থ নির্দ্দোষ থাকিত ; কুল, সমাজ, ভূস্বামীও তাঁহার বিচার করিতে পারিতেন না। কুলপতি, সমাজ ও ভূস্বামীও এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর ব্যবস্থা ও পরামর্শেই শাসন-কার্য্য সমাধান করিতেন। ইহার উপরেও এই পুরোহিত-কুলের ব্রাহ্মণগণই, প্রতি-বর্ণের বালকগণকে প্রাথমিক বিদ্যাদানের সঙ্গে, ভাষা-জ্ঞান ও স্বধর্ম্মাচার-জ্ঞান শিক্ষা দিয়া দিতেন, বৃদ্ধগণকে পুরাণাদি শ্রবণ করাইয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতেন। এই সবের প্রতিদান স্বরূপ সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত, হিন্দুর সর্ব্ববর্ণের নিকট প্রণাম ও যজমানের নিকট হইতে, তাপস-জীবন উপযোগী ফলমূল, তণ্ডুল-কণা ও বস্ত্রখণ্ড মাত্র গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত ছিলেন। এই ত্যাগ-মূর্ত্তি পুণ্যচরিত ব্রাহ্মণকে জীবনাদর্শ করিয়া, তাঁহাদের উপদেশ ও সাহচর্য্যে চলিয়াই ভারতের হীনবর্ণের মধ্যেও একদিন ধর্ম্ম-ব্যাধ, শিবা-চণ্ডাল, পিঙ্গলা-বেশ্যার মত ঋষি-চরিত্র জাগিয়া উঠিয়াছিল ; এই মহত্ব দেখিয়া ভারতের সর্ব্ববর্ণ, এমন কি, কোল ভিলাদি পার্ব্বত্য-জাতি পর্য্যন্ত আর্য্যসভ্যতাচার গ্রহণ করিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণের অনুবর্ত্তন ও অনুশাসন মানিয়াই, সদা পাপ-প্রলোভন-পূর্ণ, দুঃখের আকর, অভাব, অপবিত্রতা ও অতৃপ্তির স্থান গৃহ-জীবনকে হিন্দু পবিত্র, তৃপ্তির আগার, সুখ-শান্তিময়, জগতের লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাই সেকালের হিন্দু জগতবাসী মানব জীবনের আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছিলেন। অন্য দেশবাসী ভারতবাসী-হিন্দুকে দেবতা এবং তাঁহাদের সংসারকেই স্বর্গধাম বলিয়া বর্ণনা করিত। সত্যই হিন্দু-সভ্যতার যুগে ভারতের সর্ব্ববর্ণই অভাব ও অপরাধহীন হইয়া, এই পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখশান্তি ভোগ করিয়াছিল।

পৃথিবীর খ্রীষ্টীয় মোহম্মদী আদি ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলেও

দেখিতে পাইবেন। খ্রীষ্টানগণ যতদিন ঈশ্বর-ভক্ত, নিবৃত্তিপথী, তাবধাকী গণের ও মোহম্মদীও সংসার-বিরক্ত, ঈশ্বরভক্ত সুফি-নামক ফকিরগণের উপদেশের অধীন থাকিয়া, তাঁহাদের চরিত্রের আদর্শে চলিয়াছে, তত দিনই তাহারা চরিত্রে, মহত্ত্বে শ্রেষ্ঠ হইয়া, নিজেরাও সুখশান্তি ভোগ করিয়াছে, প্রতিবেশী অন্য-ধর্ম্মিগণকেও সুখ, শান্তি, কল্যাণ দিয়া সেবা করিয়াছিল। যেই দিন সেই আদর্শ ও কর্তৃত্ব নিবৃত্তিপথীর হস্তচ্যুত হইয়া, বিষয়-স্বার্থ-যুক্তের হস্তগত হইয়াছে, সেই দিনই গোড়ামীর দল গড়িয়া, অন্যধর্ম্মীর দ্বেষ পীড়ন ও নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছে; নিজেদের ও প্রতিবেশী অন্য-ধর্ম্মীদের সুখ শান্তি ও কল্যাণ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এক আদমের ধর্ম্মমত হইয়াও, যেমন খ্রীষ্টভক্ত ও মোহম্মদ-ভক্তের মধ্যে, এক দল খ্রীষ্টকে ও এক দল মোহম্মদকে শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করিতে যাইয়া, দুইটি দল গড়িল ও দারুণ বিরোধে মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; ভারতে হিন্দুর মধ্যেও বুদ্ধভক্তগণ, বুদ্ধদেবের তিরোভাবের শতবৎসর পরে সম্রাট-কনিষ্কের সময়ে, বুদ্ধদেবকে শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের অন্য সমস্ত সাধন-মত বিলোপ করিতে যত্নবান হইয়াছিল। সেই সম্রাট যখন দেখিলেন, ভারতে বুদ্ধদেবের ভক্তই সংখ্যায় অধিক, অধিকাংশ রাজা বুদ্ধভক্ত, বুদ্ধ-সাধনেসিদ্ধ যোগশক্তি-প্রাপ্ত বহুমানবে দেশ পরিব্যাপ্ত, তখন তাঁহারা বুদ্ধমতই মাত্র সত্য, আর সব মতই অসত্য, ধ্বংসের যোগ্য বলিয়া, ধন ও লোক-বলের সহায়তায়, হিন্দু-সভ্যতার অন্য-সাধনা ও আচার বিলোপের চেষ্টা করেন।

ব্রাহ্মণের পতনের ইতিহাস।

তাঁহারা চিন্তাকরিয়া দেখিলেন, হিন্দু-সাধারণ সর্ব্ববিষয়ে ব্রাহ্মণের অনুশাসনাধীন থাকিতে, তাহাদের মধ্যে নূতন মতের প্রবেশ করান অসম্ভব। তাই ব্রাহ্মণ-নিন্দা প্রচার দ্বারা সাধারণ হিন্দুকে ব্রাহ্মণদ্বেষী

করিয়া, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ-বিচ্যুত করিল, পরে সত্যই বৌদ্ধ-আন্দোলনকে অল্পদিন মধ্যে সফল করিয়া তুলিল। দেব-প্রকৃতি মানব সর্ব্ববিষয়ে ব্রাহ্মণের আদেশ গ্রহণ করাকে মহাকল্যাণের বলিয়া বোধ করেন ও ব্রাহ্মণ সেই উপদেশ দান করেন বলিয়া, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহাদের পূজা করেন বটে, আসুর-প্রকৃতির পক্ষে সর্ব্বদিকে ব্রাহ্মণের অনুশাসনকে দারুণ ব্রাহ্মণ-অত্যাচার, অধীনতার দুঃখ বলিয়াই মনে বাধে। ইচ্ছামতে ভোগবিলাসে বাধা, সেচ্ছামতে ধনব্যয়ে বাধা, সেচ্ছাচারিতায় বাধা, পত্নী-ভোগেও বাধা; ব্রাহ্মণ-শাসনে অনিচ্ছায়ও উপবাস ব্রতাদি করিতে হইবে, শ্রাদ্ধে বিবাহে অর্থব্যয় করিতে হইবে, আসুর-স্বভাবে তাহা কষ্টকর হইবে না? তাহাতে সেই শাসক বিষয় সম্পদ-হীন, হীন-বেশ ভিখারী ব্রাহ্মণ; আমি দান না করিলে যার অন্ন বস্ত্র জুটে না, সেই মানব। বিষয়ী সম্পদ-বান তেমন লোকের শাসন শ্রদ্ধায় মানিতে চাহিবে কেন? তাই বৌদ্ধগণের ব্রাহ্মণদ্বেষ প্রচারের চেষ্টা সহজেই সফল হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণের বিপক্ষে যত বিরুদ্ধ-বাক্য বলা হয়, ভারতে সেই সব যুক্তি এই বৌদ্ধগণই প্রথমে প্রচার করেন। ব্রাহ্মণ ভয়ানক স্বার্থপর-জাতি। কল্পিত শাস্ত্র-ব্যবস্থা গড়িয়া, নিজেদের ভোগ ও পূজাজন্য, অন্যবর্ণের জ্ঞানাধিকার হরণ করিয়া লইয়াছে; অন্যবর্ণকে অধ্যাত্মজ্ঞান ও মুক্তির সাধনে বঞ্চিত করিয়া, পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্ববর্ণের দেহই ব্রাহ্মণের দেহের মত, জন্মও ব্রাহ্মণের মত মাতার উদরে, এক রূপ রক্ত মাংসে ইন্দ্রিয়াদিতে দেহ গঠিত; ব্রাহ্মণের মত শিক্ষা ও সাধনা পাইলে অন্যবর্ণ ব্রাহ্মণতুল্য হইবে না কেন? ব্রাহ্মণত্বের সাধনায় সর্ব্ববর্ণই ব্রাহ্মণতুল্য জ্ঞান ও গুণবান হইবার অধিকারী। বিশ্বাত্মা, জগন্নাথ ভগবানের নিকট, যাইতে সর্ব্বপ্রাণীই সমঅধিকারী, তাঁহার নিকট যাইতে ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতার

প্রয়োজন পরিবে কেন? দেব-কার্য্যে ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব থাকিবে কেন? এই বলিয়া বৌদ্ধগণ যখন সর্ব্ববর্ণকেই ব্রাহ্মণ হইতে আহ্বান করিল, বিষয়ী ও অজ্ঞ সাধারণ সকলেই পুরোহিত-ব্রাহ্মণ ত্যাগ করিয়া নবমতে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাজ-শাসনে, নবমত গ্রহণ-কারীকে হিন্দুসমাজ শাসনে অনধিকারী ঘোষিত হইলে, হিন্দুগণও তাহাদিগকে শাসনে অক্ষম হইয়া, ত্যাগ করিতেই বাধ্য হইয়া পরিল। এইরূপে ব্রাহ্মণ-দ্বেষ প্রচারে, এবং হিন্দুর ব্রাহ্মণানুশাসন ও শাস্ত্রানুশাসন বিনাশ করিয়া, বুদ্ধভক্তগণ ভারতে নূতন বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধগণ হিন্দুর প্রাচীন-সভ্যতার অনুরূপ শিক্ষা, শাসন-শৃঙ্খলা ও শাস্ত্রানুশাসন এবং ত্যাগপন্থী জ্ঞানবান সাধকের আদর্শ ও অনুশাসনই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই বৌদ্ধগণ দ্বারা মূলতঃ হিন্দু-সভ্যতার পতন হয় নাই, মাত্র রূপান্তরিত হইয়াছিল। হিন্দু-শাস্ত্রের স্থানে বৌদ্ধ ত্রিপিটক শাস্ত্র হইয়াছিল, আর জন্মগত ব্রাহ্মণের স্থানে, সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ-প্রকৃতি-বালক লইয়া গঠিত, শ্রমন-নামে একদল ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীকে স্থাপন করা হইয়াছিল মাত্র। গৃহস্থগণ যখন দেখিল তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারিল না, ব্রাহ্মণের শাসন অধীনতার ক্লেশভার হইতেও স্বাধীনতা মিলিল না, সেই ধর্ম্মে যাইয়াও তাহারা তাই তুষ্ট হইতে পারিল না। ইহার উপরে বৌদ্ধ শ্রমনগণ সর্ব্ববর্ণ হইতে গৃহীত বলিয়া, অল্পদিন মধ্যেই অভিমানী হইয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। তাই মুক্তি-ধর্ম্ম বিমুখ হইয়া, ঐশ্বর্য্য-সাধক হইয়া উঠিল। নূতন নূতন দল গড়িয়া, পরস্পর-দ্বেষ বিরোধে তাহারা অত্যাচারী, কুচক্রী হইয়া পড়িল ও গৃহস্থ পীড়ন আরম্ভ করিল; তাই গৃহস্থগণ তাহাদের শাসনে বিরক্ত হইয়া পড়িল। এই জন্যই যখন হিন্দু-ধর্ম্মের জাগরণ হইল, সহজেই তাহারা

হিন্দুরশাস্ত্র ও ব্রাহ্মণানুশাসন গ্রহণ করিয়া, বৌদ্ধ-সঙ্গ বর্জ্জণ করিল। গৃহস্থগণ বৌদ্ধগণের ব্যবহারে এতই বিরক্ত হইয়াছিল যে, বৌদ্ধ-শাস্ত্র, বুদ্ধ-মন্দির ও বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীগণকে, বিনষ্ট করিয়া, ভারত হইতে বৌদ্ধ মতকেই বিলোপ করিয়া দিল। সহস্র-বর্ষের সুপ্রতিষ্ঠিত, যেই ধর্ম্ম-মত ভারতের চৌদ্দআনা হিন্দুকে কুক্ষিগত করিয়া, সমস্ত এসিয়া, ইউরোপ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিয়াছিল, সর্ব্ববর্ণের গঠিত ব্রাহ্মণ সেই ধর্ম্ম-সভ্যতাকে সহস্র বর্ষের অধিক রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না; কলুষিত করিয়া আত্মকলহে বিনষ্ট করিয়া দিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় প্রাচীন-পন্থী ব্রাহ্মণ-সন্তান সাধনা-দ্বারা নির্ব্বাণুন্মুখ হিন্দুর প্রাচীন-শাস্ত্রজ্ঞান, সগুণ সাধনা ও আচারকে নববলে উদ্দীপিত করিয়া, আবার সর্ব্বভারতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কোটী কোটী বর্ষ ধরিয়া অতি প্রাচীন এই হিন্দু-সভ্যতার জ্ঞান, আচার, সাধনাকে এই ব্রাহ্মণই অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন; হিন্দুর ব্রহ্মাণ-বর্ণের এই টুকুই বিশিষ্টতা। বৌদ্ধ ও মোহম্মদীয়ের দারুণ নির্য্যাতন, অপমান, রাজরোষ হইতে কত সাহস, ত্যাগ ও কষ্ট-সহনে তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুর শাস্ত্র, সগুণ-সাধনা, সদাচার সহিত, তীর্থ ও দেব-বিগ্রহাদিকে রক্ষা করিয়াছেন, এই ব্রহ্মাণ-বর্ণ বিনা অন্য কোন বর্ণের দেহে তাহা সহ্য হইত কি না সন্দেহ। এই ব্রাহ্মণ-বর্ণের অভাব বশতঃই, পৃথিবীর অন্য দেশের প্রাচীনসভ্যতা-সমূহ বিজেতাগণের অস্ত্র ও অত্যাচারের বলে বিলোপ হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ থাকাতেই ভারতে তাহা হইতে পারে নাই।

মেঘাবরণ নাশ করিয়া সূর্য্যোদয়ের মত, বৌদ্ধাবরণ বিমুক্ত হইয়, আবার প্রাচীন-হিন্দুত্বের প্রভায় ভারত প্লাবিত হইলেও, বৌদ্ধ-শাস্ত্রের গণ্ডীজ্ঞান ও বহুদিন হিন্দুশাস্ত্রে অযুক্ততাজন্য হিন্দুজ্ঞান প্রথমেই পূর্ব্বের মত জাগিয়া উঠিতে পারিল না। হিন্দুরাজার শাসনে ক্রমে পড়িয়া

উঠিতেছিল, কিন্তু সেই কালে মোহম্মদী প্লাবনে হিন্দুর রাজ-শক্তি বিপন্ন হইয়া পড়িলে, তাহার অগ্রগতি নিরোধ হইয়া গেল। তাহার উপরে মোহম্মদীর হিন্দুত্ব বিলোপের দরুণ চেষ্টায়, হিন্দুত্ব আবার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল ; বিষ্ণু-অবতার মহাপ্রভু আদি সেই কালে ধ্বংশ হইতে হিন্দুত্বকে রক্ষা করনে। প্রভুর তীরোভাবের তিনশত বর্ষ পরে, আবার নব-সভ্যতার প্লাবনে আজ হিন্দুসভ্যতার অগ্রগতি রুদ্ধ, তাই ভারতে পূর্ব্বের মত হইয়া হিন্দু-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াও পূর্ব্বের মত স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধাসহিত ব্রাহ্মণানুশাসনকে স্বীকার করিতে পারিল না। তাই সম্মান শ্রদ্ধাহীন পৌরহিত্যকে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণ গ্রহণে অস্বীকার করিলেন ; কেবল অর্থলোভী ও জীবিকা-অর্জ্জনে অশক্ত-ব্রাহ্মণ, অর্থলাভ জন্য গৃহস্থের মনোরঞ্জন করিয়াই, দাসের মত তাহাদের পৌরহিত্য গ্রহণ করিল। গৃহস্থও তাহার ইচ্ছামত ব্যবস্থা দেয়, অল্পমূল্যে কর্ম্ম করান যায়, সম্মানাদি দেখানরূপ হীনতা স্বীকার করিতে না হয়, এমন হীন-ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়াই, হিন্দু-নাম রক্ষায় ব্রতী হইল। তাই যেই পৌরহিত্য-পদ ব্রাহ্মণের মহাগৌরবের বিষয় ছিল, মহর্ষি ভৃগু, বৃহস্পতি, বশিষ্ট, গর্গ, ধৌম্যাদি যেই পদকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ছিলেন, সেই পৌরহিত্য পদ আজ ব্রাহ্মণের হীনতার চিহ্ন ; পুরোহিতের উচ্ছিষ্ট ভোজনে মানবের আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মভক্তির বিলোপ হয়। বৌদ্ধ প্লাবনে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সম্মান ও জীবিকাহীন হইয়া, সম্মানও জীবিকার জন্য বিষয় চেষ্টা গ্রহণে বাধ্য হইলেন। জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ সেই রাজ্যেও সহজেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া বসিল ; বৌদ্ধ-রাজত্বে অনেক মন্ত্রী-সেনাপতি-পদ এই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ লাভ করেন, ভূসম্পদও লাভ করিয়া অনেকে ভূস্বামী হইয়া পরেন। হিন্দুত্বের পুনঃ জাগরণে এই বিষয়-প্রতিষ্ঠান্বিত ব্রাহ্মণগণ

সেই বিষয়-সুখ ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণের ত্যাগ তপস্যাময়, ভিক্ষাজীবন গ্রহণে আর অগ্রসর হইলেন না। তাই ভারতের সকল ব্রাহ্মণ আবার পূর্ব্বের ব্রাহ্মণরূপে গঠিত হইয়া উঠিল না; সেজন্যই আজ ব্রাহ্মণ-বর্ণে অধিকাংশই বর্ণ-ধর্ম্মাচারহীন হইয়া রহিয়াছেন। এই ব্যাপারই হিন্দুর ব্রাহ্মণ-বর্ণের পতনের ইতিহাস।

ব্রাহ্মণবর্ণের অধিকাংশই ব্রাহ্মণাচার পরিভ্রষ্ট হইলেও, প্রাচীন হিন্দুত্বের জ্ঞান সাধনা ও পূর্ণাচারের দৃষ্টান্ত, আজও এই ব্রাহ্মণবর্ণের দুই চারি জন দ্বারাই রক্ষা হইতেছে, অন্য বর্ণে সেরূপ আদর্শ মিলা অসম্ভব। লোক গণনায় বর্ত্তমান সময়েও ভারতে ষষ্টিলক্ষ নিবৃত্তিপথি-সন্ন্যাসীর সংবাদ পাওয়া যায়। ইহারা প্রায় সমস্তেই ব্রাহ্মণ-কুলের সন্তান, মাত্র রামকৃষ্ণমিশনে ও আর্য্য-মিশনে কয়েক শত অন্যবর্ণের সন্ন্যাসী আছেন। সন্ন্যাসিগণ সকলেই উন্নত অবস্থা লাভ না করিলেও, সকলেই সন্ন্যাস-কলেজের ছাত্র। সকলেই বি এ, এম এ পাশ না করিলেও, গৃহী হইতে সকলেই ত্যাগী ও অধ্যাত্মজ্ঞানী হইয়া থাকেন। ইহার উপরে কাশী, কাঞ্চি, বৃন্দাবনাদি তীর্থস্থানে এখনও প্রাচীন-আচারী সাধক গৃহস্থ-ব্রাহ্মণই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা নিজেদের জীবনের আদর্শ দেখাইয়া, ভারতবাসীকে প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধনার দিকে টানিতেছেন, সেই আদর্শ-পুরুষ বাবা ত্রৈলঙ্গ-স্বামী, ভাস্করানন্দ হইতে পরমহংস রামকৃষ্ণ, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ, স্বামী ভোলানন্দ, গম্ভীরানন্দ, কাঠিয়া বাবা ইত্যাদি, যাঁহাদের দ্বারা সহস্র সহস্র লোক একালেও প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রেবিশ্বাসী ও আচারনিষ্ঠ হইয়াছেন, সেই সকলেই এই ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। তাই বলিতেছি অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-সন্তান আচারহীন হইলেও এখনও প্রাচীন-আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের বিলোপ হয় নাই। যুগে যুগে এই ব্রাহ্মণবর্ণই হিন্দু-ধর্ম্মকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতেছেন। মুষ্টিমেয়

শাস্ত্রাচারী ব্রাহ্মণ, দারুণ বৌদ্ধ ও মোহম্মদী প্লাবন হইতে হিন্দু-সভ্যতার আচার ও সাধনাকে রক্ষা করিয়া পুনরায় স্থাপন করেন। তাই এই ব্রাহ্মণবর্ণমধ্যে যদি দুই চারি জনও আচারী সাধক থাকেন, তবেই হিন্দু-ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিলোপের সম্ভাবনা নাই। জগতে কোটী কোটী শস্য উৎপন্ন হয়। তাহার প্রায় সমস্তই জগতের-প্রাণিবর্গ খাইয়া. ফেলিয়া নানারূপে বিনষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু দুই চারি জন সৎগৃহস্থ, যে সামান্য পরিমাণে শস্য যত্নে লুকাইয়া বীজের জন্য রক্ষা করেন, উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের দ্বারা সেই বীজ রোপিত হইয়া, আবার জগতকে শস্যপূর্ণ করিয়া তোলে ; দেশের সকল প্রাণীর অপব্যবহারেও জগতের সর্ব্ব-প্রাণীর জীবনোপায় শস্যের বিলোপত হয় না! ধর্ম্মের-অবস্থাও এই শস্যের মত, দুই চারি জন উপযুক্ত লোকের নিকট বীজ থাকিলেই আবার জগত ধর্ম্ম-পূর্ণ হয়। এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার নাশ করেন, এক গুরু বহুকে জ্ঞান দেন, একা যিশু, মোহম্মদ ও বুদ্ধাদি জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, ছিলেন। মুষ্টিমেয় ঋষি ভারতে হিন্দুসভ্যতা স্থাপন করেন। **তাই এখনও হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংসপ্রায় নয়, হিন্দুর ব্রাহ্মণত্ব ও বিলুপ্ত হয় নাই।**

নব্যশিক্ষিতগণ বলিয়া থাকেন, হীনবর্ণের উন্নতির জন্য হিন্দুসভ্যতায় কিছুই ব্যবস্থা ছিল না। উচ্চবর্ণগণ হীনবর্ণকে সর্ব্বদা অপমান, নর্য্যাতন ও অবহেলাই দান করিয়াছে। তাহারা জানেন না, দীক্ষামন্ত্র, দেবপূজা ও ব্রহ্মসাধনা হইতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তীর্থ, দানাদি কর্ম্মের বিধান সর্ব্ববর্ণের একরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। উচ্চবর্ণের মত প্রতিবর্ণ ব্রাহ্মণ গুরু, পুরুহিতের সহায়তায়, একই শাস্ত্রানুশাসনে চালিত হয়। একমাত্র ব্রাহ্মণবর্ণ বিনা, প্রতিবর্ণ ই সেই বেদাচারকে একটু হীনভাবে আচরণ করিলেও

হীনবর্ণের অধীকার হরণ

দোষের হইত না বটে, কিন্তু সর্ব্ববর্ণেরই আদর্শ-পূর্ণাচার ব্রাহ্মণাচার, তাহা গ্রহণে কোনবর্ণেরই বাধা নাই। প্রতিবর্ণ, নিজের সমান-আচারী স্ববর্ণের অন্ন ও পানীয়াদি আচরণ করিত, তাহাদের কন্যা বিবাহ করিত, ও অন্য সমস্তবর্ণের সঙ্গই বর্জ্জন করিয়া চলিত; মাত্র ব্রাহ্মণের অন্ন, পানীয় সকলেই আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণকরিত,তাহাও বর্ণ-ব্রাহ্মণের অন্নাদি শ্রেষ্ঠবর্ণ আচরণ করিতেন না। শ্রেষ্ঠবর্ণগণ আচার ও চরিত্রের মহত্ত্ব-দ্বারাই হীন বর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়া, হীনবর্ণের সম্মান্য হইয়া উঠিয়া ছিলেন। আজ আচার ও মহত্ত্বহীন হওয়ায়ই, হীনবর্ণ সমান-আচারী দেখিয়া শ্রেষ্ঠকে সম্মান করিতে পারিতেছে না ও তাহাদের সমান অধিকার চাহিতে সাহসী হইয়াছে। শ্রেষ্ঠবর্ণও আজ শ্রেষ্ঠত্ব-হীন হইয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পূজা দাবী করায়, হীনবর্ণের প্রাণে ছুৎমার্গের অপমান বলিয়া তাহা বাধিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে বর্ণের মধ্যে পূর্ব্বে উচ্চতা নীচতা ছিল না। হিন্দুর বিবাহ-কর্ম্মে ও শ্রাদ্ধাদিতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মত, নাপিত, ভূইমালীআদি হীনবর্ণ না হইলেও কার্য্য সমাধা হইবে না। এক ভূইমালীকে একদিন গৌরব করিয়া বলিতে শুনিয়াছি "আমাকে অপবিত্র ভাবিতেছ? আমি স্পর্শ না করিলে যে, কোন স্থানই পবিত্র হয় না। আমরা কোদালী স্পর্শে চাঁচিয়া, ঝাটাদ্বারা পরিষ্কার করিয়া গোময় দিলে, তবে সেই স্থান যজ্ঞ, দেব-পূজা ও শ্রাদ্ধের উপযুক্ত হয়; আমাকে বিনা ব্রাহ্মণও স্থানকে শোধন করিতে পারে না।" পশ্চিমে হীনবর্ণের মেথর পর্য্যন্ত জল ভরিবার কালে ব্রাহ্মণকেও তাহার জলস্পর্শ করিতে দেয় না। এমন সর্ব্ববর্ণই হিন্দুমধ্যে গৌরব করিতে পারে ও পূর্ব্বে করিত; নিজকে কেহই হীন বোধ করিত না। তাই হীনবর্ণ মধ্যে বহু শুদ্ধাচারী সিদ্ধ মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছিল, আজ শ্রেষ্ঠকুলেও তেমন মানুষ পাওয়া যায় না।

আর্য্যাচারে আকর্ষণের জন্য, হীনবর্ণে হীনভাবে বেদাচার ব্যবস্থা

হইয়াছে, তাহা **অধিকার হরণ নয়?** যেমন তিলকধারণে ব্রাহ্মণের দ্বাদশ তিলক ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য,শূদ্র ও অন্ত্যজে একটী মাত্র ললাটে তিলকেই চলিতে পারে। এমন শৌচে, হস্তপদে বহুবার মৃত্তিকা লেপন, স্নান,মন্ত্রন্যাস, প্রাণায়াম ব্রাহ্মণের কত চাই, শূদ্রাদি হস্তপদ ধৌত করিয়া, বিষ্ণুস্মরণেই হয়। নারীর আবর্ত্ত বা শৌচ ব্রাহ্মণে পঞ্চ রাত্রি, ক্ষত্রিয়ে চারি রাত্রি, শূদ্রে তিন, অন্ত্যজে এক রাত্রি পালিলেই হইবে। দৈবকার্য্যাদিতে ব্রাহ্মণের সংযম, উপবাস পারায়ণ, তিন দিনে দুই আহার, নিদ্রাত্যাগ চাই, শূদ্র দুগ্ধ ফল খাইয়াই পারে। তেমনি বেদমন্ত্রের প্রণব স্থানে নমঃ বলিয়াই শূদ্র ফলভাগী হয়। উচ্চারণের পার্থক্যে বেদমন্ত্র ভিন্ন ফল দান করে। মহর্ষি ত্বষ্টা ক্রোধভরে মন্ত্রোচারণে জোর দেওয়ায়, তাঁহার পুত্র বৃত্রাসুর ইন্দ্রের হন্তা না হইয়া, ইন্দ্র হস্তে নিহত হইলেন। তাই জ্ঞানহীন ও উচ্চারণে শক্তিহীন হীনবর্ণকে বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার দেওয়া হয় নাই; তাহা তাহাদের মহাকল্যাণ জন্যই হইয়াছে; নব্যজ্ঞানে আজ তাহা অধিকার হরণ। পূর্ব্বে উপযুক্ত হইলে গুরু, পুরুহিত হীনবর্ণের মানবকেও বেদাধিকার গোপনে দান করিতেন। দাসী-পুত্র জাবাল আদি ও অন্ত্যজ রুহিদাস, কবিরাদি তাহার দৃষ্টান্ত। নব্যগণ যুক্তিপ্রদর্শন করেন, কুকুর ঘরে যাইলে জল ফেলিয়া দেয় না, হীনবর্ণ গৃহে যাইলে জল ফেলিয়া দেয়, তাহা নিতান্ত অন্যায়, মানবত্বের অপমান। তাহারা জানে না, পশুর অপকার সর্ব্বমানবই ক্ষমা করে, কিন্তু মানব হইয়া অপকার করিলে, সকলেই মানবকে শাস্তি দান করিয়া থাকে। কারণ পশু অজ্ঞান, না বুঝিয়া অন্যায় করে, মানব ত অজ্ঞান নয়? মানব আমায় কষ্ট দিতে, বিরক্ত করিতেই ইচ্ছা করিয়া অন্যায় করে, তাই শাসনের দ্বারা শোধিত ও শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দুর ছুৎ দোষ সর্ব্বত্র নহে, তৃণে, কাষ্ঠে, যুদ্ধকালে, যজ্ঞে, মহাপ্রসাদে, তীর্থে,

রোগে, আপৎ-কালে স্পর্শ বিচার হিন্দুর ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাতেই বুঝা যায় হীণের জলাচরণ স্পর্শাদি অবশ্য পরিত্যাজ্য নয়। তাই এ ব্যবস্থা হীনবর্ণের অবমাননা জন্য নহে। আরও বলেন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে, হীনবর্ণকেও নাপিত ক্ষৌরি করে, ধোপা কাপর ধোয়, হিন্দু থাকিতে তাহাতে স্বীকার করে না, তাহা হিন্দুত্বের অবমাননা। তাহারা চিন্তা করিয়া দেখেন না, পত্নী, কন্যাদি যত দিন কুলে থাকে, তত দিনই তাহাদের অপরাধাদি জন্য গৃহপতি তাহাদিগকে শাসনাদি করে। যদি কুলত্যাগ করিয়া বেশ্যা হইয়া যায়, তখন কি আর তাহাকে কিছু বলে? বিবাহাদিতে নৃত্যগীত করিতে তাহারা সে বাটিতে আসিলে, তাহাদিগকে আসর বাঁধিয়া নাঁচিবার সুযোগ করিয়া দেয়, অর্থ ও পুরষ্কার দিয়া বিদায় করে। এই জন্যই হিন্দুসমাজে থাকিলেই তাহার উপর সমাজের শাসন থাকে, সমাজ ত্যাগ করিলে আর সেই অধিকার থাকে না। হিন্দু-সভ্যতায় হিন্দু-রাজ-শাসনে প্রত্যেক বর্ণের অধিকার নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক বর্ণের ধোপা, নাপিত, পুরুহিত, গুরু নির্দ্দিষ্ট ছিল। অনেক বর্ণের গৃহস্থগণই সেই পুরুহিত ইত্যাদিকে অমান্য করিয়া ত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছে; সেই ব্রাহ্মণাদি অন্য ব্যবসাদি করিয়া জীবন কাটাইতেছে। এখনও সাহা ইত্যাদি বর্ণ মধ্যে দর্পে জিদ করিয়া স্বপুরুহিত নাপিতাদি ত্যাগ করিয়া, শ্রেষ্ঠবর্ণের ব্রাহ্মণ, নাপিতাদিকে বহু অর্থদানে নিজের করিয়া লইতে দেখিয়াছি। এই জন্যই অনেক বর্ণ আজ ধোপা, নাপিত, পুরোহিত বর্জ্জিত পাওয়া যায়। হিন্দু রাজা নাই তাহার ব্যবস্থা কে করিবে? হিন্দুর সমাজ-শক্তি ও ব্রাহ্মণানুশাসনকে এখন কেহই মানিতে প্রস্তুত নয়! তাই এই সবের সমাধান জন্য কেবল বিবাদ ও বাদানুবাদই সার হইতেছে। পূর্ব্বের মত সমাজগঠন ও ব্রাহ্মণানুশাসন স্থাপন বিনা, হীনবর্ণের প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতি-সাধন

কিছুতেই কেহ করিতে সক্ষম হইবে না। হিন্দুর শিক্ষা-অধ্যায় ও শাসন-শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপন বিনা, মানব-সমাজে প্রকৃত সুখ শান্তি আনিবার ও মানবকে দেব-চরিত্র করিবার আর দ্বিতীয় পন্থা হইতেই পারে না।

## হিন্দু-শাসনের উপকারিতা।

হিন্দু-সভ্যতা মানবের দুঃখের ও হীনতার মূল নির্ব্বাচন করিয়া, তাহা বিনাশের উপায় করিয়াছিলেন, আর নব-সভ্যতা ভিতরে রোগের কারণ রাখিয়া, বাহিরে রোগের উপদ্রব নাশের উপায় করিতে ব্যস্ত। তাই বর্ত্তমানে জনহিতকর যত অনুষ্ঠান গঠন হইতেছে, সমস্তই জনগণকে কল্যাণ হইতে অকল্যাণেই ফেলিইয়া দিতেছে; সকল অনুষ্ঠানই অমানুষের হাতে পড়িয়া, আজ উদ্দেশ্যভ্রষ্ট, নানা সমস্যাময়, জনপীড়ার কারণ হইয়া উঠিতেছে। হিন্দু-সভ্যতার সময়ে এই সব অনুষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনই হয় নাই; এই সমস্ত অনুষ্ঠানের জন-সেবা ধর্ম্মাচার নামেই সম্পাদন হইয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী জগতের মানবগণের হৃদয়ে ভোগ-বিলাসাদি আত্মতৃপ্তি-লালসা বর্দ্ধিত করিয়া, এত প্রকার অভাব আনিয়া দিতেছে যে, তাহার তৃপ্তি জন্য মানব আজ হীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরাধ পরায়ণতার পথে ধাবিত না হইয়া, কিছুতেই থাকিতে পারে না। তাহাতেই মানব-সমাজে সর্ব্বদা মতানৈক্য, বিবাদ, অশান্তি, অন্ন-সমস্যা, অর্থ-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা, অপরাধী হইতে লোকরক্ষা-সমস্যা, দরিদ্র ও রোগী শুশ্রূষা-সমস্যা, বৃদ্ধবয়সে সেবা-সমস্যা, মরক-নিবারণ, রাস্তাঘাট করা, জলাশয়, বিদ্যালয় স্থাপন এমন কি গৃহস্থের মল পরিষ্কার-সমস্যারও উদয় হইয়াছে। এখন এই সমস্তই সমাহৃত জনশক্তি বা রাজ-শক্তি দ্বারা করাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। হিন্দু-সভ্যতার কালে, বর্ত্তমানের মত পুলিশ-শাসন, বিচার-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, হস্পিটাল ও

সেবাশ্রম, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, মিউনিসিপালটি, স্বাস্থ্য-বিভাগ এই সমস্ত কিছুই গঠনের প্রয়োজন হয় নাই ; এই সমস্ত কর্ম্ম, মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই সম্পাদন হইত। যেমন বর্ত্তমানে ষষ্ঠ বর্ষ বয়স হইতে বালকগণকে স্বাস্থ্য-বিধি পড়ান হইতেছে, কত সাকুলার ও স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর পরিদর্শন, পুলিশ-শাসন স্থাপন হইয়াছে, তবু স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধান কেহ পালন করিতেছে কি? খাদ্যে ভেজালদান কেহ ছাড়িতেছে কি? পূর্ব্বে পুরোহিতের উপদেশে সমাজের শাসনে ধর্ম্মবুদ্ধিতেই, জলকে গঙ্গাদেবী বলিয়া হিন্দু তাহাতে মলধৌত করিত না, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল-দান, মানবকে বিষ-দান তুল্য অপরাধ মানিত ; আজ পয়সার জন্য মানব সমস্তই করিতে প্রস্তুত। প্রাচীন শিক্ষা ও প্রাচীন শাসনের পতনে, মানবের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বরভয় হীনতাই মানবের এই হীনতা ও দুঃখের প্রকৃত কারণ।

শাস্ত্র-বিধানে নিত্য-কর্ম্ম পালিতে যাইয়াই, পূর্ব্বে মানব প্রাতে উঠিয়া দশেন্দ্রিয় ধৌত করিয়া দেহের ও ঈশ্বর ধ্যানে, মন্ত্রজপে আত্মার বল বর্দ্ধন করিত। তিথিবিশেষে ভিন্নআহার, উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোধন করিত, ভোজনে সময় ও পরিমাপ নির্দ্দিষ্ট ছিল, নিদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। রোগের কারণই ভোজন ও ভোজ্যের মধ্যে। তাহা যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, সেজন্য হিন্দু সকলেই নিজের গৃহে মাতা ইত্যাদির স্নেহময় হস্তের প্রস্তুত অন্নাদিই মাত্র ভোজন করিত। অর্থ-লোভীর লাভেচ্ছায়, অশ্রদ্ধ-ভাবে, অসাবধানে অপবিত্রতায় প্রস্তুত খাদ্য, বা খাদ্য লইয়া পথে পথে ঘুরে, যার তার গৃহে যায়, স্পর্শ করায় এমন খাদ্য হিন্দুর অখাদ্য ছিল। তাই খাদ্যদ্রব্যের দোকান ছিল না, ময়রা ও গোয়ালাগণ প্রয়োজনে শুদ্ধভাবে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিত। এই সামান্য ও পরিমিত বিশুদ্ধ দ্রব্য ভোজনেই, হিন্দু অনেক পীড়া ও মড়ক

স্বাস্থ্য-সমস্যা

জয় করিতেন। তাহার উপরে ধর্ম্মবুদ্ধিতেই প্রাতে সর্ব্ব-বাটীতে গোময়-ছড়া, গৃহ গোময়-জলে লেপন ও প্রাতে সন্ধ্যায় ধুপ ধুনা দানে, প্রতি গৃহস্থের বাটীর ভূমি ও বায়ুর রোগবীজ বিনাশ হইয়াছে। তাহার উপরেও প্রতি বাটীতে তুলসী, বিল্ব, নিম্ব-বৃক্ষ রোপিত ও পূজিত হইয়া বায়ুর শোধন করিত। তাই বর্ত্তমানের মত ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মড়কে দেশ-ধ্বংস করিতে সুযোগ পায় নাই।

শাসন সমস্যা ও অন্ন-সমস্যা।

বর্ত্তমানে শাসন-দ্বারা. মানবকে অপরাধহীন ও সুপথে সুশৃঙ্খলায় চালাইবার জন্য কমিশনার বিভাগ. জেলা, সব্ ডিবিসন, থানা, ইউনিয়ন, চৌকিদার-বিভাগ করিয়া কত ব্যয়, কত চিন্তা, কত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইতেছে, তাহাতেও গৃহস্থকে অপরাধীর হস্ত হইতে উদ্ধার বা মানবকে অপরাধ-প্রবৃত্তি হইতে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না, বরং তাহাতে আইন বাঁচাইয়া অপরাধ করিবার জন্য নিত্য নূতন কৌশল উদ্ভব হইতেছে, এমন কি শাসক পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত অপরাধে ডুবিয়া, শাসক না হইয়া পীড়ক হইয়া উঠিতেছে; তাই তাহাদের পরিদর্শন মার্জ্জণাজন্য কত উচ্চ-বেতনে উচ্চ উচ্চ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াও উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। হিন্দুর শাসন-বিধানে মানবের অপরাধ প্রবৃত্তিই বিলোপ করিয়া দিয়াছিল। গৃহের এক জনের হীনতা সেই গৃহের প্রত্যেকের নিকট বাড়ীর বংশের কলঙ্ক বোধ হইত। কেবল গৃহের নহে, সেই বর্ণের ও কুলের প্রত্যেকে তাহাকে কুলের নিন্দা মনে করিত; গ্রামের সর্ব্ববর্ণও তাহা গ্রামের নিন্দা মনে করিত। তাই সেই হীনের হীনতানাশে সকলেই চেষ্টা করিত, না পারিলে তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিয়া তাহাকে লুকাইয়া রাখিত। গৃহের কেহ ভিক্ষা করে, রোগ হইলে হস্পিটাল বা সেবাশ্রমে যায়, গ্রামের বৃদ্ধ

অনাথ-আশ্রমে যায় তাহা গৃহের, কুলের ও গ্রামের লোক অপমান বোধ করিত, নিজেদের অমানুষতার নিদর্শন মনে করিত। এখনও হিন্দু-ভাবের গৃহস্থ তাহাই মনে করেন। তাই পূর্ব্বে অনাথ-আশ্রম, সেবাশ্রম ছিল না।

বর্ত্তমানের মত অভাব-বুদ্ধিই হিন্দু-সভ্যতার কালে জাগিতে পারিত না। বিলাসদ্রব্য সাবান, এসেন্সআদি ব্যবহার ছিল না, উত্তম বেশ, শয্যা, সুখাসন ব্যবহার ছিল না, দোকানে দোকানে মনোহারী খেলনা, উত্তম-খাদ্য সজ্জিত থাকিয়া লোককে প্রলুব্ধ করিত না ; ক্লাব, বায়স্কোপ, থিয়েটার খেলাআদিও লোককে প্রলুব্ধ করে নাই। উপাদেয় ভোজন, সঙ্গীতাদি আনন্দ একাভোগ মহাপাপ বোধ ছিল। অপরকে উত্তম দ্রব্য ভোজন না করাইয়া, অপরকে সঙ্গীতাদি আনন্দ-ভোগ না করাইয়া তাই কেহ নিজে ভোগ করিত না। এইসব ভোগ করান তাহারা মহাপুণ্য জনক পরজন্মে নানা সুখদান করে বলিয়া ভাবিতে শিখিত। তাই কোন দেব-পূজা, যজ্ঞ, বা বিবাহাদি উৎসবেই মাত্র ধনবানগৃহস্থ সর্ব্ববর্ণ লইয়া উত্তম খাইতেন ও বাজি পোড়াইতেন, বাদ্য, নৃত্যগীতাদি আনন্দ ভোগ করিতেন। আর আজ রেষ্ট-হাউস, খাবার দোকানে আকর্ষিত হইয়া, জিহ্বার লালসে ও থিয়েটার বায়স্কোপের আনন্দ ভোগের লালসে সকলেই একা ভোগ ধাবিত ও সেই জন্য অতি ব্যয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পরিবারকে দারিদ্রদুঃখে ডুবাইয়া দিতেছে। খাইতে অন্নের পয়সার অভাব, অথচ বিলাসদ্রব্য না হইলেই চলে না, সেজন্য গৃহে নিত্য-বিবাদ, চুরি, প্রবঞ্চনা, ভিক্ষা করিয়াও আজ মানব তাহা পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। অভাব বুদ্ধিই তাহার কারণ। এই সবের অভাব বোধ নাশ বিনা, বাহিরের শাসনে ইহার প্রতিকার হইবে কেন ? মানব যদি জিহ্বার তৃপ্তি ছাড়িয়া দিয়া, মাত্র

শরীররক্ষার জন্য খায়, লজ্জাবারণ জন্য বস্ত্র পরে, বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া চলে, তবে জগতে অন্ন-সমস্যার উদয় হইতেই পারে না, অর্থ-সমস্যারও উদয় হয় না। হিন্দু সভ্যতায় একমাত্র ঈশ্বর-পথী বিনা, ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করাও মহাপাপ মধ্যে গণ্য ছিল; তাহাতে সপ্ত জন্ম দরিদ্র হইতে হইবে ভয় ছিল। আর আজ ভীক্ষার নাম কালেক্সন, যেন প্রজা হইতে নিজপ্রাপ্য কর আদায় হইতেছে. তাহা একটী অর্থার্জ্জণের চাতুর্য্য, বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ।

বর্ত্তমানে নব্যভাবে একজনের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, প্রতিমাসে প্রায় দুইশত টাকার প্রয়োজন পরে। তাহাও নব্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ইংলণ্ড বা আমেরিকায় দরিদ্রের জীবনযাপন; হিন্দু-সভ্যতায় প্রায় বিনা অর্থেই জীবনযাত্রার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক মানবেরই দেহেন্দ্রিয় রাজার মত সুখ, শান্তি ও সম্মান ভোগ করিতে চাহে। বর্ত্তমান শিক্ষা সে বাসনা পুরণের জন্য, কুলি-জীবন ও হোটেল-জীবন সৃজন করিয়াছে। **কুলি-জীবন**—এক ধনবানের কারখানায় চাকরী গ্রহণ করিয়া, তাহার দত্ত বাসগৃহেই, খাঁচার-পাখী হইয়া বাস করা, আর **হোটেল-জীবন**—ধনী হোটেল ওয়ালাকে অর্থদান করিয়া, তাহার নিকট হইতে রাজার তুল্য বাসস্থান, বিলাস সম্ভার, গৃহশয্যা, রাজ-শয়ন, রাজ-ভোজন, দাস দাসীর সুখাদি ভোগ করিয়া জীবন কাটান। রাজ-তুল্য সেই সব দ্রব্যের উপরে, বিলাস-দ্রব্য সাবান, এসেন্স, সংবাদ-পত্র ক্লাব-খরচ, আনন্দ-খরচ, ডাকখরচ, গমনাগমনের ট্রামাদি-খরচ, মালী মেথর খরচ, রোগ-চিকিৎসা, পুলিশ টেক্স, মিউনিসিপাল টেক্স ইত্যাদি সমস্তই অর্থ বিনিময়ে লাভ করিতে, প্রতিমানবের দুইশত টাকা খরচ পড়া অধিক ব্যয়

অর্থ-সমস্যা

নহে। ইউরোপের হোটেলে একদিন খাইতেই ২০।২৫৲ টাকা খরচ পরে, বড় লোকদের ১০০৲ টাকাও দৈনিক ব্যয় হয়। হিন্দু-সভ্যতায় অর্থব্যয় বিনা, কেবল শ্রম ও দ্রব্য বিনিময়ে জীবন যাত্রার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রতিগৃহে মানবের জীবন-যাত্রার সমস্ত-দ্রব্য, সেই পরিবারের লোকগণই পরস্পরের সহায়তায় প্রস্তুত করিয়া, পরস্পরকে পরিবেশন করতঃ স্নেহানন্দের মধ্যে ভোগ করিত। বর্ত্তমানে মটোরাদি কার খানায়, নানা জনে যন্ত্রের নানা অংশ প্রস্তুত করিতে থাকে, পরে একজনে সমস্ত মিলাইয়া এক একটা পূর্ণযন্ত্র বিতরণ করে। তেমনি প্রাচীগৃহের গৃহপতি শক্তি ও জ্ঞান বুঝিয়া, সংসার-যাত্রার দ্রব্যাদির এক এক অংশ গৃহের এক এক জন দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইতেন, পরে মিলাইয়া সংসারের সকলকে তাহাদের পূর্ণ প্রয়োজনীয় ভোগ করাইতেন; গৃহের কেহ তরকারী কুটিতেছে, কেহ ঝাট দিতেছে, কেহ রন্ধন, কেহ শয্যা পাতিতেছে, কেহ কৃষির চাষ, কেহ নিড়ান্ বীজবপন করিতেছে, কেহ কাটিতেছে, কেহ শস্য তুলিতেছে, কিন্তু এইরূপ এক এক কাজ করিয়াই প্রত্যেকে জীবন যাত্রার সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত হইতেছে; তাই কোথায়ও অর্থের প্রয়োজন পরিত না। এইরূপ বিনিময়ে গ্রহণ সেই কালে সর্ব্বত্রই ছিল। মজুর অর্থ না লইয়া চাউল ডাইল লইয়া কাজ করিত; ধোপা, নাপিত, পুরুহিত, চিকিৎসক সংসারের প্রয়োজনীয়-দ্রব্য পাইয়াই গৃহিকে কর্ম্মসেবা দান করিত। এক শস্যের বিনিময়ে অন্যশস্য সংগ্রহ হইত, তুলার বিনিময়ে বস্ত্র মিলিত। বিলাসিতার সাবান এসেন্স ছিল না, আনন্দের থিয়েটার বায়স্কোপ খরচ, ক্লাবের চাঁদা, জুয়াখেলা, গমনের ট্রেন ট্রাম, সংবাদ প্রেরণে ডাক খরচ ছিল না, বিদ্যাশিক্ষায় পুস্তকখরচ, মাহিনা, খোরাকী খরচাদি ও বোর্ডিং খরচও ছিল না। বিচারের কোর্টফি, উকিলফিস, সহরে যাওয়ার খোরাকী

পাথেয়, স্বাক্ষীর-খোরাকী, আমলা-প্রণামী ব্যয় ছিল না। এই জন্যই প্রাচীন হিন্দু অর্থ-চিন্তহীন হইয়া, ষড়ঋণ-শোধ, লোক-সেবা, ধর্ম্ম-সাধন করতঃ, সর্ব্বত্র ভালবাসা, ত্যাগ, মহত্ত্ব দেখাইয়া আনন্দে জীবনযাপন করিতে অবসর পাইত। প্রত্যেকের স্বাধীন গৃহ ছিল, কুটীর হইলেও অপরে তাড়াইয়া দিবার ভয় ছিল না, কেহ ঘরে আসিলে খোরাকীর ও ভাড়ার চিন্তায় তাড়াইয়া দিত না। সামান্য শাক ভাত খাদ্য হইলেও, স্নেহ ও আদর মাখা হইয়া, তাহাই সকলের অমৃততুল্য বোধ হইত। তাই একজন দেশভ্রমনে বাহির হইলে, বিনাঅর্থে আনন্দে সুখে ঘুড়িয়া আসিতে পারিত। হিন্দু-সভ্যতা এইরূপে অর্থের প্রয়োজনীয়তা বিনাশ করিয়া অর্থ-সমস্যাকে এবং জাতি জাতিতে পৃথক কর্ম্ম বিভাগ দান করতঃ বেকার-সমস্যাকে এবং অর্থ-চিন্তা ও তাহার জন্য চেষ্টাকে নিরোধ করিয়াছিল ; তাই অপরাধ পরায়ণতাকে ও মানব-সমাজ হইতে তাঁহারা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নবসভ্যতার-জ্ঞান, মানবকে শুধু রাজার বাহিরের সুখ—রাজ-প্রাসাদে বাস, রাজ-বেশ, রাজ-ভোগাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছে, এবং সেইজন্য মানব-জাতিকে কুলী-জীবন দান করিয়া দারুণ অর্থ চিন্তা ও চির-দাসত্বে ডুবাইয়া, প্রকৃত মানবত্বের ত্যাগ, দয়া, স্নেহ, মমতা, ঈশ্বর-যুক্ততাকে বিলোপ করতঃ মানব সমাজের সুখ, শান্তি, পবিত্রতাকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। হিন্দু-ঋষি সামান্য কুটীরে বাস করিয়া, দীনের বেশে, শাকান্ন ভোজন করিয়াও, যাহাতে মানবগণ রাজার মত প্রকৃত সুখ শান্তি অন্তরে ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকৃত সুখ শান্তি—স্বাধীন থাকিয়া অর্থ-চিন্তা ও পর-শাসনহীন, নিশ্চিন্ত, হীনতা, বর্জ্জিত ত্যাগ, দয়া স্নেহময় স্বজন সঙ্গে থাকিয়া ঈশ্বর, শ্রদ্ধাযুক্ত জীবন যাপন ; হিন্দু-সভ্যতায় প্রত্যেক মানব তাহা ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

প্রাচীন সমাজ-শাসনাদি বিলোপ করিয়া, অর্থ-মজুরীর বিচারকের হস্তে, বিচারভার তুলিয়া দেওয়ায় ও বিষয়-স্বার্থহীন সাধক, পণ্ডিত ব্রাহ্মণের স্থানে, সর্ব্ববর্ণের লোককেই উকিল মোক্তার হইয়া বিচারের আয়িন-ব্যবস্থা দানের অধিকার দেওয়ায়, মানবের রক্ষার প্রধান আশ্রয় বিচার-বিভাগের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হিন্দুসভ্যতায় যেই বিচার-বিভাগের নাম ছিল ধর্ম্মাধিকরণ, আজ তাহা একেবারে অধর্ম্মের সুদৃঢ় দুর্গ হইয়া উঠিয়াছে। আজ বিচারালয় মানবের সর্ব্বনাশের যন্ত্র, সম্পদ নাশের মহাব্যসন, শত্রুতা-সাধনের প্রধান আশ্রয়। আজ অর্থব্যয় করিতে পারিলে বাকপটু চতুর আয়িনজীবীর সহায়তায়, অসত্যকে সত্য করা যায়। আজ ধূর্ত্ত অর্থলোভী উকিল, অপরাধীর দলকে আয়িন বাঁচাইয়া চলিবার উপায় বলিয়া দিয়া, তাহাদের অর্জ্জিত ধনের অংশ ভোগ করে; কুপরামর্শ দিয়া গৃহস্থকে মোকদ্দমারস্ত করিয়া, তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করতঃ নিজে অর্থবান হয়। চতুর আয়িনজীবী অর্থজন্য কুটপ্রশ্ন ও বাক্য-কৌশলে সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে। তাইত হিন্দু সভ্যতায় স্বার্থজ্ঞানহীন ঈশ্বরযুক্ত শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণের হস্তে অপরাধ-নির্ণয় ও শাস্তি-ব্যবস্থা দান উকিলের কর্ম্ম সপিয়া দিয়া ছিলেন। বর্ত্তমানের শাসনের উদ্দেশ্য, প্রজাকে শাসনের ভয়ে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা। আর হিন্দু সভ্যতায় সমাজ-শাসনাদির উদ্দেশ্য ছিল, মানবকে অপরাধের পথ হইতে ফিরাইয়া আনা, আর যাহাতে অপরাধ না করে, তাহার ব্যবস্থা করা। তাই স্নেহের ভাজন কুলের লোক, গ্রামের লোক অপরাধীর অবস্থা বুঝিয়া সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড ক্রমে চারি উপায়ে দোষীকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেন। গ্রামে বিচার হইত, যাহারা দোষীর সাক্ষির স্বভাব জানে

বিচার সমস্যা

তাহারাই বিচার করিত, তাই সত্য ধরা পরিত। আজ বিদেশাগত বিচারক, অধর্ম্মরত সাক্ষি ও স্বার্থরত উকিলের হাতে পরিয়া সত্যবিচারে অক্ষম। তাই আজ বিচার বিভাগে নানা সমস্যার উদয় হইয়াছে, বিচারালয়ের উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়াছে।

শিক্ষা সমস্যা

এই বিচার বিভাগের মত, শিক্ষা বিভাগেও তাপস, ঈশ্বর-যুক্ত চরিত্রবান ব্রাহ্মণের স্থানে সর্ব্ববর্ণের মানবকেই শিক্ষক হইবার অধিকার দান করায়, মানবের জ্ঞানলাভের আশ্রয় শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বনাশ সাধন হইয়াছে। এখন বিদ্যালয়ে আর প্রকৃত মহত্ত্বময়, দয়া ও ত্যাগশীল, ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানব গঠিত হয় না। শিক্ষার দোষে গৃহস্থের সংসার-সুখ, সমাজ-সুখ, মানবের সর্ব্ববিধ সুখ, শান্তি ও ঈশ্বর-যুক্ততা বিনষ্ট হইয়াছে। হিন্দুর তাপস ব্রাহ্মণ-শিক্ষক, একই গ্রন্থ, একই ভাবে কোটী কোটী বর্ষ ধরিয়া শিক্ষা দান করতঃ, সর্ব্বদা মানব গঠন করিয়া আসিয়াছিল ; আজ বর্ষে বর্ষে পাঠ্য পরিবর্ত্তন, শিক্ষক পরিবর্ত্তন, শিক্ষকের পরীক্ষা, পরিদর্শকাদি নিয়োগ করিয়া শাসনাদিতেও, তেমন উদ্দেশ্য মত কর্ম্ম সম্পাদন হইতেছে না! উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাবিভাগ আজ উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট, নানা সমস্যা পূর্ণ।

শিক্ষণীয় বিষয় নির্ণয়।

যাহা যাহা জানিলে মানবের জানিবার আর কিছুই বাকী থাকিতে পারে না, তাহা নির্ণয় করিয়া হিন্দুঋষি শিক্ষার বিষয় নির্ণয় করিয়া ছিলেন। তাইত তাহাদের শিক্ষার মূল গ্রন্থ কখনও পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। নব্যগণ এখন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষার মূল নির্ণয় করিতে না পারায়ই, শিক্ষার বিষয় পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। হিন্দু ঋষি শিক্ষা-বিষয় প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মানবগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-শক্তির বিকাশ—জীবের

মুক্তি, ভগবান লাভই একভাগ, আর মানবের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ—পরিজন, মানব-সমাজ লইয়া সুখ সম্মান, ধন সম্পদ লাভ করতঃ আনন্দ ভোগের জ্ঞান দ্বিতীয়ভাগ। আধ্যাত্মিক-জ্ঞান উন্মেশের নাম জ্ঞান, আর বিষয়-জ্ঞান উন্মের নাম বিদ্যা। ইহার জ্ঞান-অধ্যায় দশ ভাগে বিভক্ত, তাহাই মহাপুরাণের দশ লক্ষণ। এই দশ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিলেই মানবের জ্ঞান পিপাসার তৃপ্তি হয়, যাহা জানিবার তাহাদের সব জানা হয়। আর বিদ্যা-অধ্যায়ে, আনন্দ ভোগের নৃত্য,গীত, চিত্র, ছদ্মবেশ ধারণ, কুহক-বিদ্যা, অভিনয়-বিদ্যা, কাব্য, উদ্যান, কৃষি, অঙ্ক, বাণিজ্য, অর্থনীতি হইতে, জীবনযাপনের শিক্ষা, চিকিৎসা জ্যোতিষ ও যুদ্ধ জ্ঞানাদি চতুষষ্টি প্রকার পৃথক বিষয়ের জ্ঞানকেই চতুষষ্টি কলাবিদ্যা বলে। মানবের জ্ঞানের দশটী বিষয়—সর্গ, বিসর্গ স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর ঈশানুকথন, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়।

১। **সর্গ**—নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ইচ্ছায়, কেমনে প্রকৃতিতে গুণের ক্ষোভ হইয়া, সৃষ্টির মূল মহতত্ত্বাদি হইতে, তত্ত্বাধিপতি দেবতা ও সূক্ষ্ম ভূতের গঠন হয় সেই সৃষ্টির অধিদৈব ও আধ্যাত্ম সর্ব্বজ্ঞানের বোধ, এককথায় বেদান্ত ও সাংখ্যজ্ঞান। ২। **বিসর্গ**—গুণত্রয় হইতে জড় সৃজনতত্ত্ব। প্রাণীর উদ্ভব তাহাদের জাতিবিভাগ ও প্রত্যেকের স্বভাবের মূল নির্ণয় ; সৃষ্টরাজ্যের স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালাদির সংস্থান পৃথিবীর দেশাদির পরিচয় ভূগোল-জ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞান বুঝায়। ৩। **স্থান**—ক্রিয়া-শক্তির ফল ও অফল বর্ণনা। এই অধ্যায়ে সৎকর্ম্মদ্বারা মানব কেমন উৎকৃষ্ট গতি, সুখাদি অর্জ্জন করিতে পারে ও নিকৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা কেমন নিকৃষ্টগতি, দুঃখাদি প্রাপ্ত হইতে পারে, কর্ম্মরাজ্য সম্বন্ধে বিধাতার অভিপ্রায় নির্দ্দেশ করিয়া, পতনের রকণগুলিকে পাপ ও উন্নতির করণ-গুলিকে পুণ্য নাম দিয়া জানান হইয়াছে। ইহাতে মানবের পাপসংবাদে

মহাপাপ, পাপ, উপপাপ ইত্যাদি হইতে, অমর্য্যাদা, অশ্লীলতাদি, আর পুণ্যমধ্যে দয়া, দান, লোক-সেবা, প্রাণী-সেবাদি হইতে ব্রত, তীর্থ, দেব উপদেব আদির পূজার ফল ও ভগবত আরাধনার প্রকার ফলাদির জ্ঞান বুঝিতে হইবে। ৪। **পোষণজ্ঞান**—কর্ম্মফলের উপরেও যে ভগবানের একটী কৃপাশক্তি আছে, সেই ভক্তানুগ্রহ-শক্তি, যাহা হইতে নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ-বিকাশ এই জড়জগতেও মানবের দৃষ্টি গোচর হয়; যাহাতে কর্ম্মবাদের উপরে ভগবান ভজনের প্রয়োজনীয়তা-জ্ঞান জন্মে, ভগবানের সেই ভক্তবৎসলতা, আর্ত্তত্রাণ, প্রণত-পালক, ভব-দুঃখ-জলধি পারকারি শক্তির সংবাদই পোষণ-জ্ঞান। বাইবেলের সমুদ্রের পথদান, অগ্নির প্রাকার, খাদ্যবর্ষণ ইত্যাদি, যিশুর রোগ সারান, জলে হাটা, মৃতের জীবন দান, সামান্য দ্রব্যে বহু লোককে ভোজন করান, সেই ঈশ্বরের পোষণ কর্ম্মই প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে ধ্রুব প্রহ্লাদাদি অনন্ত ভক্তের জীবনে, ভগবানের সেই অনন্ত পোষণ গুণের কথাই বর্ণিত হইয়াছে, এই সবই পোষণ জ্ঞান সংবাদ। ৫। **উতি জ্ঞান,**—মানবের কর্ম্মের বাসনার প্রকার ও উদ্ভব রহস্যই উতি জ্ঞান। এই তত্ত্বে প্রত্যেক কর্ম্মের তিনগুণ ও গুণাতীত ভাবে কর্ম্মের প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। গীতার সাত্ত্বিকাদি ভোজন বাসনা, সাধন বাসনা ও কর্ম্মশক্তি দানের প্রকার এই তত্ত্ব হইতেই বর্ণিত হইয়াছে। ৬। **মন্বন্তর**—জগতের বৈচিত্র জন্য, বিভিন্ন কালে স্বভাব ধর্ম্মাদির বিভিন্নতা উদ্ভবের কারণতত্ত্ব ও পৃথিবীর জন্ম বিলয় ইত্যাদি জ্ঞান। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন কালে পৃথক পৃথক কর্ম্মভাব দিতে, ভগবানের মনু, পৃথক সপ্ত ঋষি, লোকপাল দেবতা ইত্যাদির সংবাদ ও মানবের জীবনাদর্শ আদি-আর্য্যগণের মহত্ত্বময় জীবন চরিত বর্ণনাই এই মন্বন্তর জ্ঞান। ইহাতে মানব কর্ম্মশঙ্কটে কর্ত্তব্য, বিপদে ত্রাণের পথ ও মহত্ত্বময়

জীবনযাপনের সংবাদ পাইত ; এই বিষয় হিন্দুশাস্ত্রের জীবনী-সম্বলিত উপাখ্যান-অধ্যায়।

৭। **ঈশানু-কথন**। ভগবানের জগতে আবির্ভাবরূপ অবতার-সংবাদ। ভগবান যদিও ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রাদি লোকপাল দেবতা সৃজন করিয়া, তাঁহাদের হাতে সৃষ্টিরাজ্যের সৃজন, পালনাদির শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দান করিয়া দিয়াছেন, তথাপি সেই প্রজাপতিগণ যখন শৃঙ্খলা-রক্ষণে অশক্ত হইয়া পরেন, তখন স্বয়ং ভগবানই আবেশ, শক্তি, অংশ বা পূর্ণসত্ত্বালইয়া এই সৃষ্টি-রাজ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহা সমাধান করেন। ভগবানের এই অবতরণের কারণ, তাঁহাদের রূপ. গুণ, ক্রিয়ার সংবাদই ভগবানের অবতার লীলারূপ ঈশানু-কথন, অর্থাৎ ঈশ্বরের কথা। বর্ত্তমানেও মহারাজা ও রাজ-প্রাতনিধিগণের রাজ্যভ্রমণ, যেমন নির্দ্দিষ্ট কালে সমাধা হয় ; পূর্ব্বেই তাহা বিজ্ঞাপিত হয় ; ভগবানের এই আবির্ভাবের কালও তেমনি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। পৃথিবীর আয়ুরূপ কল্পমধ্যে মন্বন্তররূপ ঋতুবিশেষে যুগরূপ তিথিতে তাহা সম্পাদিত হয়। যেমন বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বর্ণিত আছে। প্রতিকল্পে এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানের অবতার হইয়া থাকে। প্রতি জীবদেহেই, যেমন জন্ম হইতে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাদি মৃত্যুপর্য্যন্ত দশ দশা একরূপ ; প্রতি বর্ষে ক্রমে একরূপ ষড় ঋতুই পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত ; পৃথিবীর জীবনেও মন্বন্তর যুগাদি বিভাগ একরূপ। তাই ব্রহ্মলোকবাসী, বহু কল্পজীবী ঋষিগণ, পৃথিবীর জীবনমধ্যে কোন্ কালে কখন কোন্ অবতাররূপে ভগবানের আবির্ভাব হয়, কি খেলা খেলেন, পূর্ব্বেই বর্ণনা করিতে পারেন। তাই শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ অবতারেও তাঁহাদের লীলা যখন

অবতার লীলার সঙ্গে মিলিয়া গেল, তখন তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া লোকে চিনিতে পারেন ; পূর্ব্বে গুণবান মানবমাত্র বলিয়াই বোধ করিয়া ছিল। নিজের অমানুষ-ঐশ্বর্য্যকে লুকাইয়া, মানবরূপে সঙ্গে মিশিয়া, নিজে আচরণ করিয়া লুপ্ত জ্ঞান ও শাস্ত্রাদির বিকাশ কারক ঋষিগণই ভাগবানের **আবেশ অবতার**। ভৃগু, বশিষ্ঠ, পরাশরাদি স্মৃতিকারক ঋষিগণই সেই অবতারের মূর্ত্তি। দৈবশাক্তর মত হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া, দুই একটী কর্ম্ম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এমন অবির্ভাবের রূপ মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন অবতারই **শক্তি-অবতার**। ব্যাস, কপিল, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কী আদিরূপে আবির্ভূত হইয়া জগতে বহুদিন থাবিলেও, দুই একটী কর্ম্ম-সত্তার খেলামাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ইহারাই **অংশ অবতার**। আর শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে বহুদিন থাকিয়া, ভগবান অনেক গুণ-সত্তার বিকাশ করিয়া, জগতের অনেক দিকের মার্জ্জনা করতঃ, জীবকে পূর্ণরসানন্দ ও কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া, ইহারাই পূর্ণব্রহ্মের **পূর্ণ অবতার** বলিয়া হিন্দু-শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে এক ভগবানই অল্প ও অধিক সত্তার বিকাশ করেন, তাই কর্ম্মভেদে আভাষাদি নামভেদ করিলেও, ইহাদের সকলেই পূর্ণ ভগবৎ-সত্ত্বা। তাই ইহাদের প্রত্যেকের সংবাদই পূর্ণব্রহ্মের সংবাদ, পরমেশ্বরের কথা।

৮। **নিরোধ**। ভগবানের সৃষ্টিবাসনার উদয়ে জগত উৎপন্ন হইয়া, তাঁহার লীলাদর্শন-মতি পর্য্যন্তই তাহা চলিতে থাকে। তিনি যখন সেই ইচ্ছার নিরোধ কারন, তখন সৃষ্টিরাজ্যের বিলোপ হয়। এই সৃষ্টিরাজ্যের স্থিতি ও লয়ের কাল-জ্ঞান, কারণ ও স্বরূপ বর্ণনাই এই নিরোধ অধ্যায়। হিন্দুশাস্ত্রমতে জীবের মৃত্যুতেই তাহার

শেষ হয় না; আত্মারূপ সূক্ষ্ম জীবসত্ত্বা জীর্ণদেহ ত্যাগ করে মাত্র; আবার নবদেহ ধরিয়া সে পৃথিবীতেই কর্ম্ম-পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। জীবাশ্রয় পৃথিবীর যখন মৃত্যু হয়, সেই প্রলয়কালে, পৃথিবীর আত্মা সকল জীবের আত্মা লইয়া, অসংখ্য পৃথিবীর আশ্রয় সূর্য্যে যাইয়া প্রবেশ করেন, তাহাই কল্পান্ত কাল। কল্পান্তে সূর্য্যমণ্ডলের আত্মা—জগত সৃজন-কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ, তেমন এক কল্পকাল নিদ্রা যাইয়া নিদ্রাভঙ্গে আবার পৃথিবীর সৃজন করেন। তখন পৃথিবীর আত্মাসহ সর্ব্বজীবের আত্মা আবার দেহ ধরিয়া, আবার কল্পান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে থাকে। দুই কল্পে একদিন ধরিয়া শতবর্ষের পরে, সেই ব্রহ্মার আয়ুশেষ হয়। তখন মহা প্রলয় হইয়া সূর্য্যসহ সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় হয় এবং সূর্য্যের আত্মা ব্রহ্মা, সকল পৃথিবীর আত্মাও জীবের আত্মা লইয়া পরব্রহ্মে লীন হয়। সেদিনই ভগবানের সৃষ্টিবাসনার নিরোধ, জীবেরও জন্মপ্রবাহ ও কর্ম্মপ্রবাহের নিরোধ হয়। জীবের মৃত্যু হইতে পৃথিবী ও সূর্য্যের এই স্বাভাবিক বিলয় জ্ঞানই হিন্দুশাস্ত্রে জগতের প্রাকৃতিক লয় বা নিরোধ জ্ঞান।

৯। **মুক্তি**। প্রাণিগণমধ্যে একমাত্র মানবজাতিই ভগবানের উপাসনা-অবলম্বনে, এই অনন্ত-কাল-ব্যাপী জন্ম মৃত্যুর প্রবাহকে উল্‌টাইয়া দিতে সক্ষম। সাধনাদ্বারা তাহারা এই দেহ হইতে পৃথিবী ও সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া, পূর্ণ ভগবানের নিকট চলিয়া যাইতে পারে; যেই ধামে যাইলে আর আসিতে হয় না, সেই পরম-ধামে, ভগবানকে পূর্ণরূপে জানিয়া, তাঁহাকে লাভ করিতে পারে; ইহার নাম আত্যান্তিক লয়। মানব-দেহ বিনা দেবদেহেও ইহার সাধনা হয় না। মুক্তির জন্য কত প্রকার সাধনা হইতে পারে, কোন সাধনপথে কি বিঘ্ন, কি ভাবে সাধনে কত দূর

মুক্তি হয়, এই বিষয়ের সংবাদই মুক্তি-জ্ঞান। এই অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণভাবে উপাসনা, একেশ্বর ও বহু দেবাদিসমন্বিত ঈশ্বরের উপাসনা; কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তিপথে ভজনা; সকামে, অকামে, মুক্তিকামে ও ভগবানকামে ভজনা ইত্যাদি ও তাহাদের ফলে সালোক্য সামিপ্যাদি পঞ্চবিধামুক্তির সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরে শেষ-জ্ঞান আশ্রয়।

১০। **আশ্রয়**। মানব গুণপ্রাধান্য, শক্তিপ্রাধান্য দেখিলেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতে চায়। শ্রেষ্ঠ-মানব হইতে যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি উপদেব ও পরে ইন্দ্রাদি দেবতা ক্রমে শ্রেষ্ঠ শক্তিধর। তাই জ্ঞানানুযায়ী মানবগণ কেহ নরের—রাজাদির, কেহ উপদেব ও কেহ দেবতাকে আরাধনায় তুষ্ট করিয়া আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। কাহাকে আশ্রয় করিলে সত্যই মানব সর্ব্বদিকে নির্ভয় ও দুঃখহীন হইয়া, ইহকালে সুখ, শান্তি, পরকালে মুক্তি পাইতে পারে—সেই উপদেব, দেবতা হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতারও যিনি আশ্রয়, সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সংবাদই আশ্রয়-জ্ঞান। ভগবানের নির্গুণ স্বরূপ ও তাঁহার সগুণ স্বরূপের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যাংশের সংবাদ, তাঁহার ক্রিয়াশক্তি, বীর্য্যশক্তি, কৃপাশক্তি ও প্রেমলীলা-শক্তির জ্ঞান লাভই আশ্রয় জ্ঞান। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণাদি অবতার লীলার দৃষ্টান্ত বিনা, ভগবানের সেই সব গুণের সন্ধান লাভের অন্য উপায় নাই। তাই অবতার লীলার মধ্যে সেই সব গুণ ও শক্তি দর্শনই আশ্রয় জ্ঞান।

এই দশবিধ জ্ঞানের আলোচনায় যে মানবের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসার পূর্ণশান্তি, তাহা বোধ হয় বর্ত্তমানেও কোন দেশের কোন জ্ঞানবান অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান শিক্ষায় ইহাদের

অনেক অধ্যায়ের অভাব বশতঃই, বার বার পাঠ্য বিষয় পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইতেছে। হিন্দু সভ্যতায় কোটী কোটী বর্ষ, একভাবে একই গ্রন্থ ও একই বিষয়সমূহের শিক্ষাদিয়া, জ্ঞান শক্তিধর পূর্ণমানব গঠণ করিয়া আসিয়াছিল। বর্ত্তমানেও যে ২।৪ জন সত্যজ্ঞানবান মানব পাওয়া যায়, তাহার কারণ সন্ধান করিলেও দেখা যায়, তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার উপরে গোপনে প্রাচীনের অনুশীলন দ্বারাই তাহা লাভ করেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে জ্ঞান একটী নিত্য সত্যসত্বার বিকাশ; সর্ব্বকালেই তাহা একরূপ, সকলের জন্যই একরূপ, তাই চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় একটী বোধ-সত্বা।

স্বাধীনতা ও সুখ শান্তি সমস্যা।

প্রাচীণের সুখ শান্তি ও স্বাধীনতাকে বর্ত্তমানশিক্ষা ভিন্নরূপ দান করিয়া বসিয়াছে। পূর্ব্বে স্বাধীনতা বলিতে একমাত্র জগতপতি ভগবান বিনা, বিশ্বজগতে আর কাহারও ভয়ে সদাচার ও সত্যপথ ত্যাগ না করা বুঝাইত। ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির শত প্রলোভনে ও কষ্টবোধেও শাস্ত্রবর্ণিত আর্য্যাচারে—পবিত্রতা, সত্য, ত্যাগ, ক্ষমা, দয়া, পরসেবা, স্নেহ-মৈত্রতা রক্ষা করিতে পারা, এবং ভগবান যাহাদের সঙ্গে সঙ্গদিয়া সেবা ও শাসন সম্বন্ধে বাঁধিয়া দিয়াছেন, জন্মজন্ম যাহাদের সঙ্গে মানব সম্বন্ধান্বিত,—যাহাদের স্নেহ, সেবা, শাসন ও শিক্ষাদানে, কীটতুল্য শিশু হইতে মানবত্ব লাভ করিয়াছি, সেই মাতা পিতা, সহোদরাদি আত্মীয়-সঙ্গে জন্মভরিয়া, সেইরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারা—দুঃখ, বিপদ, দেহে-ন্দ্রিয়ের কষ্ট, অপমান, দারিদ্রতা কিছুতেই সে সম্বন্ধ ছিড়িতে না দেওয়া শক্তিকেই বুঝাইত। **বর্ত্তমানে স্বাধীনতা** বলিতে, প্রত্যেক মানব তাহার পৃথক দেহের মত, মন ও ক্রিয়া-শক্তিকেও স্বাতন্ত্র্যে রাখিয়া বিচরণ করিতে পারা বুঝায়। এই স্বাধীনতার দোষগুণ

স্বাধীনতা অধ্যায়ে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এই স্বাধীনতা মানবের সকলদিকের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ বিনষ্ট করিয়া দেয়। নব-শিক্ষিতগণ এই আকাশকুসুমবৎ অতি অপূর্ব্ব স্বাধীনতা লাভের জন্য, সামাজিক নীতি শীলতার বাঁধনকেও স্বাধীন ইচ্ছার বাধা; পারিবারিক স্নেহ ভালবাসাকে স্বাধীনতা রোধক মায়ার বাঁধন এবং ঈশ্বর-ভয়কে অস্বাভাবিক আতঙ্ক, স্বাধীনতার সঙ্কোচ স্থির করিয়া, মানবসমাজ হইতে এই তিনকেই বিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেইজন্য রাজবলে আইন করিয়া, সন্তান পিতামাতা হইতে, শিষ্য গুরু হইতে, দাস প্রভু হইতে, পত্নী পতি হইতে শাসনের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। মানব-সন্তান ভগবানকে ভুলিয়া, জনক জননীর স্নেহের প্রভাবের বাঁধন, নব-শিক্ষা-অস্ত্রে ছেদন করিয়া, তাঁহাদের ভালবাসা ও সেবার ঋণের বোঝা, বলপূর্ব্বক মস্তক হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, মুক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। আজ মানবসন্তান বাল্যগতে অষ্টাদশ বর্ষে, যৌবনের প্রারম্ভে আইন বলে সাবালকত্ব লাভ করিবে। তখন সে সর্ব্বদিকে মুক্ত; আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মত সে একটি স্বাধীন জীব, দ্বিতীয় কাহারও সঙ্গেই তাহার কোনরূপ বন্ধন নাই। সে ঈশ্বরের কেউ নয়, পিতা মাতারও কেউ নয়, এমন কি মানব সমাজ, কি দেশের কাহারও সে কিছুই নয়; সে কেবল তার, তাহার দেহেন্দ্রিয় প্রবৃত্তির; তাই আপনার তৃপ্তি ও সুখসন্ধানই তাহার কর্ম্মজীবনের সার্থকতা।

এই স্বাধীনতা-সুখকে ভোগ করিতে যাইয়া, আজ মানবগণ সর্ব্বদিকে মনুষ্যত্বহীন, পশুতুল্য উচ্ছৃঙ্খল, নীতি ও স্নেহ বিহীন সদা অপরাধ পরায়ণ, কেবল শাসন-যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ সর্ব্ব-দেশেরই রাজশক্তি, নূতন নূতন আইনের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, কঠোর

শাসনের বেষ্টন মধ্যে মানব-সমাজকে আবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। মানব-সমাজ আজ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বপ্রকারে মহত্ব ও সুখ, শান্তি হীন হইয়া, একমাত্র রাজ-শক্তির গলগ্রহ—উঠিতে, বসিতে, ভোজনে, গমনে রাজ-শাসনের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান মানব-সমাজের অবস্থা ও রাজ-শাসনের বিষয় অলোচনা করিলে, সত্যই এই বোধ হয় যে বর্ত্তমান-শিক্ষা ও সভ্যতা প্রকৃত মানব-গঠনে ও মানবকে সুখ শান্তি স্বাধীনতা ভোগ করাইতে অপারগ হইয়াছে। মানব-সমাজের এমন পতন, সর্ব্বদিকে অধীনতার অবস্থা, এই পৃথিবীতে আর কথনও কোন দেশে হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না। আজ রাজ-শক্তির চৌকিদার ও পুলিশ শাসন বিনা, মানবের গৃহ-শান্তি, নারীর সতীত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষা অসম্ভব, ধন-সম্পদ রক্ষা অসম্ভব। পিতা মাতা সন্তানের প্রতি অত্যাচার করে কি না, নিয়মিত বয়সে বিদ্যালয়ে পাঠায় কি না, বিবাহ দেয় কি না তাহাও আজ রাজ-শক্তির দেখিতে হয়, আইন বলে বাধ্য করাইয়া করাইতে হয়। আনন্দোৎসবের লোকযাত্রা (প্রসেসন) সভাসমিতি রাজ-সম্মতিসহ রাজ-প্রহরীর সহায়তায় সম্পন্ন হয়। বিবাহের বৈধতার সাক্ষী রাজ-শক্তি না থাকিলে চলে না, বিদ্যাদান, বিবাদ মিমাংসা, চিকিৎসা, দরিদ্রসেবা, রোগীর শুশ্রূষা ও রাজ-শক্তির ও শাসনের যোগ বিনা সমাধা হয় না। রাজ-শক্তির ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও শাসনসাহায্যে পথ ঘাট, পুকুর গড়ে ও রক্ষা করে; রাজ-শক্তিযুক্ত মিউনিসিপ্যালিটী গ্রামের গৃহের ময়লা পরিষ্কার করে, বাটীর গৃহ পায়খানা গড়িবার স্থানাদি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। আজ মানব কোথাও যাইতে হইলে, রাজ-শক্তির যাইবার আদেশ ও নূতন দেশে প্রবেশের অনুমতিদানের প্রয়োজন। রাজ-শক্তির অনু-মোদন বিনা বিপন্ন অতিথি আশ্রয় পায় না; খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা

রক্ষা হয়না। মানব-সমাজের এই অবস্থা কি তাহাদের মনুষ্যত্বহীনতা ও অপরাধ পরায়ণতার নিদর্শন নয়? এইরূপ সর্ব্বদিকে রাজ-শাসনের বাঁধন কি মানবের স্বাধীনতাহীনতা নয়? এই রাজ-শক্তির শাসন ও অধীনতার উপরেও, স্বাধীনভাবে রাজসুখ ভোগ করিতে কুলীজীবন ও হোটেল জীবন গ্রহণ করিয়া, সেই সুখ রক্ষা করিতে, মানব আজ অর্থদাতার সম্পূর্ণ অধীন ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। এক দিন অর্থ না দিতে পারিলেই কুলী-জীবন ও হোটেল জীবনের সুখের রাজ্য-চ্যুত হইয়া, নিরাশ্রয় ও নিরাহারে পথে বসিতে হইবে যে! তাই তাহা রক্ষা করিতে নাসিকাবদ্ধ পশুর মত অর্থদাতার ইঙ্গিতেই চলিতেছে, ফিরিতেছে; নিজের সর্ব্বদিকের স্বাধীনতা, কর্ত্তব্যতা, নীতিধর্ম্ম ও স্নেহ-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, অপমান, নির্য্যাতণ গ্রাহ্য না করিয়া, শক্তির অতিরিক্ত খাটিয়া, নিজের বল, রক্ত, স্বাস্থ্য ও আয়ু পর্য্যন্ত বলিদান করিতেছে। মানব আজ শোকে সমবেদনার সান্ত্বনা, কাতরতায় স্নেহযুক্ত অভয় ও উৎসাহ, বেদনায় স্নেহের সেবা, অবসন্নতায় প্রাণজুড়ান সাংসারিক স্নেহের আলাপন শুনিতে পায় না। মানবের আজ বাসের স্বাধীন গৃহ নাই, স্নেহভরা সংসার, দয়া বাৎসল্যভরা সমাজ নাই, বিপদে বন্ধু নাই, দোষে ক্ষমা নাই, অথচ সর্ব্বদিকে অধীনতা ও শাসনের তাপ, কর্ম্মের শ্রম আছে। পেট অন্নহীন, দেহ বলহীন, মন তেজহীন, হৃদয় সন্তোষহীন, নব-সভ্যতার জ্ঞান মানবকে আজ এমনি সর্ব্বহারা, নিরাশ্রয়, চিরদুঃখী করিয়া তুলিয়াছে। আজ সৃষ্টিরাজ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কারখানা গৃহ মাত্র। মানবকুল তাহাতে খাটিবার কুলী, জীবন যাত্রার সংগ্রহই তাহাদের মজুরী। মানব আজ যন্ত্রের মত প্রাণ স্পন্দনহীন একটী কল মাত্র; কলের মত চলাই তাহার সার্থকতা। তাই পূর্ব্ব-

মানবের তত্ত্বালোচনা, ঈশ্বর-সাধনা, স্নেহ-মমতা, জাতি ও দেশের কল্যাণ-সেবাদি কর্ম্ম সমস্তই বিলুপ্ত করিয়া আজি কেবল স্ব ভোগবিলাস-সাধনাই জীবনের মোক্ষ উদ্দেশ্য করিয়াছে।

**পূর্ব্বে** হিন্দুসভ্যতায় ভারতের দীনদরিদ্রও আহারে, বিহারে, শ্রমে, বিশ্রামে, নরসেবায় ও আনন্দভোগে স্বাধীন ছিল। শুনিয়াছি অন্যদেশের মানব এই সুখ-স্বাধীনতার জন্য, "দরিদ্র হইলে যেন ভারতে জন্মগ্রহণ করি" এইরূপ প্রার্থনা করিত। কেন না, ভারতে দরিদ্রেরও পৃথক স্বাধীন কুটীর আছে, শ্রমে স্বাধীনতা আছে, ভোজনে, গমনে পরের অধীন নয়। স্নেহময় আত্মীয়-স্বজনমধ্যে দুঃখ-বিপদে সদা স্নেহের সেবা ও সাহায্য পাইত। **আজ** সকল মানব স্ত্রী পুরুষ বালক পর্য্যন্ত কুলী-জীবন লইয়া অর্থদাতার বিধানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার, বিশ্রাম ও শ্রম করিতে বাধ্য। তাহাদের অমতে জনক জননী, স্ত্রী পুত্রের রোগেসেবা বা মৃত্যুকালেও নিকটে যাইবার উপায় নাই; নিজের শ্রান্তি বা রোগেও বিশ্রামের অধিকার নাই। **হিন্দুর** সুখ শান্তি ছিল, অঋণী, অপ্রবাসী হওয়া। অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন বিনা অন্যের নিকট অর্থ, স্নেহ সেবাদি গ্রহণ করিয়া ঋণী না হওয়া ও আত্মীয়স্বজন বিচ্যুত না হইয়া, তাহাদিগকে লইয়া, সুখ, দুঃখ ও আনন্দ ভোগ করা। আত্মীয়—জন্মজন্য ঈশ্বরেচ্ছায় যাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছি, পিতা-মাতা, ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ। স্বজন—আমি পরে যাহাদিগকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, পত্নী, পুত্র, শ্বশুর-কুল ও বন্ধু-বান্ধব। ইহাদের ধন, স্নেহ ও সেবা গ্রহণে প্রতি মানবেরই ন্যায্য অধিকার থাকে। তাই ইহাদের অর্থ ও সেবা গ্রহণে কাহারও ঋণ হয় না। অন্যের নিকট গ্রহণ করিলেই তাহা অন্যায্য তাই ঋণতুল্য হয়; তাহার পরিশোধ না করিলে সেজন্য আবার

জন্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হয়। পিতা-মাতাদি গর্ভে ধারণ ও শৈশবে পালনে নিজেদের সুখ-স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া আমার জন্য কত কষ্ট করিয়াছেন, নিজেরা না খাইয়া খাওয়াইয়া, নিজের কষ্ট হইলেও আমায় সুখ, সেবা ও আনন্দ দিয়া, আমায় পালন করিয়াছেন। তাই নিজের দুঃখ, কষ্ট, আনন্দের ব্যাঘাত হইলেও, তাহাদিগকে ত্যাগ না করা, সদা তাহাদের দুঃখ-বিপদে সুখ, সেবা দান করা ও আনন্দের অংশ দান করা মানবসন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য, না করা অমানুষতা। নবশিক্ষিতগণ আজ স্বসুখের বিঘ্ন, ধন ও সুখের অংশ দিতে হইবে বলিয়া বা তাহাদের দুঃখের অংশ বহিতে হইবে বলিয়া, অনায়াসে জনক-জননী ও সহোদরকে পরিত্যাগ করিয়া যায়; তাহাদের দুঃখ, বিপদ, দারিদ্রতায় সাহায্য ত দূরের কথা, তাহাদিগকে অমার্যাদা করিতে, দুঃখ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না; তাহাদিগকে ফেলিয়া একা বা মাত্র স্ত্রী-পুত্র লইয়া অনায়াসে রাজ-তুল্য ভোগ-বিলাস ও সুখ-ভোগ করিতে পারে। শত শত ক্ষুধাতুর দরিদ্র, দুঃখী স্বজাতীয় মানবের ও আত্মীয়ের পিপাসায় বিশুষ্ক-মুখ, অশ্রুসিক্ত দৃষ্টির সম্মুখে, বহুমূল্য বেশে সাজিয়া, বহুমূল্যের সজ্জিত গাড়িতে উঠিয়া, বহু অর্থে বিলাসদ্রব্য ও খেলনাদি কিনিতেও কুণ্ঠিত হয় না; সদা হোটেলের রাজভোগে, থিয়েটারাদির টীকেটে, জুয়াখেলায় কত বৃথাব্যয়ে অর্থ নষ্ট করে, তবু আত্মীয়-স্বজন সাহায্য পায় না। মানবের এত দুঃখ ও হীনতার কারণ, বর্ত্তমান সভ্যতার নবশিক্ষা। ঈশ্বর-সম্বন্ধ ও আধ্যাত্ম আলোচনাহীন মানব, তাহার হৃদয়ের পর্ব্বত-প্রমাণ অতৃপ্তি, মনের জ্ঞানহীনতার নীচতা, জীবনের উপর অন্তরে বাহিরে দুর্ব্বিসহ অধীনতার পীড়ন, তা'তে অভাব, পরিশ্রমের তাপ এই সবকে ভুলিবার জন্যই, এমন করিয়া আজ আনন্দ খুঁজিতে, এমন মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া,

যত অধর্ম্ম ও হীন আনন্দে ডুবিয়া থাকিতে চাহিতেছে। হিন্দু-সভ্যতায় ঈশ্বর-সম্বন্ধ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারাই তৃণ-কুটীরে শাক-ভাত ভোজনের জীবন মধ্যেও, মানব মহারাজার স্বাধীনতার নিশ্চিন্ততা, তৃপ্তি ও আনন্দ ভোগে সমর্থ হইয়াছিল। এবং ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির হীন আসক্তিকে বিলোপ করিয়া, অপরাধের অতীত হইয়াছিল।

যন্ত্রশিল্প ও যৌথকৃষি, এই দুইটীকে নব-সভ্যতা বড়ই সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই যন্ত্র-শিল্পের কাপড়ের কল-আদি ও যৌথকৃষির চাবাগান-আদি মানবকে কুলি-জীবন দান করিয়া পশুতুল্য বা যন্ত্রতুল্য করিয়া ফেলিয়াছে। মানব আজ মানুষের মহৎগুণ, স্নেহময় সংসারজীবন ত্যাগ করিয়া, কলের অচেতন অংশের মতই কেবল খাটিবার যন্ত্রমাত্র হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাহাদের চরিত্র পশুচরিত্র হইতেও ঘৃণ্য। মানবকে এমন জ্ঞানহীন পশু করতঃ সর্ব্বদিকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া রাখা কি মনুষ্যত্ব। এক দিন দেশবিশেষে মাত্র কল ছিল, তাই অন্যদেশে বিক্রয় করিয়া তাহারা লাভবান হইত। আজ সর্ব্বদেশেই কল, সর্ব্বদেশেই যৌথকৃষি, তাই পূর্ব্বের অনেক কল ও যৌথকৃষি বিনষ্ট হইবেই। আবার রাজ্যে যুদ্ধাদি, রাষ্ট্রবিপ্লব আসিলেও, এই কল ও বাগানের কর্ম্ম বন্ধ হইবে। সেইকালে এই কোটী কোটী পশুতুল্য অশিক্ষিত কুলি, যখন অন্নের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া বাহির হইবে, তখন তাহাদের হস্তেই দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। বর্ত্তমানেই তাহার কতক আভাস বেকার-সমস্যা-রূপে দর্শন দিয়াছে। এই যৌথকৃষি ও শিল্পের পরিণাম অতীব ভীষণ, তাই হিন্দু-সভ্যতা তাঁহার স্মৃতি-শাস্ত্রে, মহাযন্ত্রস্থাপনকে পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেকালে ক্ষুদ্র যন্ত্র, কুটীর-শিল্প ও

যন্ত্র শিল্প ও যৌথকৃষি-সমস্যা।

প্রতি গৃহস্থের পৃথক কৃষির বন্দোবস্ত, তাই তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে রাজবলে পথ-ঘাট রক্ষা করিতে হয়, পুকুরাদিও গড়িতে হয়। হিন্দু সভ্যতায় লোকের পথ বন্ধ করিলে নিজের পরকালের পথ বন্ধ হয়, পরের পথে কণ্টক দিলে নিজের সুখের পথে কণ্টক পরে ভাবিতে শিখিত। পথ ও পুল গড়িয়া দিলে নিজের মুক্তির পথ সহজ হয়, পুকুরাদি জলদানে দাতার সর্ব্ব দুঃখের তাপ নাশ পায়, আশা-পিপাসায় তৃপ্তি পায় জানিত।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডাদি অনুষ্ঠান সমস্যা

বর্ত্তমানে যেমন মানব বেশে, জানে, ভোগ-বিলাসে ব্যয় ও সুন্দর গৃহবাসে, নিজের শ্রেষ্ঠতার গৌরব প্রদর্শন বোধ করে। সেদিন পর-সেবা, পথ, পুকুর, বিদ্যালয়াদি দানে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবপূজায় দশ-জনকে উত্তমদ্রব্য ভোজন করাইয়া, সঙ্গীতাদি আনন্দভোগ করাইয়া, সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব অর্জ্জন করিতে হইত। যে ধনে দশের সেবা না করিয়া সঞ্চয় করিত, লোকে তাহাকে দেখিলে চোখ ফিডাইত প্রাতে তার অশুভ নাম লইত না। সেকালে ধনিগণ দ্বারা গ্রাম সর্ব্বদা উৎসবময় থাকিয়া, সত্যই ধন্য হইত। প্রতিমাসে পূজা-পার্ব্বণে, বিবাহে ও শ্রাদ্ধে গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে লইয়া ধনী উৎসব করিত; উত্তম ভোজন নৃত্যগীত ভোগ করিত; দরিদ্র গ্রামবাসী ও আত্মীয়গণ ধনী দ্বারা প্রতিপালিত হইত। আজ নব্যশিক্ষিত ধনিগণ, কেবল আত্মবিনোদ জন্য সহরবাসী; স্বভোগ, বিলাস, থিয়েটার, বায়স্কোপসহ জুয়াখেলায় ও ইউরোপ ভ্রমণে ব্যস্ত ও তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত; গ্রামের লোক ত দূরের কথা আজ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি আদিও বিপন্ন হইলে, উপার্জ্জনশীল নবশিক্ষিতের অর্থ-সাহায্য ও সহানুভূতিতে বঞ্চিত। ত্যাগপরা শিক্ষা দ্বারা হৃদয়ের জাগরণ বিনা, দেহেন্দ্রিয়তৃপ্তি-লালসার রোধ করিয়া, দেব-স্বভাবের জাগরণ হয় না, তাহাদের দ্বারা জগতের সেবাও হইতে পারে না।

আধ্যাত্ম-জ্ঞানসহ ঈশ্বরে শ্রদ্ধা না জাগিলেই মানব কেবল আত্মবঞ্চনা, কপট বাহ্যাচারী হইয়া উঠে। তাই আজ সর্ব্বত্রই কপটাচার দেখিতে পাওয়া যায়। আজ প্রায় লোকেরই অন্তরে মলিনতা বাহিরে শুদ্ধতা, হৃদয়ে বেদনা, মুখে হাস্য, প্রাণে দৈন্য, মুখে দর্প; অর্থহীনের ভোগীর বেশ, শূন্য-ঘটের অধিক শব্দের মত অকর্ম্মার মুখে উচ্চবক্তৃতার ধ্বনি; মানব আজ ঋণ করিয়া উত্তম খাইতে, বিলাসিতা করিতেও কুন্ঠিত নয়; সকলেরই ব্যক্তিগত অন্তর-শুচিতা প্রায় বিলুপ্ত, বাহিরে উজ্জ্বল বেশের বাহার, কেশ-মুখ-প্রসাধন যথেষ্ট; অন্তঃপুর দ্রব্যহীন, বৈঠকখানা বিলাসদ্রব্যে সজ্জিত! ব্যক্তিগত শুচিতা—ভোজন করিয়া ভালরূপ আচমন নাই, মলত্যাগে ভালরূপ শৌচ নাই, প্রস্রাবে জল নাই; ভোজন যার তার হাতে, যে সে দ্রব্য—উচ্ছিষ্টবিচারও নাই, পরিবেশক সুবেশে, উত্তম পাত্রে পরিবেশন করিলেই হইল। কিন্তু বেষ্টিশৌচ, সভা-সমিতি সাজান, সহরের পথ-ঘাট পরিষ্কার, গৃহের বাহির-শোভায় সকলেরই বিশেষ যত্ন। হিন্দু সভ্যতায় বাহির হইতে ভিতরের, ব্যষ্টি হইতেও ব্যক্তিগত শুদ্ধির ও জ্ঞানেরদিকেই অধিক লক্ষ ছিল।

জগতের সমস্ত মানবকুল যদি পশুপালের মত জ্ঞানহীন হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল-পথে যার যার সুখসন্ধানে ধাবিত হয়, একমাত্র রাজশক্তি বা সংহত-প্রজাশক্তির কি সাধ্য তাহাদিগকে কেবল শাসনবলে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সৎপথে চালিত করে। সেজন্য তাহারা বহু কর্ম্ম-বিভাগ গঠন করতঃ, বহু কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া, বহু চিন্তা ও অর্থব্যয়ে অবসন্ন হইয়া পরিবে। অথচ অমানুষ স্বার্থরত কর্ম্মচারী দ্বারা প্রত্যেক বিভাগ উদ্দেশ্যভ্রষ্ট ও নানা সমস্যাযুক্ত হইয়া উঠিবে। সেই সব প্রতিষ্ঠান চালাইতে নূতন কর স্থাপনের

প্রয়োজন পড়িবে। তাহাতে কেবল শাসন ও কর-ভারে পীড়িত হইয়া প্রজাগণ রাজশক্তির উপর বিরূপ হইয়া উঠিবে। তখন সর্ব্বদিকে রাজশক্তি বিব্রত হইয়া পড়িবে। প্রাচীন শিক্ষা ও শাসনপদ্ধতির গুণে ভারতে কোটী কোটী বর্ষ মধ্যেও, শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন বা শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই; এমন চারিদিকে প্রজাদের শাসন-ভারও রাজশক্তির গ্রহণ করিতে হয় নাই। তাহা পূর্ণ-শিক্ষা ও পূর্ণশাসন ছিল বলিয়াই, হিন্দু-সভ্যতা মানবকে দেব-সদৃশ চরিত্রবান করিয়া, স্বর্গের সুখ-শান্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

## হিন্দু-সভ্যতার বর্ত্তমান পতনের ইতিহাস।

বর্ত্তমানে নব্যশিক্ষিতগণ যেমন অতিপ্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার বিধান গুলিকে ছাঁটিয়া কাঁটিয়া নবযুগানুযায়ী করিয়া লইতে চেষ্টিত হইয়াছেন। হিন্দু-সভ্যতার উপরে এমন ছাঁটিয়া কাঁটিয়া সংস্কারের চেষ্টা আরও অনেকবার,—বর্ত্তমান আন্দোলন হইতেও অধিক প্রবল শক্তিসহ বহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলনের নেতাগণ সাধন-শক্তিহীন, রাজশক্তিহীন, পূর্ব্বে সাধনসিদ্ধ নানা যোগৈশ্বর্য্যশালী, বহুশাস্ত্রদর্শীলোক, প্রবল রাজশক্তির সাহায্যেও বহুবার হিন্দুশাস্ত্র-বিধান সংস্কারের চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়াছে। সে জন্য কত যুদ্ধ, বিগ্রহ, নরহত্যা, অর্থ ব্যয়ই না হইয়াছে। কিন্তু পরে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতাই জয়যুক্ত হইয়া, সেই সব মতকে ভারত হইতে প্রায় বিলোপ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।

এই জৈনসম্প্রদায়ই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রথম নব-সংস্কারের চেষ্টায় ব্রতী

হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর অবতার দত্তাত্রেয় ঋষির অষ্টাঙ্গ-যোগ-পথে সিদ্ধশক্তি লাভ করিয়া, কতজন অমানুষ শক্তিসম্পন্ন হইলে, তাঁহাদের বহু শিষ্য হয়। কতজন রাজাও তাঁহার শিষ্য ছিল। তাঁহারা গুরুকে জিতাত্মা বলিয়া জীন বলিতেন ও দেব-দেবী পরিত্যাগ করিয়া, সেই গুরুকেই ব্রহ্মের অবতার বলিয়া তাহারা উপাস্য করেন। তাঁহারা জীনের উপাসক বলিয়া, হিন্দুগণ তাহাদিগকে জৈন নাম দান করেন। জৈনগণ যোগধর্ম্ম বিনা হিন্দুর অন্য সর্ব্বসাধনকে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টায়, অন্যসাধনের নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিতে থাকেন। রাজশক্তি অস্ত্রবলের সহায়তায়, প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্র ও দেব-বিগ্রহ বিনষ্টের জন্য চেষ্টিত হ'ন। তাই হিন্দুগণ, জৈনগণকে হিন্দুত্বচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করেন ও সঙ্গ বর্জ্জন করেন। এই জৈন-সম্প্রদায় একদিন ভারতে অতি প্রবল হইয়া, অধিকাংশ ভারতবাসীকে ঐ মত গ্রহণ করায়। কতদিন পরে কতিপয় তান্ত্রিক সাধক, বীরাচার মতে সিদ্ধ হইয়া জৈন যোগিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইলে, জৈনগণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায়। সদা সংযম, দেহকষ্ট অষ্টাঙ্গ-যোগ হইতে, তন্ত্রের ভোগময় সুখকর সাধনায় শক্তিলাভ জন্য, তখন বহু জৈনরাজা এই তন্ত্র-সাধনায় ফিরিয়া আসেন। **এই তন্ত্র-সাধনা** সেকালে সমস্ত ভারত প্লাবিত করিয়া, তিব্বত ও চীন পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিয়াছিল। সহস্র সহস্র তন্ত্র-সিদ্ধ লোকে জগত ছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মদ্য মাংস, স্ত্রী-সম্ভোগের মধ্যে, ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের-ধ্যান, উপাসনায় মনসংযোগ রক্ষা করা কি আর সহজ নয়? তাই কতদিন পরেই সেই সাধনায় ব্যাভিচার আরম্ভ হইয়া, এই সাধনপথ কলুষিত করিয়া দিল; তন্ত্র-সাধনার নামে মানব

১। জৈন সম্প্রদায়ের আক্রমন।

পশুতার মধ্যে ডুবিতে লাগিল। রাজা ও অর্থশালিগণ শক্তি-পূজার জন্য শত, সহস্র হইতে লক্ষ জীবনও বলিদান আরম্ভ করিল; এই হত্যার সংখ্যাযই পূজার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হইত। নিজের অভিষ্টলাভ জন্য মানবকে পর্য্যন্ত মানব বলির পশু করিয়া বলিদান করিত। ব্যভিচারী নর-নারী তান্ত্রিক-যোগীর বেশ ধরিয়া, পথে ঘাটে ব্যভিচার করিয়া ফিরিত, গৃহীর সদাচার ও সতীধর্ম্মে পর্য্যন্ত আঘাত আরম্ভ হইয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনে স্বয়ং বিষ্ণু, দয়ার সাগর বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া, সেই নির্দ্দয়তা ও ব্যভিচারের স্রোতকে রোধ করেন এবং জৈন ও তন্ত্রের ঐশ্বর্য্য-সাধনাকে, শরণপরা ভক্তিবাদের মুক্তি-ধর্ম্ম দানে বিনষ্ট করেন। তান্ত্রিকগণ হিন্দুর অন্য সাধনার বিরোধী ছিলেন না বলিয়া, হিন্দুগণ তান্ত্রিকগণকে নাস্তিক বলিয়া ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের দ্বারা হিন্দুর অধিক অনিষ্টও হয় নাই; কেন না, তন্ত্রে সর্ব্বদেবতা ও সর্ব্ব উপদেবাদির সাধনাসহ পরব্রহ্মের সাধনা স্বীকৃত আছে, হিন্দুর কিছুকেই অস্বীকার করে নাই।

২। বৌদ্ধ আক্রমন।

শাস্ত্রমতে, অতি প্রাচীনকালে অসুরগণ বেদের সকাম-সাধনা-পথে সমস্ত দৈবশক্তি অর্জ্জন করতঃ, দেবতাগণের অপরাজেয়, অজর অমরতুল্য হইয়া দেবতাদের হস্ত হইতে প্রজাবর্গের শাসনভার কাড়িয়া লইয়াছিল, পরে বীর্য্যদর্পে অহঙ্কারী হইয়া, স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করতঃ জগতবাসীকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করে। তখন জগত হইতে দেব-স্বভাব—লজ্জা, বিনয়, ত্যাগ, ক্ষমা, ভালবাসা ও শাস্ত্রের সদাচার লোপ পাইতে বসিয়াছিল। সাধনাবলে দেবতার অজেয় বলিয়া, দেবগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতে ছিলেন না। তাই তখন জগত-পালনকর্ত্তা বিষ্ণু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া, ভোগ-রাজ্য হইতে যে ত্যাগপথে আনন্দ

অধিক, প্রবৃত্তির অসুরত্ব লইয়া দীর্ঘায়ু হইতেও যে, নিবৃত্তির নির্ব্বাণ অনেক শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইয়া, তাহাদিগের সকাম ভোগ-স্পৃহার নিরোধ করেন। তখন অসুরত্বের উপরে আবার দেবত্ব বিজয়ী হইয়া, জগত মঙ্গলময় হইল। বিষ্ণু-অবতার অমিতাভ বুদ্ধ সেই নির্ব্বাণপদ নিবৃত্তি-ধর্ম্মের প্রচার-দ্বারাই, এবার জৈন ও তান্ত্রিকদের ঐশ্বর্য্যময় শক্তি-সাধনাকে নিরোধ করেন।

বুদ্ধরূপী-বিষ্ণুর আবির্ভাবে, তাঁহার দৈব-প্রভাবেই সেকালের তান্ত্রিকগণের হিংসা, ব্যভিচার-ময় পিশাচের তাণ্ডব-নৃত্যের অবসান হইয়া, বৈষ্ণব-বাদের প্রেম, মৈত্রী ও করুণামাখা, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ-ময় ভাবের জাগরণ হইয়া উঠে ও হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া দেয়। তাঁহার প্রদত্ত অহিংসা, জগত-মৈত্রতা ও ভোগ-বিলাস-হীনতাসহ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ ধর্ম্মের সাধনায়, ভারতবাসী আবার এই পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছিল। বুদ্ধদেব আবার ভারতবাসীকে প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতায় টানিয়া তুলিয়া ছিলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র ভারতের বহু রাজা, সম্রাট হইতে প্রজাগণ নবমত গ্রহণ করিয়া তন্ত্রাচার, জৈনা-চার পরিত্যাগ করিয়া ছিল।

অবতারের প্রকাশকাল যেন বন্যা-স্রোত। সেকালে দেবসত্ত্বার আকর্ষণেই মানবগণ বিষয়-মোহাদি মুক্ত হইয়া, ভগবৎ-রাজ্যে চলিয়া যায়। কিন্তু অবতারের অন্তর্দ্ধানের পরেই স্রোতের টান কমিতে থাকে; পরে সেই স্রোত ক্রমে ক্ষীণ হইয়া, তাঁহার পবিত্র নির্ম্মল মত বিকৃত ও পঙ্কিল হইয়া উঠে। এই বুদ্ধদেব প্রকাশিত অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী, শান্ততাসহ ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণময় ধর্ম্মমতও পরে তেমনি গণ্ডিবদ্ধ, ক্ষীণ ও দূষিত হইয়া ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, ভগবান, শাস্ত্র ও ঈশ্বরপন্থী-ভক্ত এই তিনটি মহারত্নের শরণাপন্ন

হইলেই, জীবের জীবন সত্যরূপে সার্থক হয়; মানব তাহার প্রধান প্রাপ্যাবস্থা লাভ করিয়া ধন্য হয়। কিন্তু সেই শরণের ভাব লাভ করা মানবের সহজ ভাগ্যে হয় না। জীবের মধ্যে রজোগুণীয় কর্ম্ম-প্রবৃত্তির অভিমান থাকিতে তাহা কিছুতেই হয় না। কর্ম্ম-বাসনার বিলোপ-সাধন করিতে পারিলে, মানব শরণের অধিকার পায়; তখন মানব ত্রিরত্নের শরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সত্য কল্যাণ লাভ করে। এই কর্ম্মবাসনার বিলোপজন্য কর্ম্মান্ত-চত্তিসা নামে, চত্তারিংশত প্রকার সাধনা বুদ্ধদেব শিষ্যগণকে উপদেশ দান করেন। তাহার সমস্তগুলি হিন্দুর যোগ ও জ্ঞান-সাধনা অধ্যায়ে, বহু পূর্ব্বকালেই ঋষিগণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। কর্ম্মান্ত-চত্তিসার জ্ঞান, যোগ-সাধনা ও শরণ-ধর্ম্মের ভক্তি-সাধনা হইতে, বুদ্ধ-মতে ক্রমে তিনটী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। জৈন-ভাবাপন্নগণ জ্ঞান ও যোগপথ-কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন, আর বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকগণ ভক্তি-পথকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার সাধনার রত হন। জ্ঞানিগণ জ্ঞানই বুদ্ধ; যোগিগণ শূন্যই বুদ্ধ, জীবের নির্ব্বাণই প্রধান প্রাপ্য নির্দ্দেশ করেন; আর বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুই অমিতাভ-বুদ্ধ, বিষ্ণুভক্তিই সাধনা ও বিষ্ণুই প্রাপ্য নির্দ্দেশ করেন। তান্ত্রিকগণ বুদ্ধকে মহাকাল শিব এবং তারাই বুদ্ধ বলিয়া, মহাকাল-বুদ্ধ ও তারা-বুদ্ধ সাধনায় রত হন। তান্ত্রিকগণ মহাচীন হইতে লুপ্ততন্ত্রের উদ্ধার করিয়া আনিয়া, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মত ভারতে স্থাপন করেন। নদী-স্রোতে বাধাদিয়া রাখিলে যেমন জল দূষিত, বিষাক্ত হইয়া, মানবের অনিষ্ট-কারী হইয়া উঠে; বুদ্ধদেব প্রকাশিত নির্ম্মল ধর্ম্ম-স্রোতও দলজনিত গণ্ডিতে বিভক্ত হইয়া, পরস্পরের দ্বেষ ও হিংসাদ্বারা দূষিত হইয়া তেমনি মানব সমাজের অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়া ছিল। অহিংসা,

করুণা, শীল, বিনয়, মৈত্রিসহ ঈশ্বর-শরণ বিলুপ্ত হইয়া, তাহাতে হিংসা, গুপ্তহত্যা, ব্যাভিচার লোক-পীড়ন ও দর্পের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। তাই ভারতে কুমারীল, শঙ্করাদি দেব-সত্ত্বার বিকাশ হইয়া, তাহার মার্জ্জনার প্রয়োজন হয়; সেই বিকৃতমত ও আচারকে তাঁহারা ভারত হইতেই বিলুপ্ত করিয়া দেন।

বিষ্ণু-অবতার বুদ্ধদেব কি হিন্দু-সভ্যতার অনিষ্ট করিতে পারেন? তিনি হিন্দুর ধর্ম্মমতই মার্জ্জনাজন্য আসিয়া ছিলেন, তাহাই মার্জ্জনা করিয়া প্রকাশ করিয়া যান। তাই সেকালের হিন্দুগণ কেহই তাহা গ্রহণে বিরুদ্ধতা করে নাই। নচেৎ নব ধর্ম্ম-মত সেকালে ভারতে কেহ গ্রহণ করিতেন না। কেন না, আজ সাধন-হীন হিন্দু সন্তানও হিন্দুর শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নবমত গ্রহণে সঙ্কুচিত হয়। আরও আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে এই রক্ষণশীলতা আরও কত দৃঢ় ছিল; বহু পরবর্ত্তী-কালে মুসলমান পীড়ন সহিয়াও হিন্দুত্বের রক্ষণ-চেষ্টা হইতেই তাহা বুঝা যায়। বুদ্ধদেবের অন্তর্দ্ধানের প্রায় দুই শত বর্ষ পরে বহ্লিক দেশ—বর্ত্তমান পারস্যাধিপতি, কনিষ্ক ভারতের সমস্ত রাজাকে পরাস্ত করিবা ভারত-সম্রাটপদ লাভ করেন। ইহারা পূর্ব্বে, ভারতের মনুবংশীয় ক্ষত্রিয়-রাজা ও হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসী হইলেও, আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত দেশবাসী বলিয়া, সেই দেশে ব্রাহ্মণগণ যাইতেন না। তাই সেইসব দেশবাসিগণ পতিত-হিন্দু, শূদ্রতুল্য ছিলেন। বহ্লিক-সম্রাট কনিষ্ক কাশ্মীরে রাজধানী গড়িয়া ভারত-সম্রাট হন। তিনি বুদ্ধদেবের পরমভক্ত ছিলেন। সেকালে ভারতের অধিকাংশ রাজা ও প্রজাগণকে বুদ্ধভক্ত দেখিয়া, এবং বুদ্ধ-ভক্তমধ্যে বহুসিদ্ধ পুরুষ দর্শন করিয়া, একমাত্র বুদ্ধভক্তি ও বুদ্ধ উপাসনা জগতে স্থাপন

বৌদ্ধ হইতে হিন্দু সভ্যতার অনিষ্ট

করিতে ইচ্ছা করেন। তাহার বিশ্বাস হইল, বুদ্ধদেবের মতই হিন্দুধর্ম্মের সার মত, জীবের প্রকৃত কল্যাণের পথ। তাঁহার মত বিনা হিন্দু-শাস্ত্রের অন্য সব মতই অসার, তাই ধ্বংস-যোগ্য। সেজন্য তিনি ভারতের সমস্ত বৌদ্ধাচার্য্যগণকে একত্র করত, বুদ্ধদেব কৃত উপদেশ-মালা সংগ্রহ করিলেন, এবং নূতন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। ভারতে মাত্র তাহাই রাখিয়া, হিন্দুর সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ বিনষ্ট করিতে, সমস্ত বুদ্ধভক্ত রাজাগণ ও জনগণের সহায়তায়, তিনিই দারুণ চেষ্টা আরম্ভ করেন। তখনও বৌদ্ধধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন শাখার উদয় হয় নাই, বুদ্ধদেবের নির্ম্মল মত-স্রোতে সেই প্রথম বাঁধ; সেই ধর্ম্মের অহিংসাই মূল-সূত্রে, প্রথমে হিংসা সেইদিন প্রবেশ করিল; প্রেম মৈত্রীতে বৈষম্য ও কুটিলতা প্রবেশ করিল। সেই দিন হইতেই বুদ্ধমত আর্য্যনাম ত্যাগ করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া নূতন নাম ধারণ করিল। প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা ও ব্রাহ্মণ-প্রধান্য থাকিতে নূতন মত ভারতে প্রবেশ অসম্ভব বলিয়া, হিন্দুর শাস্ত্রীয়-ভাষা সংস্কৃত আলোচনা বিনাশ-জন্য, পালীভাষাকে রাজভাষা করিয়া নূতন শাস্ত্র-গ্রন্থ লিখিত হইল। ব্রাহ্মণের কুৎসা-প্রচারে ও রাজবলে ব্রাহ্মণ হইতে হিন্দুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ইহাতে অল্প সময় মধ্যে নবমত ভারতে স্থাপন করিতে তিনি সক্ষম হইলেন। কিন্তু তাহাতেই ভারত ও হিন্দু-সভ্যতার দারুণ অনিষ্টসাধন হইল। সেই দিন হইতে ভারতে সর্ব্বহিন্দুর এক-ধর্ম্মগত ঐক্যতার বিলোপ হইল। বৌদ্ধগণ তাহাদের মতকে সৎধর্ম্ম নাম দান করিয়া, হিন্দুর অন্য সমস্ত মতকে অসৎধর্ম্ম নির্ণয় করিলেন। হিন্দুগণও তাহাদিগকে বেদ-বিদ্বেষী নাস্তিক বলিয়া, ইহাদের সঙ্গ ও জল আচরণ বন্ধ করিলেন। পরস্পরের দ্বেষে দারুণ লোক ক্ষয়কর যুদ্ধ হইয়া ভারতের বল-ক্ষয়, লোক-ক্ষয়, ধন-ক্ষয়ও হইল। অবশ্য

প্রথমে সম্রাটপক্ষই জয়-যুক্ত হইল; ভারতের বার-আনা হিন্দু বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া, বহু প্রাচীন-শাস্ত্র দগ্ধ করিল ও প্রাচীন দেবদেবী বিনষ্ট করতঃ বুদ্ধ মূর্ত্তি ও পূজা স্থাপন করিল। পরে কিন্তু আবার হিন্দুমত প্রবল হইয়া, সেই পরাজয়ের দারুণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিল; অস্ত্র ও অগ্নি-সাহায্যে তাহারা ভারত হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বৌদ্ধ-সন্নাসী বিলুপ্ত করিয়া দিল। ধর্ম্মজন্য বিরোধ. এই ভারতে বৌদ্ধগণই প্রথমে প্রবেশ করাইয়া ছিলেন; নচেৎ ভারতে পঞ্চোপাসনা প্রচলিত থাকিলেও তাহাতে দ্বেষ ছিল না। বৌদ্ধগণ প্রদত্ত এই ধর্ম্ম-গণ্ডীর দ্বেষ, বৌদ্ধগণের পরেই হিন্দুগণ-মধ্যে দেখা দিয়াছিল। রামানুজের সময় শৈব-রাজা বৈষ্ণব-ভজন নির্ম্মূলের চেষ্টা করেন, আজও ভারত হইতে এই দ্বেষবুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই। এই পরস্পরের দ্বেষ যুদ্ধের সুযোগেই, পরে মুসলমান ভারতে প্রবেশ করেন এবং হিন্দু বন্ধু ও সেনাপতির সাহায্যে, এই ভারত বিজয় করিয়া, ভারতের সম্রাট-পদ লাভ করেন।

বৌদ্ধগণ সংস্কৃতভাষার বিলোপ চেষ্টা করিয়া, হিন্দু ও হিন্দুশাস্ত্র-জ্ঞানের যে অনিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতেই হিন্দুর প্রকৃত মহাঅনিষ্ট সাধন হইয়াছিল। সমস্ত ভারতে জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য একমাত্র সংস্কৃত ভাষা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাই এই একভাষা দ্বারা, একই জ্ঞান ও একই ক্রিয়াদ্বারা সমস্ত ভারত একতাবদ্ধ ছিল। ভারতের সকল

ভাষার সর্ব্বনাশ

দেশবাসীই সংস্কৃত-ভাষায় আলাপ করিতে শিখিত। যেমন একই বাঙ্গালা ও হিন্দিভাষা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে, একটু পরিবর্ত্তিত উচ্চারিত হইয়া প্রকাশিত হইতে দেখা যায়; মূলসংস্কৃত-ভাষাই দেশভেদে একটু বিভিন্ন হইয়া সেই দেশীয় কথা-ভাষারূপে সৃজিত ছিল; সংস্কৃতের

সঙ্গে অধিক পৃথক ছিল না; তাই সকল দেশের লোকই সংস্কৃত বুঝিত। বৌদ্ধগণ হিন্দুশাস্ত্র বিলোপের জন্য সংস্কৃত-ভাষার বিনাশ চেষ্টায়, ভারতের সেই ভাষাগত ও ক্রিয়াগত একতার বিলোপ করিয়া দিল। এই বৌদ্ধযুগেই ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক-ভাষাগুলি নূতন পৃথকরূপে ফুটিয়া উঠিল: সেই সঙ্গে প্রত্যেক ভাষাভাষীও অন্যভাষী হইতে পৃথক হইয়া পরিল। তাই ভিন্ন-ভাষাভাষী হিন্দুর জন্য ভিন্ন-ভাষাভাষী হিন্দুর মমতা কমিয়া গেল, পরে বিরোধ যুদ্ধ বিগ্রহও বাধিল। এই সংস্কৃত বিলোপের চেষ্টার দোষেই পরে ভারতের পালীভাষা ভারত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাই বলিলাম, ধর্ম্মের বিরোধ ও ভাষার বিরোধ স্থাপন করিয়া, বৌদ্ধগণই ভারতের ও হিন্দু-সভ্যতার মহা অনিষ্ট সাধন করিয়া ছিলেন। সর্ব্ব-ভারতের ভাষায়-একত্ব, জ্ঞানে-একত্ব, আচারে-একত্ব ও একধর্ম্মী বলিয়া জনবলের একত্ব এই বৌদ্ধগণ হইতেই বিনষ্ট হইয়াছিল।

আরবদেশ-বাসীগণ যখন ভিন্ন ভিন্ন দলপতির অধীনে আচারে, ভাষায় ও সাধনায় পৃথক পৃথক হইয়া, সদা বিবাদ-পরায়ণ, সমাজ-নীতি, স্নেহ-বন্ধন ও ঈশ্বর-সাধন-বিমুখ—মহা অসুর-তুল্য হইয়া পরিয়াছিল। তাহারা একে অন্যকে বিনা উত্তে-

৩। মোহম্মদী আক্রমণ

জনায় নিহত করিয়া, তাহার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করত, পত্নী ও পুত্র-কন্যাগণকে ক্রীতদাস-দাসী করিয়া লইতে পারিত; এমনি নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, মহাহিংস্র-প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছিল, সেইদিন তাহাদের মধ্যে প্রেরিত-পুরুষ মোহম্মদের আবির্ভাব হয়। ইঁহারই সাধনায়, একেশ্বরের উপাসনা, এক আচার, এক নীতি-বিধান ও এক ভাষাদ্বারা, সেই বিভিন্ন দলগুলি একীভূত হইয়া, সেই আরব-বাসীগণ মহাত্যাগী, ক্ষমা ও দয়াবান, নীতিবান পরম ঈশ্বর-পরায়ণ,

মহৎ মানবজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রেরিত-পুরুষের মত-অনুসরণকারিগণই মোহম্মদী, ইসলাম বা মুসলমান নামে জগতে পরিচিত। এই ধর্ম্মপথিগণ যতদিন মোহম্মদের-মত বিষয়-বিরক্ত, মহাত্যাগী, ঈশ্বরযুক্ত ফকীরগণের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ছিল, ততদিনই ক্রমে তাহারা নানাগুণে মহৎ হইয়া উঠিয়াছিল। যেইদিন সেই অধিকার বিষয় স্বার্থপর ভূস্বামীগণের হস্তগত হইল, সেইদিন হইতেই আবার পূর্ব্ব আরব-স্বভাব হিংসা, নির্দ্দয়তা, লুণ্ঠন, নির্য্যাতন দ্বারা তাহা কলুষিত হইয়া উঠিল; তাইত সেই প্রেরিত-পুরুষের দেহজাতা, সর্ব্ব-মোহম্মদীর পূজ্যা, আদরিণী-কন্যার সন্তানগণও দারুণ নিষ্ঠুরতার সহিত, সেই মোহম্মদীর করেই নিহত হইয়াছিল।

মোহম্মদীগণের আধিপত্য রাজ-শক্তির হস্তগত হইবার কাল হইতে তাহাদের সাম্রাজ্য-যুগের আরম্ভ হয়। সেইযুগ প্রায়ই নির্দ্দয়তার লুণ্ঠন, অত্যাচার, পিতৃ-হত্যা, ভ্রাতৃ-হত্যা ও বিজিত-রাজ্যের আপামর সাধারণকে হত্যা, দেশকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধকরণ, ধন নারী লুণ্ঠন এবং অপর ধর্ম্মপথীকে তরবারী ও অগ্নিবলে মোহম্মদী করা, তাহাদের প্রাচীন-শাস্ত্র দেবমন্দিরাদি বিনষ্ট করারূপ হীনাচার দ্বারা কলঙ্কিত। এমন কি, ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া পরিচিত আদর্শ-মোগল-সম্রাট আকবরও চিতোর বিজয়ের পরে, দেশ-জ্বালাইয়া ত্রিংশসহস্র নিরীহ প্রজাকে বধ করেন। সেই সাম্রাজ্য-বাদী মোহম্মদীগণের হস্তে পালেষ্টাইনের খ্রীষ্টিয়, পারস্যের পার্শী এবং মিশর ও তাতারের প্রাচীন-সভ্যতা সমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। রোমিয়দের যত্নে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম-সভ্যতা রক্ষা পায়; কিন্তু অন্য সমস্ত গুলি, তাহাদের জ্ঞান, আচার, সাধনা সব হারাইয়া একেবারে বিলুপ্ত। কেবল কতকজন পার্শী দেশত্যাগ করিয়া আজও

সেই ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তুর্কী মিশর পারস্য ও তাতার-বাসীগণকে এক মোহম্মদীমতে দীক্ষিত করিয়া, এই শক্তি অতি প্রবল হইয়া উঠে এবং পশ্চিমে স্পেন, দক্ষিণে সর্ব্ব-আফ্রিকা, উত্তরে চীন পর্য্যন্ত মোহম্মদীর হস্তগত হয়। কিন্তু সেই কালেও পারস্যের পূর্ব্বদিকে হিন্দু সভ্যতার অধিকারে তাহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই। পরে আত্মকলহে মোহম্মদী সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রভাহীন হয়; তখন খ্রীষ্টিয়গণ ইউরোপ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। অনেকদিন পরে এক পারস্য-রাজার করে ভারতের প্রবেশদ্বার আফগানীস্থান বিধ্বস্ত হয় ও দেশবাসী মোহম্মদী মত গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করেন। অল্পদিন পরেই মহম্মদ ঘোড়ি নামে এক আফগান-বীর তাহাদিগকে তাড়াইয়া নিজে দেশপতি হন। সেই রাজা বিজয়ী-সৈন্যের সহায়তায়, দস্যুরমত হঠাৎ ভারতের দেশবিশেষে পরিয়া, সেই দেশের ধনাদি লুণ্ঠন ও হিন্দু-দেবালয়াদি বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করেন, এবং এইরূপে বিপুল অর্থসংগ্রহ করিয়া, এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী গঠন করেন। সেই প্রসিদ্ধ আফগান-পতি মোহম্মদ ঘোড়ীর মৃত্যুর পরে, তাঁহার সেনাপতি ও ভ্রাতা সাহেবুদ্দিনকে বিবাদপরায়ণ একহিন্দু-রাজা সাহায্য-জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তিনি দুইবার পরাজিত হইয়াও তৃতীয়বারে জয় লাভ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সেই হইতে বিবাদ-পরায়ণ হিন্দুদের একপক্ষের সঙ্গে মিত্রতা করিয়া, হিন্দুদিগকে বন্ধু ও সেনাপতি করিয়া, এই আফগান অধিপতিগণ হিন্দুস্থানের সম্রাটপদ লাভ করিয়া বসেন। সেকালের এই আফগান রাজাগণ হিন্দু-গণের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করিয়া, সম্রাটের মত সকল রাজগণ হইতে করগ্রহণ করিয়াই মাত্র সুখী ছিলেন, প্রজার সঙ্গে তাঁহাদের

কোনও সম্বন্ধই ছিল না। এই আফগানগণের আধিপত্যই ভারতের প্রথম মুসলমান-অধিকার পাঠান-রাজত্ব-কাল।

ইঁহাদের রাজত্বের প্রথমে হিন্দুসহায়তার প্রয়োজন ছিল বলিয়া, হিন্দুর প্রতি অত্যাচার অবিচার বড় ছিল না; কিন্তু শেষের দিকে তাঁহারা আবার আরবীয় স্বভাব ধারণ করেন ও ভারতের হিন্দু-সভ্যতার বিলোপ করিয়া, সকলকে মোহম্মদী করিতে তাঁহারা দারুণ চেষ্টা আরম্ভ করেন। সেইকালে নানারূপে হিন্দু-নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। তাহারা মোহম্মদীগণের সুখ-সম্মানের সুবিধা করিয়া, হিন্দুর দুঃখ ও অপমান আরম্ভ করে। কোনও মোহম্মদীকে কোন হিন্দু অপমান করিলে বা কষ্ট দিলে, তাহাকে পশুর মত হত্যা, তাহার গ্রাম জ্বালান ও ধন-সম্পদ হরণ হইত; প্রত্যেক হিন্দুর মস্তকপ্রতি জজিয়া নামে মুণ্ডকর স্থাপিত হইল; গো হত্যা করিয়া গো-রক্ত হিন্দুর তীর্থ দেবমন্দিরে দেওয়া হইত ও দেববিগ্রহ ভগ্ন, ধর্ম্মশাস্ত্র পোড়াইয়া দিত; হিন্দুকে বলপূর্ব্বক গোমাংস খাওয়াইয়া জাতিচ্যুত করিত এবং প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার প্রাণদণ্ড ও যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করাইত তাহাদিগকেও বধ করিত; হিন্দু-সাধনা ও সভ্যতা বিলোপের জন্য এই দারুণ চেষ্টা সেদিন হইয়াছিল। এখনও ভারতের মুসলমান-অধিকার হায়দরাবাদ ও ভূপালাদির আইন সমূহ সন্ধান করিলে, সেই নিষ্ঠুর-শাসনের সংবাদ পাওয়া যায়। সেই অত্যাচারে ভারতের এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু মুসলমান হইতে বাধ্য হয়। আর যাহারা হিন্দু ছিল, তাহারাও আতঙ্কে মৃতের মত থাকিয়া, কেবল নামে হিন্দুত্ব রক্ষা করিতেছিল। ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণের কতিপয় দৃঢ়-শ্রদ্ধাবান মানব বিনা, অন্য শ্রেষ্ঠবর্ণ ও সমস্ত হীন-বর্ণের হিন্দু, হিন্দুত্বের নিদর্শন দীক্ষাদি সংস্কার, শাস্ত্রালোচনা ও সাধনা পরিত্যাগ করিয়াছিল।

সেইকালে হিন্দুত্বকে রক্ষা করিতে স্বয়ং বিষ্ণু কতিপয় দেবতা লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হন। সেই ভগবান মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্শ্বদগণের শক্তিতে, আবার হিন্দু-ধর্ম্ম সংজিবীত হইয়া উঠে। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার চৌদ্দআনা লোক মহাপ্রভুর পার্শ্বদগণ-দ্বারা হিন্দু-আচার গ্রহণ করেন। শ্রীবৃন্দাবন আদির লুপ্ত-তীর্থ ও বিগ্রহাদি ইঁহার শক্তিতেই আবার প্রকাশিত হয়। দক্ষিণে রামেশ্বর হইতে পশ্চিমে মালব ও উত্তরে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বহু হিন্দু ইঁহার পার্শ্বদগণ দ্বারা সঞ্জীবিত হন। দক্ষিণে তুকারাম এবং মালবে ও পাঞ্জাবে কৃষ্ণদাস-গুঞ্জামালী মহাপ্রভুর মতই প্রচার করেন। সেইকালে ঈশ্বর-ইচ্ছায় পারস্যের মোগলবংশীয়গণ ভারত আক্রমণ করায়, হিন্দুগণ সেকালে আবার সুগঠিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। পাঠানগণ মোগল-ভয়ে আবার হিন্দু-রঞ্জনে ব্রতী হন এবং মোগলগণও পাঠান-বিজয়ের সুবিধা-জন্য হিন্দুর মনোরঞ্জন করিয়া, সৎব্যবহার ও মিত্রতায় ব্যস্ত হন। হিন্দু পাঠান-অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া মোগলের সহায়তা করায়, মোগলগণ সহজেই পাঠান-রাজত্ব বিলোপ করতঃ, সর্ব্বভারতের সম্রাটপদ লাভ করিয়া বসেন। ইহারাও তিন-পুরুষ পরেই আবার আরবীয় স্বরূপ ধারণ করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব হিন্দু-ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিলোপ-জন্য দারুণ চেষ্টায় ব্রতী হন। আবার তীর্থ, দেব-মন্দির অপবিত্র করণ, শাস্ত্র ও বিগ্রহ বিনষ্ট আরম্ভ হয়; বলপূর্ব্বক গো-মাংস ভক্ষণ করাইয়া ও অত্যাচারে হিন্দুকে মোহম্মদী করিতে চেষ্টা হয় এবং হিন্দুগণের মস্তক পিছু কর ধার্য্য হয়; এমন কি সমস্ত ব্রাহ্মণ-গণকে হয় মোহম্মদী হইতে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিতে আদেশ হয়। সেইকালে পাঞ্জাবে শিখ, দক্ষিণে মারহাট্টা ও রাজপুতনায় রাজ-পুতগণ, হিন্দুত্ব-রক্ষায় যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। সেই বিরোধে, মোগল

শক্তির সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, পরে ক্রমে ভারত হইতে মোহম্মদী অধিকারেরই বিলুপ্ত হয়।

ভারতের হিন্দু ভয়েই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া, শ্রদ্ধা করিয়া সেইধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, নিকৃষ্ট হিন্দুর আচার তাহারা যত্নের সহিত গোপনে এতদিন ধরিয়া রাখিত না ও তাহাতে গৌরব বোধ করিত না। দক্ষিণ ভারতের গোয়া-বাসী হিন্দুগণ, যেমন পর্ত্তুগিজ-খ্রীষ্টিয়গণের দারুণ অত্যাচারে খ্রীষ্টধর্ম্ম-মত গ্রহণে বাধ্য হইয়াও, আজ পর্য্যন্ত হিন্দু-ধর্ম্মাচারকেই যত্নে রক্ষা করিতেছে—নামাকরণ, বিবাহাদি খ্রীষ্টিয়মতে চার্চ্চে সম্পাদন করিয়া, আবার হিন্দুমতে গৃহে সম্পাদন করে; ভারতীয় মুসলমানও তেমনি মোহম্মদী-মত প্রকাশ্যে গ্রহণ করিয়া, গোপনে হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া, এতদিন হিন্দু-আচারও রক্ষা করিতেছিলেন। সেকালে বাহ্যাচার হইতেও প্রাণের আচারই বড় বোধ ছিল। বর্ত্তমান-শিক্ষায় বাহ্যাচারই বড় ও তাই নবশিক্ষার জাতীয়তা-আন্দোলনে, আজ ভারতীয়-মুসলমানগণ হিন্দু-হইতে সর্ব্ববিষয়ে পৃথক হইয়া দল-গঠনে তৎপর হইয়াছেন। তাহারা আজ হিন্দুর বংশধর বা এই ভারতের অধিবাসী বলিতেও যেন কুণ্ঠিত। আজ প্রত্যেক মুসলমান মনে করেন, তাহারা আরবের আদম-বংশীয় ভারত-বিজয়ী আগন্তুক মানব; হিন্দুর সন্তান বা হিন্দুর জ্ঞাতি-ভ্রাতা বা তাহাদের প্রতিবেশীও নয়। তাইত আজ-তারা বিনা উত্তেজনায় হিন্দু-মাত্রকেই হত্যা করিতে, তাহাদের ধন নারী লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত হয় না; আজ হিন্দুরূপ কাফের-বধে, তাহাদের নারী হরণে পুণ্য সঞ্চয় হয় বোধ করে।

হিন্দু ভয়ে মুসলমান হয়

নবশিক্ষার মহৎগুণই এইরূপ, অন্তরাচার বিলোপ পাইয়া বাহিরাচারে যত্ন হয়। সেজন্য অন্তর-ধর্ম্ম, দয়া, মমতা ও ঈশ্বরভয়কে ত্যাগ

করিয়া, বহিরাচার-বিধান রক্ষণে তাহারা তৎপর হয়। প্রাচীন-শিক্ষিত হিন্দু, কত অনির্ব্বচনীয় অত্যাচার, বহুদিন ধরিয়া সহ্য করিয়াও, হিন্দুর সাধনা ও জ্ঞানকে যত্নে রক্ষা করিয়া ছিলেন ; আজ নবশিক্ষিত হিন্দু-সন্তান, ভোগ-সুখের জন্য মুহূর্ত্তমধ্যে নিজের জাতিধর্ম্ম, পিতৃ-মাতৃ সঙ্গাদি সকল ত্যাগ করিয়া যাইতে সক্ষম। প্রাচীন-শিক্ষার গুণেই হিন্দু-সন্তান মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সঙ্গে বহুবর্ষ মিশিয়াও, নিজেদের জাতিধর্ম্ম—কুলপরিচয় ও কুলের গৌরব যত্নে রক্ষা করিত,। হীণবর্ণের সহিত বিবাহয়াদি না করা, জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ না করা ও বিবাহাদিতে কুলাচার রক্ষা করাই, তাহার প্রমাণ। শাশ্বত-ধর্ম্ম —ঈশ্বর-সাধন-পথেও প্রাচীনভাবের সাধনা তাহারা সপ্তশতবর্ষ ধরিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-বংশীয় লোকগণ মোহম্মদী হইয়াও, আজ পর্য্যন্ত পণ্ডিত-উপাধি ও তাঁহাদের ব্রাহ্মণ কুলাচার, এমন কি উপবীত পর্য্যন্ত রক্ষা করিতেছেন ; এখনও তাঁহারা অন্তবর্ণের মুসলমান-সহ বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন না। এইরূপ বঙ্গদেশের বস্ত্রজীবি তাঁতি-সন্তান, তৈলজীবি কুলু, বাদ্যকর বাজনীয়া, মৎস্য-জীবি মাইফরাস, চিড়া, ও চাউলাদি কোট্টন-কারী কুটি-সন্তানগণ মুসলমান হইয়াও, আজ পর্য্যন্ত জাতীয়-উপাধি, বংশগৌরব, আচারাদিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রায় সহস্রবর্ষ হিন্দুত্ব-চ্যুত হইয়াও হীনবর্ণে বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ ও কুল-প্রাধান্য বিসর্জ্জনকে তাহারা হীনতা মনে করিত। নবশিক্ষা-প্রভাবে হিন্দুসন্তানও আজ ধন-সুখাদি জন্য অনায়াসে মুহূর্ত্তমধ্যে এইসব পরিত্যাগে সক্ষম, তাই মুসলমাও আজ হিন্দু আচার ত্যাগ করতঃ পৃথক হইয়া উঠিতেছেন।

হিন্দুশাস্ত্রে যেমন বর্ণিত আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার ইচ্ছামাত্রে কতিপয় প্রজাপতি ঋষির উদ্ভব হয়, তাহারাই ভারতের হিন্দু-

জাতির আদি-পুরুষ। ইহারাই ঈশ্বরের বাণীকে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ-গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়া, নিজসন্তান হিন্দুগণকে দান করেন। খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদী-শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, ভগবানের ইচ্ছায় আদম ও ইভা নামে এক মানব ও মানবী সৃজিত হন; সেই আদমের প্রকাশিত ঈশ্বর-বাণীই তাঁহাদের আদিধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মমত। তাঁহার বংশধরগণ দ্বারাই এখন আরব ও পেলেষ্টাইন পরিব্যাপ্ত। তাঁহাদের বংশধরগণ পরে এস্রায়েল, য়িহুদী ও কোরস আদি অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়া নানা দলের সৃজন হয়।

৪। খ্রীষ্টিয়মত ও আক্রমণ।

আদম-বংশীয় এব্রাহিমের পৌত্র এস্রায়েলের একপুত্র দৈবে ক্রীতদাস রূপে মিশরে বিক্রীত হয়। মহৎজ্ঞান ও চরিত্র প্রভাবে, সে রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া, পরে সে মন্ত্রীপদ লাভ করেন। দারুণ দুর্ভিক্ষ হইতে বুদ্ধিবলে মিশরকে রক্ষা করিয়া, পরে তিনি সর্ব্বমিশর-বাসীর শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করেন। তিনিই পরে তাহার ভ্রাতা ও দ্বাদশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণকে মিশরে আনিয়া স্থাপন করেন। এইরূপে মিশরে এস্রায়েলবংশের একশাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তিনপুরুষে বহু সহস্রে পরিণত হয়; এস্রায়েলের জ্যেষ্ঠপুত্র য়িহুদী হইতে ইহাদের য়িহুদী নামও হয়। তৃতীয় মিশর রাজা ইহাদের জন-সংখ্যা ও বল বুদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া, ইহাদিগকে সধর্ম্মে মিলাইতে চেষ্টা করেন ও তাহাতে অপারগ হইয়া, পরে ইহাদের উপর দারুণ পীড়ন আরম্ভ করেন। ইহাদের পুত্রসন্তান হইলে মারিয়া ফেলিতে আদেশ করিয়া, ক্রীতদাসের মত ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার আরম্ভ করেন। সেইকালে মুসা নামে একজন প্রেরিত-পুরুষ তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হন। তিনি ঈশ্বর আদেশে ও দৈবশক্তির সহায়তায়, সেই দুর্দ্দিনে এস্রায়েলগণকে রক্ষা করিয়া, মিশর হইতে আরবে লইয়া আসেন। তাহাদ্বারা রক্ষিত এ

এস্রায়েলদল আরবের প্রাচীন অধিবাসী প্রায় দ্বাদশটি জাতিকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া, জেরুজেলেম-নামক স্থানে, নূতন-রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই দলই পরে য়িহুদী নামে জগতে পরিচিত হয়। মুসাকর্ত্তৃক প্রকাশিত ঈশ্বর-বাণী-সমুহ প্রথমে তওরাত-গ্রন্থনামে প্রকাশিত ছিল, বর্ত্তমানে বাইবেলের প্রাচীন-অংশ।

মুসার তিরোভাবের বহুবর্ষের পরে জেরুজেলেম-রাজ্য, আরবের প্রাচীন-জাতীয় অসুর-রাজাদ্বারা বিধ্বস্ত ও ভস্মীভুত হয। অনেক য়িহুদীকে তাঁহারা সংহার করিয়া, য়িহুদী-বংশ প্রায় নির্ম্মূল করিয়া তোলে। সেই অসুর রাজত্বকালে য়িহুদী-বংশে প্রেরিত-পুরুষ যিশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়। তওরাত হইতে স্বতন্ত্র-মত প্রকাশ করায়, য়িহুদীগণ অনেকেই ইহার বিপক্ষ হইয়া, রাজার নিকট ইহার প্রাণদণ্ড করিতে অনুরোধ করিলে, অসুর-রাজা যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করেন। হত্যাকালে যিশু যখন হত্যাকারী শত্রুর কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া, প্রশান্ত ভাবে, বিরক্তি বা দুঃখ প্রকাশ না করিয়া, অত্যাচার ও হত্যাদণ্ড গ্রহণ করিলেন, তখন য়িহুদীগণের জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া উঠিল। তিনি জীবিতে যাহাদিগকে শত আহ্বানেও ধর্ম্মের দিকে, নীতির দিকে, ঈশ্বরের দিকে টানিয়া আনিতে পারেন নাই, আজ আত্মত্যাগের মৃত্যুতে তাহারা ফিরিয়া আসিল। যিশুর গুণ, ত্যাগ সরল-উপদেশ ও অমানুষী ক্রিয়ার কথা স্মরণ করতঃ, তখন দলে দলে য়িহুদী ও দেশের সাধারণ-লোক একতা বদ্ধ হইয়া, যিশুর হত্যার প্রতিহিংসা লইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পরে তাহাদের হস্তে অসুরকুল নির্ম্মূল হইল; এমন কি ইহাদিগকে বাধা দিতে আসিয়া, পালেষ্টাইনের প্রাচীন অতি উন্নত, জ্ঞানশক্তিময় রোম-সভ্যতা বিধ্বস্ত হইয়া বিনষ্ট হইল। রোমের রাজধানী, তাহার জ্ঞান, আচার, শাস্ত্র-সমুহ সমস্ত ভস্মীভুত হইল।

অধিকাংশ জনবল নিহত ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইলে, খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টগণ জীবন রক্ষা করিল। বহুদিন অরাজক অত্যাচারের পরে, রোমবাসী তাহাদের সভ্যতার ভগ্নাবেশ-দ্বারা খ্রীষ্ট-মতকে মার্জ্জিত-আকারে শৃঙ্খলিত করতঃ, বাইবেল লিখিয়া রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টিয়-সভ্যতা গঠন করিয়া তোলেন। এই প্রেরিত-পুরুষ যিশু যে ইশ্বরের বাণী প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থের নাম এঞ্জিল, বর্ত্তমানে তাহা বাইবেলের নূতন-অংশ।

আদমের বেই বংশধরগণ আরবেই বাস করিতেছিলেন। তাহারা আরবের আদী-বংশীয রাজাদের অধীনে একদিন অতি কষ্টের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। সেইকালে তাহাদের মধ্যে প্রেরিত পুরুষ এব্রাহীমের জন্ম হয়; তিনি অমানুষ শক্তি দেখাইয়া আদমের ধর্ম্মমতকে সেদিন রক্ষা করেন। এই এব্রাহীমই কাবা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আরবে আদি উপাসনা মন্দির স্থাপন করেন। বহুদিন পরে এই বংশীয়গণ নানা দুর্নীতি পরায়ণ বা অত্যাচারে ধ্বংসপ্রায় হইয়া উঠিলে, ক্রমে মুসা, যিশু এবং প্রেরীত পুরুষ মোহম্মদ সেইবংশেই জন্মিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম ও মোহম্মদীধর্ম্ম একই আদমের প্রকাশিত ধর্ম্মমত; ঈশ্বর-তত্ত্ব, সাধন-তত্ত্ব, সামাজিক মূল-নীতি সমস্তই এক। সামান্য ক্রিয়া-ক্রমের পার্থক্য ধরিয়া, একপক্ষ যিশুকে ও অন্যপক্ষ মোহম্মদকে শ্রেষ্ঠ করিতে, বিবাদে ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন; পরস্পর পরস্পরকে মহাশত্রু বলিয়াও মনে করিতেছেন; এইজন্য শতবর্ষ-ব্যাপী কত যুদ্ধই না হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ধর্ম্ম-বিধান সমস্তই দেহেন্দ্রিয় কষ্টদ, দেহ ও বেশের শুদ্ধি, ত্যাগ, দীনতা, বিনয় মাথা ও ধর্ম্মপথী-পুরোহিতাদির অধীনতা ময়। নব-শিক্ষিতগণের নিকট এই পরাধীনতা, দেহ-কষ্ট, ভোগ-ত্যাগ, দীনতা ইত্যাদি, বৃথা-কষ্ট, স্বাধীনতার বাধা ও হীনতা বলিয়া মনে

বাধিতে লাগিল। তাই তাহারা প্রাচীন-খ্রীষ্টিয়মত বর্জ্জন করিয়া, তাহাদের নব-জ্ঞানোপযোগী সুখ-সুবিধাময় বিধান গড়িয়া লইল, তাহাতেই খ্রীষ্টিয়-মধ্যে প্রোটেষ্টান ইত্যাদি মত সৃজিত হইল। বর্ত্তমানে শিক্ষিত খ্রীষ্টিয় রাজ্য-সমূহে অধিকাংশই এই প্রোটেষ্টান মতবাদী: তাহাই বর্ত্তমানে জগতের নব-সভ্যতার আদর্শ-ধর্ম্মের স্বরূপ। বর্ত্তমান সভ্যতানুযায়ী খ্রীষ্টধর্ম্ম-সংস্কারের মত নবশিক্ষায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের ও সেইরূপ নবসংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুমধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য্য-সমাজ, নব-হিন্দুমিশন এবং মোহম্মদী-মধ্যে নবতুর্কী আদি মতবাদ, এই নবসভ্যতার প্রাচীন আচার বিলোপের চেষ্টা। নব-সভ্যতার সংবাদ লইয়া খ্রীষ্টিয়গণ ভারতে প্রবেশ করিলে, ভারত বর্ষীয় নব-শিক্ষিতগণ যে এইমত সাদরে গ্রহণ করিয়া, প্রাচীনের বিলোপের জন্য চেষ্টা করেন, তাহাই ভারতে **খ্রীষ্টিয়-আক্রমণ**।

ভারতে বৃটিশ-শাসন আরম্ভ হইবার কতদিন পরেই, কোম্পানী রাজত্বের শেষ-অংশে, এই নব-সভ্যতার অগ্রদূত-রূপে খ্রীষ্টান-মিশনরীগণ ভারতে প্রবেশ করেন। সেইকালে বঙ্গদেশে কলিকাতা-নগরীই বৃটিশ-শাসনের রাজধানী ছিল বলিয়া, মিশনরীগণ তথায়ই প্রথমে সেই সভ্যতার সংবাদ বিতরণ আরম্ভ করেন। রাজশক্তিও তাহাদের সাহায্যে ব্রতী হইয়া প্রচারের সুবিধা করিতে থাকেন। মিশনরীগণ দেশীয়-ভাষা শিখিয়া, দেশীয় ভাষা শিক্ষা-দানের সঙ্গে, বিনা-মূল্যে চিকিৎসা ও লোক-সেবার মধ্যদিয়া ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করেন। রাজশক্তি, সেই স্কুলের ছাত্রকে চাকরীর সুবিধা করিয়া দিতেন ও সামান্য ইংরাজি শিখিলেই, ভাল রাজকার্য্য দান করিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক যুবক অর্থার্জ্জন-জন্য ইংরাজি-শিক্ষায় আগ্রহান্বিত হইয়া মিশনরীগণের নিকট ইংরাজি-শিক্ষায় ব্রতী হয়। ইংরাজি

জানিলে রাজদরবারে আদর ও প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া, কলিকাতার কতক ধনবান্ লোক সন্তানদিগকে ইংরাজি শিখাইতে মনোযোগী হইলেন। এইরূপে সম্ভ্রান্ত ও সম্পদে প্রতিষ্ঠাবান্ এবং রাজদরবারেও সম্মানিত কলিকাতাবাসীর চেষ্টা ও সহায়তায়, কলিকাতায় ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া, খ্রীষ্টিয়-সভ্যতা অল্পদিন-মধ্যে হিন্দু-যুবকগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বসিল। অমনি অতিসংযম-পর হিন্দু-জীবন তাহাদের নিকট নিতান্ত কষ্টময় বোধ হইতে লাগিল, এবং সর্ব্বদিকে বন্ধনহীন পাখীর মত সদাস্বাধীনতাময় জীবন লইয়া, কেবল স্বসুখ-সন্ধানে জগতময় ঘুড়িবার জন্য, তাহাদের বুদ্ধি ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনেক নবশিক্ষিত যুবক হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, পিতা-মাতার স্নেহডোরের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। বনবাস বরণ করিয়া পিতৃ-সেবাকারী ভাতৃস্নেহে রাজ্যত্যাগী শ্রীরাম লক্ষ্মণাদির আদর্শে গঠিত হিন্দু-সন্তানের মধ্যে সেইদিনই, প্রথমে স্বসুখ জন্য পিতা-মাতা ভ্রাতাদির ত্যাগ আরম্ভ হইয়াছিল। কেবল নিজেরাই পিতা-মাতা ও স্বধর্ম্মাচার ত্যাগ করিয়া সুখী হয় নাই! মিশনারীদের অর্থ-দাস হইয়া সেইধর্ম্মের মহিমা ও হিন্দু-ধর্ম্মের কুৎসা প্রচার দ্বারা, অন্য যুবকগণকে আকর্ষণ করতঃ দলপুষ্টির চেষ্টায়ও তাহারা ব্রতী হইল। কলিকাতার অনেক শ্রেষ্ঠ হিন্দু পরিবার পুত্র-হারাইয়া বসিলে, তথাকার কতিপয় প্রতিষ্ঠাবান্-হিন্দু প্রাচীন হিন্দু-বিধানকে নবসংস্কার করিয়া, খ্রীষ্টানদের মতই সুখ-সুবিধাময় করিয়া গড়িয়া লইতে চেষ্টিত হন; তাহাদের গঠিত সেই নবমতই ভারতের ব্রাহ্মধর্ম্মান্দোলন। ইহাতে খ্রীষ্টিয়-ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা লাভ করিয়া, অনেক যুবক সত্যই খ্রীষ্টিয়-ধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া নবমতের হিন্দু হইলে, যুবকগণের খ্রীষ্টান হইবার গতি রোধ হয়। প্রোটেষ্টান্ট-মতবাদি-

গণ যেমন অস্ত্রবলে প্রাচীন মত বিলোপ করিয়া ইয়ুরোপে কেবল স্বমত স্থাপনের চেষ্টা করেন, তদ্রূপ নব-শিক্ষিতগণও ভারতের প্রাচীন মত বিনষ্ট করিয়া, নবমত স্থাপনজন্য নানা চেষ্টায় ব্রতী হন ; সেই আক্রমণই হিন্দু-ধর্ম্ম সভ্যতার উপর **ব্রাহ্ম-সমাজের আক্রমণ।**

যুগানুযায়ী করিয়া প্রাচীন হিন্দু-বিধান ও সাধনাদির সংস্কার করিয়া লইতে, সেই কালের প্রতিভাবান্ কতিপয় লোক যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সংস্কার-চেষ্টা রোধ করিতে না পারিলে, সেইদিনই হিন্দু সভ্যতা ও ধর্ম্ম-সাধনার একেবারে বিলোপ-সাধন হইত। সেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মান্দোলন বঙ্গদেশকে এমন আন্দোলিত করিয়াছিল যে, বঙ্গদেশ হইতে প্রাচীনাচার, হিন্দুর সগুণ-সাধনা, ও জাতিভেদাদি প্রায় উঠিয়া যাইতে বসিয়াছিল! সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কৃতবিদ্য, হিন্দু-সন্তানগণ বেদান্তকে হিন্দুর বেদের অন্তঃভাগ অর্থাৎ গোপনীয় গুহ্য-মত বলিয়া, বেদান্তের শ্লোক দেখাইয়া, নির্গুণ নিরাকার উপাসনাই হিন্দু-ধর্ম্মের সার-মত ; সর্ব্বজীব ও মানবকে সমানভাবে দর্শন, সকলকে ভ্রাতৃ-সম স্নেহ করাই মানবের কর্ত্তব্য ; দেব-মূর্ত্তির উপাসনা জ্ঞানহীন-দিগের জন্য কল্পিত-উপাসনামাত্র ; জাতিভেদ মানবের অবমাননা ইত্যাদি বুঝাইয়া, গ্রামে গ্রামে যাইয়া যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, উপবীত ছিঁড়িয়া, হীনবর্ণের জল ও অন্ন গ্রহণ করিয়া জাতিদোষ বিনাশে ধাবিত হইলেন ; সর্ব্ববর্ণের জনগণ দেব-বিগ্রহের অবমাননায় ইচ্ছুক হইয়া, অবৈধ-কর্ম্ম দ্বারা অপমান করিয়া ছিল ; এমন কি, সেই অপূর্ব্ব বাক্-বিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থজাতির সম্ভ্রান্তকুলের বিধবা-যুবতী, নব্য-ভ্রাতার সহায়তায় গৃহত্যাগ করতঃ, প্রচারকদের সহায়তায় যে-সে বর্ণের

নবশিক্ষার ব্রাহ্ম আক্রমন।

যুবককে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল। তখন সকল হিন্দুর মনেই বোধ হইয়াছিল যে, সুখ ও সম্মান লাভের বাসনায়, হিন্দু-ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্ররূপ অনুশাসন গড়িয়া, অন্য সমস্ত-বর্ণের হিন্দুদিগকে জ্ঞানে ও স্বাধীনতায় পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে ; সংযমের বিধান-শৃঙ্খলে ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিবর্গকে বাঁধিয়া, কেবল দুঃখের আগুন দিয়া ব্রাহ্মণই সকলকে দগ্ধ করিয়া মারিতেছে। শক্তিহীন খঞ্জের মত পড়িয়া দুঃখদাহনে দগ্ধ হইতে মানবের জন্ম হয় নাই ; বীরের মত সুখসন্ধানের চেষ্টায় ব্রতী হওয়াই মানবত্ব। এই ধারণায় হিন্দুর কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্মের ও শাশ্বত-ধর্ম্মের বিধানের বেষ্টনীর বাধা ভাঙ্গিয়া, সেইদিন নব-স্বাধীন-পথে সুখ-সন্ধানে হিন্দু-সন্তান ধাবিত হইয়াছিল।

শাস্ত্র বিধান গুলির উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, কেবল বিধিভাবে আচরণ করিতে যাইলে, যদি ধর্ম্মের প্রয়োজন বোধ, এবং সে পথে লাভা-লাভের বিচার করিয়া ধর্ম্মাচারে শ্রদ্ধা না জন্মে, তবে বিধানগুলিকে স্বাধীনতার পথে বাধা, ও অনুশাসনের বেষ্টনীকে কষ্ট বলিয়া মনে হইবেই ; আবার কতদিন পরে সেই বিধানের অধীনতা নাশ করিয়া স্বাধীন ও সুখী হইতে মতি হইবেই। প্রাচীন-শিক্ষায় প্রথমেই শাস্ত্র ও সদাচারের প্রয়োজন বুঝাইয়া, স্বৈরাচার হইতে সদাচারে শ্রদ্ধা আনিয়া দিত ; বিধান-পালনের গুণ বলিয়া, সেজন্য আকাঙ্খা ও চেষ্টা জাগাইয়া দিত। মোহম্মদীয়-অত্যাচারে অনেক দিন সেই শিক্ষার অভাবে, হিন্দু-সাধারণ কেবল অনুশাসন ভাবেই শাস্ত্র-বিধান মানিতে ছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ও ফলের বিষয় কেহই জানিত না ; তাই কতিপয় শ্রেষ্ঠ-বংশীয় নব্য জ্ঞানবান হিন্দু-সন্তানকে শাস্ত্র-প্রমাণ-সহ সুযুক্তি-পূর্ণ-ভাষায় প্রাচীন-বিধান ও অনু-শাসনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া, সেই মতকেই অকাট্য সত্য

বলিয়া সাধারণে ধরিয়া বসিয়া ছিল, এবং বদ্ধ-পশুর শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া দৌড়িবার মত, প্রাচীন ধর্ম্ম-বিধান ছিঁড়িয়া দৌড়িয়াছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় সেইকালে প্রাচীন-হিন্দুপন্থী-মধ্যেও তেমনি জ্ঞানী ও বক্তার আবির্ভাব হইয়াছিল; আরও বর্ত্তমানের মত নবশিক্ষা ও নবসভ্যতার দ্বারা তখনও সমস্ত দেশ অনুপ্রানিত হইরা উঠে নাই; তাই বৃদ্ধগণ দৃঢ়-যত্নে প্রাচীন-রক্ষণে যত্নবান্ হইয়াছিল। সেই বৃদ্ধ-গণের চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে আবার প্রাচীন-পন্থী বক্তাগণের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ইহারা যখন বুঝাইয়া দিলেন, সগুণ সাধনা ও জাতিভেদাদি হিন্দুর কলঙ্ক নয়! অসাধারণ জ্ঞান ও কল্যাণের সংবাদ দান। সগুণ সাকার-ভাবে ভগবান-লাভই পূর্ণরূপে ভগবান-লাভ। সেই লাভের সন্ধান মাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই আছে, এবং সেই জন্যই হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্তধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; সগুণ-ভগবানকে পাওয়া হিন্দুর চরম-লক্ষ্য। বেদান্ত জ্ঞান, হিন্দুর জ্ঞান-সাধনার একটী অংশমাত্র; জড়-জ্ঞানের উপর আত্মা ও প্রকৃতি-আদির বোধ-জন্য সেইজ্ঞানের প্রযোজন। ইহার উদ্দেশ্য অপ্রাকৃত ভগবৎ-রাজ্যের সত্তা বোধ করিয়া, ভগবানে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করা। হিন্দুতীর্থ সমূহ সগুণ-মূর্ত্তিব্রহ্মের লীলা-ক্ষেত্র। প্রতিতীর্থে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁহাকে সত্যই দেখিয়া, তাঁহার কৃপায় অমানুষ শক্তির খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন। ভারতের প্রতিগ্রাম, হিন্দুর প্রতিবংশ সগুণ-সিদ্ধ মহাপুরুষের স্মৃতিমাখা; সে সাধনা কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? ইঁহারা শাস্ত্র-বচন ও যুক্তিদ্বারা ব্রাহ্ম-বক্তাগণের মতসমূহের অসত্যতা ও অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিলে, আবার ধর্ম্মত্যাগী হিন্দু প্রাচীন-পথে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রাচীন-পন্থীগণও স্বধর্ম্ম-মহিমা জানিয়া তাহা রক্ষার জন্য দৃঢ়চিত্ত

হইয়া ছিলেন। তাই সেদিন বৃদ্ধগণ ধর্ম্মরক্ষণের জন্য, বিধান-লঙ্ঘনকারী সন্তানগণকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করেন; যাহারা তাহাতে অস্বীকৃত হইল, তাহাদিগকে তাহারা নির্ম্মম হইয়া বর্জ্জন করিয়া তাড়াইয়া-ছিলেন। এইরূপে সেই আন্দোলন আরম্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল।

মানব-জীবনের দুইটী দিক, একটী জীব-স্বভাব—অধ্যাত্মজ্ঞান ও ঈশ্বর-যুক্ততা-হীন পশু আদি প্রাণীর মত, কেবল দেহেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধনময় জীবন, অন্যটী দেব-স্বভাব—অধ্যাত্ম-জ্ঞান-মণ্ডিত, দেহেন্দ্রিয়ের কষ্ট হইলেও ত্যাগ, দয়া, ক্ষমা ও স্নেহবন্ধন, ঈশ্বর যুক্ত, সংযম-পূর্ণ জীবন। শৈশবের শিক্ষায় জীবভাবের উন্মেষ হইলে, দেবত্ব-স্বভাব নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইবেই; আবার দৈব-স্বভাবের উন্মেষ করিতে পারিলে, জীব স্বভাবকে মানব-জীবনে পশুত্ব-প্রকাশক বলিয়া হীন বোধ হইবে; সেই আচারে লজ্জা আসিবে। আধুনিক নবশিক্ষায় জীবভাবের বিকাশের জন্য যেরূপ চেষ্টা হয়, দেবত্ব প্রকাশের ব্যবস্থা তেমন নাই। হিন্দু-জীবনের নানা আচার বাহুল্যময়, দেহেন্দ্রিয় সংযমপূর্ণ, শাস্ত্রাধীন-জীবন, নবশিক্ষিতের নিকট তাই দুর্ব্বোধ্য ও মহাকষ্টকর বোধ হয়। প্রথমে হিন্দুরাজত্ব-কালে, সকলেই একআচারী ছিল; তাই অন্য আচরণের সংবাদ না জানিয়া, সেই আচারই সকলে কর্ত্তব্য বলিয়া পালন করিত। মুসলমান আসিয়া অন্য আচারের জীবন ও সাধনা দেখাইলেন; হিন্দুসন্তান প্রথম ভিন্নাচার দেখিয়া, নিজআচারের বিচার আরম্ভ করিল। আবার যখন প্রবল-মুসলমানবিজয়ী খ্রীষ্টিয়গণের সুখময়, সর্ব্বদিকে স্বাধীন-জীবন দেখিতে পাইল, তাহাদের মুখে হিন্দু-আচারের মধ্যে নানা অজ্ঞতা, হীনতা, বৃথা কষ্টকর আচারের সংবাদ পাইল, তখন সেইসব নাশ করিতে, ও হিন্দু

ধর্ম্মকে কলঙ্কহীন করিয়া, নিজেদেরও সুখ-সুবিধা বর্দ্ধন করিতে, নবশিক্ষিত-হিন্দু ধাবিত হইয়াছিল। সেই আন্দোলনে, প্রথমে হিন্দুধর্ম্ম-সভ্যতার অনিষ্ট না হইয়া, মহাকল্যাণই আনয়ন করিয়াছিল। মুসলমান-শাসনে হিন্দুগণ শাস্ত্রালোচনা-হীন হইয়া, কেবল বিধিভাবে হিন্দুআচার রক্ষা করিতে ছিলেন; তাই হিন্দু-আচারের মর্ম্মার্থ প্রায় কেহই জানিতেন না। সে জন্যই ব্রাহ্মগণ যখন হিন্দুর আচার ও সাধনাদির তত্ত্ব না বুঝিয়া সেই সবকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল, সাধারণ-হিন্দু তাহার উত্তর না দিতে পারিয়া, ঋষিগণের অজ্ঞতাই মনে করিয়া লইল। আবার যখন প্রাচীন-আচারের মর্ম্মজ্ঞগণ সাধারণকে হিন্দুসাধনা ও আচারের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়া, খ্রীষ্টিয় ও ব্রাহ্মমতের অপূর্ণতা ও দোষ দেখাইয়া দিলেন, অল্পসময়-মধ্যে হিন্দু-সাধারণ হিন্দু-আচারের মর্ম্ম অবগত হইয়া, লুপ্ত-জ্ঞান লাভ করিলেন। তাই প্রথমে ব্রাহ্ম-আন্দোলনে হিন্দু-ধর্ম্ম-সভ্যতার অনেক কল্যাণই হইয়াছিল। হিন্দু-সন্তানের খ্রীষ্টান হইবার ও নবসংস্কার করিবার বাসনা বিনষ্ট হইয়াছিল।

সাধারণজ্ঞানে হিন্দুর জাতাশৌচ, মৃতাশৌচ ও রমণীর আর্ত্তবাশৌচ, নিষ্প্রয়োজন কষ্ট-মাত্রই বোধ হয়। জাতিভেদের শৌচ সকলের অন্ন-জল গ্রহণ না করা ও স্বজাতিয় বিনা বিবাহাদি না করাও কষ্টকর, অসুবিধাজনক এবং সত্যই যেন মানবের অবমাননা বলিয়া বোধ হয়। তার পরেও ঈশ্বর-সাধনায়, বিবাহে, শ্রাদ্ধাদিতে হিন্দুর ক্রিয়াবাহুল্য, শরীর-কষ্ট ও অর্থব্যয়াদিও কষ্টকর, সাধারণ-জ্ঞানের দুর্ব্বোধ্য। কেন না, হিন্দুর ঈশ্বর-সাধনায়—বিধানমতে স্নান, তিলক, অঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম, জপ, পূজা, স্তব, উপবাস, দণ্ডবৎ কত কিছু চাই, খ্রীষ্টিয়-সাধনপথে এইসব কষ্ট কিছু মাত্র

নাই। তাহাতে সুবেশে সাজিয়া, সুখাসনে বসিয়া, সুন্দরী সুবেশা যুবতীগণ পরিবৃত হইযা, সুযন্ত্রে, সুস্বরে সুর-মশাইয়া একটী স্তবের গানেই তাহা সমাধা হয়। সেস্থানে অর্থ-সামর্থ দেখাইবার সুবিধা ও পত্নী-সংগ্রহের সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এমনই বিবাহে—হিন্দুর শ্রাদ্ধ, পূজা, ক্ষৌর, উপবাস, মঙ্গলাচার, স্ত্রীআচার, কুলাচার, সম্প্রদান, গোত্রান্ত, যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও ব্রাহ্মণ-ভোজন, জ্ঞাতি-ভোজন, কাঙ্গালীভোজন—কত কিছু চাই; খ্রীষ্টিয়দের মধ্যে মাত্র বন্ধুগণ লইয়া, রেজেষ্টারী কর, চার্চ্চে যাইয়া একটু উপাসনা কর, পরে হোটেলে যাইয়া, কল্যাণার্থে মদ্য ও সুখাদ্য ভোজন করিয়া, নৃত্য করিলেই বিবাহ সম্পাদন হইল। মৃত পিতামাতাদির জন্য—হিন্দুর অশৌচাচার, হবিষ্যাদি চাই, শ্রাদ্ধেও কত আচার-বাহুল্য, অর্থব্যয়, উপবাস ও ক্ষৌরাদি শরীর-কষ্ট; কিন্তু খ্রীষ্টানমধ্যে মাত্র শোকবস্ত্র পরা ও শোক-সভা আহ্বান করতঃ মৃতের জীবনী আলোচনা করিয়া, কিছুধন কোনও দাতব্য-ভাণ্ডারে পাঠাইয়া, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইয়া দিলেই হইল। নবশিক্ষিতের এই ব্রাহ্ম-আন্দোলনে, হিন্দুর এই যত সব কষ্টকর বিধানগুলি তুলিয়া, প্রোটেষ্টাণ্ট মতের মতই সুখকর করিয়া, হিন্দুর-নব-আচার-বিধান গঠনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। সেইজন্য হিন্দুর জ্ঞানযোগ সাধনার, শুধু জ্ঞান-অংশ বেদান্ত-শাস্ত্রকে তাহাদের মতের সমর্থক করিয়া, খ্রীষ্টিয়মত—একমাত্র নিগুর্ণব্রহ্মের উপাসনা ও আচার হিন্দুমধ্যে প্রচারের চেষ্টা করা হয়। ইহাতে তাহারা, হিন্দুকে যে অন্য ধর্ম্মীগণ মূর্ত্তিপূজক, পৌত্তলিক ও বহুদেব উপাসক আদি বলিয়া নিন্দা করে, সেই দোষেরও বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের এই আন্দোলন সফল হইলে, হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট বর্জ্জিত হইয়া, ঠিক প্রোটেষ্টাণ্ট-খ্রীষ্টানের মত হইয়া

যাইত। এই জন্যই পরম-রসিক নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল ব্রাহ্মগণ-সম্বন্ধে গান রচনা করিয়াছিলেন। "হিন্দুমতে সাহেব হ'তে সতত যতন।" সত্যই তাহারা ইংরাজের আচারকেই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

জাত ও মৃতাশৌচ এবং নারীর আর্ত্তবাশৌচের প্রয়োজনীয়তা, বাইবেলের প্রাচীন-অংশে এবং মোহম্মদের উক্তিতেও স্বকৃত পাওয়া যায়। তাই এই কষ্টভোগে নিশ্চয় মানবের কোন প্রকার কল্যাণ হয়, স্বীকার করিতেই হইবে। মৃত পিতা মাতার জন্য সন্তানের হবিষ্য করা ও শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান ব্যবস্থা দ্বারা, হিন্দু-ঋষি সন্তানকে পিতা মাতার পাপাচারের ফলে, পর-জন্মের দুঃখ নাশ করা হইতে মুক্তি দানের পর্য্যন্ত অধিকার দান করিয়াছিলেন। তেমনি ভক্তি-পথে সগুণ, সাকার ঈশ্বর-সাধনা দান করিয়া, সেই নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার ও ভক্তবৎসলাদি গুণ-যুক্ত ও পিতা, ভ্রাতা পুত্রাদি আপন জনের মত দেখিয়া, সেবা করিয়া, ধন্য হইবার উপায় করিযা দিয়াছিলেন; ঐশ্বরীক-শক্তির সাহায্যে বিপদ ও দুঃখাদি বিনাশের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন; মানবকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের উপরে পঞ্চম-পুরুষার্থ—ভগবান-লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। জাতি-বিভাগ গড়িয়া বর্ণ-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ-দ্বারা, জন্মগত দৈহিক হীনতা-জন্য ধর্ম্ম-সাধনের বিঘ্ন বিনাশের উপায় করিয়া, সর্ব্বজাতিকে মুক্তি ও ভগবান-লাভের অধিকারী করিয়া ছিলেন। পৃথিবীতে অন্য সমস্ত-ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই সব তত্ত্বের অভাব। পুত্রদ্বারা অধার্ম্মিক-পিতার পারলৌকিক-কল্যাণ ও মুক্তির উপায় হয়, মানব ভগবৎ-দর্শনেরও অধিকার পায়, ও বর্ণ ধর্ম্ম, এ সব অন্য কোন ধর্ম্মেই স্বীকৃত হয় নাই। এই সব জ্ঞানই হিন্দু-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব; এই সব বিলোপ পাইলে হিন্দু-ধর্ম্মই বিলুপ্ত হইত।

পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্মপন্থীর ঈশ্বর-সাধনাই হিন্দুর নিগর্ভ-সাধনার মত, অব্যক্ত—অমূর্ত্ত-উপাসনা। হিন্দুর প্রকৃত-উপাসনা সগর্ভ—ব্যক্ত, মূর্ত্ত-উপাসনা। বাটীতে কেহ উপস্থিত হইলে যেমন কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে, তাহাকে সাদরে আসনে বসাইয়া, খাওয়াইয়া, বুঝাইয়া সেবা করে, হিন্দুও তাহার ঈশ্বরকে সাদরে যত্নে স্তুতি ও সেবাদি দ্বারা পূজা করে, শুধু চোখ বুজিয়া বসিয়া অনুভব করে না। পৃথিবীতে রাজাদের যেমন দুই প্রকার জীবন, একটী প্রজাধিপের প্রতাপ-যুক্ত প্রভুজীবন, অন্যটী গৃহপতির সংসার-স্নেহময় জীবন—ভগবানেরও তেমনি নির্গুণ ও সগুণ দুইটী অবস্থা আছে। নির্গুণ—জগন্নাথের প্রভুজীবন, সগুণ—ভক্তবৎসল কৃপাময়, প্রেমময় গৃহজীবন। রাজ-জীবনে রাজা যেমন আইনবিধান গড়িয়া প্রত্যেক প্রজাকে জানাইয়া দিয়া, কর্ম্মচারীর হাতে শাসনভার দিয়াই নিশ্চিন্ত; সেই রাজ্যে সর্ব্বপ্রজার জন্যই একবিধান, সকল কর্ম্মেরই ফল পুরস্কার ও তিরস্কার সকলে একরূপই লাভ করে—নির্গুণ ভগবানও তেমন সর্ব্বজীবে সমভাব-যুক্ত, কেহই তাঁহার প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই, তিনি সকলেরই রাজা, প্রভু, তাঁহার নিকট নিবেদনেও সকলের সমান অধিকার, তাই তাহাতে জাতিবর্ণের অধিকার-পার্থক্য নাই। এমন কি, এই পথে ঈশ্বর-উপাসনা, স্তবাদিরও প্রযোজন নাই; অপরাধহীন হইয়া, আইনমতে চলিলেই রাজা পরিতুষ্ট হইয়া পুরস্কার দান করিবেন। কিন্তু সেই রাজারই পারিবারিক-জীবনে কেহ তাঁহার শত্রু, তাহাকে তিনি শাস্তি দিতেছেন; কেহ মিত্র, তিনি তাহাকে আদর করিয়া পুরস্কার দিতেছেন; কেহ অনুগত, তাহাকে ভরণ পোষণ করিতেছেন; কেহ ভৃত্য, তাহাকে সেবাধিকার দান করিতেছেন; পিতা-মাতাকে

প্রণাম, সন্তানকে ক্রোড়ে গ্রহণ, বন্ধুকে আলিঙ্গন দিতেছেন. ও পত্নীকে শয্যা-সঙ্গিনী করিতেছেন। তিনি কাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন না, কাউকে বহির্বাটী, কাহাকে অন্তঃপুরেও যাইবার অধিকার দিতেছেন। ভগবানের সেই সংসার-রাজ্যে প্রবেশের সাধনাই হিন্দুর সগুণ মূর্ত্তি-উপাসনা-পথ। তাই এই সাধনার অধিকারী-বিভাগ রূপ বর্ণবিভেদের ও তাঁহার প্রিয়, অপ্রিয় দ্রব্য ও আচার-বিভেদের প্রয়োজন হয়। এই সাধনায় ভগবানকে আপনজনের মতই মূর্ত্তিভাবে লাভ করা যায়। এই জন্যই গীতায় ৯—২৯ বলিয়াছেন আমার নিকট সর্ব্বভূতই সম, কেহ দ্বেষ্যও নাই কেহ প্রিয়ও নাই সত্য, তবু ভক্তি-পথে যাহারা আমার ভজনা করে, আমি তাহাদের তাহারা আমার। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলিয়াছেন—কি অষ্টাঙ্গ-যোগ, কি সাংখ্য-জ্ঞান, কি বেদাদি-অধ্যয়ন, ত্যাগ—সন্ন্যাস গ্রহণ, কি তপস্যা, ইহার কিছুতেই আমায় তেমন ভাবে লাভ করিতে পারে না, হে উদ্ধব, ভক্তিপথে—সেবা পূজাদ্বারা আমাকে যেমন লাভ করিতে পারে।

> ন সাধয়তি মাংযোগ ন সাংখ্যং যোগ উদ্ধব।
>
> ন স্বাধ্যায় ত্যাগোস্তপঃ যথাভক্তি র্মমোর্জ্জিতা ॥

পত্রাবলীতে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি আছে—হিন্দু-পৌত্তলিক, হিন্দু পৌত্তলিক বলিয়া এক কলঙ্কের রোল উঠিয়াছে। যেই পৌত্তলিক-সাধনায়, বশিষ্ঠ, ব্যাস ও পরমহংসদেবের মত মানব গঠিত হয়, তাহা হিন্দুর কলঙ্কের দাগ নয়, গৌরবের অলঙ্কার। তাই হিন্দুর এই সাধনা বিনষ্ট হইলে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সাধনই বিলুপ্ত হইল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু যখন মনোরঞ্জন ঠাকুরতা, বিপিন পাল, অশ্বিনী দত্ত ইত্যাদির মত বঙ্গদেশের অনেক নবশিক্ষিত

মহৎসন্তানকে লইয়া, প্রাচীন ভক্তিবাদের সাকার-ভজনপথে ফিরিয়া আসিয়া ছিলেন। সেইকালে হেরম্বমৈত্র মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যেইকর্ম্ম

ব্রাহ্মগণ হইতে হিন্দুর অনিষ্ট

সাধন-জন্য অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব-ধনু দান করিয়া ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই উদ্দেশ্য-সাধন হইয়া গেলেই, অর্জ্জুন আর গাণ্ডীব উত্তোলন করিতে পারিলেন না। সকল হিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব সমুহ বুঝাইতে ভগবানই ব্রাহ্ম-পক্ষে হিন্দুর বিপক্ষে বক্তৃতা-শক্তি, আবার হিন্দুপক্ষে সপক্ষে বক্তৃতা-শক্তি দিয়া বক্তৃতা করাইয়াছেন তাঁহারি ইচ্ছায় সেই বক্তৃতায় লোক মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখন তাঁহার উদ্দেশ্য ফুরাইয়াছে তাই বক্তৃতার সেই শক্তি আর নাই ; সেই বক্তা আছে, কিন্তু তাহার কথায় তেমন মত্ত আর কেহ হয় না। ঈশ্বরের প্রয়োজনেই ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিল, আজ প্রয়োজন-হীন হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখনও যদি তাহাকে রক্ষার চেষ্টা হয়, মৃতদেহ রক্ষা করার চেষ্টার মতই, দলের পচন নিবারণ চেষ্টায় খাটিয়া মরিতে হইবে, জীবন আনয়ন আর হইবে না ; পঁচিয়া মানব সমাজের অনিষ্ট করাও অসম্ভব নয়। সত্যই ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা পরে হিন্দু-সমাজের বহু অনিষ্ট সাধনই হইয়াছে ও হইতেছে।

সেইদিন ভারতের মাত্র সহস্রেক যুবক লইয়া ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন নিরস্ত হইলেও, তাহারা খ্রীষ্টানমিসনারী ও রাজ-পুরুষগণের নিকট বেশ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন বলিয়া, রাজশক্তি তাহাদের মত গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মগণ সেই সুযোগে রাজ-পুরুষগণের সহায়তায় হিন্দুধর্ম্মের আচারের মার্জ্জনায় ব্রতী হন। তাহাদের পরামর্শে ও তাহাদের জনমতের সমর্থনে, রাজশক্তি আইনের সহায়তায় হিন্দুর

শাস্ত্রানু-শাসন, গৃহ ও সমাজ-শাসন এবং ব্রাহ্মণানুশাসনকে ক্ষুণ্ণ করিয়া, হিন্দুর শিক্ষায় ও শাসনে অসহযোগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহাতেই হিন্দুসভ্যতার ভিত্তিতে ক্রমে ছিদ্র হইয়া, তাহাতে অশ্রদ্ধা ও অনাচারের বন্যার জল প্রবেশ পূর্ব্বক, আজ তাহাকে এই হীন অবস্থায় আনিয়া ফেলাইয়াছে। সমস্ত সংস্কারই যে, তৎকালের ব্রাহ্ম-প্রধানগণের পরামর্শে ও সহায়তায় সম্পাদন হয়, সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মগণ আজও গৌরব অনুভব করেন। এই গুলি যে, গৌরবের কল্যাণ-দান নয়, মৃতদেহের দুর্গন্ধ ও বিষ-বায়ুর মত, হিন্দু সমাজকে মৃত ব্রাহ্মসমাজ মহা অকল্যাণই দান করিয়া ছিল. এতদিনে সেই কথা বলিবার কাল আগমন করিয়াছে; এখন সেই কার্য্য জন্য তাহাদের লজ্জিত হইতে হইবে। সেইদিন যাহারাই ব্রাহ্মমতের ও নব-সভ্যতার সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহারাই ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষি বলিয়া আজও নবশিক্ষিতগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হন, যাহারা সেই প্লাবনে হিন্দুত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদের নামও কেহ জ্ঞাত নহে, কিন্তু সত্য আবরিত থাকে না।

সেই নবশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মগণই ভারতে নব-সভ্যতা বরণের প্রথম পুরোহিত। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি, বিচার পদ্ধতি তাহারাই বরণ করিয়া লইয়াছেন। দেশীয় ভাষার স্থানে রাজভাষাকে প্রধান শিক্ষার ভাষা তাহাদের সমর্থনেই হইয়াছে; তাহাদের বক্তৃতা ও পত্রিকার প্রবন্ধে হিন্দুর আচার ব্যবহারের নিন্দা, কুব্যাখ্যায় হিন্দু-যুবকগণের বুদ্ধিভেদ আজও হইতেছে। যদিও লোকগণনায় তাহারা সর্ব্বভারতে পঞ্চ সহস্রাধিকও হন নাই: কিন্তু বিদেশ হইতে শিক্ষা-প্রাপ্ত জনগণকে হিন্দুসমাজ গ্রহণ না করায়, তাঁহারা সেই সমাজে আসিয়া পিতা-মাতার সঙ্গে যুক্ততা রক্ষা করিতেছেন—ইহারা ধর্ম্ম-

সাধনার কোনও ধার না ধারিলেও, তাঁহাদের নামযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ রাজশক্তির নিকট সুপরিচিত ও নবশিক্ষা-প্রাপ্ত যুবক যুবতীগণের নিকটও সর্ব্বদা সমর্থন-যোগ্য। তাই ব্রাহ্মদের কৃত কুৎসা নিন্দাকে যুবক যুবতীগণ অনেক সময় সাদরে গ্রহণ করে। এই হিন্দু-ভাবে অশ্রদ্ধ ব্রাহ্মগণ বড়-রাজকর্ম্মচারী ও নানা প্রকারে রাজ সরকারে প্রতিষ্ঠাবান বলিয়া, রাজ-সরকার তাঁহাদের কথাকে সত্য হিন্দু-সমাজের কথা বলিয়াই মনে করেন ; প্রাচীন হিন্দু-পন্থীদের কথা শ্রবণের প্রয়োজনই বোধ করেন না। এই সব সুযোগেই আজ পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মগণ দ্বারা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার বহু অকল্যাণ সাধন হইয়াছে। ইহাদের সহায়তায় রাজশক্তি কেমন করিয়া কি কি আইন গড়িয়া, হিন্দুর শিক্ষা, গৃহ-শাসন, শাস্ত্রানুশাসন, ব্রহ্মণ্যতা আদিতে আঘাত দিয়াছেন তাহা পরে দেখাইব, এখন নব-শিক্ষার আরও কয়টি আক্রমণের বিষয় সংক্ষেপতঃ প্রদর্শন করিতেছি।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মান্দোলনের মতই পাঞ্জাবে আর্য্যধর্ম্মনামে এক আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাহাও এই নব-সভ্যতার প্রাচীনের সংস্কার চেষ্টা। হিন্দুগণমধ্যে উপাসক-ভেদ—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদির ভিন্ননামে, রূপে ও উপচারে উপাসনা এবং আচার-ভেদ—যোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্তি পন্থীর আচার-পার্থক্যকে বিনাশের জন্য, ব্রাহ্মগণ যেমন বেদান্তের নির্গুণ ভগবানবোধক একব্রহ্ম উপাসনা স্থাপন করতঃ, সকল হিন্দুকে এক উপাসক, এক আচারী, এক নাম দান করিয়া সর্ব্ব হিন্দুর এক ব্রাহ্মনাম দান করিতে চেষ্টা করেন, এই আর্য্য-সম্প্রদায়ও হিন্দুকে ঋষি প্রবর্ত্তিত এক বেদাচারী বলিয়া এক আর্য্য নামদ্বারা সকল হিন্দুকে এক আচারী, এক উপাসক, এক নাম দিতে চাহিয়া

আর্য্য সমাজ আক্রমণ

ছিলেন। ব্রাহ্মগণ বেদান্তের শূন্য-ধ্যান ও প্রার্থনাকেই সর্ব্বহিন্দুর এক সাধনা করিতে চাহিয়াছিলেন; আর্য্যগণ বেদের যজ্ঞ-কাণ্ডকে এক মাত্র সাধনা নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। ইহারাও হিন্দুর সগুণ মূর্ত্ত্য-সাধনা এবং জাতিভেদাদিকে হিন্দুর অনার্য্যত্ব, অবতার তত্ত্বকে মহামূর্খতা মনে করিয়া, সর্ব্বদা কুৎসিত ভাষায় গালি দান করেন। ইহাদের সত্য-প্রকাশ-নামক গ্রন্থ, হিন্দুর সগুণ-সাধনা ও জাতি-ভেদাদির সরস কুৎসা দ্বারা রচিত। বাল্য-বয়সে প্রত্যেক আর্য্যপন্থী বালককে তাহা মুখস্থ করাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা হিন্দুতীর্থ-যাত্রি আদি দেখিলেই সুর ধরিয়া তাহা পাঠ করিয়া করিয়া, সর্ব্বদা হিন্দুদের প্রাণে দুঃখ দান করিতে মহাআনন্দ ও কৃতিত্ব বোধ করে। ব্রাহ্মগণের মত ইহারাও বক্তৃতায় গ্রন্থে ও পত্রিকায় সর্ব্বদা হিন্দু-আচারের হীনতা ও কুৎসা প্রচার করিয়া এবং রাজশক্তিদ্বারা বিরুদ্ধাচার করাইয়া, সর্ব্বদা হিন্দু-সভ্যতার মহা অপকার করিতেছেন। আর্য্য-সমাজ, ব্রাহ্মসমাজের পরে আক্রমণ করায়, কিছু কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, প্রায় লক্ষাধিক লোক তাহাদের সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আক্রমণ বেগও রোধ হইয়াছে। এখন ইহাদের মধ্যেই দলাদলী দেখা দিয়াছে। সনাতনী সম্প্রদায়ের শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী সত্যপ্রকাশের প্রতি কথার প্রতিবাদ ও দোষ-দর্শন করাইয়া, তেমনি সরস ভাষায় একটী গ্রন্থপ্রকাশ করিয়া, তাহার উত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। ইহারি চেষ্টায় উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে নব-শিক্ষার আর্য্য-আক্রমণ রোধ হইয়াছে।

শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী নামে একজন অসাধারণ শব্দ-শাস্ত্রদক্ষ পণ্ডিত ও বক্তা সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি শব্দ-শাস্ত্রের সাহায্যে শাস্ত্রবাক্যকে নানারূপে ব্যখ্যা করিতেন। ব্রহ্মদর্শী না হওয়ায় তিনি যশ-জন্য

পণ্ডিতগণকে বাক্য-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াই আনন্দ বোধ করিতেন। প্রচলিত মতের বিপক্ষ হইয়া তথাকার পণ্ডিতগণকে, বাক্য কৌশলে পরাজয় করাতেই তাঁহার আনন্দ ছিল। একবার জয়পুর যাইয়া, তথায় বিষ্ণুভজনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া তিনি রাজার নিকট বিচার প্রার্থী হইলেন। বিচারকালে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বাক্য-কৌশলে, সমস্ত বৈষ্ণব-পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া, শিব-উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। রাজা তাঁহার শিষ্য হইয়া, হস্তি ও অশ্বকে পর্য্যন্ত রুদ্রাক্ষ মালা ও ত্রিপুণ্ড্রে শোভিত করিলেন। কতদিন পরে অন্য রাজ্যে যাইয়া, তথাকার শৈব পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করতঃ আবার বিষ্ণুর উপাসনাকে তথায় প্রধান করিলেন ও রাজাকে বৈষ্ণবী-দীক্ষা দান করিলেন। ইহাতে জয়পুর-রাজা বিরক্ত হইয়া ইহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। তখন কাশীধামে আসিয়া তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিজয় করিবার জন্য তিনি সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় হিন্দুর মূর্ত্তি-উপাসনা, ও বর্ণ-বিভেদাদিকে বেদ-বহির্ভূত অনার্য্যাচার বলিয়া প্রমাণের জন্য তিনি দণ্ডায়মান হন। তিনি বেদের যজ্ঞ-কাণ্ড বিনা মূর্ত্তি-উপাসনা পরবর্ত্তী ঋষিগণ কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিতেও চেষ্টা করেন। হিন্দু-শাস্ত্রের বেদান্ত-গ্রন্থ বিনা পুরাণাদি শাস্ত্রকে বেদের অন্তর্গত বলিতে তিনি অস্বীকৃত হন। তিনি কেবল শব্দার্থদ্বারা প্রযোজন মত ব্যাখ্যা করিয়া, অন্যের প্রমাণ বচন নিরস্ত করিতে থাকেন। যেমন বেদের শ্রাদ্ধ-বিধানে পুরাণ পাঠের উল্লেখে, তিনি এই পুরাণ শব্দকে শাস্ত্র না বলিয়া, মৃতের প্রাচীন কাবন্যালোচনা ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার ব্যাখ্য কাশীর পণ্ডিত-মণ্ডলী গ্রহণ না করিলেও, নব-শিক্ষা প্রাপ্ত অনেকের নিকট বেশ উত্তম বোধ হইল। ইহারা সেই দয়ানন্দ স্বামীকে পাঞ্জাবে নিয়া, এই নব-আর্য্য-সমাজ গঠন পূর্ব্বক হিন্দু-

ধর্ম্মকে যুগানুযায়ী করিয়া গঠনের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। ইহারা সেই সাধনাকে সর্ব্বভারতে স্থাপন করিতে ও বৈদিক যুগের হিন্দু-গড়িতে, বহু অর্থব্যয়ে নানা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্ববর্ণকেই ব্রাহ্মণত্ব দানের চেষ্টায়, তাহাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সুফল প্রসব করিতেছে না। প্রায় শতবর্ষের চেষ্টায়ও, তাহাদের গুরুকুল নামক শিক্ষালয়ে, একটী আর্য্যগুরুও গঠন করিতে পারেন নাই। সগুণ-সাধনার অভাবে তাহাদের সম্প্রদায়ে একটিও বিনয়ী, ঈশ্বর-ভক্তের প্রকাশ হয় নাই, তাই ইহাদের চরিত্র, মহত্ত্ব বা সাধনশক্তি কিছুই হিন্দু-সাধারণের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সেজন্যই ইহাদের দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্ম ও সভ্যতার কোন উপকারই হয় নাই; বরং আরও একটী দল গড়িয়া লোক সংখ্যার হ্রাস করিয়াছেন এবং বিরোধ-বুদ্ধির হিংসা আনয়ন করিয়াছেন, আর শাস্ত্রের কুৎসা-প্রচার দ্বারা, সাধারণ হিন্দুর শাস্ত্র-শ্রদ্ধার বিলোপ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

আর্য্য-সমাজের পরে বর্ত্তমানে আরও একটী সংস্কারক-দলের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা বর্ত্তমান শুদ্ধি বা ছুৎমার্গ পরিহারকারী মত। শুদ্ধি শব্দের অর্থ—হীনবর্ণ ও অন্য ধর্ম্মিকে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ আচারের সাধনা দিয়া, শ্রেষ্ঠ, মহৎ হিন্দুর ব্রাহ্মণ তুল্য করিয়া ফেলিব ভাব, আর ছুৎমার্গ-পরিহার—শ্রেষ্ঠ-বর্ণগণ হীনাচারী হীন-বর্ণগণকেও, সমানে বসিবার, খাইবার, ইত্যাদি সুবিধা দেওয়ার ভাব।

শুদ্ধি ও ছুৎমার্গ পরিহার আক্রমণ

হিন্দু সভ্যতার যুগেও শুদ্ধি ব্যবস্থা ছিল। শুদ্ধি-ব্যবস্থায়ই ভারতের অজ্ঞান আচারহীন প্রাচীন মানবগণকে, প্রজাপতি ঋষিগণ-আচারবান আর্য্য-মানব করিয়া গঠন করেন। তাহাদের শুদ্ধি-ব্যবস্থায়ই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-বিভেদের, শাসন স্থাপিত হয়। ভারতের অজ্ঞ, অন্ত্যজ

পার্ব্বতীয় জাতিবর্গও হিন্দু-আচার ও সাধনা গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানবান ও চরিত্রবান হইয়া উঠে। বর্ত্তমান মোহাম্মদী ও খ্রীষ্টয়াদির মত, অন্যধর্ম্মীর স্বাতন্ত্র্য প্রাচীনত্বকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের আচার, বেশ, ভাষাকে বিলুপ্ত করিবার পক্ষপাতী ঋষিগণ ছিলেন না। তাঁহারা প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বর্ণকে পৃথক হিন্দু-পুরোহিত ও গুরু দান করিয়া, জ্ঞান, সাধনার শিক্ষা দানপূর্ব্বক, তাহাদের জাতীয় আচারকে ক্রমে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে টানিয়া তুলিয়াছেন। তাই একটী শ্রেষ্ঠাচারকে আদর্শ দিয়া, যেই জাতির দ্বারা যতদূর সম্ভব, ততটুকু করিয়া আর্য্যাচার আচরণ করিতেই তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। এই বিধানেই হরিজন, কোল, ভীল আদি হীনাচারী হইয়াও হিন্দুসমাজেরই লোক হইয়া আছে। আজ একজন ইউরোপীয় ও মোহম্মদীকে হিন্দু-দীক্ষা দান করিয়াই, শ্রেষ্ঠবর্ণের উপাধি সহ তাহাকে কর্ম্মাধিকার দানের ব্যবস্থা হইতেছে। দীক্ষা ত মাত্র বিদ্যারম্ভ, হাতে-খড়ি, পূর্ণ-শিক্ষান্তেই অধিকার দান হয়; পূর্ব্বেই অধিকার পাইলে আর শিক্ষা করিবে কেন? হিন্দু-শাস্ত্র-মতে প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বংশ বিনা অন্য সমস্ত মানবই শূদ্র-বর্ণ; বহু দিন আচার ও সাধনা ত্যাগী, হীনসঙ্গী ব্রাহ্মণ-আদিও শূদ্র। তাই যেই নব-দীক্ষিত বা সংস্কৃত হইবে, সকলেই শূদ্র হইতে পারেন, উচ্চবর্ণত্ব পাইতেই পারে না। বর্ত্তমান শুদ্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্য, হিন্দুকে খ্রীষ্টান আদির মত একবর্ণ, এক জাতিতে পরিণত করা ও এক-আচারী করা, হীনাচারীকে উন্নত করা নহে। তাই তাহাদের শুদ্ধির বর্ত্তমান নাম দুঃমার্গ-পরিহার, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচারী শ্রেষ্ঠবর্ণ আচার-ভ্রষ্ট হইয়া, হীনাচারী হীনবর্ণের সঙ্গে মিশিয়া যাউক। ইহাতে হীনবর্ণ শুদ্ধাচার গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ হইবে না, শ্রেষ্ঠবর্ণই হীনাচারী হইয়া অশুদ্ধ হইয়া পড়িবে। কেন না, শুদ্ধাচারের ত্যাগ ও কষ্ট হীনবর্ণের দেহের,

স্বভাবের অগ্রহণীয়, কিন্তু শ্রেষ্ঠবর্ণের দেহ হীনাচারের সুখ-স্বাধীনতা সহজেই গ্রহণ করিবে। এক মাত্র বিদ্যালয়ের ছুৎপরিহারের ফলেই, আজ শ্রেষ্ঠবর্ণের সন্তান, তাহাদের সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠত্ব,—দয়া, মমতা, শুচিতা, বিনয়, নম্রতা, শীলতা, গুরুবর্গ-নমনীয়তা, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, রাজ-শাসন, সমাজ ও শাস্ত্রানুশাসনের অনুবর্ত্তীতা আদি ভ্রষ্ট হইয়া, হীনবর্ণ-তুল্য নিতান্ত অভদ্র, উচ্ছৃঙ্খল ও সদা অপরাধ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বদিকে ছুৎমার্গ উঠিয়া গেলে দশবর্ষ মধ্যে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠাচার, নীতি ও ঈশ্বর-সাধনা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

**ছুৎমার্গ পরিহার**—অন্যবর্ণকে হীন না ভাবা, কোন প্রকারে হিংসা দ্বেষ না করা, এই মত ত হিন্দুধর্ম্মের ও সভ্যতার মূল-সূত্র। বৈষ্ণব মতে, কুকুরান্ত সর্ব্ব-জীবকেই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানিয়া সম্মান করিবে ; যে প্রতিমাতে বিষ্ণুর পূজা করে কিন্তু তাঁহার জীবরূপকে হিংসা করে, অশ্রদ্ধা করে, সে কখনও বিষ্ণুর কৃপা পায় না ; এইকথা ভাগবতে বর্ণিত আছে। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ, অহিংসা পরমো তপঃ—ইহা ত হিন্দুর শাস্ত্র-বাণী। হিন্দুর বিবাহ, শ্রাদ্ধ. দেব-পূজাদিতে সর্ব্ববর্ণ, বেশ্যাকে পর্য্যন্ত সেবা করাইবার ব্যবস্থা ; প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞে, প্রাণীযজ্ঞ একটী নিত্যকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। জ্ঞান-যোগীর পক্ষে যত্র জীব তত্র শিব, বিশ্বের সমস্তই সেই পরমব্রহ্ম, ভাবিবার ব্যবস্থা। কিন্তু এই ছুৎমার্গহীন সমতা অবস্থাই, সর্ব্বজীবে কৃপা, মৈত্রী, সমতা বা ব্রহ্মদর্শন, সাধনার চরম অবস্থায় মানব লাভ করিতে সক্ষম হয়। বুদ্ধদেব ত এই অহিংসা ও মৈত্রীর ধর্ম্মই জগতে প্রকাশ করিয়াছিলে। সেই ধর্ম্ম হিংসা ও অমৈত্রীর বৈরতা দোষেই বিনষ্ট হইয়া গেল না? মুখের স্বীকারে বা জলাদি আচরণ, বিবাহের বাধা বিনাশেই ছুৎমার্গ বিলোপ হয় না। হিন্দুর বর্ণ-দ্বেষের জন্য

মানবকে হীন বোধ, পরস্পরকে হিংসা-দ্বেষ করা কি, খ্রীষ্টিয় ও মোহম্মদী মধ্যে নাই? মুসলমান কি মুসলমানের প্রতি দ্বেষ ও অত্যাচার করে না? মুসলমান দস্যু কি মুসলমান বধ করিয়া ধনরত্ন লুঠিয়া নেয় না? একবর্ণ বলিয়া খ্রীষ্টানদের মধ্যে যুদ্ধ, বিগ্রহ, অত্যাচার, নির্য্যাতন, দ্বেষ ও হিংসা কি অল্প হইতেছে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভাবে জাতি-বিভাগ না হইয়া, অন্যধর্ম্মে তাহা অন্য প্রকারে পরিচিত মাত্র। যেমন খ্রীষ্টিয়গণ মধ্যে দেশভেদে জর্ম্মান, ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি ও মোহম্মদী মধ্যে মোগল, পাঠান, সৈয়দ, জাঠ, তুর্কী, আরব ইত্যাদি বিভাগ, ইহাদের মধ্যে বেশ শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট বোধের দ্বেষ আছে। বাহিরের দৃষ্টান্তে প্রয়োজন কি—হিন্দুর একবর্ণ মধ্যেও কি বংশের উচ্চতা নীচতা নাই? তাহাদের মধ্যে কি সকলকে সমভাবে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, সকলেই দিতে পারে? অন্য সমস্ত দেশেই বর্ণভেদ গুণগত—ধনবান ধনবানকে, জ্ঞানী জ্ঞানীকে, সুন্দর সুন্দরকে স্বজাতি বোধ করে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, নচেৎ স্বজাতিকেও শ্রদ্ধা করিতে পারে না। হিন্দুমতে তাহা এক বর্ণগত করিয়া আরও বৃহৎ দল গড়িয়া দিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, নির্দ্ধন, অজ্ঞান, কুসিৎ হইলেও পূজ্য; স্ববর্ণের লোক যেমনি হউক প্রতিপাল্য শ্রদ্ধাপাত্র; হীনবর্ণের কেহ সুশ্রী, জ্ঞানবান, ধনবান হইলেও, সে সম্মান ও কন্যাদানের অযোগ্য। খ্রীষ্টিয় বা মোহম্মদী হিন্দুর স্ববর্ণগ্রহণের মত সর্ব্বস্বধর্ম্মীকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় কি? হীনে অশ্রদ্ধা, মহতে পূজা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দোষ-গুণ বোধ থাকিতে হীনজ্ঞান, হীনাচারীকে সমভাবে শ্রদ্ধাসহ গ্রহণ অসম্ভব, তাহা কেবল ব্রহ্মদর্শী বা ঈশ্বর-ভক্ত দ্বারাই সম্ভব। নচেৎ সেই সমতা ও শ্রদ্ধা স্বার্থ-বুদ্ধিজনিত কপট ভান্ মাত্র। বর্ত্তমানের ছুৎমার্গ পরিহারও সেইরূপ বলিয়াই বোধ হয়। কেন না, যেই যুবকগণ মাতা, পিতা, ভ্রাতাদিগেই শ্রদ্ধা করে

না, ভালবাসে না, নিজের উপার্জ্জনের অংশ দিয়া পালনে কষ্ট বোধ করে, তাহারা যে সর্ব্ববর্ণকে শ্রদ্ধা ও সেবা করিতে উদ্যত, তাহাতে প্রেম, মৈত্রী, করুণার লেশও থাকিতে পারে না; নিশ্চয় স্বসুখ সন্ধান আছে; কেবল, আহার, বিহার ও বিবাহে স্বেচ্ছাচারের সুবিধা জন্য ছুৎমার্গ নাশের চেষ্টা। ইহারা ভোজন-কষ্ট ও শ্রমের সহায়তা জন্য যার তার হাতে খাইতে চাহে, অল্পব্যয়ে ভৃত্যের সুবিধা জন্য হীনবর্ণকে আচারণীয় করিতে চাহে, অর্থলাভ ও সুন্দরী নারীভোগ জন্য হীনবর্ণা ও বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে চাহে, এই কর্ম্মে ইহাদের হৃদয়ে একটুকু ত্যাগ, কৃপা বা প্রেমও নাই।

সত্য ছুৎমার্গ পরিহার বঙ্গদেশে হিন্দুর মধ্যে আমরা দেখিয়াছি। উচ্চবর্ণের জমীদার তাঁহার ভৃত্য ও গ্রামের হীনবর্ণ সকলকে, নিজের পরিজন জানিয়া সর্ব্বদা, প্রকৃত শ্রদ্ধা, ভালবাসা দিয়া সেবা ও পালন করিয়াছেন। একত্র একাসনে বসিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সখের যাত্রাদল গড়িয়া, হা-ডু-ডু খেলিয়া, ধরা-ধরি, গড়া-গড়ি করিয়াছেন। পূর্ব্বে গ্রামবাসী প্রত্যেকের সঙ্গে প্রতিবেশীর প্রত্যেকের ভ্রাতৃ আদি সম্বন্ধ থাকিত। গ্রামের উচ্চবর্ণের শিশুগণও, সেই সম্বন্ধ ধরিয়া, হীনবর্ণের বৃদ্ধগণকে কাকা, মামা ইত্যাদি ডাকিয়া, তেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। পিতার সময়ের ভৃত্যগণকে জমিদার-পুত্রও গুরুবর্গের সম্মান দিয়াছে; অক্ষম হইলে দয়া ও স্নেহ দিয়া প্রতিপালন করিয়াছে। ধনীর বাটীতে বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি উৎসবে, সর্ব্ববর্ণের গ্রাম্য লোক নিজের বাটীর মত সরল শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহার কর্ম্মের সহায়তা করিয়াছে; যেই বর্ণ দ্বারা যাহা সম্ভব তেমন কর্ম্মভার বাটিয়া লইয়াছে। বাটির কর্ত্তাও নিজের পরিজনের মত স্নেহ কৃপা দিয়া তাহাদিগকে আহার ও আনন্দ দানে সেবা করিয়াছেন। নবশিক্ষার জ্ঞানে আজ গ্রামের সেই সর্ব্ববর্ণ

মৈত্রতা ও প্রেমোৎসব বিলুপ্ত। আজ যে প্রত্যেকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র-জীব। পিতা, মাতা, শিক্ষককেই মানিতে চাহে না, তাহারা অন্যবর্ণকে সম্মান দিবে কি? এখন প্রবাস হইতে আসিয়া, কোন্ যুবক আনন্দে গ্রামবাসীর গৃহে গৃহে সকলকে দেখিতে ধাবিত হয়? মস্তক নত করিবার ভয়েই যায় না, তাহাতে যে অপরকে বড় স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বে গ্রামের প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসিত, যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সেবার আদান-প্রদান করিত। ধনী প্রতিগৃহে প্রচুর পান, মিষ্ট ও তৈল পাঠাইয়া, নিজের বাটীর বিবাহ সংবাদ গ্রামে দান করিত। দীন চণ্ডালও সামান্য কিছু পান ও চিনি পাঠাইয়া ধনী মনিবকে সংবাদ দিত; ধনবান শ্রেষ্ঠবর্ণ তেমন আদরে সেই পান-চিনি গ্রহণ করিয়া, খিয়লি-ছলে আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিবাহের খরচের সাহায্য করিত। বিজয়া-দশমীতে গ্রামের প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট যাইয়া সর্ব্ববর্ণে কোলাকোলি করিয়াছে; সমর্থগণ লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় সর্ব্ববর্ণকে লইয়া উৎসবসহ লাড়ু-মোদকাদি ভোজন করিয়াছে, পৌষে পিঠা, চৈত্রে ছাতু, জৈষ্ঠে আম-ক্ষীর ভোজন করিয়াছে। আজ সভা করিয়া, ঢোল বাজাইয়া, বক্তৃতার বাক্যচ্ছটায় হীনবর্ণের কর্ণ তৃপ্ত করিয়া, তাহাদের হস্তে জল ও একটু মিষ্ট গ্রহণ করিয়াই ছুৎমার্গ-পরিহারের সমাধা হয়। সেই সভার বাহিরে অন্ন-বস্ত্রহীন, ক্ষীণ-শীর্ণ হীনবর্ণের উপর চাবুক চালাইতে, বা মোটর চালাইতে, অথবা তাহাদের আশ্রয়ের কুটীরটী কাড়িয়া লইয়া খেলার মাঠ গড়িতে কুণ্ঠীত নয়। মহাপ্রভুর বঙ্গদেশে ছুৎমার্গ ছিল না, তাহা হইলে নরোত্তমদাসের ব্রাহ্মণ শিষ্য হইত না; চণ্ডাল মন্ত্রদানের অধিকার, অধিকারীপদ পাইত না। ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা হইতে, এই দেশে ছুৎমার্গের আবির্ভাব হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে বর্ণদ্বেষ, তাহাদেরই জাতিধর্ম্মের কুৎসা প্রচার হইতে উদ্ভব হইয়াছে।

হৃদয়ে ধর্ম্মের উন্মেষ বিনা, এই দেহাত্মবুদ্ধি-প্রকাশক শিক্ষায় পরিবর্ত্তন বিনা, এই দ্বেষ-বুদ্ধির বিলোপ অসম্ভব। বর্ত্তমানে ছুৎমার্গ-পরিহার করিতে যাইয়া, শ্রেষ্ঠবর্ণের সন্তানই তাহার শ্রেষ্ঠ আচার ছাড়িয়া, হীনাচারীর গুণ ও আচারের দ্বারা হীন হইয়া উঠিতেছে, আর হীনবর্ণও আচারে হীন হইয়াও শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়া, শ্রেষ্ঠ আচার জন্য চেষ্টা রহিত হইয়া উঠিতেছে। তাই ছুৎমার্গ পরিহার প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ আচার-পরিহার হইয়া পড়িবে। ইহার প্রচারে হিন্দুর সকল শ্রেষ্ঠ-বর্ণ মহত্ত্ব ও আচার ভ্রষ্ট হইয়া, এক হীনাচারী হীনবর্ণ হইয়া পড়িবে।

হিন্দুঋষি সর্ব্বহিন্দুর জন্য একটী পূর্ণাচারকে সদাচার নাম দিয়া, স্থাপন করিয়া, একমাত্র ব্রাহ্মণকেই তাহা পূর্ণরূপে আচরণ করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ, অন্য সমস্ত বর্ণে তাহা কিছু হীনভাবেও করিতে পারে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেমন নারীর আর্ত্তবাশৌচ ব্রাহ্মণের পঞ্চরাত্রিই পালিতেই হইবে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য চারি, শূদ্র তিন, অন্ত্যজ এক রাত্রি পালিতে হইবে বলিয়া শাস্ত্রীয় বিধান। কিন্তু পঞ্চরাত্রি পূর্ণাচার সকলেরই পালিবার অধিকার আছে। যে ব্রাহ্মণের পূর্ণাচার পালন করিবে, সে যেই বর্ণেরই হউক, সে সাধু ও বৈষ্ণব নামে সর্ব্ববর্ণের শ্রদ্ধা ও সম্মান-পাত্র হইবে। এইরূপ শ্রেষ্ঠাচারে রুচির উন্মেষ-জন্য, শ্রেষ্ঠাচারীকে হীনবর্ণ-সন্তানের পূজা করিয়া, যে যে বর্ণ শ্রেষ্ঠাচারী তাহাদের সম্মান ব্যবস্থা দিয়া, অনাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা, অনাদর প্রদর্শন দ্বারাই সমাজের কল্যাণ করিয়া ছিলেন; সকলেরই সমান মূল্য করিলে কখনও সমাজের কল্যাণ লাভ হইতে পারে না। এই দোষেই বর্ত্তমান শুদ্ধি বা ছুৎমার্গ-পরিহার পন্থী, সর্ব্বহিন্দুর শ্রদ্ধা পাইতেছেন না। ভোজন-সভায়, ধর্ম্মসভায়, ধর্ম্মপথী ও সদাচারীকে

সম্মান দেখাইয়া, অনাচারীকে পশ্চাতে নিম্নাসনে বসাইয়া, হীনাচারের অনাদর দেখাইলে,এবং হীনবর্ণের সদাচারীকেও শ্রেষ্ঠবর্ণের হীনাচারী হইতে অধিক সম্মান দেখাইলেই, সত্য ধর্ম্মপথের উন্নতি আনয়ন করিবে। ইহাতেই সমাজে **শুদ্ধি ও ছুৎমার্গ-পরিহার** সত্যরূপে আবির্ভূত হইবে।

নবশিক্ষার জ্ঞানে আজ ধর্ম্মসভার সভাপতি শাস্ত্রজ্ঞানহীন, ধর্ম্মাচার-হীন, ভোগী, নবশিক্ষিত বিষয়-প্রতিষ্ঠান্বিত ব্যক্তি—আইনজীবী বা রাজকর্ম্মচারী ; ধর্ম্মবক্তা ও মিমাংসক সাধন-রাজ্য বিমুখ বিষয়-প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। যাঁহারা কত ত্যাগ, কঠোরতা, সংযমের তপস্যা ও সাধনায় ধর্ম্মাচারকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা আজ ধর্ম্মের কেহই নহেন, তাঁহারা ইহাতে মত প্রকাশেরও অযোগ্য। আর যাহারা কোনও বিধান মানি না, শাস্ত্র আলোচনা ও সাধনা করি না, তাহারাই ধর্ম্মসংস্কারক, ধর্ম্মরক্ষক, ধর্ম্মাবক্তা ও মিমাংসক। যাঁহারা কত শৌচাদি শুদ্ধাচারের ও উপবাস আদি শরীর ক্লেশ সহিয়া, নিরামিশ ভোজন, সেবা ও পূজার নিয়ম-বিধানে চলিয়া, কত শ্রম-যত্নাদি করিয়া দেব-মন্দির গুলিকে রক্ষা করিতেছেন, বিগ্রহের সগুণ-প্রভা রক্ষা করিতেছেন, আজ তাঁহারা দেব-মন্দিরের অধিকারী নহেন ; যাহারা অর্থ, শ্রদ্ধা দিয়া, উৎসব পূজায় যোগদান করিয়া হিন্দু দেব-আরাধনা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারাও মন্দিরের কেহ নহেন ; যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, আচার নাই, কেবল উৎসবকালে তামাসা দেখিতে, অর্জ্জন বা জনসেবার নাম-কিনিতে মাত্র আগমন করেন, তাহারাই মন্দিরের কর্ত্তা, শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়াও স্বমতে বিধান-নির্ম্মাণের কর্ত্তা, প্রসাদ বণ্টণের কর্ত্তা। সকলেই তাহাদের মত হইলে, দেব-সেবা, তীর্থ-যাত্রা, যোগ-স্নান, দেবোৎসব কিছুই যে থাকিবে না, সমস্তই যে বিলুপ্ত হইবে। প্রাচীন-

বিশ্বাসী থাকাতেই তাহারা পূজা না দিয়া ও প্রসাদ পাইতেছে, তীর্থ যাত্রীর সেবার গৌরব পাইতেছে। তাহাদের মত আচারবান ও জ্ঞানবান হইলে, কে দেবপূজা দিবে, কেই বা তীর্থ-স্নানাদিতে যোগ দিবে। তাই বলিতেছি প্রাচীন আচারকে রক্ষা করিতে পারিলেই হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে। নব্যমতে সংস্কার করিলে সবই বিনষ্ট হইবে। সর্ব্ব ধর্ম্ম মধ্যেই অধিকাংশ লোক, মতে ধর্ম্ম মানিয়া, হীনভাবে আচরণকে রক্ষা করে। মোহম্মদী মধ্যে ও খ্রীষ্টিয় মধ্যে এমন অনেক জাতীয় লোক আছে, যাহাদের চরিত্র ও বুদ্ধি পশু হইতে একটুকুও উন্নত নয়, অথচ তাহারা মোহম্মদী ও খ্রীষ্টিয় বলিয়াই পরিচয় দান করে। মোহম্মদীর মধ্যে মুন্সী ও মৌলবীগণই পূর্ণাচারী, আর সাধারণলোক সামান্য-মাত্র আচার প্রতিপালন করে। প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টিয়দের মধ্যেও মিশনারিগণের হস্তে ধর্ম্মের সাধনা ও আচার দান করিয়া, সাধারনে সেচ্ছাচার পথে সুখভোগেই ব্যস্ত। ইহারা কেবল অর্থদান ও রবিবারে চার্চ্চে গমন দ্বারাই, সাধারণতঃ ধর্ম্মাচার রক্ষা করিতেছে। নবশিক্ষিতগণ ও তেমনি মতে হিন্দু-পন্থি হইয়া, ধর্ম্মবিধান ও আচার রক্ষার ভার, প্রাচীন-আচারী সনাতন পন্থীগণের হাতে সপিয়া দিলেই কল্যাণ হয়। প্রোটেষ্টাণ্টগণ যেমন অস্ত্রবলে রোমান-কাথলিক মতকে বিলোপের চেষ্টা করিযাছিলেন, নব্যগণের সেইরূপ মতি, তাহা ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের মহা অকল্যাণের কারণ। নব্যখৃষ্টিয় যেমন প্রাচীন কাথলিকমত বিলোপ করিতে সক্ষম হয় নাই, প্রাচীন হিন্দু-আচার ও তেমনি বিলুপ্ত হইবার নহে। প্রোটেষ্টাণ্ট যেমন পরে কাথলিকগণকে ও খ্রীষ্টান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, পৃথক মন্দিরে পৃথক বিধানে উপাসনা করিয়া, মতানৈক্য থাকিলেও, এক সমাজের বলিয়া পরিচয় দেয়; নব্যগণেরও তেমন পৃথকমন্দির গড়িয়া সার্ব্বজনীন সেচ্ছাচারের পূজার

দেবালয় স্থাপন করা উচিৎ; বলপূর্ব্বক পূর্ণাচারকে বিলোপ-চেষ্টায় তাঁহাদের কি প্রযোজন? মুষ্টিমেয় পূর্ণাচারীর সাধনায়ই বৌদ্ধ ও মোহম্মদী-প্লাবন হইতে হিন্দুত্বকে আবার সঞ্জীবীত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইযাছিল। সেই দিন যদি সামান্য কয়জনও পূর্ণাচারকে রক্ষা না করিত, তবে আব জাগিতে পারিত কি? রোম, মিসরাদিয় ধর্ম্মের মতই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত না?

প্রাচীন আচারকে লঙ্ঘন করিয়া নবসভ্যতা যত প্রকার জনহিত-কর ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সমস্তই যে মানব-সমাজের সর্ব্বদিকে অকল্যাণই অনয়ন করিয়াছে. তাহা পূর্ব্বে হিন্দু-শাসনের গুণ অধ্যায়েই প্রদর্শিত হইযাছে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম ও নব-শিক্ষিতগণ রাজশক্তি সহায়ে হিন্দুত্বের সংস্কার করিতে যাইয়া, কেমনে হিন্দুর শিক্ষা. শাসন, গৃহ-সুখ, সমাজ-সুখ সহ ধর্ম্মানুশাসন, ব্রাহ্মনানুশাসন আদিকে বিনষ্ট করিয়া হিন্দুসভ্যতাকে সংহার করিতে বসিযাছেন, এখন তাহাই আলোচনা করিব।

## আইন বলে হিন্দুর শাস্ত্রানুশাসনাদি বিলোপের সংবাদ।

১। **সহমরণ নিরোধ বিল।** বিশেষ পতিব্রতা হিন্দু-রমণী মৃতপতির দেহ দাহ-কালে, সেচ্ছায় সেই চিতায় প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিতেন: সতী-নারীর এই পতির সহগমন অধিকার রাজ-বলে নিষিদ্ধ করা হয়। নবশিক্ষিতগণ ও খ্রীষ্টীয়গণ এমন কঠোরভাবে পুড়িয়া মরাকে সেচ্ছাকৃত ভাবিতে অক্ষম হইয়া, বলপূর্ব্বক বিধবা-বধ হয় মনে করিয়াছিলেন, তাই এই ব্যাপারের নাম তাহারা সতী-দাহ করিয়া উহার বিলোপ করেন।

**২। সাগরে সন্তান-নিক্ষেপ নিরোধ বিল।** নিঃসন্তান পিতা-মাতা বরুণ-দেবকে সন্তানদানে পূজা করিবেন বলিয়া, মানস করিতেন ও সন্তান জন্মিলে সাগর-সঙ্গমে যাইয়া বরুণ-দেবের পূজা করতঃ, তাঁহাকে দিলেন বলিয়া সন্তানকে জলে ছাড়িয়া দিতেন, আর তৎক্ষণাৎ পুরুহিত সন্তান তুলিয়া লইতেন এবং পরে পিতা-মাতা পুরুহিতকে অর্থ দিয়া বিনিময়রূপে সন্তান লইয়া গৃহে ফিরিতেন। দৈবাৎ দুই একটী সন্তান প্রায়-বৎসরই তুলিতে পারা যাইত না, ডুবিয়া মারা যাইত। খ্রীষ্টান ও নব্যগণ সন্তানজন্য দেবতার মানতকে কুসংস্কার ও সন্তানদ্বারা পূজাকে বর্ব্বর শিশু-হত্যা ভাবিয়া, রাজ-বলে এইটি বিলুপ্ত করেন, তাই তাহারা ইহার নাম দেন সাগরে সন্তান নিক্ষেপ নিরোধ বিল।

**৩। সন্তানের সাবালক আইন।** প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান শাসনে, সন্তান চিরকাল পিতা-মাতার অধীন ছিল। পিতা-মাতা জীবিত থাকিতে তাহারাই গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। সন্তান বয়স্ক হইয়াও তাঁহাদের বিরুদ্ধাচার করিলে বা অবাধ্য হইলে, পিতা-মাতা পুত্রকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিতেন। পিতার অমতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারী পুত্র ব্যভিচারীতুল্য পিতৃসম্পদ বিচ্যুত হইত। খ্রীষ্টান হইলেও যেন সম্পত্তি পায়, এইজন্য খ্রীষ্টীয়-রাজশক্তি ও ব্রাহ্ম হইলেও যেন সম্পদ না হারায়, এইজন্য ব্রাহ্মগণ এই সাবালক আইন পাশ করিয়া, সঙ্কীর্ণ-জ্ঞান প্রাচীন-আচারী পিতা-মাতার শাসন কবল-হইতে, নবশিক্ষিত যুবক-যুবতীগণকে উদ্ধার করেন।

**৪। সর্ব্ববর্ণকে শিক্ষক ও উকিল হইবার অধিকার দান।** হিন্দু-শাস্ত্র-বিধানে ব্রাহ্মণবর্ণের পণ্ডিত বিনা শিক্ষক হইতে পারিত না এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিনা অপরাধের শাস্তি-

ব্যবস্থাদাতা উকিলের কর্ম্মও করিতে পারিত না। মুসলমান-রাজত্বেও হিন্দুর বিচার-ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ দ্বারা সম্পন্ন হইত, কোম্পানী রাজত্বের প্রথমেও এই ব্রাহ্মণ-জাতীয় জজ-পণ্ডিত বিচারব্যবস্থা দান করিতেন। মুসলমান মধ্যেও আচারবান পণ্ডিত-মৌলবিগণ মোহম্মদীগণের বিচার-ব্যবস্থা দিতেন, ও তেমন আচারী ও ধর্ম্মবিশ্বাসী বিনা শিক্ষক হইতে পারিতেন না। খ্রীষ্টীয় ও নব্যগণ, তাহা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হীনবর্ণের অধিকার হরণ বলিয়া পরিত্যক্ত হয় এবং পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলে সকলেই শিক্ষক ও উকিল হইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

৫। **হিন্দুর বিবাহ-বিধান সংস্কার।** ১। সহবাস সম্মতি আইন। ২। বিবাহের বয়স-নির্ণয়। ৩। বিধবা-বিবাহ বিল। ৪। সিবিল মেরেজ বা রেজেষ্টারী-বিবাহ। হিন্দুর বিবাহ-বিধানের বিপক্ষে এই চারি-প্রকার সংস্কার সাধন হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্ম-বিধানেই বিবাহকে, নর ও নারীর সহবাসের বৈধতা নির্দ্দেশ বুঝায়। তাই তাহার উপযোগী বয়স বিনা বিবাহ সম্পাদনের প্রযোজন তাহাদের হয় না, এবং তাহাতে উভয়ের সম্মতিরও প্রয়োজন হয়। হিন্দুর বিবাহ সেইরূপ নহে, তাই হিন্দুর বিবাহের নাম কন্যা-সম্প্রদান। হিন্দু পিতা, তাহার কন্যাকে একজনে সম্প্রদান অর্থাৎ চিরকালের জন্য দান করিয়া দেয়; সম্প্রদান শব্দের অর্থই সত্ত্ব ত্যাগপূর্ব্বক দান, তাই হিন্দু-কন্যাকে শ্বশুরকুল, পুষ্যপুত্র গ্রহণ করার মতই গোত্রান্তরিত করিয়া স্বকুলে গ্রহণ করেন; কন্যার পিতৃ-গোত্রাদির বিনাশ পায়, ভ্রাতার মৃত্যুতেও তাহার অশৌচ হয় না। এই জন্যই কন্যা বিধবা হইলেও হিন্দু পিতা কন্যাকে আর বিবাহ দান করিতে পারে না, বিধবা-কন্যা নিজে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে;

বিধবার শ্বশুর-গৃহই স্বগৃহ। পিতা-মাতার সর্ব্ব সময়েই সন্তানকে দানের অধিকার থাকে বলিয়াই, হিন্দু-বিবাহে বয়সের নির্ণয় ছিল না। নারীর শৈশব-বিবাহে তাহার উপর অত্যাচার হইতে পারে বলিয়া, এই সহবাস-সম্মতি আইন করিয়া, প্রথমে দ্বাদশ-বর্ষের পূর্ব্বে যেন নারী স্বামীর নিকট না যায় তাহার ব্যবস্থা হয়। হিন্দু মধ্যে দ্বিতীয়-বিবাহরূপ ঋতুসংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত, স্বামী-স্ত্রী একত্র হইবার নিয়ম ছিল না, তাই এই আইনে হিন্দুর অকল্যাণ হয় নাই। কিন্তু সেই আইনই দ্বিতীয় বিবাহের বয়স নির্দ্দেশে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ বর্ষের নারী ও অষ্টাদশ বর্ষের নর বিনা বিবাহই হইতে পারিবে না, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য সমাজের মত বিধবা বিবাহকে হিন্দু সমাজে প্রচলনের চেষ্টায়, বিবাহিত, বিধবা ও তাহার সন্তান বৈধপত্নী ও পুত্রেরমত পুরুষের সম্পদ অধিকারী হইবে বলিয়া যে আইন হয়, তাহাই বিধবা-বিবাহ বিল। আর হিন্দু মধ্যে অসবর্ণ ও অন্য-ধর্ম্মীর বিবাহের প্রচলন-চেষ্টায়, রেজেষ্টারী-বিবাহ স্থাপিত হইয়াছে। যে কোনও নর-নারী রেজেষ্টারী করিয়া মিলিত হইলে, স্ববর্ণ বিবাহের মতই একজনে আর-জনের সম্পদের বৈধ-অধিকারী হইবে বলিয়া আইন হইয়াছে।

৬। **প্রজাসত্ত্ব আইন**। প্র+জায়তে=প্রজা, সন্তানকে বুঝায়। রাজ্যবাসিগণ রাজার পুত্রতুল্য প্রতিপাল্য বলিই তাহাদিগকে রাজার প্রজা বলা হয়। হিন্দু ও মোহম্মদী-শাস্ত্রে প্রজাও পুত্রের মত চিরকাল রাজার সম্পূর্ণ-অধীন ছিল। তাই প্রজা রাজার অনুমোদন ব্যতীত নিজের ভূমিতেও প্রাসাদ নির্ম্মাণ বা জলাশয় খননের এবং তাহা দান-বিক্রয়েরও অধিকারী ছিল না। নব্যগণ অনিষ্টকর জুলুম বলিয়া রাজ-শক্তির সহায়তায়, প্রজাসত্ত্ব আইন গড়িয়া, ভূস্বামীর শাসন ও অধীনতা হইতে প্রজাগণকে বিমুক্ত, স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন।

এই বিলগুলির প্রত্যেকটি দ্বারাই হিন্দুর শাস্ত্রানুশাসনাদি বিলুপ্ত হইয়াছে, আর শিক্ষায় অসহযোগ ও শাসনে অসহযোগকেও বল-পূর্ব্বক বিনষ্ট করা হইয়াছে। প্রায় সপ্তশত-বর্ষ মোহম্মদী-শাসনেও হিন্দুগণকে যেই অবস্থায় আনিতে সক্ষম হয় নাই, মাত্র পঞ্চাশত-বর্ষে নবশিক্ষিত গণের প্রভাবে হিন্দু-সমাজের ততোধিক অনিষ্টসাধন হইয়াছে। তাহাদের কৃত শাস্ত্রের অপব্যখ্যা, শাস্ত্র-বিধানের কুৎসা, আচারের নিন্দা ও রাজশক্তির সাহায্যে বিল প্রণয়নই হিন্দু-সভ্যতার বর্ত্তমান পতনের কারণ।

**বিলের অপকারীতা।** সাবালক হইলে পিতা-মাতার বিরুদ্ধা-চারকারী, ধর্ম্মত্যাগী পুত্রও বংশগতসম্পদের অধিকার হারাইবে না, এই আইন দ্বারা, হিন্দুর গৃহ-শাসন ও কুল-শাসন অধিকার বিলোপ করিয়া, পারিবারিক-শান্তি বিনষ্ট করা হইয়াছে। যদিও খ্রীষ্টীয় এবং ব্রাহ্মগণ হিন্দু-সন্তান খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম হইলেও যাহাতে সম্পদহীন না হয়, সেইজন্য এই আইনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আইনে সর্ব্বধর্ম্মীর সন্তানকেই পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচার ও স্ব-সুখ জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে ইহা দ্বারা সংসারে পিতা ও পুত্রের ভালবাসা-বন্ধন, সন্তান দ্বারা পিতা-মাতার সুখের আশা তিরোহিত হইয়াছে। সেই জন্যই পিতা-মাতা আজ সন্তান জন্য যত্ন ও অর্থব্যয়ে কাতর হয়; তাই আজ বাধ্যতামূলক-শিক্ষাদি আইন গাড়িয়া সন্তানের শিক্ষা ও পালনের ব্যবস্থা রাজ-শক্তির গ্রহণ করিতে হইতেছে।

বিবাহ-সংস্কারক অইনগুলি দ্বারাও মানব-সমাজের অনিষ্ট এবং হিন্দুর শাস্ত্রানুশাসন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে অনেক দারিদ্র ও বিধবাদি কন্যার পালন ও শিক্ষা দানে অপারগ হইয়া, অল্পবয়সে

কন্যাকে কোনও সক্ষম-গৃহে বিবাহদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইত। অনেক দরিদ্র, পুত্রকে ধনী-গৃহে বিবাহ দিয়া সন্তানের শিক্ষা চালাইত। আজ বাল্য-বিবাহ বল-পূর্ব্বক নিরোধে সেই সুবিধা বিনষ্ট হইল। বাল্য-বয়সে পিতা-মাতাই বিবাহের কর্ত্তা ছিল বলিয়া, হিন্দু মধ্যে পূর্ব্বে অবিবাহিত নর ও নারী মিলিত না। বয়স্ক-বিবাহ প্রচলিত হইলেই, উভয়ের বিবাহ-সম্মতি প্রয়োজন হইবে, তাই শ্রেষ্ঠবিনা নির্গুণ কুৎসিতের আর বিবাহ হইবে না। বর্ত্তমানে ইউরোপে সন্ধান করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। ইউরোপে শত জনে মাত্র ত্রিংশৎ জনের বিবাহ হয়; আর সমস্তেই অবিবাহিত থাকিয়া ব্যভিচার-পথে জীবন কাটায়। যৌবন-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহ ও রেজেষ্টারী-বিবাহ প্রচার দ্বারা, নারীমধ্যে ব্যভিচার প্রসারই করিয়া দেওয়া হইয়াছে-হিন্দু-সভ্যতায় নারীর ব্যভিচার-নিরোধকে মানব-সমাজের সর্ব্বদিকের মহাকল্যাণের বিষয় নির্ণীত ছিল। সেই জন্য ব্যভিচারী স্ত্রী-পুরুষের বর্ণচ্যুতি, সম্পত্তি-চ্যুতি নানা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। নারী অনন্যভাবে পতিকে গ্রহণ করিয়া, সুখে দুঃখে শরীরের হস্তপদাদির মত সদা সাহায্য ও সেবাভার গ্রহণ করিলেই, মানবের সংসার-জীবন স্বার্থক হয়; মানবের সকল দিকের সুখ ও কল্যাণ বর্দ্ধন হয়। তাই হিন্দু-সভ্যতা প্রত্যেক নারীকেই তেমন পতিব্রতা সতী করিয়া গঠনের পক্ষপাতি হইয়া, সর্ব্বত্র সতীর পূজা ও অসতী, ব্যভিচারিণীর অসম্মান ও শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; বিবাহের বয়সাদিকেও তাহার অনুকূল করিয়া গঠন করিয়াছিলেন। যৌবন-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহাদির উৎসাহ দিয়া, নব-সভ্যতা সেই পাতিব্রত্য সাধনায় আঘাত করিয়াছেন, এবং বলপূর্ব্বক বিবাহসম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রানুশাসনকে বিনষ্ট করিয়াছেন।

এইরূপ সতীর সহমরণ-নিরোধ দ্বারাও শাস্ত্রানুশাসন বিলোপ ও নারীর কল্যাণ বিনষ্ট হইয়াছে। সহমরণ ও সন্তান-নিক্ষেপ বিলোপ দ্বারা, ব্যবহারতঃ হিন্দু-ধর্ম্মের বা সভ্যতার বিশেষ কোনও অনিষ্টই হয় নাই। কেন না, সহমরণ-ধর্ম্মের ব্যবহার কদাচিৎই ঘটিত, সন্তান-নিক্ষেপও তেমন বিরলই ছিল। সহমরণের মত জীবন্তে দগ্ধ হইবার প্রাণ ও সাহস, সহস্র বিধবার মধ্যেও দুই এক জনার হওয়াই সম্ভব। আর স্নেহের কন্যা, ভগিনীকে তেমন মৃত্যুবরণ করিতে, দিতে, মাতা-পিতাদি আত্মীয় কি সহজে প্রবৃত্ত হয়? অপর লোকেও ত বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না। তাই বর্ষমধ্যে কোনও প্রদেশে সহমরণ-ঘটনা দুই একটীই সংঘটিত হইত। সন্তান-নিক্ষেপ ঘটনা—বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান না হইলে, কোনও পিতা-মাতা সন্তানের জন্য এই বরুণ-পূজার মানস করিতেন। কেন না, নৌকায় সাগর-সঙ্গমে গমন, বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ ও মহা বিপদসঙ্কুল ছিল, নিজেদেরও প্রাণের ভয় সহ না না দেহ কষ্ট ছিল: তাতে সন্তানেরও মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল, তাই সহজে কেহ এ মানস করিতেন না। এই জন্যই বলিলাম, এই দুই অনুষ্ঠান-বিলোপে, হিন্দুর বিশেষ কোন সাধনায় হস্তার্পণ হয় নাই; মাত্র অতি-প্রাচীন দুইটীশাস্ত্র-সাধনা বিলুপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু সহমরণ-রোধে, হিন্দু নারীর পতিব্রতা-সাধনা সতী-ধর্ম্মের উৎসাহ বিলোপ হইয়াছে। হিন্দুনারী পতিকে কেমন ভালবাসিতেন সতী-ধর্ম্মের জন্য কত ত্যাগ ও দুঃখকে নারী বরণ করিতে পারিতেন, সেই আদর্শ বিনষ্ট হইয়াছে। এই সতীর সহমরণ-দৃষ্টান্ত ও তাঁহার সম্মান পূজা দেখিয়া, সমস্ত বর্ণের নারীই সতী হইতে প্রলুব্ধ হইত। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই. সতী-ধর্ম্ম বিনষ্টভয়ে রাজপুত নারী জহর-ব্রত করিয়া জীবন্তে দগ্ধ হইয়াছেন; মুসলমান সম্রাট-পত্নীর সুখ বিলাস

হইতেও সতীধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়াছেন। কোম্পানি রাজত্বের কালে একজন ফরাসী দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক, ভারতের বিভিন্ন-দেশে কতগুলি সতীর সহমরণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, স্বদেশে পত্র লিখিয়া জ্ঞাপন করেন। সম্প্রতি সেই পত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া, তাহার ইংরাজি ও বঙ্গানুবাদও বাহির হইয়াছে। কলিকাতা গুরুদাস লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, সহমরণ বিলোপে হিন্দু নারীজাতির কতবড় একটী মহাগৌরব—একাধারে ত্যাগ, বীরত্ব ও স্বামী-প্রেমের নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই কর্ম্ম সত্যই সতীর পতি-সহগমন ছিল, বিধবা-দাহ ছিল না।

সন্তান-নিক্ষেপ-সাধনা দাতাশিরোমণি মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে হিন্দুমধ্যে প্রকাশিত হয়। তিনিই পুত্র হইলে, পুত্রদ্বারা বরুণ-দেবের পূজা করিবেন বলিয়া মানস করতঃ পুত্র-লাভ করেন। পরে পুত্র জন্মিলে মমতাযুক্ত হইয়া বিলম্ব করিতে থাকিলে, পুত্র বড় হইয়া জানিতে পারিয়া পলায়ণ করে ও রাজা উদরী রোগগ্রস্থ হন। তখন পুত্র অর্থের দ্বারা বাধ্য করিয়া, নিজের বিনিময়ে এক ব্রাহ্মণ কুমারকে প্রতিনিধি করিয়া প্রেরণ করে। রাজা তাহার দ্বারা বরুণের তৃপ্তিজন্য নরমেধ যজ্ঞে ব্রতী হন। পুরোহিত বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণ-বালকের সভক্তি স্তবে বরুণ দেব তুষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মণ বালকের জীবন দান করেন ও রাজা রোগমুক্ত হন। যজ্ঞে অক্ষম হিন্দু-সন্তান, সাগর-সঙ্গমে বরুণদেবের পূজা করিয়া, সন্তানকে বরুণ-উদ্দেশ্যে সাগরে দিতেন ও পুরোহিত পুত্র রক্ষা করিতেন, এইরূপে এই ব্রত প্রবর্ত্তিত হয়। পিতা মাতা পরে পুরোহিতকে তুষ্ট করিয়া, স্বর্ণবিনিময়ে সেই পুত্রকে গ্রহণ করিতেন। সহমরণ-সাধনাও পৃথিবীর আদি-রাজা, আর্য্যত্ব-স্থাপয়িতা মহারাজ পৃথুর পত্নী অর্চ্চি হইতে ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়। স্বয়ং-লক্ষ্মীর অবতার

মহারাণী স্বচি পতীসহ চিতায় আরোহণ করিয়া ছিলেন বলিয়াই, আর্য্যগণ সেই আদর্শ গ্রহণ করেন। সেই আর্য্যত্বের স্থাপনকাল, হিন্দু-সভ্যতার জন্ম হইতে প্রচলিত হইয়া এই সাধনা নবসভ্যতার করে বিলুপ্ত হইল। যাহাতে সাগরে-নিক্ষিপ্তসন্তানের মৃত্যু না হয় তাহার ব্যবস্থা করিযাই, সন্তান-নিক্ষেপ-সাধনা রক্ষা করা যাইত। বরুণ-দেবের মানসে সন্তান লাভ হইতে পারে, এই বিষয়ে খ্রীষ্টীয় ও নব-শিক্ষিতগণের বিশ্বাস ছিল না, তাই এই সাধনাকে হিন্দুর কুসংস্কার, বর্ব্বর-শিশুহত্যা ভাবিয়া ইহার বিলোপ করেন। সহমরণ বিষয়ে ও নারী কখনও স্বেচ্ছায় মৃত-পতির সহিত পুড়িয়া মরিতে প্রস্তুত হইতে পারে, এই বিষয়ে অবিশ্বাসী হইয়াই খ্রীষ্টিয় ও নবশিক্ষিতগণ তাহাকে সতীদাহ নাম দিয়াছিল এবং হিন্দুর বর্ব্বর-নারীহত্যাকে বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়াছিল। বিধবার সম্পত্তির লোভে জ্ঞাতিগণ তাহাকে প্ররোচনা দিয়া বধ করে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু সহমরণব্যপারে তাহা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। তাই সহমরণে সতীকে বিশেষ-পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া, এই সাধনাকেও রক্ষা করা যাইত।

**সহমরণ**—বিশেষ-দেবপ্রকৃতি পতিব্রতা-রমণী পতির দেহত্যাগ ঘটিলে, তাঁহার দেহকে ক্রোড়ে লইয়া জ্বলন্ত-চিতায় প্রবেশ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতেন, তাহারি নাম সতীর সহমরণ। কদাচিৎ কোনও সতী এই সাধনে প্রস্তুত হইত। এই সংবাদ প্রকাশ হওয়া মাত্র, যাহারা শুনিত তাহারাই যুবক, যুবতী, বালক ও বৃদ্ধ দেখিতে ধাবিত হইত। ব্রাহ্মণ-সধবাগণ তাঁহাকে স্নান করাইয়া ললাটে হিঙ্গুর, পায়ে আলতা পরণে রক্তচেলীর বস্ত্র পরাইয়া, ফুলমালাদ্বারা সাজাইয়া দিতেন ; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে মন্ত্রজলে অভিষেক করিয়া, বেদের

দেবীসূক্ত পাঠ করতঃ স্তব করিতেন। সর্ব্বসাধারণ সতীর জয়ধ্বনি করিয়া ধুলায় লোটাইয়া প্রণাম করিত, তাঁহার গমন-পথের ধুলি লইয়া গায়ে মাখিত। বাদ্যকরগণ বিনা-আহ্বানেই যন্ত্র-সহিত আসিয়া বাদ্য বাজাইতে থাকিত, কীর্ত্তন-কারীগণ কীর্ত্তন করিতে থাকিত, জ্ঞাতিগণ সতীকে যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া কান্দিতে কান্দিতে বিদায় দান করিতেন। সতী স্বর্গের দেবীর মতই, যেন অগ্নিময় স্বর্ণরথে উঠিয়া পতির সহিত পরমধামে গমন করিতেছেন ভাবে, মহিমা-মণ্ডিত সহাস্য, প্রশান্তমুখে সমাগত জনগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চিতায় আরোহণ করিতেন। সেই সহমৃতার ভস্মাবশেষ সমাগতজনগণ কণা কণা করিয়া বাঁটিয়া গৃহে লইয়া যাইতেন; মূল্যবান-পাত্রে রাখিয়া প্রত্যহ তাহাকে ধূপ-দ্বীপ দিয়া পূজা করিতেন। সেই ভস্মটুক গৃহে থাকিয়া, প্রতি গৃহস্থ-রমণীর মনে সতীত্বের মহিমা, সতীর সম্মান ও পূজার কথা জাগাইয়া, সর্ব্বদা রক্ষা-কবচের মত হইয়া, নারীগণকে সতীত্ব ও পাতিব্রত্য-পথে রক্ষা করিত। তাই এই সহমরণের বিলোপে, নারী-সমাজের একটি মহাকল্যাণ বিনষ্ট হইয়াছে। একটী সহমরণে ২০।২৫ সহস্র লোক পর্য্যন্ত একত্র হইয়া সেইকর্ম্ম সম্পাদন করিত, তাই তাহাতে অত্যাচার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তবে গোপনে বিধবা-হত্যা করিয়া, সহমরণ গিয়াছে বলিয়া, রক্ষা পাইবার চেষ্টাকরা অসম্ভব নয়; সেইরূপ হত্যাকে কে বারণ করিতে পারে। এইরূপ বালিকার উপর বলপ্রয়োগ নিবারণ জন্য বাল্যবিবাহ নিরোধের চেষ্টা হয়। হিন্দুর মধ্যে সেই অত্যাচার ত অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া ছিল না যে, তাহা নিরোধ প্রয়োজন হইল? আর এই বল-প্রয়োগ কি কেবল স্বামীদ্বারাই ঘটে, না অন্য-পুরুষ দ্বারাও সংঘটিত হয়? এই পশুতা পৃথিবীতে সর্ব্বদেশেই বর্ষে দুই একটি সম্পাদন হয়

না কি? এই আইন হিন্দু চরিত্রে একটী কলঙ্ক অঙ্কিত করিয়াছে। মানবকে জ্ঞান-দানে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে, রাজশাসনে সমাজ হইতে পশুতার বিলোপ করা যায় না। এই বিষয়ে স্বামী শ্রীবিবেকানন্দজির কথাটী বড়ই সুন্দর মীমাংসা। (তাঁহার পত্রাবলী)।

ইংলণ্ডে বাসকালে কয়েকজন স্বামীজিকে প্রশ্ন করেন যে, হিন্দু-ঋষিগণ মহাপ্রাণ ও জীবের প্রতি অশেষ করুণাশীল ছিলেন বুঝা যায়। এ হেন ঋষিগণ হিন্দু-বিধবার প্রতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দারুণ-কষ্ট দান করিলেন কেন? বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহকে কেন তাঁহারা সমর্থন করিলেন না? স্বামীজি উত্তর করেন, মানব যতকেন সুচিন্তা করিয়া কোনও বিধান প্রণয়ণ না করুক, তাহা সকলের পক্ষে কল্যাণকর হইবেই না। তাই যাহা অধিকাংশের কল্যাণ-কর তাহাই বিধান করা উচিৎ! ভারতে নারীগণমধ্যে শতকরা ত্রিংশতজন বিধবা আছেন, তাহাদের মধ্যে মাত্র দশজন অকালে বিধবা; যাহাদের বিবাহ হইলেই ভাল হয়। নারী-সমাজের কল্যাণ জন্য এই দশজনের কষ্টকে তাঁহারা চিন্তনীয় মনে করেন নাই। ইউরোপ ত নারী-সমাজকে সুখী করিতে অনেক ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারা সকল নারীকেই সুখী করিতে পারিয়াছেন কি? বিধবা-বিবাহ-বিধান না থাকায়, ভারতের কোন কোন গৃহ বাল-বিধবার অশ্রুজলে সিক্ত হয় বটে; আমি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, তাহার সর্ব্বগৃহই অবিবাহিত-যুবতীর তপ্তশ্বাসে দগ্ধ। বাস্তবিক পাশ্চাত্যে শতকরা ত্রিংশত-জনা নারীর মাত্র বিবাহ হয়, আর সমস্তেই কুমারী থাকিয়া বৈধব্য ভোগই করে, নচেৎ ব্যভিচারে জীবন-যাপন করে।

সহমরণ ও সন্তান-নিক্ষেপে সামান্য কতজন নারী ও শিশু

হত্যার সমর্থণ করিয়াছে বলিয়া, হিন্দুসভ্যতাকে কুসংস্কারী, বর্ব্বর, হত্যাকারী বলিয়া অভিহিত করা হয়; শাসনবলে নিরোধ করা হয়। নব সভ্যতার প্রভাবে ভ্রূণ-হত্যা, আত্ম-হত্যা ও যন্ত্র-জনিত হত্যা কিরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার বাৎসরিক তালিকা দেখিলে, যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যা বলিয়া মনে হয় না কি? পাশ্চাত্যের যেই সব সহরে যত অধিক নব-সভ্যতার প্রভাব, তাহাদের এক এক সহরে প্রতিবৎসর বহুলক্ষ ভ্রূণ-হত্যা হয়। আবার ইহার অধিকাংশই অবিবাহিত যুবতীগণের ব্যভিচারের ফল। আত্মহত্যাও, ভারত হইতে সেই সব দেশে অনেক অধিক। তাহার উপর নব-সভ্যতার বিলাস-যান মটোরে ও বস্ত্রশিল্পের যন্ত্র-পেষণে সহস্র সহস্র লোকের প্রত্যহ মৃত্যু ঘটিতেছে। তবু নবসভ্যতার বিধান সুসংস্কৃত, মানব-কল্যাণময়, আর প্রাচীন হিন্দুর বিধান নিন্দিত, বর্জ্জনীয়। হাইকোর্টের উকিল শ্রীচারু চন্দ্র মিত্রের বাল্য-বিবাহ-সমর্থক পুস্তিকা ও তাঁহারি প্রদত্ত ১৩৪০ সনে মাসিক বসুমতীতে দেওয়া প্রবন্ধে, পাশ্চাত্যের কোন্ সহরে বর্ষে কতটি করিয়া ভ্রূণ হত্যা হয়, সেই দেশের সরকারী রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে। এক লণ্ডন ও ওয়াসিংটন সহরেই বর্ষে বহু লক্ষ ভ্রূণ-হত্যা হয় বলিয়া তাহাতে বর্ণিত আছে।

সর্ব্ববর্ণকে শিক্ষক ও উকিল হইবার অধিকারের অপকারিতা পূর্ব্বে শিক্ষা ও বিচার-সমস্যায় আলোচিত হইয়াছে। আর **প্রজাসত্ত্ব আইনে,** ভারতের সুখশান্তিময় স্বাধীন-প্রজাজীবনের একেবারে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। বালকের হস্তে জ্বলন্ত-অগ্নিশলাকা প্রদান করিলে, সে যেমন নিজের গাত্রবস্ত্রেই সেই অগ্নি জ্বলাইয়া, নিজের দেহ ও গৃহ সহিত সর্ব্বপ্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব পোড়াইয়া সর্ব্বনাশ করে—অজ্ঞ প্রজাকুলও স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ভোগ করিতে যাইয়া, মাত্র

দশবর্ষ মধ্যে নিজেদের নীতিময়, স্নেহময়, অনার্য্যের শান্ত-স্বভাবের সহিত নিজেদের ধন, সম্পদ, সুখ, শান্তি বিনষ্ট করিয়া, সমাজের কল্যাণও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। স্বভূমির বৃক্ষের স্বাধীন-মালিক হইয়া, সমস্ত ভূমিকে ফলবান-বৃক্ষ হীন করিয়াছে; ভূমি হস্তান্তরের মালিক হইয়া, সর্ব্বভূমি ঋণদাতা ও উকিল মোক্তারের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে আজ প্রজাকুল কেবল জমীদারের শাসন হইতে মুক্ত নহে! ধন, সম্পদ, গৃহ বন্ধন মুক্ত হইয়া, ঈশ্বরের মুক্ত-আকাশতলের অধিবাসী হইয়াছে। ভূমি হস্তান্তরের মালিক হইয়া, ভোগবিলাসে পিপাসা মিটাইতে, টিনের ঘর, দালান, বড় গরু, বিলাসদ্রব্য, উত্তম ভোজনে ও ক্রোধবসে জেদে ভূমির দর বাড়াইয়া, বিবাদে মোকদ্দমায় আজ সমস্তপ্রজাই ঋণে ডুবিয়াছে; সম্পত্তির মূল্য হইতেও ঋণের পরিমান অধিক। আজ সমস্ত ভূমিই ধনী বা যৌথকৃষির হইবে, আর প্রজাগণ ইউরোপের দরিদ্র-গণের মতই, আশ্রয় ও জীবিকাজন্য মানব হইয়া হীনপশুতুল্য কুলি-জীবন গ্রহণ করিবে, না হয় বেকার-সমস্যা হইয়া দেশের উপদ্রব স্বরূপ হইবে।

হিন্দুধর্ম্ম যায় যায় বলিয়া নব-শিক্ষিতগণ এক রব তুলিয়াছেন, এবং তাই নব-সংস্কার করিয়া হিন্দুত্বকে রক্ষার জন্যও তাহারা চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। যাহারা যেই দেশের, তাহারা সেই দেশের সংবাদ মাত্র জানেন। তাই নব্যগণ তাহাদের আদর্শেই সর্ব্ব হিন্দুকে তেমন বোধ করিতেছেন। পত্রিকা, বক্তৃতা, গ্রন্থপ্রকাশ, সভা সমিতির হৈ চৈ সব তাহাদের হাতে, তাই তাহাদের কথাই সকলে জানে। প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতদের ইহার একটীও নাই, মুখ বুজিয়া দ্বারবদ্ধ-গৃহে তাঁহাদের সাধনা; তাই সেই রাজ্যের কোনও খবরই পাওয়া যাওয়া না। কিন্তু হিন্দুমধ্যে নবশিক্ষিত

হিন্দু সভ্যতাকি ধ্বংসপ্রায়

এখনও শতকরা দশ জনের অধিক নয়। মাত্র তাহারাই হিন্দুর দীক্ষাদি সংস্কার ও শৌচ সাধনাদি আচারহীন। ইহারা দেব-মন্দিরে যায় না, তীর্থ-যাত্রা, যোগ-স্নানাদিতেও যোগ দেয় না. কখন যাইলেও হৈ চৈ নাম কিনিবার জন্য বা পত্রিকায় প্রকাশ-জন্যই গমন করেন। প্রাচীন-বিশ্বাসী প্রাচীন-আচারী জনের এখনও অভাব হয় নাই। নব্যগণ-বিনা প্রায়হিন্দুই, হীনবর্ণ—চণ্ডালাদি পর্যান্ত প্রাচীন-বিশ্বাসী, আচারী, দীক্ষিত, ও নিত্য সাধনা-রত। সেই বিশ্বাসীগণের শ্রদ্ধা-দত্ত সেবা উপহারে এখনও ভারতে কোটী কোটী দেবমন্দিরের পূজা ও উৎসব সম্পন্ন হয়। এখনও গ্রামে গ্রামে দেবোৎসবে শত শত গ্রাম-বাসী উপবাসী থাকিয়া, নানা দ্রব্যে দেবতাকে শ্রদ্ধাসহ পূজাকরে; এখনও প্রতিবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষৌর, উপবাস, দান, পূজা ব্রাহ্মণ-সেবা, পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে, শ্রদ্ধাসহ তীর্থ-যাত্রায় ধাবিত হয়; এখনও যোগস্নানে, কুম্ভমেলায়, গ্রহণ-স্নান করিয়া প্রাচীন-সাধক সন্ন্যাসী গণকে পূজা করিতে, একস্থানে বিংশতি লক্ষ লোকের পর্য্যন্ত সমাগম হয়। এখনও কাশী, কাঞ্চি, বৃন্দাবনাদি তীর্থক্ষেত্রে, পবিত্র সাধনময় জীবন-লইয়া, বহু লক্ষ লোক তীর্থবাসী হইয়া আছেন; এখনও প্রতিগ্রামে আচার-বান ঈশ্বর-সাধকের অভাব হয় নাই। এখনও সাধনপন্থী বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসী দেখিলে, নবশিক্ষিতবিনা হিন্দু-গৃহস্থ শ্রদ্ধায় সেবা করিয়া নিজকে কৃতার্থ বোধ করে। লোকগণনায় জানা গিয়াছে, এখনও ভারতে ষষ্টিলক্ষ গৃহত্যাগী, কেবল ঈশ্বর-পথী সন্ন্যাসী সাধক আছেন। নবশিক্ষিত মধ্যেও অনেক এম, এ, আদি উচ্চশিক্ষিত, বড় রাজকর্ম্মচারী হইয়াও সব ত্যাগ করতঃ প্রাচীন সাধন-পথ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এখনও প্রাচীনপথে সাধনায় সিদ্ধ-পুরুষ, পরমহংসদেব, গোস্বামীপ্রভু, গম্ভিরানাথ, ভোলানন্দাদির পায়ে

মস্তক বিকাইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাচীন-সাধনামত ও মন্ত্র গ্রহণ করতঃ, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী, নবশিক্ষিতও সাধন করিতেছেন; এইদিকের বিষয় সন্ধান করিলে, কে বলিবে হিন্দুর ধর্ম্ম-সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ, লুপ্তপ্রায়? তবে অনেকেই পূর্ণ প্রাচীনাচার রক্ষা করিয়া চলে না বটে; তাহা কোন ধর্ম্ম পথেই থাকে না। অধিকাংশ লোকই মতে ধর্ম্মগ্রহণ করে; পূর্ণ-সাধক অতি অল্পই হয়। হিন্দু-শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে, লক্ষ লক্ষ মানবমধ্যে দুই এক জনের ধর্ম্মের দিকে মতি জন্মে, সেই মতিমান সহস্রমধ্যে একজন শুনিতে যায়, শ্রবণ কারীর সহস্রমধ্যে এক জন আচরণে শ্রদ্ধাপায়, সেই আচরণকারীর সহস্রে একজন পূর্ণাচারী হয়, সেই আচারে সিদ্ধ হয়; তাঁহার সহস্রে একজন ব্রহ্মবেত্তি হয়, ভগবানকে জ্ঞানে বুঝে; তাঁহাদের সহস্রে একজন ভক্তি লাভ করিয়া ভগবানকে পায়। গীতায়ও আছে সহস্র লোকমধ্যে কেহ কেহ যত্নবান হয়, তাঁহার সহস্রে কেহ সিদ্ধ ও সিদ্ধের সহস্রে একজন বেত্তি হয়। তাই বলিলাম অনেকের হীনাচার দ্বারাও ধর্ম্ম বিলোপের পথে যায় না; যদি আদর্শ স্থির থাকে ও তাহাতে জাতির শ্রদ্ধা থাকে। তবেই রাত্রির পরে দিনের মত, নানা আক্রমণ রোধ করিয়াও পূর্ণ ধর্ম্ম ও আচার আবার একদিন জাগিয়া উঠে।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ গীতা ৭-৩

প্রজাসত্ত্ব আইনের দোষ ভূমিকার শেষ দেওয়া হইল।

---

# সপ্তম অধ্যায়।

## যুগ মন্বন্তরাদি কালবিভাগ সংবাদ

প্রবন্ধ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে হিন্দুর কালবিভাগ-তত্ত্বের সংবাদ আলোচনার প্রয়োজন বোধ হইল। গ্রন্থে অনেক স্থানে যুগ, মন্বন্তরাদি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, অথচ তাহা কি, তাহা বুঝান হয় নাই, তাই এই স্থানে তাহার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা হউক।

বর্ত্তমানে আমরা যেমন শকাব্দ খ্রীষ্টাব্দ ইত্যাদি নামে একটী শতাব্দী রূপ কালবিভাগদ্বারা, অতীত ঘটনার ইতিহাসাদি নির্ণয় করি, হিন্দুশাস্ত্রে ঋষিগণ পরার্দ্ধ, কল্প, মন্বন্তর ও যুগ নামক কালবিভাগ করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু জ্যোতিষগণের পঞ্জিকা-গণনায়ও এই যুগাব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুগাব্দ সাহায্যে হিন্দু জ্যোতিষ তিথি আদি গণনা সাধন করেন। শ্রীচণ্ডী-গ্রন্থে দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্লোকে আছে, বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে, দ্বাপরের শেষে যশোদা-গর্ভে উৎপন্ন হন। স্কন্দ পুরাণ প্রবাসখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায়ে বর্ত্তমান চন্দ্রদেবের জন্ম সংবাদে, তাঁহার ও কতিপয় বিষ্ণু-অবতারের আবির্ভাব-কাল বর্ণিত আছে; তাহাতে পরার্দ্ধ, কল্প, মন্বন্তর ও যুগ দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ দেখা যায়। অনুবাদ—বর্ত্তমানে দ্বিতীয়-পরার্দ্ধ চলিতেছে। তাহার শ্বেত-বরাহ কল্পে, বৈবস্বত মন্বন্তরে অধুনা যেই চন্দ্র বিদ্যমান, তিনি এই মন্বন্তরের দশম-ত্রেতায় বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার দত্তাত্রেয় সহিত উৎপন্ন হন। একোন-বিংশ-ত্রেতায় ষষ্ঠঅবতার ক্ষত্রান্তক রাম জমদগ্নি হইতে জন্মেন। চতুর্বিংশ-ত্রেতায় সপ্তম-অবতার রাবণারি শ্রীরাম দশরথের ঘরে জন্মেন। অষ্টাবিংশ দ্বাপরে অষ্টম-অবতার ব্যাসদেব পরাশর হইতে জন্মগ্রহণ

করেন। সেই অষ্টাবিংশেই দ্বাপরের শেষ, ধর্ম্ম প্রায় নষ্ট হইতে বসিলে, দেবকী ও বসুদেব হইতে নবম অবতার শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলে উৎপন্ন হন। ৬৮ শ্লোক হইতে ৭৮ শ্লোক পর্য্যন্ত ১০ শ্লোকে বর্ণিত আছে। তাই এই পরার্দ্ধাদি কালবিভাগ তত্ত্বটি কি, হিন্দু-শাস্ত্র পাঠকারী সকলেরই জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

দ্বিতীয়েতু পরার্দ্ধেঽস্মিন বর্ত্তমানেন বেধসে।
শ্বেত কল্প্যাৎ সমারভ্য যদ্বরাহ গোচরম্॥
বৈবস্বতে ঽন্তরে প্রাপ্তে যশ্চন্দ্রং বর্ত্ততেঽধুনা।
ত্রেতা যুগেতু দশমে দত্তাত্রেয় পুরঃ সরঃ॥
একোনবিংশ ত্রেতায়াং সর্ব্বক্ষত্রান্তকোঽভৎ।
জমদগ্ন্য স্তথাষষ্ঠো বিশ্বামিত্র পুরঃ সরঃ॥
চতুর্ব্বিংশে যুগে রামো বশিষ্ঠেন পুরোধসা।
সপ্তমে রাবণস্থার্থে যজ্ঞে দশরথাত্মজ॥
অষ্টমে দ্বাপরে বিষ্ণু রষ্টাবিংশে পরাশরাৎ।
বেদব্যাস স্ততো যজ্ঞে জাতুকর্ণ পুরঃ সরঃ॥
দেবক্যাং বসুদেবাত্ত ব্রহ্মগর্গ পুরঃ সরঃ।
অষ্টাবিংশ স্যাস্য দ্বাপর স্যাংশসংক্ষয়ে॥
নষ্টেধর্ম্মে তদ্‌যজ্ঞে বিষ্ণু বৃষ্ণিকুলে স্বয়ম্॥ ৭৮

কালকে কর্ম্মালোড়ণের হেতু জানিয়াই আর্য্যঋষি কালতত্ত্ব লইয়া বহুপ্রকারের গবেষণা করিয়া ছিলেন। আধুনিক-শিক্ষিতগণ, বর্ত্তমানে সেইতত্ত্বের আলোচনাকে যদিও বৃথাজ্ঞান বলিয়া বর্জ্জন করুণ, কিন্তু কালশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে, কর্ম্ম-জগতে কালনির্ণয়ের প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে। কালের অনুবর্ত্তণবিনা কেবল চেষ্টায় কখনও কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে কি? আধার বিনা কর্ম্ম-সমাধা হয় না। সেই আধারই একটি কাল ও একটী স্থান বা পাত্র। ব্যাকরণমতে তাহাই

কালতত্ত্ব

ক্রিয়ার কালাধিকরণ ও আধার অধিকরণরূপ কর্ম্মের আশ্রয়। অকালে, উত্তম ভূমিতে বহু শ্রম চেষ্টা করিয়া, উত্তম বীজ রোপণেও, বৃক্ষের উদ্ভব হইবে না; বৃক্ষ হইলেও ফল দিবে না। তাই চেষ্টা ও স্থান হইতেও কালতত্ত্ব জ্ঞানের অধিক প্রয়োজন। এই জন্যই ঋষিগণ এই কালতত্ত্ব লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। কালকে নানা প্রকারে বিভাগ করিয়া, তাহাদের পৃথকসত্ত্বার শক্তি নির্ণয় করিয়াছিলেন। প্রাচীন-হিন্দু এই কালমতে আহার বিহার নির্দ্দেশ করিয়া, নিরোগতা ও শরীরের বলাদি শক্তির বর্দ্ধন করিয়াছিলেন; সন্তান-জননে কালনির্ণয়ে শ্রেষ্ঠ রূপ, গুণ, শক্তিমান দেব-সন্তান লাভের উপায় ও কর্ম্মের সাফল্য ও কল্যাণ-লাভকে নিশ্চিত করিয়া ছিলেন। এককথায় ব্রহ্মের মতই নিরাকার, অনন্ত অসীম কাল-দেবতাকে সদা সাফল্য দান করিতে, তাঁহারা দাস করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। নব্য-সভ্যতায় এই কাল-সাধনার বিলোপেই, আজ জগতের আরোগ্যাদি কল্যাণ ও সুখ-শান্তি, কর্ম্ম-সাফল্য ও সৎসন্তানাদির লাভ দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। এই কালতত্ত্বের বিলোপে মানবের অতি প্রয়োজনীয় একটী মহাজ্ঞান বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে।

কর্ম্মের ভাব ও কর্ম্মপ্রেরণা, কালের শক্তিতেই জীবমধ্যে প্রকাশিত হয়। নাট্যাভিনয়-কালে, যেমন তাহার কর্ম্মস্চীচ-রূপ প্রোগ্রাম মতেই দৃশ্য ও অভিনেতার প্রকাশ ও অভিনয় সমাধা হয়, কালই তেমন এই বিশ্বনাট্যের সেই প্রোগ্রাম। কালধর্ম্মেই নিশা আসিলে জগত নিদ্রাতুর হইয়া উঠে, আবার দিবার আগমন মাত্র জাগিয়া কর্ম্মরত হয়; কাল-স্বভাবেই ক্রমে ষড়ঋতু জগতকে ভিন্ন ভিন্ন ফল ফুলাদিতে, ভিন্নভাবে সাজাইয়া জীবের প্রাণে ভিন্ন প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলে; কাল-শক্তিতেই নারী ঋতু-

কর্ম্মালোড়ণের মূলই কাল

মতী হইয়া গর্ভ ধারণ করে, কাল-স্বভাবেই গর্ভ ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া সন্তানরূপে প্রসূত হয়; কাল-ধর্ম্মেই জীবদেহে বাল্য, কৈশোর, যৌবনাদি অবস্থার সঙ্গে ভিন্ন-আকার, ভিন্ন-স্বভাব, বৃত্তি আদির প্রকাশ পায়। জগতকে, জীবকে কলয়ন—সর্ব্বদা অলোড়ন করেন বলিয়াই যে, এই শক্তিকে ঋষি কাল নাম দান করিয়াছেন। আমরা যেমন কোন কর্ম্ম করিতে; তাহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থার বিষয় নির্ণয় করিয়া, সেই মতে কর্ম্ম সমাধা করি; ভগবানের সৃষ্টিরাজ্য-বিষয়ে সেই চিন্তাই কালশক্তি, জীবের কর্ম্মের নিয়তিচক্র. আর্য্যঋষি সাধনা-বলে কালতত্ত্বরা তাহা জানিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। ঋষিমতে, কাল যখন পৃথক-অস্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তিমান সত্তা, তখন কালের বিভাগগুলি প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক দেব-সত্ত্বা। তাই হিন্দুর বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধকালে, রাত্রি অভিমানী-দেবতা, দিবাভিমানী-দেবতা হইতে, ঋতু, বর্ষ, তিথি, দণ্ডাধিপতি দেবের পূজা করিতে হয়। এই কাল-সত্ত্বাকে বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী ও নারায়ণের সুদর্শন চক্র বলেন; শৈব ও শাক্তগণ শিবশক্তি-কালীকা দেবী বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণে গোপ গোপীনীর ও যমুনার গতির মত, কালপ্রভাবে গুপ্তসত্ত্বা ও কর্ম্মপ্রবাহ গতিশীল হয়; সুদর্শণচক্রই কালচক্রের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া জগতকে কর্ম্মপথে ঘুরাইতেছে; কাগজের বুকে কালীর লিখা নিয়মাবলীর মত, মহাকালের বুকে কালীমাতা দাঁড়াইয়া, নাচিয়া নাচিয়া জগতের জীবকুলকে কর্ম্ম-পথে নাচাইতেছেন। কাল ব্রহ্মের মতই দুর্ব্বোধ্য, অসীম দৈবসত্ত্বা হইলেও জীবের কর্ম্মের মূলসূত্র।

কাল অসীম হইলেও শক্তি-বিভেদাদির পার্থক্য ধরিয়া, তাহাকে পৃথক অংশে বিভাগ করা যায়। তাহাই দিবা, রাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ, মাস, ঋতু, ও বর্ষাদি কালবিভাগ। চন্দ্রের পৃথক প্রকাশ ধরিয়া, রাত্রি, তিথি, পক্ষাদি বিভাগ, আবার সূর্য্যের অবস্থাভেদে দিবা, ঋতু, অয়ন, বর্ষাদি বিভাগ করা হইয়াছে। ঋষি সাধারণের বোধাতীত দণ্ড, মুহূর্ত্ত, যাম, বার, নক্ষত্রাদি আরও অনেক পৃথক কাল-সত্ত্বা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই চন্দ্র সূর্য্যের বিভাগের মত প্রতিজীবের মধ্যেও গর্ভস্থ, জন্ম, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু পর্য্যন্ত

অষ্টটি পৃথক-অবস্থাকেও একরূপ কাল-বিভাগ করা হয়; তাহাই গর্ভস্থ-কাল, জন্মকাল, বাল্য-কালাদি রূপে কাল-বিভাগ। দিবা, রাত্রি, তিথি আদি বিভেদ সর্ব্ব জগতেরই একরূপ। কিন্তু এই জীবের কাল-বিভাগ তাহার আয়ুর অনুরূপ, অতি অল্প ও অনেক অধিক কাল স্থায়ী। যেমন যেই কীটের আয়ু মাত্র কয়েক ঘণ্টা, ইহার মধ্যেই তাহার দেহ জন্মহইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত অষ্টদশা ভোগ করিয়া, পুত্র, পৌত্র মুখ দেখিয়া জীবন শেষ করে; আর মানব শতবর্ষে তাহা ভোগ করে। মানব হইতেও তাহদের আশ্রয় পৃথিবী ও পৃথিবীর উর্দ্ধ-লোকবাসী দেবতানামক প্রাণিবর্গের আয়ু আরও অনেক অধিক; তাঁহাদের জন্ম, বাল্যাদি বিভেদের কালও মানব হইতে অনেক অধিক। কীট যেমন কয়েকঘণ্টা বাঁচে বলিয়া, জগতের দিবা-রাত্রির বিভাগ, ঋতু বিভাগাদির সংবাদও রাখে না, সাধারণ-মানবের নিকট এই পৃথিবী ও দেবতাদের কাল-বিভেদও তেমন দুর্ব্বোধ্য-তত্ত্ব; তাহা বলিয়া সেই বিভাগকে নাই বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হিন্দুর শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ দেবলোকেরও উর্দ্ধের ব্রহ্মলোক-বাসী ব্রহ্মর্ষি। তাই তাঁহারা তাঁহাদের দেশের সময়-বিভাগ-দ্বারা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহাদের লিখা বুঝিতে হইলে, তাঁহাদের কালতত্ত্ব জানিয়া লইবার প্রয়োজন। তাঁহাদের রাজ্যের কালবিভাগই, যুগ, মন্বন্তর, কল্প ও পরার্দ্ধাদি সজ্ঞা বিভাগ।

সৃষ্টপদার্থ মাত্রই প্রাণী। যাহার অস্তিত্ব ও গুণ-কর্ম্ম প্রকাশ আছে, তাহার প্রাণ থাকিতে হইবেই, এবং তাহার জন্ম হইতে মরণপর্য্যন্ত অবস্থাবিভেদও থাকিবেই। কাষ্ঠ ও প্রস্তরের পর্য্যন্ত প্রাণসত্ত্বা আছে। সেই সত্ত্বার বিলোপ হইলেই, তাহাদের পরমাণুসমূহ বন্ধন-হীন হইয়া পাঁচয়া উঠিবে। পৃথিবীর পরমাণুগুলি যখন পৃথক হইতেছে না, তখন সেও জীবিত একটী বৃহৎ-প্রাণী। তাহার গর্ভবাস হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত অষ্টঅবস্থান্তরও ঘটে নিশ্চয়। হিন্দু-শাস্ত্রে ব্রহ্ম-কল্পনামে পৃথিবীর গর্ভাধান, পদ্মকল্পনামে গর্ভবাস ও বরাহকল্প নামে বাল্য হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বরাহ কল্পের চতুর্দ্দশ পৃথক মনুর শাসন-কালই, পৃথিবীর শৈশব, বাল্য,

কৈশোর, যৌবনাদি অবস্থান্তর হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অথবা পৃথিবীর আয়ু এককল্পকাল যেন বর্ষ. আর তাহার পৃথক পৃথক ঋতু-কাল এক এক মন্বন্তর কাল, দিব্যযুগ দিবস এবং চতুর্যুগ দিবা ও রাত্রির চারি চারি প্রহর—পূর্ব্বাহ্ন. মধ্যাহ্ন. অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা। দেবতাগণের বাসস্থান চন্দ্র লোকের ঊর্দ্ধে ভূর্বঃ স্ব ও জন লোক—বোধহয় মঙ্গল, বুধ ও শনি গ্রহ। ভূর্বঃ মঙ্গলে অসুর, যক্ষ, রাক্ষসাদি উপদেব. স্ব বুধে দেবতা ও জন শনিতে ঋষিগণ অবস্থান করেন। ইহারা মন্বন্তর পরে পরিবর্ত্তিত হন. তাই ইহারা মন্বন্তর-জীবী দেবতা। এই তিন লোকের ঊর্দ্ধে মহ, তপ ও সত্য লোক নামে তিনটি জীবস্থান আছে: তাহার দেবতারূপ জীবগণের আয়ু আরও অধিক। সেই তিনধাম বোধহয় শুক্র, বৃহস্পতি ও সূর্য্যমণ্ডল। মহরূপ শুক্রে ভৃগু. দক্ষাদি শাস্ত্রকর্ত্তা ব্রহ্মর্ষিগণ, তপ বৃহস্পতিতে নারদ শনকাদি সিদ্ধগণ. আর সত্য সূর্য্যমণ্ডলে বিষ্ণুলোক, শিবলোক. শক্তিলোক ও ব্রহ্মালোক অবস্থিত। ইহার মহ ও জনলোক বাসীগণ কল্পজীবী, কল্পান্তে দেহত্যাগ করিয়া, নিদ্রাকালে প্রবৃত্তি-লয়ের মত ইহারা সত্যলোক লীন হন; আবার কল্পান্তে নবদেহ ধরিয়া নামিয়া আসেন। সত্যলোক-বাসী চারি দেবসত্ত্বার এককল্পকালে এক দিবা মাত্র। আবার তেমনি সময় রাত্রির নিদ্রাভোগ করিয়া, ইহারা জাগিয়া আবার পৃথিবী ও প্রাণীবর্গ সৃজন করিয়া খেলা দেখেন। এইরূপ দিবায় ত্রিংশতদিবসে মাস, দ্বাদশমাসে বর্ষ ধরিয়া শত-বর্ষপরে সেই সত্যলোক সূর্য্যমণ্ডলের আয়ু শেষ হয়, সেই দেব-চতুষ্টয় দেহত্যাগ করিয়া পরব্রহ্ম ভগবানে যাইয়া মিলিত হন; সূর্য্যের তেজোময় পরমাণু বন্ধন বিছিন্ন হইয়া তখন সূর্য্যও বিলয় পাইয়া যায়। সূর্য্য মণ্ডলের আয়ুর প্রথম পঞ্চাশত বর্ষকে পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষ পঞ্চাশত বর্ষকে পরার্দ্ধ বলা হয়। বর্ত্তমানে পরার্দ্ধের প্রথম কল্পের বৈবস্বতনামীয় সপ্তম-মন্বন্তরে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিযুগ চলিতেছে বলিয়া, হিন্দুশাস্ত্রে সংখ্যা পাওয়া যায়। ইহাতেই বুঝাযায় হিন্দুশাস্ত্র কত প্রাচীনকাল হইতে সময় গণনা করিয়া আসিতেছেন. এই সভ্যতার শাস্ত্র গ্রন্থ কত প্রাচীন কালের।

ভুব, স্ব ও জনলোক[illegible]
জীবী। সেই মন্বন্তরকে [illegible]
দিব্যযুগকাল হয়। সেইকাল [illegible]
হইবার সমান কাল। পৃথিবীর [illegible]
দ্বাপর ও কলি নামে চারিটি যুগরূপ [illegible]
তাহার চারিটি চতুর্যুগে এক দিব্য[illegible]
একমন্বন্তর ও তেমন চতুর্দশ মন্বন্তরে [illegible]
পৃথিবীতে দ্বাদশ-ঘণ্টা দিবা ও সেই পরিমাণ সময়ে রাত্রির স্বভাব দেখা দেয়। ঋষিমতে চন্দ্রলোকে একপক্ষ—পঞ্চদশ-দিবসে দিবা ও তেমনি সময়ে রাত্রি-স্বভাব প্রকাশ পায়; শুক্লপক্ষ তাহার দিবা ও কৃষ্ণপক্ষ তাহার রাত্রি-কাল। সূর্য্যমণ্ডলে এক অয়ন—ছয় মাসে দিবা, তেমনি কালে রাত্রিস্বভাব দেখা দেয়; তাই পৃথিবীর একবর্ষে সূর্য্যের এক দিবসকাল। উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি কাল। সূর্য্যমণ্ডলের দিবসকেই দিব্যমাস বলে। এই দিব্যমানে দিবসের ত্রিংশতদিবসে মাস ও দ্বাদশমাসে বর্ষ ধরিয়া দিব্যবর্ষ-কাল হয়। তেমন দ্বাদশ-সহস্র বর্ষে পৃথিবীর একচতুর্যুগ-কাল হইয়া থাকে। ইহার সত্যযুগ চারিসহস্র বর্ষ ও দুই সন্ধ্যাকাল অষ্টশত বর্ষ, ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বর্ষ, সন্ধ্যাদ্বয় ছয়শত বর্ষ, দ্বাপরযুগ দুই সহস্র বর্ষ, সন্ধ্যা চারিশত বর্ষ, আর কলিযুগ সহস্র বর্ষ সন্ধ্যা দুইশত বর্ষ কাল। সন্ধ্যা অংশ ছাড়িয়া দশ-সহস্র দিব্যবর্ষে চারিযুগ হইয়া থাকে। দিব্য-দ্বাদশ সহস্রবর্ষ, পৃথিবীর মানে ৪৩২০০০০০০০ চারিশত দ্বাত্রিংশত কোটীবর্ষে সেই চারি যুগকাল গত হয়। চারিযুগ × ৪ = দিব্যযুগ। দিব্যযুগ × ৭১ = মন্বন্তর। মন্বন্তর × ১৪ = কল্পকাল, তার পরে পৃথিবী জল-প্লাবনে গলিয়া যায়। কল্পান্তে নূতন সৃষ্টিতে আবার ব্রহ্মকল্প, পদ্মকল্প পরে বিষ্ণু বরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, আবার জগত সৃষ্টি হয়। সূর্য্যমণ্ডল লয়ের কালে ভূ, র্ভুব, স্ব, মহতপ সমস্ত লোক, চন্দ্র, তারকা, গ্রহাদিও একেবারে বিনষ্ট হইয়া ভগবানে মিলিয়া যায়। হিন্দু-শাস্ত্রে পৃথিবী ও সূর্য্য-সম্বন্ধে এই ঋষি-মীমাংশা পাওয়া যায়।

ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মর্ষিগণই হিন্দুর শাস্ত্রকর্ত্তা-ঋষি। তাঁহাদের